সচিত্র শিশির

৪৬শ বর্ষ

১ম সংখ্যা

আষাঢ়, — চৈত্র

১৩৭৩-৭৪

সচিত্র শিশির

৪৬শ বর্ষ
১ম সংখ্যা
আষাঢ়, —জ্যৈষ্ঠ
১৩৭৩-৭৪

৪৬শ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৭৩ | ১ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণ-অভিযোগের প্রতিকার

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগ থাকা খুবই স্বাভাবিক। এবং সে অভিযোগের যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকা সুস্থ গণতন্ত্রের পরিচায়ক। শান্তিপূর্ণ ও সংবিধান সম্মত উপায়ে অভিযোগ জানানর ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকলে গণতন্ত্রের বনিয়াদ শক্ত হয় এবং জনসাধারণও তাদের অভিযোগের প্রতিকার আদায় করে নিতে পারেন।

ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীগজেন্দ্র গদকরের মতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হিংসাত্মক বিক্ষোভ কিংবা অহিংস অনশন কোনোটাই গণ-অভিযোগ জানাবার সঙ্গত পন্থা হতে পারে না। শ্রীগদকর একজন আইনজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তি। তাঁর মতে, সরকারের কাছে জনতার অভিযোগ পৌঁছিবার এবং তার দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকা খুবই সমীচীন। তিনি জানেন যে আমাদের দেশে কাগজে কলমে সে সুযোগ স্বীকৃত হলেও বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই। তাই দেখা গেছে যে, রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ না জানিয়ে কিংবা শান্তিপূর্ণ ভাবে অনশনের পথে না গিয়ে কোন গণ-অভিযোগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তার প্রতিকার আদায় করা সম্ভব হয়নি।

নিরস্ত্র জনতার অমোঘ অস্ত্র হিসাবে স্বাধীনতা-পূর্ব কালে গান্ধীজী অনশনকে রাজনৈতিক সংগ্রামে ব্যবহার করেছিলেন। বর্তমানে তার পটভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে গেছে ঠিকই। কিন্তু আবেদন-নিবেদন ও শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেও যখন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় না, তখন

অনশনকে দাবি আদায়ের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে হয় বই কি! যদিও অবশ্য সরকারী কর্ণধারেরা অনশনকে সুনজরে দেখেন না, এবং এটাকে জবরদস্তি বলেই মনে করেন! কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অভিযোগ জানাবার অধিকার স্বীকৃত হলেও তার দ্বারা সমস্যার প্রতিকারের খুব বেশী দৃষ্টান্ত সরকার স্থাপন করার সুযোগ দেননি।

আবেদন-নিবেদন-বিক্ষোভ প্রদর্শন কিংবা অনশনও যখন ব্যর্থ হয়, তখন হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া আর কি কোন উপায় থাকে? দেখা গেছে যে, জনসাধারণের ন্যূনতম ন্যায্য দাবি যখন ক্রমাগত উপেক্ষিত ও অবহেলিত হতে থাকে এবং শত আবেদন-নিবেদন করেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় না, তখন বাঁচার তাগিদে বাধ্য হয়ে জনসাধারণকে হিংসার মোক্ষম অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়। এর জন্য রাজনৈতিক দলগুলির কিছুটা সাহায্য হয়ত থাকতে পারে,—কিন্তু প্ররোচনার কোন প্রয়োজন থাকে না। জনসাধারণকে সে প্ররোচনা দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন সরকার নিজেই। জনসাধারণের আজ বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে গণতন্ত্রসম্মত উপায়ে তাদের অভিযোগের প্রতিকার আদায় করা সম্ভব নয়। এই ধারণার ফলেই ভারতবর্ষে আজ প্রতিটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ, অনশন ও হিংসার পথ অবলম্বন করার ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যে সর্বনাশা পথে দেশ আজ এগিয়ে চলেছে তার শেষ কোথায়!—এ প্রশ্ন আজ সকলের মনে খুব স্বাভাবিক ভাবেই উঁকি মারছে। শ্রীগজেন্দ্র গদকর এই দুর্লক্ষণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে এ বিষয়ে অবহিত হতে হবে। সংবাদপত্রে অথবা জনসভার মারফত জনমতের যে অভিব্যক্তি প্রতিফলিত হয় তার প্রতি সম্মান দেখিয়ে গণতান্ত্রিক সরকারকে সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে, [illegible]' হলেই বিক্ষোভ বা অনশনের দ্বারা জনসাধারণকে অভিযোগ প্রতিকারের পথ সন্ধান করতে হবে না। গণতান্ত্রিক উপায়ে অভিযোগ প্রকাশ এবং অনতিবিলম্বে তার প্রতিকারে সরকারের সহযোগিতামূলক সম্মতিই এ সমস্যা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়। এদিক থেকে শ্রীগদকর বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন।

সরকার যদি জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ না করেন, এবং তার মধ্যে সহানুভূতি ও সহযোগিতামূলক মনোভাব যদি না থাকে, তাহলে কখনওই কল্যাণ রাষ্ট্রের বনিয়াদ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অনশন অথবা বিক্ষোভ-শোভাযাত্রাকে জবরদস্তি অথবা দুঃস্বপ্নরূপে গ্রহণ করলেও সরকারী কর্ণধারদের একথা মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অভিযোগ জানাবার অধিকার স্বীকৃত হলেও তার প্রতি কতটুকু মনোযোগ দেওয়া হয়েছে? ভারতবর্ষের জনসাধারণ আজ বুঝেছে যে বন্‌ধ-এর আহ্বান না দিলে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাবে না। এ ধারণা জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেলে সরকারের প্রতি কতটুকু আস্থা থাকে? এই থেকেই গড়ে উঠছে জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে বিভেদের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর,—যা পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র রীতি-বিরুদ্ধ।

জনমত সংগঠনের এই গুরু দায়িত্বে বুদ্ধিজীবী ও সংবাদপত্রের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। গণতন্ত্রের সুস্থ আদর্শ রক্ষার জন্য এর প্রয়োজন অপরিসীম। দেশের স্বার্থে দলমত-শূন্য বুদ্ধিজীবীদের জনমত সংগঠনের বিরাট ভূমিকা আছে। এবং সরকারেরও সেই সংগঠিত জনমতকে যথোচিত গুরুত্ব ও মর্যাদা দেওয়া কর্তব্য। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রাজনৈতিক ভ্রা বুদ্ধির বশে গণতান্ত্রিক পথ যেন আমরা কখনও রুদ্ধ করে না দেই।
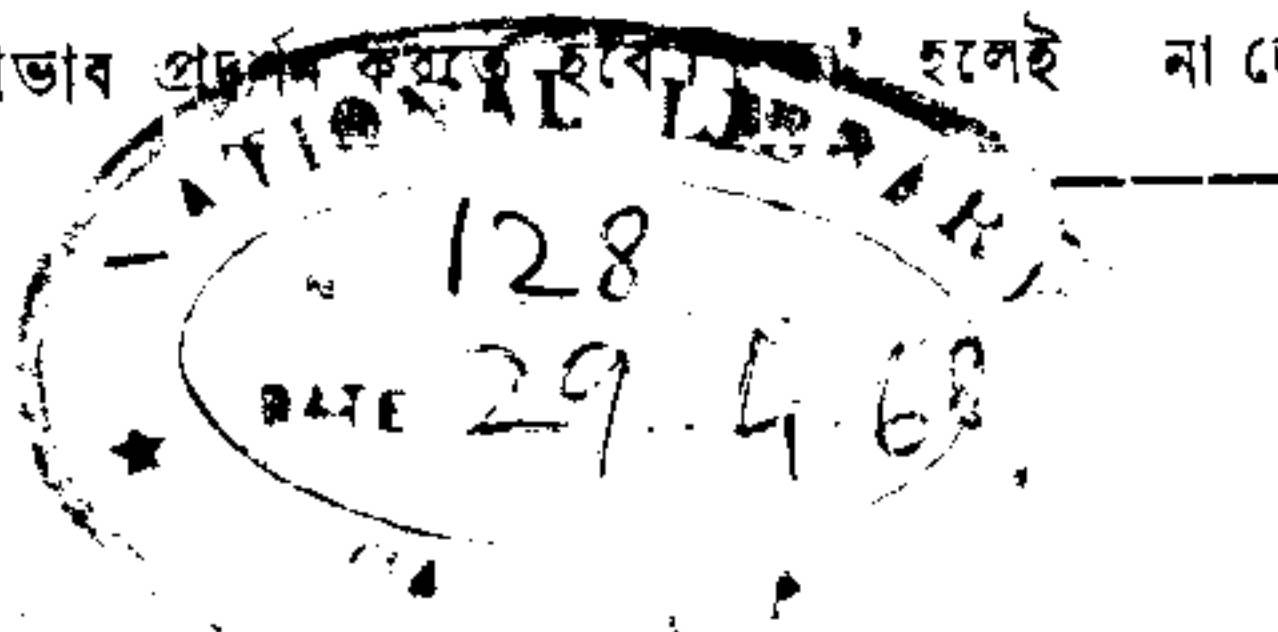
রঙ্গচিত্র

আজ্ঞে, চেহারা আগে ভালই ছিল। তবে এখনকার রেশনের ঠেলায় একটু শুকিয়ে গেছে।

মুহূর্তের জন্যে

সংস্মিতা

উৎসাহের আতিশয্যে ও মুহূর্তের উত্তেজনায় অনেকে এমন কাণ্ড করে বসে যার মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু এই অহেতুক আতিশয্য যদি শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে যায়, সেটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

সম্প্রতি কলকাতায় মার্কিন দূতাবাস, লাইব্রেরী ইত্যাদির উপর সুপরিকল্পিত ভাবে যে উপায়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে, তার দ্বারা আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতাই প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়বস্তু ছিল ভিয়েৎনাম; আর তার বিক্ষোভ প্রকাশ হল কলকাতাস্থিত মার্কিন লাইব্রেরী পুড়িয়ে দিয়ে ও মার্কিন পতাকা লাঞ্ছিত করে—এর চেয়ে কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত অবিবেচনা প্রসূত কাজ আর কি হতে পারে! বন্ধু রাষ্ট্রের পতাকা লাঞ্ছনা অথবা বৈদেশিক অফিসে অগ্নি সংযোগের ঘটনায় সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক মাত্রেই বিচলিত হবেন, সন্দেহ নেই। উগ্রপন্থী বিক্ষোভ-কারীরা শিষ্টাচার রীতি বিরোধী এই ধরনের ঘটনার অনুষ্ঠানকেই বিক্ষোভ প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলে ধরে নিয়েছেন।

ক'দিন ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠান—'ডলারের বন্ধন ছিন্ন কর'—প্রকাশ্য রাজপথের শোভা বর্ধন করছিল। ডলারের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক মোহ ও তার অবশ্যম্ভাবী কুফল সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করাই এই অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয়-বস্তু ছিল।

বন্ধু-রাষ্ট্রের প্রতি শিষ্টাচার বিরোধী এ-ধরনের বিক্ষোভ প্রকাশের মধ্য দিয়ে আমাদের সুনাম কি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না? অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এ-ধরনের বিদ্বেষমূলক মনোভাব গ্রহণ কতদূর বাঞ্ছনীয়, সেটা একটু ভেবে দেখবার বিষয়।

অবশ্য আমাদের সরকার মার্কিন পতাকা লাঞ্ছনার ঘটনায় উদ্‌বিগ্ন হয়ে কিছুটা কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে-ছেন। এ নীতি কিছু আগে গ্রহণ করলে এ-জাতীয় অপ্রীতিকর ঘটনাগুলি হয়ত এড়ান সম্ভব হত। কিন্তু রাজ-নীতি ও দলীয় নীতির ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে কূটনৈতিক শিষ্টা-চারকে জলাঞ্জলি দিলে আমাদের গৌরব কি তাতে বৃদ্ধি পাবে?

* * *

তামাম ভারতবর্ষে প্রকৃতির বিচিত্র লীলা চলেছে। বাঙলা দেশে বিলম্বিত বৃষ্টির জন্য সাধারণ মানুষ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। দেরিতে হলেও বৃষ্টি নামল। আবার আসামে বন্যার তাণ্ডবে লক্ষ লক্ষ নরনারী, কোটি কোটি টাকার ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট ও বিপর্যস্ত হয়েছে। ওদিকে বোম্বাই-এ জলের জন্য হাহাকার ধ্বনি উঠেছে। বহু আবেদন-নিবেদন ও প্রার্থনা অনুষ্ঠানের দ্বারা বরুণ দেব প্রীত হয়ে বোম্বাইয়ের জল-সমস্যার সুরাহা করে দিয়েছেন। উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি না নামলে যে কি দুঃসহ অবস্থার উদ্ভব হত, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

এ-ধরনের বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনায় প্রকৃতির কাছে মানুষ যে কত অসহায় তা' বারে বারে প্রমাণিত হচ্ছে। বিলাস-ব্যসনের প্রাসাদ বানালেও প্রতিটি মৌলিক বিষয়ে এখনও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।

শক্তি ও প্রতিপত্তির দম্ভে মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলে। ভুলে যায় মানুষ প্রকৃতির হাতে সে ক্রীড়নক মাত্র। যথেচ্ছভাবে বন কেটে বসত গড়ার খেসারত দিতে হবে বই কি! বিজ্ঞানের প্রসারে কল-কারখানার সংখ্যা বহু গুণ বেড়ে গেছে। শিল্প কারখানার জলের রাক্ষুসে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য মানুষের প্রয়োজনের জলে টান পড়েছে। তাই একদিকে সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপর দিকে দুঃসহ দুর্দশার সৃষ্টি হচ্ছে। কৃত্রিমতার স্পর্শে মানুষের জীবন থেকে প্রকৃতির সজীবতা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমাদের জীবনে ডেকে এনেছে চরম সঙ্কট ও অনিশ্চয়তা। প্রকৃতিকে বশে আনতে গিয়ে বারে বারে মানুষকে-ই তার কাছে নতি স্বীকার করতে হচ্ছে!

———

জড় জগতের পরিবেশ ও আকর্ষণময়ী আলোক মণ্ডল

চক্রের অভিজ্ঞতা

ছয়

মানব দেহের উপর ভরকারী প্রেতাত্মারা অনেক সময় প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছায় প্রণোদিত হয়; অনেক সময় আবার তারা যে দেহের উপর আশ্রয় গ্রহণ করেছে সেই দেহকেই যন্ত্রণা দিতে শুরু করে—তারা বলে যে সেই দেহ নাকি তাদের ব্যক্তিত্বে আঘাত করেছে।

এই সব যন্ত্রণাদানকারী প্রেতাত্মারা (Tormenting spirits) মানব-দেহের উপর ভর ক'রে তাদের অশেষ যন্ত্রণা দেয় এবং ব্যক্তিকে নিজ-দেহের উপর আঘাত করতে বাধ্য করে। কিন্তু দেহের আঘাত-জনিত কোন বেদনাই সেই প্রেতাত্মারা অনুভব করে না, যদিও অনেক সময় তারা আশ্রয়-গ্রহণকারী দেহকে নিজের দেহ বলেই মনে করে।

মিসেস এল. ডাবলু তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর অধিকাংশ সময়ই বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন এবং সেই সময় তিনি যেন কিসের আহ্বান শুনতে পেতেন। প্রেতাত্মার অস্ফুট আহ্বানে বিচলিতা হয়ে তিনি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতেন এবং আকুল স্বরে ক্রন্দন করতে করতে নিজের চুল ছিঁড়তেন।

এই সময় তাঁর কন্যা মায়ের চারিদিকে প্রেতাত্মার আবির্ভাব দেখতে পেতেন। তাঁর কন্যা ছিলেন দিব্য-দৃষ্টির অধিকারিণী (clairvoyant)। তিনি দেখতেন যে একটি ভীষণ-দর্শন বৃদ্ধ তাঁর মায়ের চারপাশে দাঁত খিঁচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রুগিণীও এই সময় চীৎকার ক'রে উঠত, 'ওই আবার সেই ভয়ঙ্কর লোকটা আসছে গো'।

রুগিণীকে স্থান পরিবর্তনের জন্য সেন্ট লুইসে নিয়ে যাওয়া হ'ল, কিন্তু কোন ফলই হ'ল না; বরং আক্রমণ বেড়েই চলল। আক্রমণের সময় রুগিণী তার হাত কামড়াত, মাথার চুল ছিঁড়ত এবং নিজের পায়ের চটি খুলে নিজের গালে মুখে মারত।

ক্রমশঃই রুগিণীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল এবং তাঁকে পাগল বলে গণ্য ক'রে একটি বাতুলাশ্রমের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রাখা হ'ল। সেখানে এক বছর অবস্থান করেও তাঁর অবস্থার কোন পরিবর্তন হ'ল না। বাতুলাশ্রম থেকে তিনবার পলায়নের পর, তাঁকে চক্র-বৈঠকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় এবং তিন মাসের মধ্যেই তাঁর উপর আশ্রয়-গ্রহণকারী প্রেতাত্মাদের তাঁর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেওয়া হয় এবং তাদের মিসেস্ উইকল্যাণ্ডের দেহে অনুপ্রবিষ্ট করা হয়। তারপর থেকে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং স্বাভাবিকভাবে গৃহ-সংসারের কাজে যোগদান করেন।

রুগিণীর চারপাশে দৃষ্ট সেই দাঁত খিঁচানো প্রেতাত্মাটিকে রুগিণীর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, মিসেস উইকল্যাণ্ডের দেহে কয়েক দিন পরে প্রবেশ করান হয়।

* * *

প্রেতাত্মাটি মুক্ত হবার জন্য ঝটাপটি শুরু করায়, তাকে সংযত করবার প্রয়োজন হয়।

প্রেতাত্মা: কেন আপনারা আমাকে ধরে আছেন? আপনাদের মত লোকের সঙ্গে আমার কোন কাজই নেই, আপনাদের কাউকেই আমি পছন্দ করি না। আমাকে ধরে রাখবার কি অধিকার আপনাদের আছে? আমি আপনাদের কোন ক্ষতি করিনি—কিন্তু এবার বেরিয়ে এলেই তা' করব ব'লে রাখছি।

ডাক্তার: আপনি নবাগত অপরিচিত হয়ে এখানে এসেই ঝটাপটি শুরু করলেন। সুতরাং আপনাকে ধরে না রেখে উপায় কি বলুন?

প্রেতাত্মা: এভাবে ধরে রাখা আমি পছন্দ করি না।

ডাক্তার: আপনি কে?

প্রেতাত্মা: কে তা' আপনাদের কেন বলব। আপনাদের আমি গ্রাহ্যই করি না। আমায় ছেড়ে দিন, চলে যাই।

ডাক্তার: রাগ করছেন কেন বন্ধু? বলুন না কে আপনি? আমাদের মনে হচ্ছে আপনি একটি বেশ শক্ত সামর্থ্য মেয়ে, তাই না?

প্রেতাত্মা: আমাকে মেয়ে মনে করবার আগে একবার

আমার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখুন ত ?

ডাক্তার : কোথা থেকে আপনি আসছেন, কি চান আপনি তা' আমাদের বলুন।

প্রেতাত্মা : আপনার তাতে প্রয়োজন কি ?

ডাক্তার : আমরা আপনার বর্তমান অবস্থায় সাহায্য করতে পারব।

প্রেতাত্মা : অত জোরে আমাকে ধরবেন না, বলছি সব।

ডাক্তার : হ্যাঁ, আপনার সব কথা আমাদের খুলে বলুন।

প্রেতাত্মা : প্রথমতঃ আমি ওইসব ছুঁচগুলো সহ্য করতে পারি না (রুগীকে প্রদত্ত বৈদ্যুতিক চিকিৎসা)। তারপর অনেকক্ষণ আমাকে বদ্ধ ক'রে রাখা হয়েছে। কেন, কিসের জন্য আমার গায়ে ওই ছুঁচগুলো বিদ্ধ করেছিলেন বলুন ত ? এখান থেকে যদি মুক্তি পাই, তবে সোজা বাড়ী চলে যাব।

ডাক্তার : আপনার বাড়ী কোথায় ?

প্রেতাত্মা : কোথায় আবার, যেখান থেকে এসেছি সেখানে!

ডাক্তার : এখানে কি ক'রে এলেন ?

প্রেতাত্মা : জানি না।

ডাক্তার : কোন প্রিয়জনকে অনুসরণ করেই কি এখানে এসেছেন ?

প্রেতাত্মা : আমার প্রিয় আমি নিজেই।

ডাক্তার : সম্প্রতি আপনি কোথায় ছিলেন ?

প্রেতাত্মা : অন্ধকারে, নিবিড় ঘন অন্ধকারে। আমি বাড়ী থেকে চলে এসেছিলাম। তারপর আর কিছুই দেখতে পাই নি—অন্ধকার, সব অন্ধকার। মনে হয়েছিল যে আমি বোধহয় অন্ধ হ'য়ে গেছি।

ডাক্তার : আচ্ছা যেখানে আপনি ছিলেন এবং সেখানটাকে আপনি বাড়ী বলছেন, সেখানে কি আপনার কোন কিছুই আশ্চর্যবোধ হয় নি ?

প্রেতাত্মা : সেটা আমার আসল ঘর ছিল না ; তবে অনেকটা সেই রকম।

ডাক্তার : আচ্ছা, সময় সময় কি বিরক্ত হয়ে আপনি কোন বিচিত্র বা অদ্ভুত ব্যবহার করতেন না ?

প্রেতাত্মা : অনেক সময় আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না যে কোথায় আছি। অনেক সময় আমরা হাতাহাতি শুরু করতাম। আমার আশেপাশে অনেকেই ছিল—একদিন সব ব্যাটাকে একসঙ্গে পাব।

ডাক্তার : তারা কে ?

প্রেতাত্মা : কে জানে কে ? নানা ধরনের নানা লোক।

ডাক্তার : তাদের মধ্যে কোন নারী ছিল কি ?

প্রেতাত্মা : বহু বহু। নারী! একদিন আমি সব কটাকে একসঙ্গে ধরে আছাড় মারব, বুঝলেন!

ডাক্তার : আপনি অপরের ক্ষতি করতে চাইছেন কেন, তা'ত বুঝতে পারছি না।

প্রেতাত্মা : একের পর এক একটি নারী এসে আমাকে পাগল ক'রে দেয়। একজনের চারপাশে কুড়ি কয়েক গণ্ডা মেয়েমানুষ থাকে, সে বেচারা কি করতে পারে বলুন ? (রুগীর দেহের আলোকে আবদ্ধ অপরাপর প্রেতাত্মারা।)

ডাক্তার : আপনি কোথায় ছিলেন ?

প্রেতাত্মা : বহু স্থানে ছিলাম—এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে ঘুরে আমি ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠেছি। আমার আশেপাশে খালি স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোক আর স্ত্রীলোক। আমি নারীর উপর তিক্ত, বিরক্ত হয়ে উঠেছি। একটাকে আমি কিল চড় লাথি মেরে ফেলে দিয়েছি, তবুও সে আমায় জড়িয়েছিল (রুগিণী মিসেস এল. ডাবলুকে উল্লেখ করে)। আমার চারপাশে ঝুলে থাকবার তার কোনই প্রয়োজন নেই। একদিন আমি তাকে সুবিধা হলে খুন ক'রে ফেলব, তা' বলে রাখছি।

ডাক্তার : আপনি কি করছেন, তা' জানেন ?

প্রেতাত্মা : আমার জানবার দরকার নেই, আমি কাউকেই কেয়ার করি না। হ্যাঁ, একদিন তার হাতের কবজিখানা মুচড়ে দিলাম, তবু সে আমার সঙ্গে লেপটে রইল, কিছুতেই ছেড়ে গেল না। তারপর সজোরে তার চুল ধরে টানলাম, কিন্তু তবুও সে আমাকে ছাড়ে নি। তার হাত থেকে কিছুতেই আমি রেহাই পাই নি।

ডাক্তার : সেই স্ত্রীলোকটি এখন কোথায় ?

প্রেতাত্মা : কিছুক্ষণ হ'ল আর তাকে দেখছি না।

ডাক্তার : আচ্ছা সেই স্ত্রীলোকটি আপনার কি ক্ষতি করেছে বলতে পারেন ?

প্রেতাত্মা : আমার গায়ে লেপটে থাকবার তার কি

অধিকার, কি প্রয়োজন আছে বলতে পারেন ?

ডাক্তার : আচ্ছা আমরা যদি উলটো কথাটাই বলি। যদি বলি যে আপনিই তার দেহে আশ্রয় করেছিলেন ?

প্রেতাত্মা : আমাকে নারীর বেশে সজ্জিত করবার, মাথায় নারীর মত বড় বড় চুল রাখবার, তার কি অধিকার আছে ?

ডাক্তার : কতদিন হ'ল আপনি মারা গেছেন ?

প্রেতাত্মা : মারা গেছি ! (প্রবল হাস্য)।

ডাক্তার : আচ্ছা মাঝে মাঝে অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে কি আপনি পড়েন নি ?

প্রেতাত্মা : অদ্ভুত বলে অদ্ভুত, যাচ্ছেতাই অবস্থার মধ্যে পড়েছি। আপনার হাতটা বড় গরম, ওটা সরিয়ে নিন।

ডাক্তার : আচ্ছা, সেই স্ত্রীলোকটি কিভাবে আপনাকে সজ্জিত করতে পারে, তা' আপনি ধারণা করতে পারেন কি ? আপনি খুব স্বার্থপর, তাই না ?

প্রেতাত্মা : সে স্বার্থপর, আমি না।

ডাক্তার : আপনি একটি অজ্ঞ প্রেতাত্মা, সেই স্ত্রী-লোকটির চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বুঝলেন ?

প্রেতাত্মা : আমি স্ত্রীলোকের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াব ! না, কখনই না।

ডাক্তার : সত্যই তাই। আপনি একটি মহিলাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিলেন, আমি ইলেকট্রিক নিয়ে আপনাকে তাড়া করেছি, বুঝলেন।

প্রেতাত্মা : তাই নাকি ! ওঃ, আপনিই তবে আমায় বন্দী করেছেন ! (আঘাত করতে উদ্যত) সেই স্ত্রীলোককে হাতে পেলে আমি টুকরো টুকরো ক'রে কেটে ফেলব। সেই বদমাইশ মেয়েমানুষটা আমাকে জড়িয়ে থেকে কম কষ্ট দিয়েছে।

ডাক্তার : সে নয়, আপনিই তাকে জড়িয়ে ছিলেন। এখন তিনি আপনার কবল থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। আপনি চিন্তা করুন যে আপনি একজন পরলোকগত আত্মা এবং ধীরে ধীরে আপনার চেতনা ফিরে আসছে। আমি আপনাকে সত্যি কথাই বলছি।

প্রেতাত্মা : সেই মেয়েমানুষটাকে পেলে তার মুখ আমি থেঁতলে দেব, ভেঙে চুরমার ক'রে দেব। তারপর আমি আপনাকেও দেখে নেব।

ডাক্তার : কেন তাকে আপনি আঘাত করবেন ? সে ত আপনার কোন অনিষ্ট করে নি। দেখুন আপনি যদি শান্ত না হন, তা'হলে আবার আপনাকে 'ইলেকট্রিক শক' দেওয়া হবে। হ্যাঁ, দেখুন আপনি বলছেন যে আপনি একজন পুরুষ মানুষ। কিন্তু আমরা আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমরা শুধু একজন স্ত্রীলোককেই দেখছি।

প্রেতাত্মা : কেন আপনাদের কি চোখ নেই নাকি ? দেখতে পাচ্ছেন না আমি পুরুষ মানুষ ?

ডাক্তার : আপনার স্ত্রীলোকের বেশ দেখতে পাচ্ছি। (You have woman's clothes on.)

প্রেতাত্মা : আমি ওটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আবার আমাকে ওটা পরিয়েছে।

ডাক্তার : সেই স্ত্রীলোককে আপনি এখন ছেড়ে এসেছেন। এখন আপনি অন্য একজন স্ত্রীলোকের দেহে ভর করেছেন।

প্রেতাত্মা : তার মানে ?

ডাক্তার : আপনি জড়-জগতের পরিমণ্ডলে আবদ্ধ একটি অজ্ঞ প্রেতাত্মা, একটি স্ত্রীলোকের পিছু পিছু আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এখন আপনি আমার স্ত্রীর দেহে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

প্রেতাত্মা : আমি কারও দেহে আশ্রয় করি নি। এটা আমার নিজের দেহ। সেই স্ত্রীলোকটা কেন আমাকে জড়িয়ে ছিল ?

ডাক্তার : সে নয়, আপনিই তাকে জড়িয়ে ছিলেন। আপনি ছেড়ে যাবার পর এখন তিনি ভালই আছেন।

প্রেতাত্মা : আপনিই তাহলে আমাকে অন্ধকারে বন্দী করেছেন ?

ডাক্তার : না। উন্নত আত্মারা আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। আপনি আপনার অবস্থা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছেন না কেন ? আপনি স্বার্থপর, ঘোরতর স্বার্থপর ব্যক্তি।

প্রেতাত্মা : একজন স্ত্রীলোক আমাকে জড়িয়ে থাকবে ; সে আমাকে স্ত্রীলোকের বেশ পরাবে, এটা ভাবতে গেলেই আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। আমি স্ত্রীলোককে, নারী-জাতিকে ঘৃণা করি।

ডাক্তার : বিচলিত হবেন না। স্থির হোন, সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করুন, তা' হলেই আপনার চেতনা হবে।

আপনি উন্নত ও সুখী হতে পারবেন।

প্রেতাত্মা : সুখ বলে কিছু নেই।

ডাক্তার : ঈশ্বরকে কখনও উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন কি ? জীবনের প্রকৃত সত্য অবগত হবার চেষ্টা কি কোনদিন করেছেন ?

প্রেতাত্মা : ঈশ্বর বলে কিছু নেই।

ডাক্তার : বৃহত্তর কোন কিছুর যদি অস্তিত্বই না থাকবে, তা' হ'লে আপনার অস্তিত্ব কি ক'রে সম্ভব হ'ল ? কি ক'রে আপনি বেঁচে আছেন ? বলতে পারেন কি ক'রে আপনি আমার স্ত্রীর দেহের মধ্যে থেকে, আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন ?

প্রেতাত্মা : তাহলে কি আপনার স্ত্রীই আমাকে সর্বক্ষণ জড়িয়ে থাকত নাকি ?

ডাক্তার : না। আপনি অন্য একজন স্ত্রীলোককে ভর করেছিলেন। তাঁকে সাহায্যের জন্য এখানে নিয়ে আসা হয়। তাঁকে আমি আপনার কবল থেকে মুক্ত করেছি। উন্নত আত্মারা আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছেন, আপনি এখন আমার স্ত্রীর দেহকে অধিকার করেছেন, বুঝলেন।

প্রেতাত্মা : কি জ্বালা! স্ত্রীলোককে আমি ঘৃণা করি। আমি তাদের উপর ভর করব কেন ? আমার ইচ্ছা হয় তাদের প্রত্যেককে আছড়ে মেরে ফেলি।

ডাক্তার : দেখুন বন্ধু, আপনি যদি সুখী হতে চান, তা'হলে আপনার মনোভাবের পরিবর্তন দরকার। আপনি একজন জড়-জগতের পরিমণ্ডলে ভ্রমণকারী প্রেতাত্মা, আপনার জড়-দেহ নষ্ট হয়েছে। আপনি জড়-দেহের উপর ভর করে তাদের অনিষ্ট করছেন। আপনি সেই স্ত্রীলোক-টির উপর ভর করে তাঁকে ৩।৪ বছর ধরে কষ্ট দিয়েছেন।

প্রেতাত্মা : কেমন করে আমি সেই স্ত্রীলোকটিকে ভর করলাম ? জানেন, আমি স্ত্রীলোককে ঘৃণা করি। কেন তবে তারা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতে পারেন ? সব স্ত্রীলোকই শঠ, প্রবঞ্চক, স্বার্থপর। যতক্ষণ তাদের পেছনে টাকা খরচ করতে পারবেন, তারা ততক্ষণ আপনার—তার-পর সব শুষে নিয়ে আপনাকে দূর ক'রে দেবে।

স্ত্রীলোকের উপর আমি প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা নিয়েছি এবং তা' নেবও। স্ত্রীলোকেই আমার সর্বনাশ করেছে, স্ত্রীলোকের জন্যই আমার [illegible] হয়েছে। আমি প্রতিশোধ নেবই।

ডাক্তার : মাথা ঠাণ্ডা ক'রে আপনার অতীত জীবনের আলোচনা করুন। দেখুন দেখি, আপনি কি কোন দোষ করেন নি ? আপনার কি মনে হয় না যে আপনার বহু দোষ-ত্রুটি ছিল।

প্রেতাত্মা : কোন মানুষই সম্পূর্ণ সৎ বা অসৎ নয়। আমিও সাধারণ মানুষ ছিলাম।

ডাক্তার : জীবন-রহস্যকে জানবার চেষ্টা করুন। আমার মনে হয় বহুদিন হল আপনি মারা গেছেন। উন্নত আত্মারা এখানে আছেন, তাঁরা আপনাকে অনেক নতুন বিষয়ের শিক্ষা দেবেন। আপনাকে এখানে এনে আমার স্ত্রীর দেহের উপর আশ্রয় গ্রহণ করান হয়েছে, কেননা আমরা যাতে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

প্রেতাত্মা : আপনার স্ত্রী খুব নির্বোধ ত! তিনি সম্মতি দিলেন কেন ?

ডাক্তার : তিনি সম্মতি দিয়েছেন, কারণ আপনার মত হতভাগ্য প্রেতাত্মাদের তিনি সাহায্য করতে চান। সব স্ত্রীলোকই অপদার্থ, অন্তঃসারশূন্য নয় (All women are not false)।

প্রেতাত্মা : আমার মা খুব ভাল ছিলেন। তাঁর কথা স্মরণ করেই ত যে স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসি তাকে হত্যা করতে পারি না। আমার মা বছর চল্লিশ আগে মারা গেছেন।

ডাক্তার : আপনিও মারা গেছেন, অবশ্য জড়-দেহের দিক থেকে। দেখুন ত কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি না ?

প্রেতাত্মা : আমি আমার মা'কে দেখতে পাচ্ছি। ওঁকে দেখে আমার বড় ভয় করছে। উনি একজন প্রেতাত্মা।

ডাক্তার : হ্যাঁ, তিনিও আপনার মত প্রেতাত্মা। শুনুন তিনি কি বলছেন।

প্রেতাত্মা : তিনি বলছেন, 'জন, আমি অনেক দিন ধরেই তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি'। আরে দেখুন দেখুন, ওই যে আমার বাবাও দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কী আশ্চর্য লিজিও (Lizzie) যে ওইখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। খবরদার, লিজি দূরে থাক, আমার কাছে এস না। তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই ; বদমাইশ, শয়তানী কোথাকার !

চাইতেই এসেছে।

প্রেতাত্মা : কখনো না, কখনো আমি ওকে ক্ষমা করব না। আমি ওকে ঘৃণা করি।

ডাক্তার : ধীর হোন, শান্ত হোন। মন থেকে ঘৃণার ভাব দূর করুন।

প্রেতাত্মা : লিজি চলে যাও, চলে যাও এখান থেকে। ক্রুর সর্পিনীর মত তুই আমাকে দংশন করেছিস বুঝলি। না না, আমি কোন কথা শুনতে চাই না, কোন ওজর না। আমি বিশ্বাস হারিয়েছি, তোমার মত শয়তানীকে আর বিশ্বাস করি না। আমি পাগল হয়েছি, হ্যাঁ সত্যিই পাগল হয়ে গেছি।

ডাক্তার : উনি আপনাকে কি বলছেন ?

প্রেতাত্মা : ও বলছে যে, ঈর্ষার জন্যই ব্যাপারটা ঘটেছে। কিন্তু আমি কোনদিন ঈর্ষান্বিত ছিলাম না।

ডাক্তার : উনি কি বলতে চান ভাল ক'রে শুনুন না।

প্রেতাত্মা : (শুনিতে শুনিতে) গল্প, চমৎকার একটা গল্প। আমাদের বিবাহ স্থির হয়ে গিয়েছিল, লিজিও ছিল চমৎকার মেয়ে। শুনছেন, ও এখন কি বলছে ? ও বলছে যে, আমি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলাম এবং সব কিছুকেই নাকি বাঁকা চোখে দেখতাম।

ডাক্তার : মনে হচ্ছে আপনি নির্বোধ ও গোঁয়ার প্রকৃতির লোক ছিলেন।

প্রেতাত্মা : লিজি একটা ডাহা মিথ্যাবাদী। সে কি বলছে জানেন ? সে বলছে যে, সেদিন সন্ধ্যা বেলায় বাড়ী ফেরবার সময়, ঘটনা-চক্রে সেই লোকটির সঙ্গে রাস্তায় একটা গাড়ীর মধ্যে দেখা হয়েছিল। লোকটি তার সঙ্গে বাড়ীর একটা তোলা পর্যন্ত এসেছিল—সেই সময়ই আমি ওদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখে দারুণ সন্দেহ করি এবং ঈর্ষান্বিত হয়ে নাকি নিজেকে ছুরি মারি।

ডাক্তার : আমার মনে হয় আপনি আত্মহত্যাই করেছিলেন।

প্রেতাত্মা : হ্যাঁ, আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার মৃত্যু হয় নি ; হ'লে অবশ্য খুব ভালই হত। যাই হোক, আমি আবার ওই স্ত্রীলোকটির উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করব।

ডাক্তার : আপনি লিজিকে ক্ষমা করছেন না কেন ?

প্রেতাত্মা : আপনি কি ওর কথা বিশ্বাস করলেন নাকি ? নিজেকে ছুরি মেরে আমি কি কম কষ্ট পেয়েছি নাকি ? কিন্তু তবুও আমি মরিনি, বেঁচে রয়েছি। ওই দেখুন, লিজি ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর কাঁদছে।

ডাক্তার : আপনার বিবেকের নির্দেশ পালন করুন। হঠকারিতার বশে কাজ ক'রে, যন্ত্রণা ভোগ ক'রে লাভ কি ?

প্রেতাত্মা : আমি লিজিকে প্রাণের সঙ্গে ভালবেসে ছিলাম। কিন্তু ওর কাছ থেকে কি আমি পেলাম, কি আমি পেয়েছি বলুন ! না, ওকে আমি বিশ্বাস করি না। ও অন্য লোকের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। ও কি বলছে জানেন ? ও বলছে যে ও অন্য কারও সঙ্গে চলে যায় নি—ওর কথা ও আমাকে বিশ্বাস করতে বলছে।

ডাক্তার : উনিও মারা গেছেন একথা আপনি জানেন ত ?

প্রেতাত্মা : না। যদি তাই হয় তা'হলে ও এখন একজন প্রেতাত্মা ?

ডাক্তার : উনি ত আপনার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওঁকে কি প্রেতাত্মার মত দেখাচ্ছে নাকি ?

প্রেতাত্মা : না। আমার মা'ও বলছেন, 'জন, প্রকৃতিস্থ হ, বুঝে দেখ, বিবেচনা কর।'

ডাক্তার : আপনি আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু আপনার সে ধারণা এখনও হয় নি ; সেইজন্যই আপনি একে-ওকে-তাকে ভর করে কষ্ট দিচ্ছেন। যে স্ত্রীলোকের উপর আপনি ভর করেছিলেন, সে আমাদের একজন রুগিণী—আপনার জন্য সে বহু কষ্ট পেয়েছে।

প্রেতাত্মা : আমি কি কারও কেয়ার করি নাকি ? আমি স্ত্রীলোককে ঘৃণা করি, আর সেও আমায় ছাড়বে না, আঁকড়ে ধরে আছে। আমি চাই স্রেফ প্রতিহিংসা—

ওই দেখুন, মা আর লিজি দু'জনেই ওখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। কেউ কিন্তু আমার জন্য চিন্তা করে না—সুতরাং ভাল হয়ে লাভ কি ?

ডাক্তার : 'জন' ছাড়া আপনার পুরো নামটা কি ?

প্রেতাত্মা : জন্ মুলিগান।

ডাক্তার : আপনি অন্য একজন স্ত্রীলোককে কষ্ট দেওয়ার জন্য লজ্জিত বোধ করেন না ? আপনি কি মনে করেন, আপনার প্রেম প্রকৃত প্রেম ? না, তা' নয়—প্রকৃত

প্রেম নয়, এ হচ্ছে স্বার্থপরতা।

প্রেতাত্মা : লিজি আমার হতে পারত, হয় নি। আমার প্রেম, ঘৃণা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। না, না, লিজি কেঁদ না, কেঁদে কোন লাভ নেই। তুমি হাজার বার বললেও আমি তোমাকে ক্ষমা করব না।

ডাক্তার : লিজিকে ক্ষমা করুন। তা' হলেই আপনার বর্তমান অবস্থার উন্নতি হবে।

প্রেতাত্মা : না, আমি কখনই ওকে ক্ষমা করব না। জানেন, সব সময়ই মেয়েরা আমার পিছনে ঘুরে বেড়াত, আমি দেখতে খুব সুন্দর ছিলাম কিনা।

ডাক্তার : ওই ত আপনার রোগ। ঘরের মায়া যদি আপনার থাকত, তা' হলে কিছু সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনাও জন্মাত ; এরকম এক গুঁয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠতেন না। যাই হোক এখন একটু শান্ত হয়ে বিবেচনা করুন, এখন আপনি আমার স্ত্রীর দেহের উপর আশ্রয় করেছেন।

প্রেতাত্মা : বেশ ত আপনার স্ত্রীকে সরিয়ে নিন না, কে চাইছে ওঁকে ? লিজি, ওখানে দাঁড়িয়ে কেঁদে কোন লাভ নেই, ক্ষমা আমি করব না।

ডাক্তার : আপনি যদি এখন ক্ষমা না করেন, তা'হলে এখান থেকে চলে যাবার পর অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ দেখতে পাবেন—যতদিন না আপনি অনুতপ্ত হচ্ছেন, ততদিন সেই অন্ধকার ঘরেই আপনাকে থাকতে হবে, বুঝলেন। সুতরাং ভাল কথাই বলছি। আপনার মধ্যে যে ক্রুটি ও বিচ্যুতি রয়েছে, সে সম্বন্ধে অবহিত হবার চেষ্টা করুন। আচ্ছা, কোন্ শহরে বাস কর্চ্ছেন তা' জানেন কি ?

প্রেতাত্মা : সেণ্ট লুইস্।

ডাক্তার : আপনি কালিফোর্নিয়ায় তা' জানেন কি ? আচ্ছা, এটা কোন সাল ?

প্রেতাত্মা : ১৯১০ সাল।

ডাক্তার : না, আজ ১৯১৮ সালের ১৩ই জানুয়ারী।

প্রেতাত্মা : মেয়েমানুষকে কাঁদতে দেখলে আমার বিরক্তি ধরে, সহ্য করতে পারি না। লিজি, কান্না থামাও বলছি।

ডাক্তার : আপনার মা কি বলছেন শুনুন না। উনি নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করবেন।

প্রেতাত্মা : মা, তুমিই ত অধিক আদর দিয়ে আমায় নষ্ট করেছ। এখন আমার পক্ষে অন্যরকম হওয়া সম্ভব নয়।

ডাক্তার : দেখুন আপনি লিজিকে ক্ষমা করতে অনিচ্ছুক হ'লে, আপনার অদৃষ্টে কষ্ট আছে তা' বলে দিচ্ছি।

প্রেতাত্মা : আপনার ওই অন্ধকার ঘর ত ? ওকে আমি থোড়াই কেয়ার করি।

ডাক্তার : আপনি বলেছেন যে আপনার মা'কে আপনি খুব ভালবাসেন। কিন্তু কারও প্রতি কোন সমবেদনা বা করুণা কি আপনার নেই ?

প্রেতাত্মা : 'সমবেদনা বা করুণা' এই কথাগুলোকে আমি ঘৃণা করি। আমার বাবা বলছেন যে আমার পরিবর্তন দরকার—কিন্তু আমার পরিবর্তনের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

ডাক্তার : দেখুন, আপনার ছেলেমানুষি ভাব ত্যাগ ক'রে গম্ভীর ও সৎ হওয়া উচিত।

প্রেতাত্মা : মা বলছেন যে আমার অন্যায়ের জন্য তিনিও কিছুটা দায়ী। সরিয়ে নিন (চীৎকারে) আমি অন্ধকার ঘরে যেতে চাই না। আমি লিজিকে ক্ষমা করব, সব কিছুই করব। আমি বড় ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত।

ডাক্তার : পরলোক-তীর্থে উপনীত হয়ে আপনি অন্য লোকের ক্ষতি না ক'রে ; তাদের কল্যাণ করবার দিকে মন দেবেন। যাই হোক, স্ত্রীলোকটির উপর ভর ক'রে তার যে ক্ষতি করেছেন, তা' পূরণ করবার চেষ্টা করুন। (Try to undo the wrong you have done by obsessing this lady.)

প্রেতাত্মা : সে আমাকে যন্ত্রণা দিয়েছে। আমি স্ত্রীলোককে ঘৃণা করি, সেইজন্যই প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমি চটি-জুতো খুলে তার মুখে মেরেছি। স্ত্রীজাতির উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই আমি এটা করেছি—আমি ওদের সকলকেই দারুণ ঘৃণা করি।

প্রেতাত্মাকে তার প্রকৃত অবস্থার বিষয় কিছুতেই বোঝান গেল না। তারপর তাকে মিডিয়ামের দেহ থেকে বিযুক্ত ক'রে অন্ধকার ঘরে বন্দী ক'রে রাখা হ'ল—যতদিন না তার আত্মচেতনা হয় এবং মানুষের উপর তার বিদ্বেষের ভাব অন্তর্হিত হয়, ততদিন সেখানেই তাকে থাকতে হবে।

———

বিস্মৃত-সন্ধ্যা

(গল্প)

সুকুমার রায়

বসন্তের শেষ পর্বের একটা নিরালা সন্ধ্যা। আকাশে অষ্টমীর খণ্ড চাঁদ—পাশে বসন্তের মৃদু দোলায় নৃত্যরত বৃহৎ পুকুরের কৃষ্ণ জলরাশি। পুকুরের পশ্চিম পাশের ঘাসযুক্ত বৃহৎ ভূমিতে এসে বসল সু। আজ দিনের বেলায় বেশ গরম পড়ে দিনান্তের সূর্য তার অগ্নিঝরা রশ্মিমালা নিয়ে মিলিয়ে গেল দিগন্ত রেখার নীচে। আর তখনই ধীরে ধীরে বইতে শুরু করেছে মৃদু-মন্দ বিদায়ী-প্রায় বসন্তের বায়ু প্রবাহ। দিনান্তের পাখীদের নীড়ে ফেরা সমাপ্তি সংগীত আর বিকালের মধুঢালা বায়ু প্রবাহ তরুণ মনকে করে তোলে উন্মুখ, চেতনাকে নিয়ে যায় অজানা-অচেনা রাজ্যের স্বপ্নপুরীতে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ও একা—নিঃসঙ্গ অবস্থায়। তারপর এক সময় শুয়ে পড়ল। মনে ওর আশা-আনন্দের অজস্র বর্ণালী চিন্তা, চোখে নূতনের শিহরন জাগা বৈপ্লবিক আলো, যৌবনের মায়া কাননে আশার বিভাবরী রাগিণীর রিনিঝিনি, হৃদয়ের গুপ্ত মণিকোঠায় কোন অভিসারিকার গুপ্ত অভিসারের হৃদয়-দোলান নূপুর ধ্বনি। হঠাৎ ঠাণ্ডা স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠে বসল সু।—কে?

—আমি।

—ও, দেবীরানী!

—না, দেবলা।

—ঐ হল, ঐ দেবলা হ'ল আমার স্বর্গ রাজ্যের দেবীরানী।

—আমি বাপু স্বর্গ রাজ্যের দেবী-টেবি হতে পারব না। তোমার হৃদয় রাজ্যের রানী ছাড়া আর কিছু আমি হতে চাই না।

—ও, কিন্তু যদি ইংল্যাণ্ডের মাটিতে গিয়ে মিস্ (Miss) বলি তবে কি তোমাকে মিস করার কোন কারণ হতে পারে!

—ওসব কিছু আমি চাই না, চাই বাংলার মাটিতে বিশেষ একজন মানুষের কাছে মানুষী হয়ে থাকতে। ওসব কথা ছেড়ে দাও। বল শুয়ে পড়েছ কেন এখানে,—এ স্থানটা ভাল নয়।

—কেন, কিসের ভয়? লোকচক্ষুর ভীতি অথবা সর্প-সংকুল বিরাম কুঞ্জ?

—দুটোই।

—কিন্তু সাপ বলতে মনের কথাটা বুঝছ না ত!

—না, আমাদের অন্তরটাকে অনেকে সাপ বলে অভিহিত করলেও এখানে কিন্তু বিষের তীব্রতা নেই। কই ওঠ, আমার খুব ভয় করছে।

—কিন্তু সাপের ভয়-টয় ত আমার নেই—বলে সু আবার শুয়ে পড়ল।

দেবলা উদ্‌বিগ্ন হ'ল। চঞ্চল হয়ে বলল—একি আবার শুয়ে পড়লে? আমাকে পাগল করে তবে ছাড়বে দেখছি। আচ্ছা এমন দস্যি তোমার স্বভাব কেন বলত?

—তা না হ'লে ত তোমাকে কাছে পাই না।

—ও তাই বুঝি! হাসল দেবলা—কই, ওঠো বাব্বা, কি ছন্নছাড়া হচ্ছো দিনের পর দিন। এই ছন্নছাড়া দশাটা বা হচ্ছে কেন?

—সঙ্গীর অভাবে।

—তাই বুঝি!—চোখ নাচিয়ে ও বলল—বেশ বুঝলাম। তোমার কথা যদি সত্য হয়, তবে ঐ দোষটা অনেক আগেই ছাড়া উচিত ছিল। কই ওঠো! দেবলা সু-র হাত ধরে টান দিয়ে বলে—রাত বেশ হয়েছে। পাশে ঝোপঝাড় আমার ভয় করছে।

—আমার জন্যে তোমার ভয় করবে কেন?

—জানি না—অভিমান করে দেবলা বলে। তারপর একটু থেমে বলে—কেন তা যদি বুঝতে তা হলে—যাক্‌গে ওসব কথা। কই ওঠো! বাঃ বেশ অবাধ্য ছেলে ত! দেখি ওঠো কি না! সু-র হাত ছেড়ে দিয়ে ঝোপের দিকে পা বাড়াল দেবলা।

তাড়াতাড়ি সু উঠে বসল—এই, যেও না। আমি বাপু ভদ্রলোকের মত তোমার আদেশ মেনে চলব। যেও না, প্লিজ!

দেবলা একই ভাবে এক পা এক পা করে হাঁটছিল। ছুটে গিয়ে সু দেবলার হাত ধরল। দেবলার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—অপরাধ ক্ষম দেবী, চলো তব নির্দেশিত Place. মুখে হাসি ধরো, ঘুচাও মনোক্লেশ।

দেবলা হাসল। সু-র মুখটা দু' হাত দিয়ে উঁচু করে ধরে বলে—চল।

—My sweet darling, দেবীরানী চল।

পাশাপাশি চলতে চলতে দেবলা বলে—কেমন উঠবে না নাকি! হেরে গেলে যে বড়—ভীতু!

—জেতায় কি কম ট্রাজেডী! হারজিতের ট্রফিতে ট্রাজেডীর চেয়ে হেরে কমেডি লাভ করা ভাল। হেরে গেলাম বলে তোমাকে পেলাম। জিতলে—

পাশে উঁচু জমির ওপরের কাঁঠাল গাছ দেখিয়ে বলে—ওখানটায় চল। সু-র অসমাপ্ত উত্তর শুনবার আগ্রহ প্রকাশ করল না একটুও।

—এতে বলার কি থাকতে পারে? I am always ready.—নাটকীয় ভঙ্গীতে সু বলল।

দেবলা নীরবে হাসল। গাছের নীচে এসে দাঁড়াল ওরা। একটু পরে দেবলা ওর শাড়ীর আঁচল দিয়ে ঘাসের ওপরের ময়লা পরিষ্কার করছিল। বাধা দিয়ে সু বলল—ওকি, কাপড়টায় ময়লা লাগবে না?

—লাগুক। আশা এইটুকু যে তোমার মনে আমার স্থান আরও দৃঢ় হবে। তাছাড়া এতে ধুলো লাগবে, ময়লা লাগবে না। ধুলোয় আবরণের সৃষ্টি করে বটে, ময়লার মত চিরস্থায়ী ছোপ রাখে না। বস এবার।

দেবলার মুখটা একবার অন্ধকারে দেখবার চেষ্টা করল সু। তারপর বলে—বসছি, আচ্ছা এত কথা শিখলে কবে থেকে? আগে অগ্নিবাণে জর্জরিত করলে, তারপর পুষ্পবাণ মারতে। এমন অগ্নিবাণ শিখলে কেমন করে?

—একলব্যের সাধনাকে অনুসরণ করে। মানুষের ত একটা ধৈর্যশক্তি আছে। আর কত মুখ বুজে সহ্য করা যায়। তাছাড়া বাণ খেয়ে খেয়ে বাণ মারার টেকনিক আয়ত্ত করে ফেলেছি। বস না।

—হ্যাঁ বসছি।—আবৃত্তি করতে করতে বসে পড়ে সু।

আমি যেমন করিয়া চাই
আমি যেমন করিয়া গাই
বেদনা বিহীন ঐ হাসি মুখ
সমান দেখিতে পাই।

একটু থেমে দেবলার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে সু বলে—ঠিক বলেছি না? দেবলা নীরবে হাসে। সু বলে—ও বুঝেছি। পুরো না বললে তুমি উত্তর দেবে না। তবে শোন—

ওই রূপ রাশি আপনি বিকাশি'
রয়েছ পূর্ণ গৌরবে ভাসি'
আমার ভিখারী প্রাণের বাসনা
হোথায় না পাই ঠাঁই।

সু-র শেষ হতেই হাসতে হাসতে দেবলা যোগ করে—

তবে লুকাব না আমি আর
এই ব্যথিত হৃদয় ভার।
আপনার হাতে চাব না রাখিতে—
আপনার অধিকার।
বাঁচিলাম প্রাণে তেয়াগিয়া লাজ
বদ্ধ-বেদনা ছাড়া পেল আজ,
আশা নিরাশায় তোমারি যে আমি
জানাইনু শতবার।

দেবলার আবৃত্তি বন্ধ হলে সু দেবলার গায়ে ছোট্ট একটা ঢিল দিয়ে আঘাত করে বলে—তুমিও এটা জান নাকি?

—তা না জানলে একের মনের সঙ্গে অপরের মনের মিলন কখনও সম্ভব নয়।

—বেশ বুঝলাম, আমাকে বসতে বলে কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করবে।

হাসল দেবলা।—ও তাই বুঝি, বেশ বসছি।

সু-র কাছ থেকে বেশ ব্যবধান রেখে দেবলা বসল। সু মাটি থেকে ছোট ঢিল সংগ্রহ করে অন্ধকারে লক্ষ্যহীন ভাবে ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলে—দূরে বসলে কেন?

—নিকটে বা বসব কেন?

—কেন বসবে—

—হুঁ—

—দূরে থাকলে মোহ হয় বেশী, উপভোগ করবার ইচ্ছা জাগে—মনে তেমন জোর থাকে না আর হারানর সম্ভাবনা—ইত্যাদি ইত্যাদি বিশ্রী উপসর্গগুলি মাথা চাড়া দিয়ে

ওঠে। ফলে সংযম, সৌজন্য দুটোই নষ্ট হয় আর তৃষ্ণা বাড়ে।

—কিন্তু নিকটে গেলে কি তৃষ্ণা মিটবে?

—না মিটুক, তবু সাধারণ তৃষ্ণা আর মৃগ-তৃষ্ণায় পরিণত হবে না। সুতরাং জীবন ত্যাগের সম্ভাবনা নেই তাই বলছি।

—যাক্‌গে যাক্‌গে বাপু যাচ্ছি কাছে—আর হতাশ হতে হবে না। হতাশ হলে আশ মিটবে না আর পাস পেলেও সাকসেসফুলের সার্টিফিকেটও পাওয়া যাবে না।—দেবলা নিকটে এসে বসল।

এক সময় ওরা নীরব হয়ে গেল—কেউ কোন কথা বলল না। সু রাত্রির অস্পষ্ট গাছের দিকে মুখ উঁচু করেবু তাকিয়ে রইল। দেবলা নীরব ভাবে মাথা নীচু করে ঘাস ছিঁড়তে থাকে। এত গভীর ভাবে দুজনকে ওরা কাছে পেয়েছে এই প্রথম। প্রেমের পথে বড় জ্বালা, বড় বাধা—কিন্তু এই বাধাতে আনন্দ আছে। এই বাধার জন্যে পরস্পর পরস্পরকে গভীর করে চিনতে পারে। প্রেমে মোহ আছে, মায়া আছে, লজ্জা আছে, সংকোচ আছে, ভয় আছে আর আছে নির্ভয়তা। তাই ত চোখে চোখে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না—চোখে নামিয়ে রাখতে হয়। আবার নামিয়েও রাখা যায় না বেশীক্ষণ, আবার একটু তুলতে হয়। চোখে লজ্জা আছে, তৃষ্ণা আছে আবার সংকোচও আছে।

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর দেবলা একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে—তুমি নাকি দু'চার দিনের মধ্যে চলে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—বাঃ বাড়ী যেতে হবে না? পাকিস্থানে বসে থাকলে চলবে।

—কিন্তু এখন ত কোন কাজের তাড়া নেই, পড়ার চাপ নেই। পরীক্ষা দিয়ে এসেছো, রেজাল্ট আউট হতে ত অনেক দেরি।

—তা' দু' মাস—আড়াই মাস হবে।

—তবে বাড়ী গিয়ে চুপটি করে বসে থাকবে, নতুবা

—কথাটা যত জোরে বললে আসলে শব্দ ছাড়া বিষয় বস্তুর অভাব ওতে।

—না-না আমি যেটা বলি সেটায় ও দুটোই থাকে দেখবে—বলে সু-র একটা হাত নিজের গলায় ধরে বলে—কেমন ক্ষমতা যাও ত দেখি! যদি যেতে পার তবে প্রমাণ করতে পারবে যে আমার কথা বাজে।

—দূর, আমি কোন ছার, রাধিকার কর-বন্ধনীতে স্বয়ং ভগবান ফেল মেরে গেলেন। এই যে বাঁধন জোর করে না হয় এর ওপরেরটা ছাড়ান গেল, ভেতরেরটা যে আরও জোরে চেপে ধরে।

—তবে বাজে কথা কেন বল? দু'দিনের জন্তে এসেছ—এসো, থাকো, খাও—তাতে সন্তুষ্ট নও—মেয়েদের মনটাকেও দখল করা চাই। সুস্থ মনকে পাগল করা চাই, আবার মনটা স্বাভাবিক হওয়ার আগেই পলায়ন কাপুরুষ, ভীরু!

কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল সু। দেবলা বুঝতে পারল না সু-র মনের অবস্থার। যেখানে মন দেওয়া নেওয়ার মধ্যে পাগল হওয়ার পালা, সেখানে আর একটা

মন ভাল থাকে কি করে? প্রেমের তীব্র শকে ফুটো মনই ত অবশ হয়ে যায়। সর্বত্র একই জ্বালা—উপশম করবে কে?

দেবলা মুখ তুলে তাকাল। সু-কে নীরব থাকতে দেখে প্রশ্ন করে—এই, কি ভাবছ?

—ভাবছি—একটু নীরব হল সু। তারপর গলাটা পরিষ্কার করে বলে—ভাবছি আমাদের ভালবাসার ভবিষ্যৎ, আমাদের এই মিলনের ভবিষ্যৎ।

—চির উজ্জ্বল আমাদের এই প্রেম চির অম্লান থাকবে। দেখছি, দিনে দিনে তোমার বুদ্ধিটা সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

—আমার জায়গায় গিয়ে তোমার বুদ্ধি আরও সংকীর্ণ হবে না ত?

দেবলা ও কথায় কান না দিয়ে বলে—তোমার বৌদির সঙ্গে যে কথাটি বলেছি সেটা শুনে এখন সন্দেহ হয় ত তোমার?

—হ্যাঁ তাইত, ঐ কথাটা আমার একবারও মনে ছিল না।

—ভুলো মন, বাজে মন তোমার।

—থাম, কথাটা চিন্তা করে দেখি।—'এক ফুলে দেবতার একবার পূজো হয়—দু'বার নয়,'—এই না!

—তবে এর চেয়ে বড় আশ্বাস আর কি দিতে পারি বলত?

—তা ঠিক, আচ্ছা এটা কি তোমার অন্তরের কথা?

—Fool, বোকা। তুমি জড়পদার্থ, যে যাকে তাকে একটা মৌখিক মিথ্যা বুলি শোনালুম। অন্তরকে পেতে হলে অন্তরের কথা বলতে হয়। তা ছাড়া এক ফুলে দু'বার দেবতাকে পূজা করলে এতে যেমন দেবতাকে অপমান করা হয় তেমনি দেবতার অভিশাপ কুড়োতে হয়, ফলে জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে।

গল্পটা শেষ করল সু। পানু অবাক্ হয়ে শুনছিল সু-র গল্প। পানু বললে—আশ্চর্য! এত প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও দেবলা কি ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারল?

পানুর কথায় সু কান দিল না। কাঁথাটা বুকের ওপর টানতে টানতে বলে—এই জ্বর যেন আমার শেষ জ্বর হয়, এর চে'য় মৃত্যু সংবাদও ভাল। যে দিনের কথা বললাম ঠিক সেই দিনটিও ছিল ৩০শে চৈত্র। আর আজকের ঐ একই তারিখে পেলাম ওর বিয়ের সংবাদ। কি লিখেছে আর একবার পড়ত চিঠিটা।

পানু বাধা দিয়ে বলে—না, এই অবস্থায় তোকে বেশী শোনান উচিত হবে না।

—ওরে, একবার ত শুনেছি, আর একবার পড় না।

—ছাড়বি না যখন তবে শোন।

'আমাদের ভালবাসা....ওটাকে কি বলব?—বলব ছেলেদের পুতুল খেলা। খেলা ঘরের বর-বউ পাতান। প্রেমের উত্তেজনায় পথের ভিখারীকে বিয়ে করা যায়। যেই উত্তেজনায় একটু ভাঁটা পড়ে, তখন মনে হয় ভুল করেছি। তাই পুতুল খেলায় কি একটু করেছি কিনা সেটাকে ত চিরদিনের বলে ধরে নেওয়া যাবে না আর ধরাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। স্বার্থের চেয়ে প্রেম বড় নয়। যাক্‌গে সে সব কথা। আমি বিরাট বাড়ীর বউ হতে চলেছি। তোমার নিমন্ত্রণ রইল।'

—বিশ্বাসঘাতক—বলে পানু চিঠি বন্ধ করল।

বর্ষদেবতা

শ্রীতারাপদ দাশ

নূতন কোরে লও হে আমারে, তোমার নীরব চরণে,
অন্ধ তমসা বিদূরিত কোরো নবীন প্রভাত বরণে।
দূর হয়ে যাক্ পুরানো ক্লান্তি,
শোক-তাপ-ভরা মলিন ভ্রান্তি,
উৎসবময় নিখিল ছন্দ প্রকাশিত করো জীবনে।

মরুভূ-তপ্ত প্রখরতা নাশো, নিবিড় প্রেমের নির্ঝরে,
মুখরিত করো অন্তর বীণা, মধুর কল্যাণ ঝঙ্কারে।
জীবনে-মরণে, পথ-প্রান্তরে,
দিন-রজনী, আলোক-আঁধারে,
নবারুণ রাগে পূর্ণ বিকশি, জেগে র'ব মহা শরণে।

আমার জন্যে

(গল্প)

কৃষ্ণদাস মণ্ডল

—মাধুরী!

—হ্যাঁ, মাধুরীর কথাই সেদিন ভাবছিলাম।

যে মেয়েটি পৃথিবীতে অসহায়, নিঃসঙ্গ, যার বুকের বেদনা পাথরের মত চেপে বসে আছে—মুক্ত নয়, স্বাধীন নয়। বৈচিত্র্যহীন পৃথিবীর বুকে ছোপ ধরা একটি মেয়ের কথা। একটু ভালবাসা, একটু দয়া, একটু পরশের অভাবে যার জীবন মরুভূমির মত শুষ্ক হয়ে গেল, তারই কাহিনী অকপটে মনে স্থান পেয়েছিল।

সাড়ে এগারোটার ট্রেন বেশ কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে। নিস্তব্ধ, নিথর রাত্রি। চারিদিকে চাঁদের আলোর মায়াবী রূপ। কুয়াশার মত চাঁদের আলো ঝরছে। লেভেল ক্রসিং-এর সিতু পাণ্ডের ঘরের আলোটা টিপটিপ করে জ্বলছে। ফাগুনের হাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দ। বাঁশের বনে মুঠো মুঠো আঁধার এখানে ওখানে ছড়ানো। বিজলী বাতির আলোর রশ্মিটা পুকুরের কালো জলে পড়ে চিকচিক করছে। দখিনা বাতাসের সাথে ভেসে আসছে আশাবরী রাগের সানাইয়ের করুণ ধ্বনি। হয়ত এতক্ষণে মাধুরীর বিয়ে হয়ে গেছে। কিংবা হয়ত শুভদৃষ্টি হচ্ছে এতক্ষণে। একটু চাওয়া,....একটু হাসি...একটু রোমান্স!

হঠাৎ পিছনের জানলা দিয়ে আমার নাম ধরে কে যেন ডাক দিলে—শোভেন দা!

চিন্তায় ছেদ পড়ল। এক মুহূর্তে যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে বললাম—কে?

সেই আধো-আলো আধো-আঁধারের মাঝ থেকে বিয়ের শাড়ী পরা, চন্দন চর্চিতা টিপ পরানো একটি মেয়েলী কণ্ঠের জবাব এল—আমি মাধুরী, শোভেন দা।

—তুমি মাধুরী, এত রাতে!—বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম।—আজ না তোমার বিয়ে!

মাধুরী ধরা গলায় উত্তর দিল—হ্যাঁ শোভেন দা, সেই জন্যেই ত এলাম। বাবা মা'র নির্বাচিত পাত্র আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারলাম না।

আস্তে আস্তে মাধুরী ঘরের ভিতর ঢুকল। ব্যথার অশ্রু উপচে পড়ল আমার হাতের উপর। পুনরায় প্রশ্ন করলাম—কেন এলে মাধুরী? ফিরে যাও।

মাধুরী আমার ডান হাতখানা চেপে ধরে বলল—তুমি আমাকে গ্রহণ করতে পারো না শোভেন দা? তুমি আমাকে নিরাশ করো না। আমি আর ফিরে যাব না। তোমার পায়ের তলায় আমাকে একটু আশ্রয় দাও। তুমি কি আমাকে বাঁচাতে পার না? ঐ ব্যভিচারী, মদ্যপ কমল সেনের হাত থেকে! তুমিই একদিন বলেছিলে—'আমি তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধব'। সেই সেদিন, যেদিন কালী মন্দিরে গিয়েছিলাম আমরা পূজো দিতে।

—হ্যাঁ বলেছিলাম, কিন্তু—

—কি কিন্তু? তুমি আমাকে নিয়ে পালাতে পার না?

—না, তা আর হয় না।

—কেন হয় না? কেন হয় না শোভেন দা?

—কারণ তোমার বাবা মা আমার সাথে বিয়ে দিতে রাজী নন। আর আমি তাঁদের মতের বিরুদ্ধে যেতে চাই নে। সামান্য একজন স্কুল মাষ্টার আমি, কোন ভবিষ্যৎ নেই, সেই অর্থ, নেই বিত্ত—কি হবে আমাকে বিয়ে করে? আর তাছাড়া, তোমার বাবা মার অমতে আমি কিছু করতে চাই না।

মাধুরী পুনরায় বলল—আমার শেষ অনুরোধটুকু রাখ শোভেন দা।

—তা হয় না মাধুরী। তোমার বাবা মা যাকে পছন্দ করেছেন তাকে বিয়ে করে সুখী হও। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি।

চোখের জল মুছতে মুছতে মাধুরী বলল—তাহলে আমি কোনদিনই সুখী হতে পারব না। ওর অপমান আমি সহ্য করতে পারব না। বাবা-মা শুধু টাকাই দেখেছেন। ওর

মধ্যে যে একটা পিশাচ, জন্তু লুকিয়ে আছে তা তারা জানেন না।

ওর উদ্গত অশ্রু বিমোচন আমার চোখেও জল আনল। মাথা নিচু করে রইলাম। মনে মনে ভাবলাম, কেন ওকে গ্রহণ করতে পারি না! চলে যাই না এখান থেকে ওকে নিয়ে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, না—আমি শিক্ষক, চুরির অপবাদ আমি সহ্য করতে পারব না। আমি পালাতে পারব না।

—তুমি যাও মাধুরী, দূর থেকে আমি তোমাকে ভালবাসব। আমি জীবনে বিয়ে করব না। এটুকু তুমি সব সময়েই জেনো যে, তোমার কথা চিন্তা করেই আমি বেঁচে থাকব।

—তাহলে মৃত্যু ছাড়া আর কোন উপায়ই আমার নেই। —বলেই ঘর থেকে বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়ে গেল।

কিছু সময় পর দরজাটা বন্ধ করে ইজিচেয়ারে শুয়ে চিন্তা-সাগরে পাড়ি জমালাম। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর ঝাপসা হয়ে গেল। পেটা ঘড়িতে রাত ২'টো বাজার সঙ্কেত শুনতে পেলাম। আস্তে আস্তে ভেসে উঠল মনের আয়নায় সুখ-দুঃখের দোলা লাগানো ঝাপসা অতীত।

* * *

আমি যখন ওকে পড়াতাম, ও ছিল দশম শ্রেণীর ছাত্রী। ক্লান্তিভরা অবসন্ন দেহে আমার সামনে এসে বসত। মনে হ'ত যেন ব্যথার পসরা নিয়ে বসেছে।

একদিন মাধুরী আমাকে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা শোভেন দা, আপনার মা আছেন ?

আমি বললাম—কেন হঠাৎ এ প্রশ্ন ?

মাধুরী হাতে ধরা খাতাটায় দাগ কাটতে কাটতে বলল—এমনি বললাম।

—হ্যাঁ আমার মা আছেন।

—তিনি আপনাকে খুব ভালবাসেন, না ?

—হ্যাঁ তা'র তো বাসেন বই কি। আর মা তো ছেলেকে ভালবাসবেন-ই। কেন তোমার মা তোমাকে ভালবাসেন না ?

—আমার নিজের মা থাকলে হয়ত বাসতেন—বলে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল মাধুরী।

আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম—কেন মিসেস বোস তোমার আপন মা নন !

মাধুরী বলল—না, সৎমা।

আমি প্রশ্ন করলাম—উনি তোমাকে ভালবাসেন না ?

ও বেদনার হাসি হেসে বলল—হুঁ, খুব ভালবাসেন,—তার তুলনা হয় না।

বুঝলাম ওর ব্যথা কোথায়। সেদিন থেকে বুঝলাম, ওর হৃদয় বেদনায় ভরে গেছে। ও বড় অসহায়—বড় একা। সেদিন থেকে এই অসহায়াকে নিজের মনের অগোচরে একটু একটু করে ভালবেসে ফেললাম। প্রতিদিনই ও অসহায় ভাবে আমার সামনে এসে বসত। দেখলে বড় মায়া হত। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। পাখীদের কলগুঞ্জনে ঘুম ভেঙে গেল।

* * *

আজ মনে হল পাখীদের আনন্দ-ধ্বনি যেন থেমে গেছে। কোন দুঃসংবাদ জানাবার জন্য চীৎকার করে আমাকে জাগিয়ে দিচ্ছে। পূর্ব দিগন্তে ঊষা যেন আজ প্রখর তেজ নিয়ে উদিত হয়েছে। ঘর থেকে বেরুবার জন্য দরজা খুলেই চমকে উঠলাম।

—একি। এ যে মাধুরী। মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। হাতে ও কিসের শিশি! ওমা, এ যে বিষ!—প্রায় চীৎকার করে উঠলাম। মুহূর্তে দিশাহারা হয়ে গেলাম। কান্নায় ফেটে পড়তে চাইলাম।

—তুমি একি করলে মাধুরী!

ওর মাথার কাছে একটা কাগজ পেলাম। ও লিখেছে : কমল সেনকে বিয়ে করার চাইতে আমার মৃত্যু ভাল। কিন্তু তুমি কি আমাকে বাঁচাতে পারতে না ?........

মাধুরী।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি তোমাকে বাঁচাতে পারতাম। আমিই তোমার মৃত্যুর জন্য দায়ী। মাধু! মাধু!—বলে ওকে বুকে তুলে নিলাম। নির্জীব অধরে এঁকে দিলাম প্রেমের জয়টিকা।

———

রানীপুরের ডাক্তার

(গল্প)

শ্রীনিরঞ্জন সেন

ডাক্তার সুবিমল সরকার কি কারণে রানীপুরে এসে ডাক্তারখানা খুলল তার কারণ বুঝে ওঠা শক্ত। রানীপুরের লোকেরাই বুঝতে পারল না, তা চারপাশের গ্রামের লোকেরা আর কি করে বুঝবে!

ডাক্তার হিসাবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল—গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। পরোপকারী সদা হাস্যময় সুবিমল ডাক্তারের আগমনে ঝিমিয়ে পড়া রানীপুর গ্রাম সহসা প্রাণ ফিরে পেল। রানীপুরের রূপও পালটে গেল আচমকাই!

নদীর নামে গ্রামের নাম। নদীর নাম রানীপুরের নদী। সারা বছর ও ক্ষীণ স্রোতা—নীরব ওর ভাষা! বর্ষায় পায় প্রাণ—ঐ সময় ওর ভরা-যৌবন। যৌবন-ভরা দেহ নিয়ে ছুটে চলে "বেলাকুড়ি"র দিকে। ছন্দময় ওর চলার গতি।—চার পাশের গ্রামগু[illegible] ক করে তোলে শস্য শ্যামলা—চাষীরা নতুন করে স্বপ্ন [illegible] কত রূপ এই রানীপুরের নদীর। প্রতি ঋতুতেই রূপ পা[illegible]লটায়। অদ্ভুত!

ভৈরব স্থানের কাছে বাঁক নিয়েছে নদীটা। ভৈরব স্থানের সামনেই পিচের রাস্তা—কালো দেহটা নিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে শালতোড়ার দিকে। "পাহাড়ীবাবু" প্রায়ই এসে বসে থাকে ভৈরব স্থানে। কখনও বা নদীর কাছে। বসে বসে কি যেন ভাবে। ওর জীবনে প্রেম এসেছিল কিন্তু সফলতা পায় নি। ব্যর্থ প্রেমিক পাহাড়ীবাবু—সাহিত্যিকও। দেবীর কথা আজও ভুলতে পারে নি—আর পারবেও না। তাছাড়া ভুলতেও পারা যায় না। আমিও তো আরতিকে ভুলতে পারিনি—আর পারবও না। আরতি বিশ্বাস এখন আরতি দাস। পাহাড়ীবাবু "পোপ মন্দিরে"ও আসেন।

ভৈরব বাবার মন্দিরটি একাই দাঁড়িয়ে আছে। তবে কি একটা গাছ আছে ওর কাছে—নিঃসঙ্গতা দূর করেছে। একক মন্দিরটির ব্যথার সমবেদনা জানাচ্ছে। একটা মিষ্টি মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওদের মধ্যে।

অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকেন সুবিমল সরকার! ওর আসল পরিচয় কি, তা' কেউ জানতে পারেনি। শুধু ডাক্তার এই পরিচয়ে তিনি সকলের কাছে পরিচিত। সবার ডাকেই তিনি যান—তবে পায়ে হেঁটে।—কেবল দু' পাঁচটা গাছ যেখানে জটলা করছে সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন—কি যেন ভাবেন—কিছু উপলব্ধির উৎস যেন! ভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির এই পরিবর্তন—এক অদ্ভুত জিনিস—কে এই পরিবর্তনে সহায়তা করে কে জানে!

বিকালে তিনি রানীপুরের নদীর ধারে এসে বসেন। সন্ধ্যা নামার আগেই বাসায় আসেন ডাক্তার। সন্ধ্যাপ্রদীপ আর ধূপ জ্বালিয়ে দেন ঘরে, তারপরে উত্তর ধারের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ান। হরি ঘোষের তরকারি বাগান, তার কোলেই একটি ফুল বাগান।

রানীপুর সুবিমল ডাক্তারের কাছে কত পরিচিত। রানীপুরের গাছপালা-মাটি, প্রতিটি মানুষই যেন কত দিনের পরিচিত। শেষে সুবিমল সরকার এই নামটা সবাই ভুলে গেল—তারই ফলে হলো—রানীপুরের ডাক্তার।

আমার সঙ্গে ডাক্তারের পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ হলো। আমাকে তিনি স্নেহ করেন অথচ বন্ধুর মত মনের দ্বার খুলে সব কথা বলেন। মর্মান্তিক ব্যর্থতায় ডাক্তারের মনটা ভেঙ্গে গেছে। ফুল বড্ড ভালবাসেন ডাক্তার। ভিজিটের পরিবর্তে তিনি ফুল নিয়ে আসেন অনেক ক্ষেত্রে।

সত্যি ডাক্তার আজও ভাবছেন—রানী ঠিকই বলতো—সুবিমলদা, তোমার ডাক্তার না হয়ে কবি হওয়া উচিত ছিল। ডাক্তারের মনটা গিয়ে অতীতের স্মৃতির দেওয়ালে ধাক্কা মারে।

—হারিয়ে যাওয়া দিন কি আর ফিরে পাওয়া যায় না? নিজের মনকে প্রশ্ন করেন ডাক্তার।—না! মন থেকেই উত্তর পান ডাক্তার।

বাইরে এসে বাতাবি নেবুর গাছ থেকে কয়েকটা ফুল

তুলে নেন। অদ্ভুত মন মাতানো গন্ধ। ডালে ডালে ফুটন্ত ফুলের সমারোহ!

ঐ দূরে "সাহেব বাঁধের" পাড়ের গাছগুলোর ওপর চাঁদের আলো পড়েছে! না—আর না—ঘরে আসেন ডাক্তার। মনটাকে জোর করে বশ করতে চেষ্টা করেন। এ ভাবপ্রবণতা ওর সাজে না।—কিন্তু সান্ত্বনা কোথায় পাবে?—কর্মক্লান্ত দেহের ওপর একটি মিষ্টি প্রেরণাময় হাতের স্পর্শ!........

রাত ফুরিয়ে গেল।

কুয়ো তলায় আসেন ডাক্তার। আগে যে ঘরটায় থাকতেন তার দিকে দৃষ্টি দেন। অবহেলিত ঘরটা পড়ে আছে। এখন ওর আর কোন প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। ঘরটার দরজার পাশেই দু'টি কাঁঠাল গাছ—দু'টি গাছ একই জায়গায়। যেন নির্বাক অথচ সতর্ক প্রহরী!

পাথরের দেশ....কেমন একটা রুক্ষ ভাব। পাহাড় আছে একটার পাশে আর একটা। একজন আর একজনের চেয়ে মাথা উচিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। নির্জন পাথুরে পথ—কেবল "পাথর কোয়েরী" থেকে পাথর ভাঙ্গার শব্দ নির্জনতাকে ভেঙ্গে দিচ্ছে—দেবেও। হাতুড়ির ঘায়ে পাথরগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। ছিটকেও পড়ছে। ডাক্তারের সংসারকে এমনি এক হাতুড়ির ঘায়ে ভেঙ্গে দিয়েছে....নিয়তির অদৃশ্য ইঙ্গিত!

ফিরে যান ডাক্তার তার আগের জীবনে।

কই আজও তো ডাক্তার ভুলতে পারলেন না রেবাকে। রেবা নিয়োগী। আসল নাম সবিতা দত্ত। রেবা নামটি ডাক্তারের দেওয়া—রানী নামটিও তাই। রানী বলেই বেশী ডাকতেন ডাক্তার সুবিমল সরকার।

নার্স রানী ছাড়া তরুণ ডাক্তার সুবিমল সরকারের কোন কাজই হতো না হাসপাতালে। অপারেশন টেবিলের পাশে রানী না থাকলে অপারেশন করতেন না ডাক্তার।—সব কিছুতে রানীকে চাই। শেষে ওরা ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখল। নিজেদের মনের অবস্থা ওরা নিজেরা বুঝল।

—আজ তো ডিউটি নেই, চল না একটু ঘুরে আসি—অনুরোধ ছড়ানো ডাক্তারের কণ্ঠস্বর।

—চল।

দু'জনে এসে বসে একটা আকাশমণি গাছের তলায়। এ এক অন্য জগৎ। রানীর হাতখানা তুলে নেন ডাক্তার নিজের হাতের মুঠোয়। আবেগ কাঁপা পরিবেশ। রানী আরও সরে আসে ডাক্তারের কাছে। যৌবন-ভরা একটি নারী। নিজেকে প্রকাশ করতে চায়—রূপে-গন্ধে!

উদ্ভিন্ন যৌবনা নারী দেহের উত্তাপ ডাক্তারকে এক নেশায় পেয়ে বসে। এ নেশার প্রয়োজন আছে দু' পক্ষেরই।—আপত্তিও করেনি রানী। স্বপ্নময় পরিবেশে দেহ এলিয়ে দেয় রানী। বেশ রাত করে ওরা ফিরে আসে।

রানীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। অন্য পাঁচজন মেয়ের মত নয়। হাসপাতালে ওর এক রূপ। অদ্ভুত মায়া-ঝরা মিষ্টি কথায় যন্ত্রণা কাতর রোগীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে। ফরসা নিটোল হাতের স্পর্শে রোগীরা ভুলে যায় রোগ যন্ত্রণা। তারা পায় নতুন করে বাঁচার আশ্বাস—ফিরে যেতে চায় নিজেদের শান্তির নীড়ে।

দিন চলে যায়—মাস আসে।—একদিন চৈত্রের বিকাল।

আমের মুকুলের গন্ধে বাতাস কেমন আনমনা। ছাতা পাথরের শিবের গাজন আসছে। আবার ভাবছেন ডাক্তার আগের কথা। বর্ণ মুখর প্রকৃতি। এই সময়ে মানুষ

আপন জনের সঙ্গ চায়। বিরহ কাতর হয়ে পড়ে মন।

—কে?—নিটোল হাতের আলতো স্পর্শে ফিরে চান ডাক্তার।—তুমি!

জল টলমল করছে রানীর কামনা-কাঁপা দু'টি চোখে।

—কি হয়েছে রানী—তোমার চোখে জল?—অধীর আগ্রহে উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকেন ডাক্তার।

—মা আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে—জানতে পেরেছে আমি মা হতে চলেছি। এ-মাসে আমার মাইনের টাকা পর্যন্ত নেয় নি। ও-পথ আমার বন্ধ—চিরদিনের মত। তুমি কিছু ব্যবস্থা কর—যতদিন ব্যবস্থা না হয় ততদিন আমি মণিমালার কাছে গিয়ে থাকি। মণিমালা সিংহ।

—বেশ তো, ব্যবস্থা হবে—হাসি টেনে বলেন ডাক্তার।

ওদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়েছিল—ঘর বেঁধেছিল ওরা। তারপরে দশ মাস দশ দিন পরে রানী মা হতে গিয়েছিল হাসপাতালে। নতুন সৃষ্টি বাইরের ডাকে সাড়া দিয়েছিল—একটি মেয়ে হয়েছিল। কিন্তু মা ও মেয়ে কেউই বাঁচেনি।

তারপরে হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই রানীপুরে আসেন ডাক্তার সুবিমল সরকার।—ডাক্তার আজও ভুলতে পারেন নি রানীকে।

—ডাক্তারবাবু—ডাক এসেছে মণিপুর থেকে। ডাকতে এসেছে ঝুমকি মেথরান।

সক্রিয় হয়ে ওঠেন ডাক্তার। রানীপুরের ডাক্তার…এ ছাড়া পৃথিবীতে আজ আর ডাক্তার সুবিমল সরকারের অন্য কোন পরিচয় নেই।

———
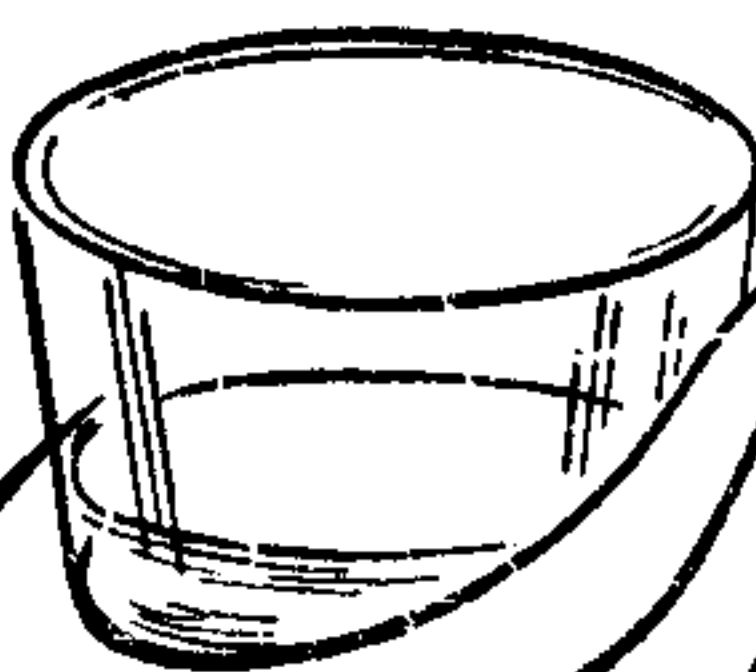
পুনর্জন্ম

শ্রীউমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

—ওলো, অমন দেমাক দেখিয়ে বেড়াস না। গরীবের মেয়ে একবার কালসাপের নজরে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না। ছোবল মারবেই। যে জঙ্গলে বাস করছি আমরা!

কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে বলা সে কোন কিছুই গ্রাহ্যই করে না। ঘাড় বেঁকিয়ে হেলে দুলে চলে যায়। মনে হয় যেন জানাতে চায়, আমিও তো কালনাগিনী। আমার আবার সাপে ভয় কি! জ্ঞান হবার আগেই বাবাকে খেয়েছি, তারপর মাকে ও শেষে স্বামীকে।

আকন্দগাছি অজ পাড়াগাঁ। শহরের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেক দূরের। আইন শৃঙ্খলার কঠোর শাসন সেখানে তেমন পাকাপোক্ত নয়। এই ছোট গাঁয়ের জমিদার বিত্তশালী ভুজঙ্গ চৌধুরী একটি মূর্তিমান শয়তান। তার অসাধ্য এমন কোন দুষ্কর্মই ছিল না। দিন-রাত কাটে তার ব্যভিচারের স্রোতে। এর ছোঁয়াচ লেগেছিল গাঁয়ের আরও অনেক অকর্মণ্য দুশ্চরিত্র লোকের মধ্যে। এদের অত্যাচারে মধ্যবিত্ত গরীব লোকেদের পারিবারিক সুখ-শান্তি প্রায় ছিল না বললেই হয়।

হরিহর ভট্টাচার্য গাঁয়ের একজন গরীব ব্রাহ্মণ। অপরের সাহায্যেই তাঁর সংসার চলে। লাবণ্য তাঁরই সহায়হীনা বালবিধবা ভগিনী। অসামান্যা রূপবতী। সব হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল মামার কাছে। প্রকৃতি যেন নিখুঁত করে কুঁদে গড়েছিল তাকে। সকলেই তারিফ করতো তার রূপের। বর্ষীয়সীরা নাসিকা কুঞ্চন করে বলতো—বিষকন্যা। এই রূপের জন্যই ও সব খোয়াল। কপালে আরও কি আছে, কে জানে!

সে এক রাতের ঘটনা। গভীর আঁধারের নিস্তব্ধতায় চারদিক মৌন। সকলের অজ্ঞাতে অগোচরে লাবণ্যর জীবনে ঘটে গেল এক চরম বিপর্যয়।

চোখ মেলে চায় লাবণ্য। সত্য, না স্বপ্ন! বহুমূল্য খাটে ভুজঙ্গ চৌধুরীর পাশে সে শায়িত। দু'হাতে চোখ মুছে স্পষ্ট করে বুঝতে চেষ্টা করে। ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত ফুলতে থাকে রাগে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে কেঁপে যায় শরীর। নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন সর্ব শরীর। কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে চায়। না—না, লজ্জা ও ভয়ে জ্ঞানশূন্যা হলে তাকে চলবে না। কান্নার এ সময় নয়। এই নরককুণ্ড থেকে তাকে উদ্ধার পেতেই হবে। সে যে কালনাগিনী! তাকে সেটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে হবে বই কি!

অনেক দিনই কেটে যায়। বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে যায় সব স্মৃতি। কেউ খোঁজ রাখে না লাবণ্যর। বৃদ্ধ হরিহর ভট্টাচার্য রোগে-শোকে ও অনাহারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অত্যাচার ও ব্যভিচারের শেষ পরিণতির হাত থেকে রেহাই পেল না ভুজঙ্গ চৌধুরীও। ক্রমশঃ শরীর জরা-ব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে পড়ে। জ্বর যেন ছাড়তেই চায় না শরীর থেকে। তারপর কাশির সঙ্গে একদিন বের হয়ে এল তাজা রক্ত। ডাক্তার পরামর্শ দেয় হাসপাতালে ভর্তি হবার। কারণ বাড়ীতে বিশেষতঃ এই অজ পাড়াগাঁয়ে এ-রোগের ভাল চিকিৎসা একবারেই অসম্ভব।

শিক্ষা ও সংস্কারের বালাই না থাকলেও, ভুজঙ্গ চৌধুরীর এটা বুঝতে বেশী কষ্ট হয়নি যে তার দিন ফুরিয়ে আসছে। পাপের ফল ফলতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু ভুজঙ্গ চৌধুরী সহজে দমবার পাত্র নয়। জীবনে পরাজয় স্বীকার করেনি কারও কাছে কোনদিন। তাই মনে মনে বলে—বাঁচতে তাকে হবেই—যে কোন কিছুর বিনিময়ে। কিন্তু আর এ-পথ নয়। নূতন ভাবে আবার জীবন শুরু করতে হবে।

তারপর একদিন বইবার মত ধন-সম্পত্তি নিয়ে পাড়ি দিল শহরের দিকে। সঙ্গে নিল না কাউকে। সব বেইমান; বিশ্বাস নেই কাউকে। নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। সব কিছুর বিনিময়েও আজ তাকে বেঁচে উঠতে হবে। কোন মতেই অকালে সে মরবে না। পয়সার অভাব তার নেই। কিন্তু পর মুহূর্তেই ভাবে, পয়সা থাকলেই যদি লোকে বেঁচে থাকতো তাহলে জগতের বড়-

লোকেরা আর মারা যেত না। বেদনায় মুষড়ে পড়ে।

প্রথম শ্রেণীর কামরা। যাত্রী মাত্র গোটা তিনেক। রিভলভারটা হাত দিয়ে দেখে নেয় জামার তলায় ঠিক আছে। এটিই তার একমাত্র বিশ্বাসী সাথী। ঠিক সাথেই আছে। একদিনের জন্যও কাছ ছাড়া হয়নি। গাড়ী চলেছে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে। সহসা আকাশের বুকে জমে ওঠে কালো ঘন মেঘ। গাছপালা-তারা সব কিছু ডুবে যায় কালোর বন্যায়। কিছুই দেখা যায় না। কামরার আলোটা মিটমিট করে জ্বলে। যাত্রী তিনজন একে একে নেমে যায় তাদের গন্তব্য স্থানে। ভুজঙ্গ একেবারে একা। বড় নিঃসঙ্গ মনে হয় আজ তার নিজেকে। অবসন্ন, ক্লান্ত জরাজীর্ণ শরীর। মনও বড় দুর্বল। ঘুমে এলিয়ে পড়তে চায় শরীর। কিন্তু ঘুমুলে চলবে না। জেগে তাকে থাকতেই হবে। রুগ্ন শরীরটাকে টেনে খাড়া করে বসায়। চিন্তা করতে থাকে—জীবনভোর ইচ্ছামত ভোগ করলাম। কিন্তু তৃপ্তি কোথায়! কামনার যেন আর শেষ নেই। কত লোকের সর্বনাশ করেছি। আজ তারই প্রতিফল শুরু হয়েছে। এসব পাপেরই পরিণাম। পরমুহূর্তে সিগারেটটা ছুঁড়ে দূরে ফেলে দেয়। গা ঝাড়া দিয়ে সরে বসে। বলে —ধ্যেৎ, পাপ-পুণ্য বলে কিছু আছে নাকি! ওসব দুর্বল লোকের অলীক কল্পনা। চুলোয় যাক সব। আগে সেরে উঠি, তারপর ও-সম্বন্ধে মাথা ঘামান যাবে। গাড়ী এসে থামে পরের ষ্টেশনে।

অন্ধকারে বিদ্যুৎ ঝলকের মত এক সুন্দরী, রূপসী উঠে আসে কামরায়। মেয়েটি চোখ মেলে চায় এদিক-ওদিক। কামরায় অসুস্থ ভুজঙ্গ চৌধুরী ছাড়া আর দ্বিতীয় লোক নেই। গাড়ী চলতে শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে, আর নামবারও উপায় নেই। অগত্যা জড়সড় হয়ে বসে' দূরে এক কোণে অন্ধকারে নিজেকে খানিকটা লুকিয়ে রাখে। ভুজঙ্গ চৌধুরী উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। বাস্তবিকই প্রকৃত সুন্দরী। কোন বড়লোকের মেয়েই হবে বোধহয়। গাড়ীর স্বল্প আলোয় দূর থেকে ভাল করে দেখা যায় না তার আপাদমস্তক। রক্তলোভী বাঘের মত তার চোখ চকচক করে জ্বলে ওঠে। ভুলে যায় তার রুগ্ন শরীরের কথা। কপালের শিরগুলো ফুলে ওঠে উত্তেজনায়। মেয়েটি জানলা দিয়ে মুখ বাইরে বের করে দিয়েছিল অন্ধকারে,—হয়তো আলোর প্রত্যাশায়। কিন্তু একবার যদি সেই মুহূর্তে ভুজঙ্গ চৌধুরীর মুখের দিকে দৃষ্টি দিত, তাহলে তাকে বিপদ-শিকল টেনে গাড়ী থামাতেই হত। সাহসে কুলোতো না একলা আর ঐ কামরায় বসে থাকতে।

আকাশে তখন বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে।

কামনার আগুনে হৃদয় জ্বলতে থাকলেও সাহস পায় না। আজ যে সে অসুস্থ। বাঁচবার আশায় ছুটেছে শহরের দিকে। বড়ই অসহায় সে আজ। কিছুক্ষণ স্নায়ু যুদ্ধের পর ক্লান্ত অসুস্থ শরীর আরও অবসন্ন হয়ে পড়ে। ভাবে আজ আর শক্তিতে নয়, ছলনায় বাজীমাত করতে হবে। সে বেশ নম্রভাবে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে—আপনি কোথায় যাবেন?

—কোলকাতায়।—শুধু ছোট্ট একটু জবাব।

—ভালই হল। আমিও কলকাতাতেই যাচ্ছি। শরীর আমার খুব অসুস্থ। মালপত্রগুলোর জন্য চোখের পাতা বুজতে পারছি না। দয়া ক'রে আপনি যদি এগুলোর ওপর একটু দৃষ্টি রাখেন তাহলে নিশ্চিন্তে আমি একটু ঘুমুতে পারি। এর মধ্যে কোন অসুবিধা হলে আমাকে জাগাতে আপনি কোন কুণ্ঠা বোধ করবেন না। আশা করি কোলকাতা পৌঁছুবার আগেই আমার ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে সম্মতিই জানায়। ভুজঙ্গ চৌধুরী আশ্বস্ত হয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু ঘুমুতে পারে না। ঘুমুবার ভান করে পড়ে থাকে। মেয়েটির দিকে তির্যক্ ভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করে। মেয়েটি জানলার বাইরে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। ভুজঙ্গ নিজের মনেই হাসে। পরম নির্ভরতা। মেয়েদের নাড়ীনক্ষত্র তার সব জানা। ঘুমে দু'চোখ একবারে জুড়ে আসে। কোন রকমেই যেন আর সম্ভব হয় না নিজেকে খাড়া রাখা। হলেই বা অপরিচিতা, ভদ্র ঘরের মেয়ে—বিশ্বাসের অমর্যাদা কখনই করতে পারবে না। চিন্তা-সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে এক সময় অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে ভুজঙ্গ চৌধুরী। ঘুম ভাঙ্গলো একবারে হাওড়া ষ্টেশনে কুলীদের চিৎকারে। দু'হাতে চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসে। প্রথমেই চোখ মেলে দেখে তার স্যুটকেসটি উধাও! একে অসুস্থ শরীর,

তায় আবার এ-দুর্ঘটনা—শরীর যেন অবসন্নতায় ভেঙ্গে পড়ে। তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে দেখে মনিব্যাগও নেই! ভাঁজ করা একটা কাগজ বার হয়ে আসে পকেট থেকে। কাগজটা বিষণ্ণ মনে চোখের সামনে তুলে ধরে। একটা চিঠি।

ভুজঙ্গ চৌধুরী, অনেক দিন অপেক্ষার পর তোমাকে মুঠোয় পেলাম। তাই এ-সুযোগের কি অপচয় করতে পারি! এরই অপেক্ষায় এতদিন আমি দিন গুনছিলাম। এই সুদীর্ঘ দিন আমি কিভাবে তোমাকে অনুসরণ করেছি তা একমাত্র আমার অন্তর্যামীই জানেন। আহার-নিদ্রা মান-সম্ভ্রম কিছুই আমার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। কঠোর সাধনা আজ আমার সফল হয়েছে।

যেভাবে অনেক মেয়ে তোমার অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে নিজেদের মুক্ত করেছিল, তেমনি ভাবে তুমি নিজে মুক্ত হতে পার। সেইজন্য তোমার রিভলভারটা আর সরালাম না। যাতে অতি সহজেই তুমি মুক্তি পেতে পার। তোমার টাকাকড়ি সব 'নারী কল্যাণ আশ্রমে' জমা দিয়ে দেব। যাতে পরলোকে তোমার আত্মার কিছুটা শান্তি ও সদ্গতি হয়—এই ইচ্ছায়। ইতি—

লাবণ্য।

অসুস্থ রুগ্ন শরীর তার টলে পড়ে। একে একে গাড়ী ফাঁকা হয়ে আসে। ভুজঙ্গ আজ সত্যই বড় অসহায় বোধ করে। তার মত কঠিন হৃদয় ব্যক্তির চোখেও জল এসে যায়। মাথায় হাত দিয়ে আত্মস্থ হতে চেষ্টা করে।

সহসা লুপ্তপ্রায় চেতনা যেন ফিরে আসে ভুজঙ্গ চৌধুরীর। ক্রোধে উত্তেজনায় সর্বশরীর কাঁপতে থাকে থরথর করে। মনে মনে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে বসে—দেখে নেব হরি ভট্টাচার্যের ভাগনীকে! ভিখারীর ছেঁড়া কাঁথা! আচ্ছা, দাঁড়াও, কোন রকমে সারি আগে।

উত্তেজনায় প্রায় ছুটে বের হয়ে যায়। সম্মুখেই একটি খালি ট্যাক্সি পেয়ে তাতেই উঠে বসে। হুকুম দেয়—'নারী কল্যাণ আশ্রম'।—আপন মনেই গজরাতে থাকে—কল্যাণ করাচ্ছি!

ট্যাক্সি চলতে থাকে। উত্তেজনায় মুখের শিরাগুলো সব ফুলে ফুলে ওঠে। কাশির বেগ আরম্ভ হয় প্রবলভাবে। মুখ দিয়ে বার হয়ে আসে ঝলকে ঝলকে তাজা রক্ত। বীর-বিক্রম ভুজঙ্গ চৌধুরীর বিরাট দেহখানা অবশ হয়ে নেতিয়ে পড়ে গাড়ীর মধ্যে। 'নারী কল্যাণ আশ্রমের' সম্মুখে এসে গাড়ী থেমে যায়। পিছন দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে ড্রাইভার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। ভেবে পায় না কি করবে সে। লোকটা কি শেষে মারা গেল নাকি! চুপিসারে সে ভুজঙ্গকে 'নারী কল্যাণ আশ্রমের' দাওয়ায় শুইয়ে দিয়ে গাড়ী নিয়ে সরে পড়ে।

আশ্রমের পরিচালিকা মিসেস ভাণ্ডারী কোন কাজের জন্য বাইরে যাচ্ছিলেন। তিনি মৃতপ্রায় একটি লোককে ঐ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে বিস্ময়ে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। ভাল করে পরীক্ষা করে বোঝেন লোকটি জীবিত। তবে এই অবস্থায় আর কিছুক্ষণ থাকলে জীবনের কোন আশা থাকবে না। সমস্ত শরীর তাজা রক্তে ভরে গেছে। দুই কশ বেয়ে কাল জমাট রক্ত। তিনি কোন ভাবনার অবকাশ না রেখে তৎক্ষণাৎ তাকে হাসপাতাল পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

বেহুঁশ অবস্থায় কেটে গেল কয়েক দিন। তারপর অল্প জ্ঞান হলে আস্তে আস্তে মলিন দৃষ্টি মেলে। বুঝতে কষ্ট হয় না যে সে হাসপাতালে।

এইভাবে আরও কিছুদিন কেটে গেল। কিন্তু তবুও সব কিছুই যেন তার কাছে ধোঁয়াটে বলে মনে হয়। একদিন ভুজঙ্গ নার্সকে বলে—একি অন্যায় জবরদস্তি আপনাদের! নিজের বিষয় কিছু জানবার অধিকারও থাকবে না আমার!

নার্স হেসে ছোট্ট ভাবে উত্তর দেয়—যাকে জানাবার তাঁকে জানানর কোন ত্রুটি হচ্ছে না।

—যাঁকে জানাবার তাঁকে জানান হচ্ছে মানে! ভারি আশ্চর্য তো! আমার আবার আপনার লোক কে এল?

—কেন, মিসেস ভাণ্ডারী। যিনি আপনাকে এখানে ভর্তি করেছেন। রোজ এসে আপনার মাথার কাছে বসে থাকেন। তিনি বলেন—আপনি নাকি তাঁর ছেলে। যাক আপনি আর কথা বলবেন না। ডাক্তাররা জানতে পারলে আর রক্ষে থাকবে না। এখনও আপনার Complete rest-এর period.

ভুজঙ্গ চৌধুরী আর কিছু বলতে পারে না। রোগ-পাণ্ডুর মুখে ক্ষীণ ম্লান হাসি দেখা দেয়। মনে মনে বলে—

মিসেস্ ভাণ্ডারী,—তার মা! হায় নারী, ছলনাময়ী! তুমি কতটুকু চেন আমাকে?

জ্ঞানে-অজ্ঞানে প্রায়ই ভুজঙ্গ চৌধুরী দেখত এক বৃদ্ধা নারী চিন্তাক্লিষ্ট মুখে তার মাথার কাছে বসে থাকতেন। কিন্তু নার্সের কঠিন নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মুখ খুলতে সাহস হয় না তার। অতীতের দুর্দান্ত দুঃসাহসী আজ শিশুর ন্যায় দুর্বল ও ভীত।

দীর্ঘ দিন চিকিৎসার পর শরীর ক্রমশঃ সুস্থ হতে লাগলো। একদিন ক্ষীণ কণ্ঠে সাহসে ভর করে জিজ্ঞাসা করে—আপনি কে?

—আমি? কেন, তোমার মা!

বিষণ্ণ হাসির ঢেউ ভুজঙ্গর চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

—হাসছো কেন বাবা? আমি কি তোমার মা হতে পারি না?

—হাসছি আমার ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে! এখন আমি জীবন্মৃত। বাঁচার আর কোন সাধই নেই আমার। আর কিইবা হবে এই জীর্ণ শরীরের মিথ্যা বোঝা বয়ে বেঁচে থেকে!

—শরীর কি সকলের সব সময়েই একরকম যায়? এখন অসুস্থ হয়েছো, আবার দু-দিন বাদেই সুস্থ হয়ে ভাল হয়ে উঠবে। নির্ভাবনায় সুখে সংসার করবে।

—সংসার!

—অমন আশ্চর্য হচ্ছ কেন বাবা! কেন, তোমার কি কেউ নেই?

—না কই, কেউ তো নেই!

—আছে বাবা, আছে। সব আছে। মানুষ বেঁচে থাকলেই আবার সব হয়। নিজের মত অপরকে ভাবতে শেখ, বাবা। তোমার যেমন আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সেই সঙ্গে মান-সম্ভ্রম ও মর্যাদা আছে, তেমনি অপরেরও তো ঐসব থাকতে পারে। আমি যদি বাবা, তোমাকে ছেলে বলে ভালবেসে কাছে টানি, তুমি কি দূরে সরে থাকতে পার? মা বলে কি ভালবেসে কাছে আসবে না? তাই বলে জীবনে ভুল যে হতে পারে না, এমন কথা কেউ জোর করে বলতে পারে না। কারণ ভুল নিয়েই তো আমাদের জীবন। তাই বলে নৈরাশ্যবাদী হলে চলবে না।

ভুজঙ্গ নীরব। মিসেস ভাণ্ডারী আবার বলেন—সত্যি করে বলতো বাবা, আজ যদি তোমার মা বেঁচে থাকতেন, তিনি কি তোমাকে অমনভাবে একলা ছেড়ে দিতে পারতেন? ভুজঙ্গ নীরব হয়ে থাকে। শুধু দু-চোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুর বন্যা। মিসেস ভাণ্ডারী সস্নেহে তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে সান্ত্বনার সুরে বলেন—ছি, বাবা, পুরুষ মানুষের কি এমন দুর্বল হলে চলে। কত সাহস তোমার। আমি লাবণ্যর কাছে সব শুনেছি।

ভুজঙ্গর চোখ সহসা চকচক করে জ্বলে ওঠে।—লাবণ্য! হ্যাঁ—হ্যাঁ। হরিহর ভশ্চার্যের ভাগনী। কোথায় সে? একবার যদি তাকে কাছে পাই। তা'হলে বুঝিয়ে দি তাকে। তার দম্ভ·······।

ছি, বাবা! আবার শুধু শুধু উত্তেজিত হচ্ছ। তোমার নিজের জীবনের ওপরও কি মায়া নেই। একথা কি তোমার মনে থাকে না যে, তোমার জীবন এখনও নিরাপদ নয়।

বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে ভুজঙ্গ চৌধুরী। কোন কিছু করবার উপায় নেই তার। পরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সে।

মিসেস ভাণ্ডারী আবার বলেন—ব্যথা পেলে বাবা! আমার নিজের ছেলেপুলে নেই। তোমরাই আমার সব। তাই তোমাকে বলি। লাবণ্য কেন—সমস্ত নারী জাতিকে তুমিও এখন থেকে আমার মত ভাবতে চেষ্টা কর। অতীতের গ্লানি নিঃশেষে মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেল।

—এ মুছবার নয়। তাই ভাবি এ-রকম গ্লানিময় জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে লাভ কি!—নির্জীবের মত বলে ভুজঙ্গ।

—ওকি, বাবা! জীবনের দাম কি কম। এখনও তোমার অনেক কাজ বাকী। এ হল তোমার নব জন্ম। নূতন ভাবে শুরু করতে হবে তোমাকে সব কিছু।

—মা-মা-মাগো! সত্যিই তুমি আমার মা। যুগ-সঞ্চিত কুয়াশার আড়াল থেকে আমার চোখের সম্মুখে এক নূতন জগৎ খুলে গেল। আশীর্বাদ কর মা, ত্যাগের ব্রতে যেন নিজের জীবনকে দীক্ষিত করতে পারি। নারী—সে কেবল ভোগের সামগ্রী নয়—সে যে মহাশক্তি স্বরূপিনী!

৪৬শ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৭৩ | ২য় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

সমাজ-শত্রুদের বিরুদ্ধে গণ-অভিযান

পশ্চিমবঙ্গের যুব সম্প্রদায় মজুতদার ও মুনাফাবাজদের হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। ন্যায্য মূল্যের অতিরিক্ত দরে জিনিসপত্র ক্রয় না করে তারা ক্রেতা প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেছেন। অবশ্য আপাততঃ এ-অভিযান খুচরা ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। কিন্তু আড়কাঠীর বড় বড় রাঘব বোয়াল এখনও অভিযানের লক্ষ্য বস্তুর বাইরে।

বস্তুতঃ পক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্যস্তর এখন সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। মজুতদার ও মুনাফাবাজদের জঘন্য চক্রান্তে পণ্যদ্রব্য সমূহ অদৃশ্য পথে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। অথচ কালোবাজারে কোন কিছুরই অভাব নাই। এদের শায়েস্তা করতে সরকারের ব্যর্থতা জাতীয় জীবনে এক ঘোর দুর্দিনের সূচনা করেছে।

সরকার দ্রব্যমূল্য জনসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে রাখার জন্য আবেদন জানিয়েছেন এবং তাঁরা এ-কথা বার বার ঘোষণা করছেন যে, জিনিসপত্রের দাম বাড়তে দেওয়া হবে না। অবশ্য সরকার এ আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে, টাকার বৈদেশিক বাট্টা হ্রাসের ফলে দেশের ভিতরের জিনিসের দাম বাড়বে না। কিন্তু সাম্প্রতিক এক অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে ডি-ভ্যালুয়েশন-পরবর্তীকালে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য—যার মধ্যে আমদানীকৃত কোন উপকরণ নেই—সেগুলিরও দাম ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বেড়ে গেছে। এর ফলে স্বভাবতঃই

সাধারণ মানুষের সংসার খরচ ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বেড়েছে। বলা বাহুল্য সরকারী আশ্বাস জনসাধারণকে কোন স্বস্তি দিতে পারছে না। আইনের ক্ষমতা সরকারের আছে। কিন্তু তা' প্রয়োগ করতে গিয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে সরকারী নীতি। আর তার ফলে একদল অসাধু ব্যবসায়ী ও মজুতদার—যারা জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশাকেই নিজেদের মুনাফার প্রকৃষ্ট সুযোগ বলে গ্রহণ করে—যথেচ্ছ ভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।

পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের পরেই রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর মজুতদার ও মুনাফাবাজদের বিরুদ্ধে যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তা' খুবই প্রশংসার্হ। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে সহস্রাধিক অসাধু ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়। চোরাবাজারী, মজুতদারী ও ভেজাল মেশানো ইত্যাদি নানাবিধ অপরাধে এরা অভিযুক্ত। এদের বিচারের জন্য জেলায় জেলায় জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট বসান হয়। অভিযুক্তদের লাইসেন্স ও পারমিট বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এর সুফল পাওয়া গেছে। সৎ ব্যবসায়ীরা স্বেচ্ছায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য পাঞ্জাব সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছেন।

পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়েই যা করতে পারলেন, পাঞ্জাব মন্ত্রিসভা এত দিনেও তা' পারেন নি! আত্মবিশ্বাস ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারলে, সাফল্যের সম্ভাবনাও অনেকখানি সহজ হয়ে আসে। পাঞ্জাবের পর দিল্লী, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যেও অনুরূপ অভিযান শুরু হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে সমস্যার অন্ত নেই। বেকার সমস্যার তীব্রতা ও অন্যান্য বহুবিধ কারণে এ-রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো স্বভাবতঃই দুর্বল। তার উপর এভাবে বাজার দর ঊর্ধ্বমুখী হলে জনসাধারণের ক্ষোভ হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। জনসাধারণের আয় সীমাবদ্ধ। অথচ ধাপে ধাপে জিনিসের দাম বাড়ছে—এই অবস্থা বেশী দিন চলতে দিলে মানুষ মরিয়া হয়ে একদিন আগ্নেয়গিরির মতো বিস্ফোরণে ফেটে পড়বে। সাধারণ মানুষের ভাতের ওপর যদি টান পড়ে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর দাম যদি ন্যায্য স্তরে না থাকে, তাহলেও জনসাধারণ শান্ত হয়ে মুখ বুজে সেটা সহ্য করে যাবে—এ আশা করা বাতুলতা মাত্র। ভারতবর্ষের দুর্দশা ও দুরবস্থার জন্য দায়ী তার অর্থনৈতিক ব্যর্থতা। এর পেছনে মজুতদার ও মুনাফাখোরদেরও একটি জঘন্য ভূমিকা আছে।

সরকারের দুর্বল নীতির ফলে মজুতদার ও মুনাফাখোর-দের সঙ্গে সরকার এঁটে উঠতে পারছেন না। পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর যে আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা নিয়ে অভি-যান পরিচালনা করেছেন অন্যান্য প্রদেশে অনুরূপ কোন সক্রিয় ব্যবস্থা এখনও অবলম্বিত হচ্ছে না। হালে পানি না পেয়ে সরকার মজুতদার ও মুনাফাখোরদের সঙ্গে মোকা-বিলা করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়েছেন।

যে দায়িত্ব পালনে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের যুব সম্প্রদায় সেই দায়িত্ব পালনে স্বেচ্ছায় অগ্রণী হয়েছেন। কায়েমী স্বার্থে আঘাত হানলে প্রতিপক্ষ থেকে বাধা আসবে—এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তার জন্যে পশ্চাৎপদ হওয়া কাপুরুষতার পরিচায়ক। যুব সম্প্রদায়ের এ-অভিযান ইতিমধ্যেই আংশিক সাফল্য লাভ করেছে। সম্পূর্ণ সাফল্য নির্ভর করছে দৃঢ়তা, ধৈর্য ও সংগঠন শক্তির উপর। এই ক্রেতা প্রতিরোধ আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে উঠুক, কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রেই এ আশা পোষণ করবেন।

ক্রেতা প্রতিরোধ আন্দোলন শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরি-চালিত হলেও, এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় বঁটি, ছুরি ইত্যাদি অস্ত্র ক্রেতা প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। এই সব অসাধু ও লোভী ব্যবসায়ীদের সাহস ও স্পর্ধা কতদূর এগিয়ে গেছে, এর থেকেই সেটা বেশ বোঝা যায়।

শাসনের উপযুক্ত যথেষ্ট ক্ষমতা সরকারের হাতে আছে। সরকার যদি এইসব সমাজ বিরোধী শত্রুদের বিরুদ্ধে সে ক্ষমতার প্রয়োগ না করে রাজনীতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন এবং মানুষের পুঞ্জীভূত দুর্গতি যদি প্রতিকারহীন হয়, তাহলে তা শেষ পর্যন্ত কোন যুক্তি মানতে চাইবে না। বিক্ষোভের অগ্ন্যুৎপাত ঘটার পূর্বেই সরকারের এ-কথা অবহিত হওয়া উচিত।

প্রেমের রকম-ফের

উপায় কি!

মুহূর্তের জন্যে

সংস্মিতা

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ব্যবস্থাধীনে আনা সংস্থা সমূহের এক বিপজ্জনক নজির সৃষ্টি হতে চলেছে। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত ব্যবসায় সমূহের দোষ-ত্রুটি দূর করে যথা সম্ভব সুপরিচালনা করাই ছিল এই সকল সরকারী সংস্থা সমূহের প্রধান কর্তব্য। কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নীতির উপর ভিত্তি করে সরকারি সংস্থা পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান। পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থানের মহৎ উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। অবশ্য জনসাধারণের জন্য উন্নততর সুখ সুবিধা সমন্বিত পরিবহনের উদ্দেশ্যও এর মধ্যে ছিল। আশা করা গিয়েছিল সরকারী পরিচালনায় পরিবহন সমস্যার তীব্রতা কিছুটা লাঘব হবে। কিন্তু বাস্তবে সে আশা আজ হতাশায় পরিণত হয়েছে।

একথা ঠিক যে, এই সাস্থার দ্বারা বেকার বাঙালী যুবকদের কর্ম সংস্থানের যথেষ্ট সুরাহা হয়েছে, কিন্তু যাত্রীসাধারণের সুখ সুবিধার প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। প্রশাসন ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য অনিয়মিত বাস-সার্ভিস অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ব্রেক ডাউনের' মহিমায় রাস্তায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস পাওয়া যায় না। অথচ যাত্রীসাধারণের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সম্বন্ধে কর্তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। বিশেষতঃ, মহিলা যাত্রীরা এই পরিবহন সমস্যার সঙ্কটে যে কত অসহায় বোধ করেন, তা' একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানে।

এ-বিষয়ে যখনই আলোচনার তুফান ছোটে, তখনই কর্তারা সংখ্যা তত্ত্বের ভেলকি বাজি দেখিয়ে সমস্যাটিকে পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। মনো রেল, সার্কুলার রেল ইত্যাদি বড় বড় কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে বুঝিয়ে দেন—সমস্যার আশু মীমাংসা নেই। কিন্তু তাঁরা একটুও ভেবে দেখেন না রাস্তায় যথাসম্ভব চালু বাসের সংখ্যা বাড়িয়ে ও প্রশাসন ব্যবস্থা গলদমুক্ত করলে সমস্যার অনেকখানি সুরাহা হতে পারে।

প্রতি বৎসর মোটা অঙ্কের লোকসান দিতে হচ্ছে। তার উপর যাত্রীদের দুর্দশা চরম সীমায় পৌঁছেচে। তা' হলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে, কি সার্থকতা আছে এরূপ অপদার্থ সংস্থাটিকে জীইয়ে রাখার!

* * *

বাংলা, বিহার, বোম্বাই, আসাম—চতুর্দিকে আজ 'বন্ধ্'-এর খেলা চলেছে। সরকারী অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই 'বন্ধ্'-এর আহ্বান দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সরকারের বক্তব্য হল, এটা বিরোধীদের প্রাক-নির্বাচনী চাল!

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, 'বন্ধ্' আহ্বানের ফলে কিছু সংখ্যক নিরীহ লোকের প্রাণহানি আর সরকারী সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া সাধারণ সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি।

সরকার স্বীকার না করলেও একথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে সরকারী নীতি ও প্রশাসন ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য দেশের সমস্যার তীব্রতা অনেক বেড়ে গেছে। স্বাধীনতা পাওয়ার পর প্রায় ১৮ বছর কেটে গেছে, কিন্তু এখনও আমরা মার্কিন অনুগ্রহ পি. এল. ৪৮০-র উপর একান্ত নির্ভরশীল। একটির পর একটি পাঁচসালা পরিকল্পনা হয়ে চলেছে, তার জন্য শত শত কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দও হচ্ছে—কিন্তু দেশের মৌলিক সমস্যার কোন সমাধান নেই। তার উপর আবার অপদার্থ ও অযোগ্য প্রশাসন ব্যবস্থার ফলে দেশে দুর্নীতির ঘূর্ণিস্রোত বয়ে চলেছে। সেই স্রোতের টানে অসহায় জনসাধারণ ভেসে চলেছে আর খড়কুটো অবলম্বন করে আত্মরক্ষার ব্যর্থ প্রয়াস পাচ্ছে!

স্বভাবতঃই জনসাধারণের মনোভাব সরকারের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ। এই বিরূপ মনোভাবের পূর্ণ সুযোগ নিতে চান সরকার-বিরোধী গোষ্ঠীবর্গ। দেশ ও দশের স্বার্থ আজ কারো কাছেই মুখ্য নয়—সকলেরই লক্ষ্য ক্ষমতায় আসীন হওয়া। রাজনীতির এই পঙ্কিল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে 'বন্ধ্' আন্দোলন জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে কতখানি সাহায্য করবে, তা' সত্যই দুর্জ্ঞেয় রয়ে গেছে।

বাদল ঝরে

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, কাব্যশ্রী

রিম্ ঝিম্ —রিম্ ঝিম্—বাদল ঝরে,
ঝর্ ঝর্—যেন নিঝর—বৃষ্টি পড়ে!
আকাশের যত তারা, মুদেছে আঁখি-তারা,
চাঁদের কিরণ-ধারা নাহিরে ক্ষরে!
বরষার বারি ঝরে, বাদল ঝরে!

আঁধারে গেছে আজ ভুবন মিশি,
চারিপাশ মেঘময়—কৃষ্ণা নিশি!
বিটপীর শাখে শাখে, পল্লব বারি মাগে,
জাগেরে সাড়া বনে—বনান্তরে!
বরষার বারি ঝরে, বাদল ঝরে!

তটিনী বলে—"আয় মেঘের ধারা,
আয় পাহাড়িয়া ঢল্—বাঁধন-হারা!"
বুক তার উতরোল, জেগে ওঠে কল্লোল,
জাগেরে তৃষা আরো—তৃষার 'পরে!
বরষার বারি ঝরে, বাদল ঝরে!

বরষার জল নামে ধরার 'পরে!
মাটির কাতর বুক আকুল করে!
নিবিড়তর ক্ষুধা, চায়রে প্রাণের সুধা,
মেঘেরে ডাকেরে সে কাতর স্বরে!
বরষার বারি ঝরে, বাদল ঝরে!

অলৌকিক রহস্য — সত্য ঘটনা

জড় জগতের পরিবেশ ও আকর্ষণময়ী আলোক মণ্ডল

চক্রের অভিজ্ঞতা

সাত

কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের একজন বন্ধু, মিঃ পী নামে তাঁর একজন ব্যবসায়ী বন্ধুর বিচিত্র মানসিক পরিবর্তন ও ব্যবহারের কাহিনী আমাদের গোচরে এনেছিলেন।

মিঃ পী হঠাৎ কেমন যেন অন্যরকম মানুষ হয়ে উঠেন এবং তাঁর ভাবগতিকের বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তিনি হঠাৎ বদমেজাজী হয়ে উঠেন এবং অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রতি দুর্ব্যবহার শুরু করেন—কোন কিছুতেই তাঁকে সন্তুষ্ট করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠতে থাকে।

ভদ্রলোকের উপর প্রেতাত্মার অশুভ প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে এই আশঙ্কা ক'রে আমরা চক্র আহ্বান করি। কয়েক সপ্তাহ পরে একটি ক্রুদ্ধ প্রেতাত্মা মিসেস্ উইকল্যাণ্ডের মুখ দিয়ে আমাদের জানায় যে, সে সেই ভদ্রলোকটিকে কষ্ট দিচ্ছে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রেতাত্মাটি জানায় যে, সে এই কাজ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই করছে; তার মৃত্যুর পর তার (প্রেতাত্মার) বিধবা স্ত্রীর প্রতি মিঃ পী-এর আকর্ষণই এই প্রতিহিংসার কারণ।

প্রেতাত্মা বলে সে একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। সে কিছুকাল পূর্বে দেহত্যাগ করলেও, এ-সম্বন্ধে পুরোপুরিই অজ্ঞ ছিল। সে বলে যে, সে কিছুদিন পূর্বে গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিল, কিন্তু এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং তার ইচ্ছানুযায়ী সে সর্বত্র অবাধে চলাফেরা করতে পারে।

তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা তার সঙ্গে কেন যে কথা বলে না, এতে প্রেতাত্মা খুব বিস্ময় প্রকাশ করে এবং অভিযোগ করে যে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তার স্নেহ-প্রীতি বিস্মৃত হয়ে, তার প্রতি উদাসীন হয়ে উঠেছে।

প্রেতাত্মা অভিযোগ ক'রে যে, তার অনেক বন্ধু-বান্ধব তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেছে এবং ফুল ও নানা উপহার তার স্ত্রীকে প্রেরণ করছে। প্রেতাত্মা শপথ ক'রে বলে যে, সে তাদের উপর পুরোপুরি প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর।

প্রেতাত্মা স্বীকার ক'রে যে তার চিন্তাশক্তি কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে এবং কোন বিষয়কেই স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করবার ক্ষমতা যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। কিছুদিন পূর্বে তার যে গুরুতর পীড়া হয়েছিল, তার ফলেই তার চিন্তাশক্তির জড়ত্ব এবং দেহের লঘুত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে বলে তার ধারণা।

সে একটা বিষয়ে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল যে, যখনই সে কোন ব্যক্তির কথা চিন্তা করত, তখনই সে সবিস্ময়ে দেখত যে, সে সেই ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেছে। এই রকম ভাবেই সম্প্রতি সে মিঃ পীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মিঃ পীকে নানা কষ্ট দিতে থাকে, সারারাত জাগিয়ে রেখে, সকাল-সন্ধ্যা অবিরত কাজ করিয়ে ও নানা রকম ভাবে সে মিঃ পীর উপর পীড়ন করতে থাকে।

অবশেষে অনেক আলোচনা করবার পর প্রেতাত্মা তার মৃত্যুর বিষয় উপলব্ধি করতে পারল। তার ধারণা ছিল যে মৃত্যুই মানুষের চরম সমাপ্তি, তারপর আর কিছু নেই, কিছু থাকে না।

পরলোকে তার জন্য বহু কল্যাণকর কাজ অপেক্ষা করছে এবং সেখানে গেলেই সে সব কিছুই উপলব্ধি করবে, এই কথা বলায় প্রেতাত্মা হৃষ্ট চিত্তে বিদায় গ্রহণ করল।

পরদিন থেকেই মিঃ পীর আশ্চর্য রকম উন্নতি হ'ল, তাঁর ব্যবহারের মধ্যে পূর্বেকার সেই স্বাভাবিক ভাব ফিরে এল এবং অফিসের সকলেই সেই পরিবর্তন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলেন। মিঃ পী নিজে কোনদিন জানতে পারেন নি যে, তাঁর সুস্থতা সম্পাদনের জন্য কী প্রচেষ্টা হয়েছিল।

ভুল

সুদর্শন চক্রবর্ত্তী

—একি করছিস্ তুই প্রদোষ ?

—এ আর এমন কিছু নয় সুখেন্দু, একটু শুধু ভুলে থাকার চেষ্টা ; মানে নিষ্কৃতি পেতে চাই !—বলেই প্রদোষ পাশের বোতল থেকে সবটুকু ঢেলে এক চুমুকেই পান ক'রে নেয়। তারপর আবার ঢালতে চায়।

এবার হাতটা ধ'রে ফেলে সুখেন্দু। ফলে একটা বিকট হাসির হল্লায় কাঁপিয়ে তোলে প্রদোষ সমস্ত ঘরখানা। মুখ থেকে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সুখেন্দু এবার তুলে আনে প্রদোষকে নিউ মার্কেটের একটা বার থেকে। মোটর ছুটিয়ে নিয়ে যায় প্রদোষকে বোটানিকেল গার্ডেনে। দুটো সিগারেট বার ক'রে একটা প্রদোষকে দিয়ে অপরটা নিজে ধরিয়ে সুখেন্দু বলে—কিসে এত শক্ পেলি তুই প্রদোষ ?

—বুঝবি না সুখেন্দু, এ দুঃখের জ্বালা।

—তা বুঝেছি, নইলে যে কখনও একটা সিগারেট পর্যন্ত মুখে দিত না, নস্যি পর্যন্ত নিত না, পান খাওয়াকেও ঘৃণা করত, সে আজ সহসা এতখানি এগিয়ে এল কি ক'রে !—বলে সুখেন্দু প্রদোষের কথায় সায় দেয়।

—আজ আর বেঁচে থাকার কোন মূল্যই নেই সুখেন্দু, এ ভারাক্রান্ত জীবনে আজ বেঁচে থাকাই একটা বিড়ম্বনা। তারপর একটা দম দিয়ে আবার প্রদোষ বলে—ভাল একদিন সত্যিই আমিও ছিলামরে।—বলেই একরাশ ধোঁয়া ছাড়ে প্রদোষ। সেই ধোঁয়াটা কুণ্ডলী পাকিয়ে ধীরে ধীরে হাওয়ার সঙ্গে দোল খেয়ে খেয়ে মিলিয়ে গেল। আবার প্রদোষ শুরু করে—খেলায় মেডেল, ক্লাসের ফার্ষ্ট বয়, আবৃত্তিতে পুরাস্কর সবই আমি পেয়েছি। পয়সারও কোন অভাব হয়নি কখনও। ভালও বেসেছিলাম আমি রাত্রিকে।

—রাত্রিকে ?—ব'লে ওঠে সুখেন্দু অস্পষ্ট ভাষায়।

—হ্যাঁ, ওই জমিদারের মেয়ে রাত্রি, যে একটা দিনও আমায় না দেখে একেবারে পাগল হ'য়ে উঠত।

—তারপর ?

—যা হ'য়ে থাকে,—কথাবার্তাও আমাদের ঠিক হ'য়ে গেল। পিকনিকের ছলে ডায়মণ্ড হারবার গিয়ে একটা গাছের তলায় দুজনে বসলাম। গাছটা কদম গাছ না কি গাছ ছিল, ঠিক মনে নেই। তবে রাত্রিই আমাকে প্রথম কথা দেয়।—বলতে থাকে প্রদোষ দূরের দিকে তাকিয়ে।

—তাতে কি হয়েছে প্রদোষ ? এ আর বিশেষ কি হয়েছে ! এমন ত কত হয়ে থাকে। এখন সে আর একজনকে বিয়ে করবে বলেছে, এইত ?

—না—বলেই প্রদোষ গম্ভীর হয়ে যায়।

—কি তবে !—বিস্ময়ে অধীর হয়ে ওঠে সুখেন্দু।

—এতদিন সে আমাকেই বিয়ে করবে বলেছিল।

—বেশ তো, ভাল কথাই সে বলেছে।

—তুই থাম সুখেন্দু, বি সিরিয়াস্ ! জীবনটা খেলা নয়। মাঝখানের এই তিনটি বছরের খবর কিছু জানিস কি ?

—তার মানে ?

—ওর বাবার ইচ্ছা অনুসারে মাঝখানে রবি দত্তের সঙ্গে ওর বিয়ের সবই ঠিক হ'য়ে থাকে। শুধু একটু আপত্তি ছিল—রবি দত্ত বিলেত যাচ্ছে তখন, বিলেত থেকে এলেই সে ওকে বিয়ে করবে। ভারি রাশভারী লোক ওর বাবা, কিছুতেই তাকে ঠেকানো যায় না।

—হরিবল !—বলে ওঠে সুখেন্দু।

—শুধু তাই নয়, এই তিনটি বছর ধরে চলল সেই সাধনা, কিসে বিলেত ফেরত রবি দত্ত তার মার্জিত রুচি নিয়ে এসে রাত্রিকে উপযুক্ত স্ত্রী 'বলে গ্রহণ করতে পারে !

—তারপর ?

—লিপিষ্টিক, পমেড, রুজ, হাইহিল, বব-ছাঁট চুল, ভ্যানিটি ব্যাগ আর বুক কাটা ব্লাউজে রাত্রি যখন গেল তাকে দমদমের এয়ার পোর্ট থেকে আনতে, রবি দত্ত তখন দিশেহারা হ'য়ে পড়ল রাত্রির এ-রূপ পরিবর্তনে। সেখানে এই ধরনের নকল প্যাকেটগুলোকে দেখে দেখে সে একেবারে যেন অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল কখন দেখবে, বাংলার সেই লাজ-নম্র গ্রাম্য বধূর স্নিগ্ধ সহাস্য চাহনি। তাই একেবারে বিগড়ে বসল রবি দত্ত রাত্রির এসব কাণ্ড দেখে।

—তাই সে আবার ফিরে এসেছে তোর কাছে, এইত ?

—হ্যাঁ, ফিরে এসেছিল কিন্তু গ্রহণ করতে পারিনি তাকে আর।

(শেষাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গল্প বলো

শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য

গল্প বলো, বলেছিলো উলঙ্গ সেই নিকষ কালো রঙের
ছেলেটা,
একেবারে গ্রামের প্রান্তে মাঠের কোলে
যাদের কুঁড়েঘরটা ছিল কোনরকমে দাঁড়িয়ে
প্রকৃতির ছয় ঋতুর খেয়ালীপনা থেকে মাথা বাঁচিয়ে।
এক গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের দুপুরে—
ঘামে-ভেজা গরম শরীরটা একটুকাল ঠাণ্ডা করবার আশায়
যখন গিয়ে বসেছিলাম
ওদের জমিতে দাঁড়ানো বিরলপত্র বাবলা গাছটার তলায়,
সেই ছেলেটা, সেই কোনো একটি চাষীর নিকষ কালো
রঙের উলঙ্গ ছেলেটা
আবদারের সুরে বলেছিলো আমাকে, গল্প বলো।
জানিনা, গল্প শোনার সে-আগ্রহ ছেলেটা কোথায়
পেয়েছিলো,
হয়তো ওরই চাষী-দাদুর বা দিদিমার কোলের কাছটিতে
শুয়ে
এ-অভ্যাস ওর দাঁড়িয়েছিল।
তার সে-ইচ্ছা মেটাতে পারিনি আমি
সময়ের চাকায়-বাঁধা ক্রীতদাস হওয়ার জন্যই
উঠে পড়তে হয়েছিল তখুনি কর্তব্যের আহ্বানে।
যাবার মুহূর্তে দেখেছিলাম
ছেলেটার চোখ দুটো ছল্‌ছল্‌ করছিলো,
গল্প না শুনতে পাওয়ার অভিমানেই হয়তো।
তারপর থেকে গল্পতো অনেক লিখেছি
অনেক পাঠকের অলসক্ষণের খোরাক যোগাতে,
অনেক শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য অনেক গল্পইতো বলতে
হয়েছে
কত সভায়, কত আসরে, কতবার।
কিন্তু তবুও সত্য কথাই বলবো—
আজো তেমন করে, তেমন আগ্রহ নিয়ে গলার স্বরে,
ঔজ্জ্বল্য নিয়ে দু'চোখের তারায়,
কারুকে বলতে শুনলাম না, 'গল্প বলো',
যেমন বলেছিল একদা এক গ্রাম প্রান্তের একটি চাষীর
উলঙ্গ, নিকষ কালো রঙের সেই ছেলেটা।
চোখ দুটো আমার আজ যদি একটুক্ষণ ঝাপসাই হয়ে
আসে, ক্ষতি কি,
কারণ, রোগপঙ্গু, অশক্ত আমাকে কেউ সাধছে না একটা
গল্প বলতে,
ইচ্ছা থাকলেও কোনো পাঠক বলছে না গল্প লিখতে,
জানি, এইভাবে আরো কিছুকাল থাকলে একদিন সবাই
আমাকে হয়তো ভুলেই যাবে,
তখন যদি এক দুর্বল অবসরে
ঝাপসা চোখের আবরণ ভেঙ্গে দু'ফোঁটা জল নেমে
এসে বলে :
'তাকে সেদিন গল্প শোনাওনি,
আজ সে তাই প্রতিশোধ নিতে এসেছে এই সার্বজনীন
বিস্মরণের মধ্য দিয়ে'
তাহলে কি খুব বেশী ভুল তারা বলবে ?

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ)

—তবে ?

—সে কোথায় চলে গেছে কাল রাত্রে, তার আর কোন সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না।—বলেই প্রদোষ পকেট থেকে একখানা চিঠি বার ক'রে সুখেন্দুর হাতে দেয়। তাতে লেখা আছে—শেষে তুমিও আমায় ভুল বুঝলে!

তারপর অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে প্রদোষ আবার ধীরে ধীরে বলে—তুই-ই বল না সুখেন্দু, এই যে আমার মুখের কথাটা শুনেই ফিরে গেল রাত্রি বুকের ঝড়টাকে না দেখে, তাতে ভুল কি সে আমাকেও বোঝেনি ?

উত্তরে সুখেন্দুর মুখ থেকে কিছু বেরুল না বটে, কিন্তু প্রদোষের চোখের দিকে তাকাতেই উদ্‌গত অশ্রু আর বাধা মানল না।

একটি চিঠি—দুটি খুন

(গল্প)

জ. কু. বি.

ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং……………

টেলিফোনের কর্কশ আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। শীতের সকাল। আড়চোখে দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালাম। ছ'টা বেজে দশ। এত সকালে উঠতে ইচ্ছা করছিল না। ঝি বোধহয় এরই মধ্যে এসে গেছে। কলতলা থেকে বাসন মাজার আওয়াজ পাচ্ছি। পাশ ফিরে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু—না, ঘুম আর আমার কপালে নেই। আবার টেলিফোন বেজে উঠল। এবার রীতিমত বিরক্ত হ'য়ে লেপ ফেলে দিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসলাম। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা নিয়ে কানে তুললাম,—হ্যালো! ওপাশ থেকে ইন্স্পেক্টার সুভাষ দত্তের গলা ভেসে এল—'আমি থানা থেকে বলছি। মিঃ বিশ্বাসকে চাই'।

বললাম—আমিই বিশ্বাস। আপনার বক্তব্য বলতে পারেন।

—ও স্যার, আপনি। এইমাত্র একটা জরুরী কেসের খবর পেলাম। দয়া করে একবার যদি আসেন।

—কেসটা কি?

—খুন স্যার! দু-দুটো খুন। আমি এখনও যাইনি সেখানে। এইমাত্র জনার্দন খবর দিল। আমি ওকে 'স্পট'-এ পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

—আমি এখুনি যাচ্ছি। পনেরো মিনিট। আচ্ছা রাখলাম।

মনটা বিষিয়ে উঠল। এই শীতের সকালে দুনিয়ার লোক লেপের তলায়। আর আমি কোথায় কে খুন হ'ল তার তদন্ত করতে চলেছি। ধেৎ, চাকরির নিকুচি করেছে।

কোন রকমে সকালের কাজ শেষ করে, সরকারী পোশাক গায়ে চাপিয়ে থানার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বাড়ি থেকে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ খেয়াল হ'ল টুপির কথা। তাড়াতাড়িতে টুপি নিতে ভুলে গেছি। সুতরাং ফিরতে হ'ল। ফিরে এসে টুপি নিয়ে আবার রওনা হ'লাম।

থানায় গিয়ে দেখলাম, সুভাষবাবু আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। জন চারেক কনস্টেবল নিয়ে জীপে চড়ে আমরা ঘটনাস্থলের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম—জায়গাটা কোথায়?

উত্তর পেলাম—'কাছেই'। আর কোন কথা না বলে চুপ করে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ চলার পরে জীপটা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়াল যেটাকে ঠিক শহরের পর্যায়ে ফেলা যায় না।

একটা বস্তি অঞ্চল। রাস্তাটা এত সরু যে, দুটো জীপ কোন রকমে পাশ কাটাতে পারে, তাও অতি সাবধানে। একটু বেতাল হলেই রাস্তার পাশে পচা নর্দমায় গিয়ে পড়তে হবে। রাস্তার দুধারে—ঠিক নর্দমার গা ঘেঁষে—রাজ্যের ময়লা জমে একটা ছোটখাটো হিমালয় গড়ে তুলেছে। তাতে নেই এ হেন জিনিস বোধহয় পৃথিবীতে নেই। ছাই থেকে আরম্ভ করে ছেঁড়া রামায়ণের পাতা পর্যন্ত চোখে পড়ল। উৎকট গন্ধে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি পেট থেকে বেরিয়ে আসতে চায়!

নাকে রুমাল চেপে গাড়ি থেকে নেমে মিনিট তিনেক চলার পর একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। বাড়িটা অনেক দিনের পুরনো বলেই মনে হয়। চুন-বালির প্ল্যাস্টার জায়গায় জায়গায় খসে গিয়ে ভেতরের ইট বেরিয়ে গেছে। পাঁচিলের ওপর হাত খানেক লম্বা একটা অশ্বত্থের চারাও চোখে পড়ল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকজন লোক জটলা করছিল। আমাদের দেখে তারা সরে দাঁড়াল। আমরা সদলবলে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলাম। দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে একটা ঘর চোখে পড়লো। ঘরটা লোকে ভর্তি। ঘরের দরজায় জনার্দন দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে ও সেলাম করে একটা নীলাভ খাম আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল।

অবাক্ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি এটা?

জনার্দন বলল—এ ঘরের মেঝেতে পড়েছিল। আপনার বোধহয়।

খামটা হাতে নিয়ে দেখলাম, আমারই বটে। ওপরে বড় বড় করে লেখা—'দারোগাবাবু'। খামের মুখ আঠা দিয়ে আটকান। খামটা পকেটে রেখে ঘরে ঢুকলাম।

আমাদের ঢুকতে দেখে ঘরের লোকেরা সব বাইরে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে নজর পড়ল লাশ দুটোর ওপর। দুজনই স্ত্রীলোক। একজনের বয়স ২৪।২৫ বছর। অপর জনের ৪০।৪৫। তরুণীটির মৃতদেহ খাটের ওপর, আর বৃদ্ধার মৃতদেহ মেঝেতে পড়ে আছে। সুভাষবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—দুটোই কি খুন?

—কি জানি স্যার, ঠিক বুঝতে পারছি না।

দুজনকেই পরীক্ষা করলাম। নাঃ, কারও দেহে প্রাণ নেই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার দুজনের মধ্যে কারও গায়ে কোন আঘাতের চিহ্নও নেই। শ্বাসরোধ করে যে হত্যা করা হ'য়েছে তাও নয়। পরীক্ষা করে দেখলাম, গলায় সে-রকম কোন দাগ নেই। হঠাৎ নজরে পড়ল তরুণীটির মাথার দিকে। একটা কলাইয়ের গ্লাস উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তুলে দেখলাম। কিন্তু তাতেও কিছু নেই। ঘরের মেঝের একটা সাদা কাগজের ঠোঙা চোখে পড়ল। ঠোঙাটা নিয়ে দেখলাম, তাতে কি একটা গুঁড়ো লেগে রয়েছে। চকিতে মনের কোণে একটা সন্দেহ খেলে গেল। বিষ খায়নি তো? যা হোক মৃতদেহ দুটো ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে ঠোঙাটাও পাঠালাম। যদি কোন কাজে লাগে।

বাইরে বেরিয়ে যে লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল, তাকে কোনদিন কোথাও দেখেছি বলে মনে হ'ল না। চোখ দুটো অসম্ভব রকমের লাল। দাঁতগুলো আরও লাল। সেগুলোর রং যে কোনদিন সাদা ছিল দেখে তা মনেই হয় না। আমাকে দেখে হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে বলল—'নমস্কার'।

প্রতি-নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি?

পাশ থেকে কে একজন বলে উঠল—এ বাড়ির জামাই।

—জামাই? অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—আজ্ঞে। এবার উত্তর দিল সেই লোকটি। কথা নাকে এলে লাগল। বলল—ঘরের মধ্যে যে দুজনকে দেখলেন ঐ দুজন হ'ল আমার শাশুড়ী আর স্ত্রী।

—ও। আমার সঙ্গে একটু আসুন। কতকগুলো কথা জানার আছে। বলে আমি এগিয়ে গেলাম।

থানায় গিয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললাম—বসুন। চেয়ারে বসবার পর জিজ্ঞেস করলাম—কি নাম আপনার?

—আজ্ঞে, অনিমেষ মিত্র।

—কি করেন?

—মাষ্টারি। স্থানীয় একটা স্কুলের নাম করলেন।

—আচ্ছা, যাঁর বয়স কম উনি তো আপনার স্ত্রী; তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কতদিন বিয়ে হয়েছে আপনাদের?

—এক বছর।

—কোন বাচ্চা—

—না, কিছু হয়নি।

—আচ্ছা, আপনার স্ত্রী এবং আপনার শাশুড়ী দুজনেই খুন হ'লেন। আপনার কি কিছু মনে হয়?

—আমার কিছুই মনে হয় না স্যার।

—তবু অনুমান তো কিছু একটা করেন!

—আমার অনুমানে তো কিছুই আসছে না স্যার।

—আপনাদের বাড়িতে আর কে কে থাকেন?

—আর কেউ থাকে না স্যার। আমি, আমার স্ত্রী আর আমার শাশুড়ী ছাড়া চতুর্থ কোন ব্যক্তি ও-বাড়িতে থাকে না।

কথাগুলো নোট করে নিয়ে তাকে বিদায় দিলাম। ওর বাড়ির পাশে থাকে এমন একজনকে ডাকলাম। বললাম—আপনি অনিমেষবাবুর বাড়ির পাশে থাকেন?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—গতরাত্রে ওদের বাড়িতে কোন ঝগড়া ঝাঁটি হয়েছিল বলে আপনারা কিছু জানেন?

—ঝগড়া ঝাঁটি তো ওদের বাড়িতে প্রায় প্রতিদিন হয়। ওটা ওদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

—মানে?

জামাই। ওনার শাশুড়ীর আর কোন ছেলে বা মেয়ে নেই। তাই অনিমেষবাবুকে উনি ঘরজামাই করে রেখেছিলেন। কিন্তু অনিমেষবাবুর চরিত্র মোটেই ভাল নয়। মাঝে ওনার কোন এক দূর সম্পর্কের ভাইঝিকে নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করেছিলেন। সেই থেকেই যত অশান্তির সৃষ্টি।

—I see. ঠিক আছে, আপনি এখন আসতে পারেন।

—লোকটিকে বিদায় দিয়ে কথাগুলো নোট করে সবে মাত্র একটা সিগারেট ধরিয়েছি। হঠাৎ জনার্দন ময়না তদন্তের রিপোর্ট নিয়ে হাজির হ'ল। রিপোর্টটা নিয়ে দেখলাম, আমার অনুমান মিথ্যে নয়। দুটো হত্যাই বিষ প্রয়োগে হয়েছে। আর ঠোঙাটায় "পটাসিয়াম সায়নাইড" পাওয়া গিয়েছে।

চিন্তার ঝড় উঠল মনে। বিষ প্রয়োগে দুজনের মৃত্যু ঘটান হয়েছে। কিন্তু কে প্রয়োগ করল আর কেনই বা করল? সারাদিন ধরে মনের আনাচে-কানাচে কেবল এই প্রশ্নটাই ঘুরে বেড়াতে লাগল। সারাদিনে কোন সমাধান খুঁজে পেলাম না। তখনও আমি জানতাম না এর সমাধান জমা হ'য়ে আছে আমার পকেটে। সেই চিঠিটাই আমার সব সমস্যার সমাধান করবে।

কাজের ভিড়ে চিঠিটার কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম। বাড়ি এসে খেয়াল হ'ল। চিঠিটা নিয়ে বসলাম। খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা বের করলাম। নীল রঙের প্যাডের কাগজে লেখা। 'মুক্তোর মত হাতের লেখা'—কথাটা কেবলমাত্র উপন্যাসে পড়ে আর লোকের মুখে শুনে এসেছি। আজ চোখে দেখলাম। সার্থক উপমা কবির। চিঠিটার ওপর চোখ বুলতে লাগলাম :—

দারোগাবাবু,

এ চিঠি আপনি যখন পাবেন, তখন আমি আপনার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আমাকে আপনি পাবেন না। পাবেন আমার দেহটা। যে দেহ নড়ে না, কথা বলে না। আর পাবেন আমার মেয়ের দেহ। দু-দুটো দেহ। কিন্তু দুটোই মৃত। কতকগুলো কথা জানাবার জন্যে আপনাকে এই চিঠি লেখা। আমি জানি আপনি আসবেন। তাই লিখছি।

প্রথমেই বলে রাখি, আমার মেয়েকে বিষ খাইয়ে মারা হ'য়েছে। আর মেরেছি আমি। হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি। আমিই আমার মেয়েকে বিষ খাইয়ে মেরেছি। কিন্তু কেন? কেন মারলাম তাকে? যদি এই 'কেন'র উত্তর পেতে চান, তবে দয়া করে চিঠিটা শেষ পর্যন্ত পড়বেন। শুধু একটা অনুরোধ, চিঠিটা পড়ে যাকে আপনি অপরাধী বলে মনে করেন—যদি পারেন তাকে মুক্তি দেবেন।

আপনি বলতে পারেন, কতখানি দুঃখ পেলে তবে মা পারে তার মেয়ের হাতে বিষের পাত্র তুলে দিতে! কতখানি নিষ্ঠুর হ'লে তবে মা পারে তার মেয়ের খাবারের সাথে বিষ মেশাতে! পারেন আপনি বলতে? আমি জানি, আপনি পারবেন না। কারণ সে অভিজ্ঞতা আপনার নেই। কিন্তু আমি পেরেছি। আমি পেরেছি আমার মেয়ের হাতে বিষ তুলে দিতে।

এক বছর আগে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম অনিমেষের সঙ্গে। আমার আত্মীয়-স্বজন সবার অমতে। কারণ প্রথমে দেখেই ছেলেটাকে আমার ভাল লেগে গিয়েছিল। তাছাড়া ওর মা-বাবা কেউ ছিল না। আর
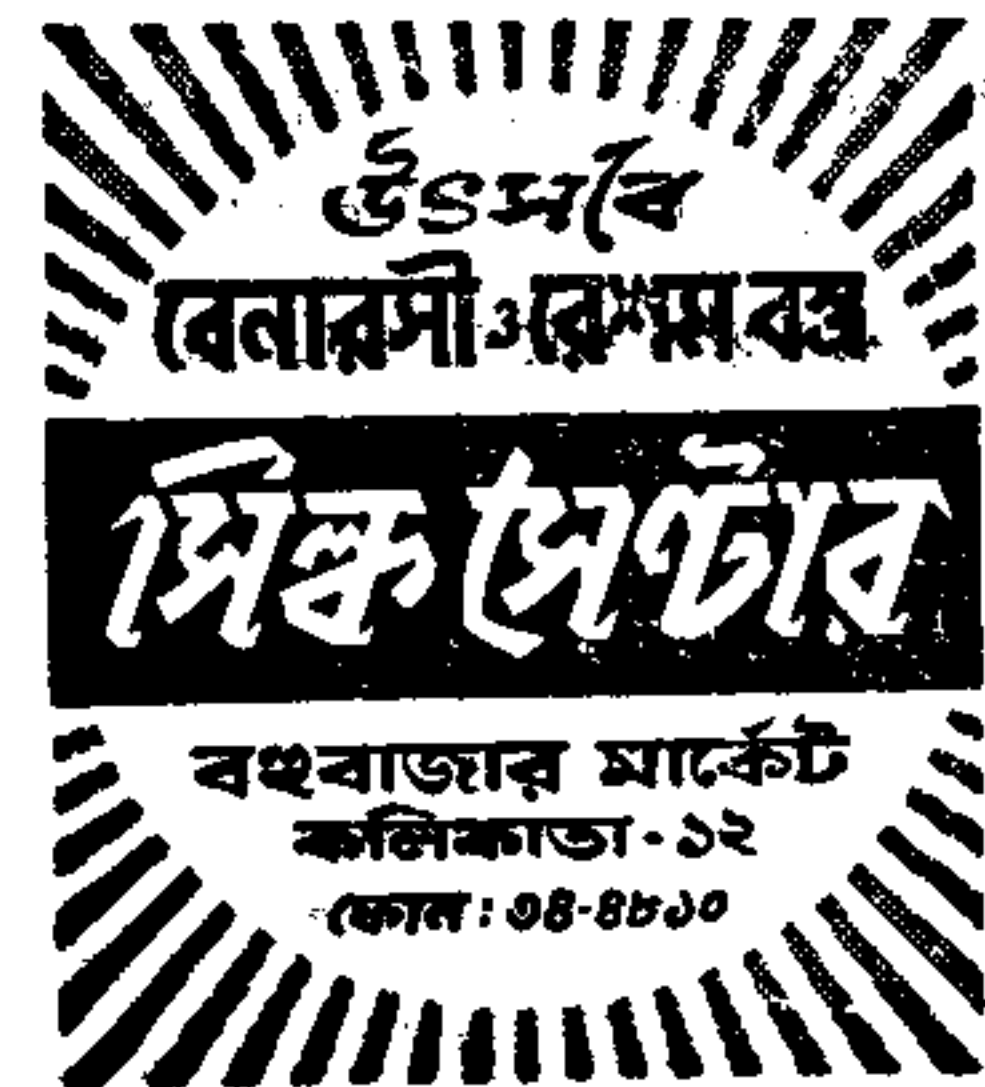
মা-বাবা না থাকার বেদনা যে কত গভীর, তা আমি জানি। ওর মত বয়সে আমারও মা-বাবা ছিল না। মানুষ হয়েছিল এক দূর সম্পর্কের কাকার কাছে থেকে। বিয়ে দিয়ে ওকে আমার কাছে এনে রেখেছিলাম। তখনও জানতে পারিনি, ওর সুপুরুষ চেহারার আবরণে বাস করে এক কু-পুরুষ দানব। বুঝেছিলাম, ছ'মাস পরে। প্রায় রাতেই অনিমেষ বাড়ি থাকত না। সকালে যখন বাড়ি ফিরত, তখন মুখ থেকে বেরুত একটা বিশ্রী গন্ধ। রোজ তার টাকার দরকার হ'ত। সে টাকা যোগান দিতে হ'ত আমাকে। মাইনে যা পেত তা মাসের ছ'দিন যেতে না যেতে শেষ হ'য়ে যেত। সহ্য করা ছাড়া উপায় ছিল না আমার। সহ্য করেও যাচ্ছিলাম। কিন্তু শেষের দিকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম।

ইদানীং ওর এক দূর সম্পর্কের ভাইঝিকে নিয়ে ও দারুণ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিল। আমার মেয়ে ওসব সহ্য করতে পারেনি। কোন মেয়েই পারে না তার চোখের সামনে নিজের স্বামীর নষ্টামি দেখতে। আমার মেয়েও পারেনি। তাই নিয়েই অশান্তির সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন অশান্তি হ'ত। কিন্তু অবস্থা চরমে উঠল গতকাল রাত্রে।

কালকে ও আর বাইরে যায়নি। খাওয়ার সময়ে আমার মেয়ে ওকে ওর ভাইঝি সংক্রান্ত কোন কথা বলে থাকবে বোধহয়। তার থেকে শুরু হয় ঝগড়া ঝাটি। শেষে মারধর। আমি মা মা হ'য়ে মেয়ের নির্যাতন কতদিন দেখতে পারি? আর পারিনি বলেই সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলাম, যেমন করে পারি আজই এই অশান্তির সমাপ্তি ঘটাব। কিন্তু কোন পথই খুঁজে পেলাম না।

হঠাৎ মনে হ'ল এইতো একটা উপায় রয়েছে। এতে আমি বা আমার মেয়ে সুখী হ'ব না। কিন্তু আমার জামাই তো হবে। তাই এই পথই বেছে নিলাম।

ভগবান বোধহয় আমার এই পথকে সমর্থন করেছিলেন। তাই রাত্রে শুয়ে মেয়ে আমার কাছে এক গ্লাস জল চাইল। এ সুযোগ আমি হাতছাড়া করলাম না। মেয়ের অসাক্ষাতে সেই জলে মিশিয়ে দিলাম 'পটাসিয়াম সায়নাইড'। বিশ্বাস করুন দারোগাবাবু, বিষ মেশাবার সময় একটুও হাত কাঁপেনি আমার। তারপর মেয়ের দেহে বিষক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও খেলাম। তারপর কি হ'ল সেত' আপনি চোখেই দেখতে পাচ্ছেন।

এই হ'ল আমার এবং আমার মেয়ের মৃত্যুর ইতিহাস।

শুভেচ্ছান্তে—

সরমা রায়

আমার চোখের সামনে থেকে একটা কালো পর্দা সরে গেল। সব কিছু দিনের আলোর মত পরিষ্কার হ'য়ে ফুটে উঠল।

তারপর কেটে গেছে ছ'টা বছর। সেখান থেকে বদলী হয়ে আমি চলে এসেছি এক অজ পাড়াগাঁয়ে। কিন্তু সেই ঘটনাটা আমি আজও ভুলতে পারিনি। আর পারিনি সরমা দেবীর জীবনের শেষ প্রশ্নটিকে। বার বার মনে হ'য়েছে প্রশ্নটা, 'আপনি বলতে পারেন, কতখানি দুঃখ পেলে, তবে মা পারে তার মেয়ের হাতে বিষের পাত্র তুলে দিতে! কতখানি নিষ্ঠুর হ'লে, তবে মা পারে তার মেয়ের খাবারের সাথে বিষ মেশাতে'। আজ পর্যন্ত নিজের মনের কাছেও এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারিনি। কোনদিন পারব বলেও মনে হয় না।

প্রেম

(গল্প)

শ্রীসুশোভন দত্ত

ম্যাল থেকে উঠবো উঠবো ভাবছি। এরই নাম ম্যাল! স্কার্ট-ব্রিচেস আর শাড়ি পরা একপাল নানা জাতের রং-বেরঙের মেয়ে আর প্যান্ট-কোট-টাই পরা একদল ছেলে নাচছে-হাসছে-ড্রিঙ্ক করছে। আশ্চর্য! যারা দার্জিলিং বেড়াতে আসে, এই ম্যাল তাদের কাছে একটা বিশেষ আকর্ষণ। বাংলার প্রফেসার সুকুমার ভট্টাচার্য এই ম্যালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছিলেন সেদিন। গাইড বুকে মোটা মোটা হরফে লেখা আছে—'visit to the Mal.' আমার মনে হ'ল দার্জিলিং বেড়াতে এসে ম্যাল দেখার অর্থ হ'ল সময় নষ্ট করা। মনটাকে আবিল ক'রে তোলা।

আমি গরীবের ছেলে। ভাবিনি কোনদিন দার্জিলিং দেখতে পাবো। বাবা কাজ করতেন একটা অফিসে। আয় করতেন সামান্য। কোনমতে চলতো আমাদের সংসার। কিন্তু তিনি মারা গেলেন হঠাৎ। তখন আমার বয়স নয় কি দশ বছর। কোনমতে দিন চালিয়ে লেখাপড়া শিখেছি। বিলাসের মুখ দেখতে পাইনি জীবনে। মা বলতেন, আরাম-বিলাস বড়লোকেদের জন্যে, গরীবের ওতে অধিকার নেই! M. A. পড়ার সময় পর্যন্ত একখানা সার্ট আর একখানা কাপড় পরেছি। নিদারুণ দারিদ্র্যের ভেতর দিয়ে আমার জীবনের অনেকগুলো দিন কেটেছে।

কিন্তু এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পরিধানে টেরিলিনের সার্ট, ট্রাউজার। হাতে সর্বাধুনিক ডিজাইনের স্কোয়ার ডায়ালের ঘড়ি। মুখে দামী সিগারেট। দারিদ্র্যের ওপর আজন্মের আক্রোশের চরম প্রতিশোধ নিচ্ছি যেন। মাকেও যথাসাধ্য সুখী করার চেষ্টা করেছি। তবে পারিনি তাঁর একটা কথা রাখতে। মা আমাকে বার বার অনুরোধ করেছিলেন বিয়ে করবার জন্য। কিন্তু আমি আমার প্রতিজ্ঞায় অনড়। বিয়ে আমি জীবনে করব না। বিয়েতে একটা রোমান্স আছে জানি। কিন্তু তা নিতান্তই রোমান্স! কয়েকটি দিনের সামগ্রী। তারপর জীবনটা হ'য়ে উঠবে অসহ্য, সংসারটাকে মনে হবে জেলখানা। কি প্রয়োজন সুখী জীবনটাকে অসুখী ক'রে তোলা?

একরাশ কাচের গেলাস ভাঙার শব্দ কর্ণপটহে আঘাত হানলো। কি ঘটলো জানবার জন্য আশেপাশে তাকালাম। পাশের টেবিলে চোখ পড়লো এক সময়। না, সত্যি কোন কাচের গেলাস ভাঙেনি। পাঁচ-ছ'টা তরুণী বিয়ারের গেলাস হাতে হাসছিল খিলখিল ক'রে। বুঝলাম এই লাস্যময়ী ললনাদের সরব হাস্যকেই আমি কাচের গেলাস ভাঙার শব্দ ব'লে ভুল করেছি। ওখান থেকে চলে আসার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। ঠোঁটে একটা সিগারেট গুঁজে দেশলাইয়ে কাঠি ঠুকছি, এমন সময়ে পেছন থেকে কে যেন সুরেলা গলায় ডাকলো—'অর্ণবদা'।

নামটা আমার, তবু মনে করলাম, এখানে আর কে আমায় ডাকবে? হয়তো আমি ভুল শুনেছি। কাউন্টারে বিল চুকিয়ে গেটের কাছে গেছি। আবার সেই মিষ্টি ডাক 'অর্ণবদা'।

পেছন ফিরে তাকাতেই দেখলাম শিফনের শাড়ি পরা একটা ছিপছিপে তন্বী ছোট ছোট পদক্ষেপে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। মেয়েটা আর একটু কাছে আসতে চিনতে পারলাম, ঊর্মিলা হাজরা।

ইউনিভারসিটি লাইফের ক্লাসমেট শান্তব্রত হাজরার বোন। শান্তব্রত এখন জার্মানীতে। M. A. পাস করার পর ও জার্মানীতে গেছে Economics নিয়ে রিসার্চ করতে। ওদের বাড়িতে আমি প্রায়ই যেতাম। গরীবের ছেলে ব'লে ওর চোখে ঘৃণার চিহ্ন কোনদিন দেখিনি। তাছাড়া ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বটা ছিল সমুদ্রের মতো গভীর। ওর বাবা মা'ও খুব স্নেহ করতেন আমায়। শান্তব্রত জার্মানীতে যাওয়ার পর আর ওদের বাড়ি যাইনি নানা সঙ্কোচে। ঊর্মিলার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিলো, তবে ঘনিষ্ঠতা হয়নি। আমি যে কলেজের লেকচারার ও সেই কলেজেরই ছাত্রী।

এমনকি আমার subject-টাও ওর আছে। কলেজে ও আমাকে সব সময় এড়িয়ে চলতে চাইত। প্রয়োজন না হ'লে কোন কথা বলত না। হয়তো ওর দাদার বন্ধু বলেই! উর্মিলা এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। কৌতুক মাখা চোখে প্রশ্ন করল—অর্ণবদা আপনি এখানে?—ওর চোখ-মুখ হতে ঝরে পড়লো এক ঝলক বিস্ময়।

—কেন, দার্জিলিং আসতে আমার মানা আছে নাকি?

—অনেকটা সেই রকমই! আমি তো জানতাম অজানার ওপর কোন আকর্ষণই আপনার নেই। আপনাকে হাত-ছানি দেয় যতো রাজ্যের বই।

—বড় একঘেয়ে লাগছিলো, তাই চ'লে এলাম। বন্দী জীবনে একটু বৈচিত্র্যের প্রয়োজনেই।

—যাক তবু ভালো। আপনারও একঘেয়ে লাগে, বৈচিত্র্যের প্রয়োজন হয়!

—কেন উর্মিলা, তুমি কি মনে করো আমি গ্রন্থ-কীট?

—তাইতো জানতাম। দাদার কাছেও তো সেই রকম শুনেছি।—হেসে হেসে বলে ও।

—না, তোমার সঙ্গে কথায় পেরে উঠবো না। কোথায় উঠেছ তাই বলো?

—'মাউন্ট এভারেষ্ট' হোটেলে। আপনি কোনটাতে?

—'হিমালয়ান গ্লোরি'তে। তোমার বাবা মা'ও সঙ্গে আছেন নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ। তাঁরা তো আপনার কথা প্রায়ই বলেন। আপনি তো অনেকদিন যাননি আমাদের বাড়ি। মা বলেন, আপনি আমাদের ভুলেই গেছেন।

—না, না, ভুলবো কেন?

ঘাসের গালিচা বিছানো রাস্তা দিয়ে দু'জনে হাঁটছিলাম পাশাপাশি। ওর চলাফেরা কথাবার্তার ভঙ্গিটা নৃত্য-চপল। ভেবে পাচ্ছিলাম না উর্মিলা আজ নিজেকে এতটা অনাবৃত করলো কেমন ক'রে? কই আগে তো কোনদিন ওকে এতটা মুখর হ'তে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। তবে? ও আজ কেন এতটা উচ্ছল? হয়তো আমারই ভুল। অপরিচিত জায়গায় একজন পরিচিতের সন্ধান মিলেছে ব'লেই হয়তো ও আজ মনের ঘোমটা খুলে ফেলেছে। যে কোন কারণেই হোক, ওকে আজ আমার ভারি ভালো

কথা বলতে বলতে হোটেলের কাছে পৌঁছে গেলাম আমরা। বললাম—চলি উর্মিলা, কাল আবার দেখা হবে।

—এত তাড়াতাড়ি হোটেলে ঢুকে কি করবেন? চলুন না আমাদের হোটেলে। বাবা মা'য়ের সঙ্গে দেখা ক'রে আসবেন। তাঁরা কিন্তু আপনাকে দেখে খুব খুশী হবেন।

—আজ নয়। কাল সকালে যাবো।

—ঠিকতো? অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললো ও।

—হ্যাঁ, ঠিক।

—আমি না হয় ডেকে নিয়ে যাব। ঠিক ন'টায়।

—তাই এসো।

উর্মিলা চলে গেল ওদের হোটেলে। হিমালয়ান গ্লোরি আর মাউন্ট এভারেষ্ট ঠিক পাশাপাশি। যেন দু'টি যমজ ভাই। হোটেলের ফ্ল্যাটে ঢুকে কেমন যেন একা একা মনে হ'তে লাগলো। অনেকক্ষণ পায়চারি করলাম। সিগারেটের ধোঁয়ায় রিং করবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। একি হ'ল আমার? জীবনে তো এ-রকম মানসিক দুর্বলতা কোনদিন দেখা দেয়নি। আশ্চর্য! চাকর রাতের খাবার দিয়ে গেল। খেয়ে নিলাম। তারপর অবশ দেহটাকে লুটিয়ে দিলাম শয্যায়। চোখ বুজে এলো ঘুমে।

* * *

ঘুম ভাঙলো অনেক বেলায়। তাও আবার চাকরের ডাকাডাকিতে। টেবিলের ওপর বেড-টীর কাপটা নামিয়ে রেখে ও চ'লে যাচ্ছিল। ওকে ডেকে বাথরুমে গরম জল দিতে বললাম। ও চ'লে গেল। হঠাৎ চোখ পড়লো হাত-ঘড়িটার ওপর। আটটা! অনেক দেরি হ'য়ে গেছে। একটু বাদেই তো উর্মিলা আসবে। চায়ের কাপটা কয়েক চুমুকে শেষ ক'রে ছুটলাম বাথরুমে। বাথ টবে গরম জল ছিলো। তাড়াতাড়ি চান ক'রে নিলাম।

জামা-প্যান্ট পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনি চালাচ্ছি। উর্মিলা এসে ঘরে ঢুকল। ওকে বসতে ব'লে চটপট তৈরী হ'য়ে নিলাম। বেরুলাম ওর সঙ্গে।

পথ চলতে চলতে ও বলছিলো—বাবা-মা এখনও ব্রেকফাষ্ট করেন নি। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আপনি দার্জিলিং এসেছেন শুনে ওঁরা তো খুব খুশী।

নয়। মৃন্ময়বাবু আর রিণা দেবী অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্য। আমি বসলাম ওঁদের মুখোমুখি। উর্মিলা বসলো আমার পাশে। ব্রেকফাষ্ট করলাম ওঁদের সঙ্গে। ডিনারও খেতে হ'ল ওঁদের সঙ্গে। সন্ধ্যে বেলায় ক্লান্ত হ'য়ে ফিরে এলাম হোটেলে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এক সময়।

পরের দিন সকালটা বিছানায় গড়িয়ে গড়িয়ে কেটে গেল। বিকেল বেলায় উর্মিলার সঙ্গে গল্প করলাম। 'Price Theory' বুঝতে এসেছিলো ও। বুঝিয়ে দিলাম।

এইভাবে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। উর্মিলার সঙ্গে সম্বন্ধটা এসে দাঁড়ালো অন্তরঙ্গতায়। ছাত্রী আর অধ্যাপকের অদৃশ্য ব্যবধানটা ঘুচে গেছে নিজেদের অজান্তে। সত্যি প্রেম পদার্থটা খুব ছোঁয়াচে। অনেকটা হামের মতো। প্রেম প্রমত্তা পদ্মা নদীর মতো সর্বগ্রাসী। প্রেমের জোয়ারে আভিজাত্য, কুল-মান—সব ভেসে যায়। কিন্তু আমাদের সমাজের নিয়ম অন্যরকম। শ্রদ্ধা-ভক্তি, স্নেহ-প্রীতি নিয়ে মাতামাতি করো আপত্তি নেই, কিন্তু প্রেম! অস্পৃশ্য! অশ্লীল! শুচি-শুভ্র-সুন্দর বস্তুটাই আমাদের কাছে লজ্জার বিষয়।

আমি যে কথা বলতে সাহস পাইনি, লজ্জা পেয়েছি, ও সে-কথা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছে। ও একদিন বলল —আমায় ভালবাসে। প্রেমের মনোভাব সম্বন্ধে ভিক্টর হুগো ব'লেছেন, "The first symptom of love in a young man is timidity; in a girl it is boldness."

কলেজ খুলতে আর দিন কয়েক মাত্র বাকি। তারপরই আবার যোগ দিতে হবে ছকে বাঁধা একঘেয়ে জীবনে। আরাম কেদারায় দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে সিগারেট টানছিলাম। উর্মিলা এসে হাজির। আবদারের ভঙ্গীতে বলল—চলো একটু বেড়িয়ে আসি।

—কোথায় যাবে উর্মি? সারা দার্জিলিংটাই তো চ'ষে ফেলেছি এ ক'দিনের মধ্যে।

—চলো না, একটু নির্জনে গিয়ে বসি। আবদারের সুর শুনলাম ওর স্বরে।

—তার কি আর কোন দরকার আছে উর্মি?

—তবুও চলো। আমার হাত ধ'রে টেনে তুললো ও।

অগত্যা বেরুতে হ'ল। গা ঘেঁষে ঘেঁষে হাঁটছিলাম দু'জনে। বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে এসে এক জায়গায় দেখতে পেলাম, পাইন আর বার্চ গাছের মেলা। মাঝে মাঝে নানা ধরনের বুনো ফুলের ঝোপ। এক কথায় অপূর্ব সুন্দর জায়গাটা। যেন কোন নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি। উর্মিলা বললো, আর হাঁটতে পারছি না। এসো এখানে বসি।

ঘন হয়ে বসলাম ওর পাশে। একটা সিগারেট ধরালাম। কচি সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো উর্মিলা। ভাল ক'রে তাকালাম ওর দিকে। ও যেন অনন্যা! ওর ফরসা দেহটা যেন পাথর কুঁদে তৈরী। সুডোল চিবুকে লাবণ্যের আভাস। চোখ দু'টো কি নিবিড় কালো, গভীরতা যেন অতলস্পর্শী। ঠোঁটের কিনারে ছুরির ফলার মতো স্বচ্ছ হাসিটুকু নিতান্ত একঘেয়ে হ'য়ে গেছে ব'লেই মোনালিসার রহস্যময় হাসির সঙ্গে তুলনা করছি না। নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম ওর দিকে। লাজে আবীর-রাঙা হ'য়ে উঠলো ওর কমনীয় মুখটা।

—অমন ক'রে দেখছ কি? জড়ানো স্বরে বললো উর্মি।

—তোমাকে। সহজ ছোট্ট উত্তর দিলাম।

—প্রথম দেখছ নাকি?—চাপা কৌতুক ক'রে বললো ও।

—না, দেখছি ওথেলোর সঙ্গে কেমন মানাবে ডেস্‌ডিমনাকে।

—তুমি বুঝি ওথেলো? বলো তো এ-রকম বৈষ্ণব-বিনয় শিখলে কোথা থেকে?

—বেশ বাবা, বেশ!

—ভাল হবে না বলছি।—কপট রাগে ঠোঁট ওলটালো উর্মিলা।

ওর দু'চোখে এক অদ্ভুত আবেদন। উর্মিলার মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিলাম। নরম কপোলে এঁকে দিলাম প্রেমের জয়টিকা।

চলার পথে

(গল্প)

এস. দত্ত

পর পর দু'বার হুইশেল বাজিয়ে রাতের মোহময় নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে থেমে গেল দশটা দশের হিমেলগঞ্জ লোক্যাল। ভিড় ছিল না প্ল্যাটফর্মে। বেশী রাতের ট্রেন বলেই হয়ত। ঝিরঝিরে হাওয়ার দোলায় দূরের কোন বাগান থেকে ভেসে আসছিল নাগকেশরের সুরভি। আকাশটা তারায় তারায় ছাওয়া। তারার রোশনাইয়ের মাঝে শুক্ল পক্ষের এক টুকরো চাঁদ অকৃপণভাবে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে নিজের আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রচেষ্টায় মগ্ন। ষ্টেশন ঘরে কেরোসিনের একটা বাতি জ্বলছিল মিটমিট করে। জমাট অন্ধকারকে লঘু করার বৃথা চেষ্টা। হিমেলগঞ্জ ফরেষ্টের তরুণ অফিসার পরেশ চ্যাটার্জী গাড়ী থেকে নেমে সাতপাঁচ ভাবলো অনেকক্ষণ ধরে। এতো রাতে কোয়ার্টার্সে যাওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। উচিতও হবে না। তাই ছোট ওয়েটিং রুমটার দিকে মন্থর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল পরেশ।

খোলাই ছিল ওয়েটিং রুমটা। কেরোসিন বাতির বাদামী শিখাটা কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। একটা জীর্ণ লম্বা বেঞ্চে আশ্রয় নেয় পরেশ। বড্ড নোংরা। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তবু আজকের রাতটার মত থাকতে হবে এখানে। উন্মুক্ত বাতায়ন পথে দৃষ্টিকে অন্ধকার দিগন্তে প্রসারিত করে দেয় সে। কতকগুলো তালগাছের মাথা দেখা যাচ্ছিল আবছা চাঁদের আলোয়। উদার আকাশের নীচে অজস্র জোনাকির আলোর হরিলুট। সত্যিই বড় ভাল লাগছিল তাকিয়ে থাকতে। নিঃসঙ্গতার প্রেমে পড়ে যায় সে। বেশ কিছু সময় কেটে যায় বাইরের দিকে চেয়ে।

—ঝরামৌ যাওয়ার ট্রেনটা ক'টায় বলতে পারেন?—প্রশ্ন করলেন এক ভদ্রমহিলা।

মিহি গলার চিঁচিঁ শব্দে মোহজাল ছিন্ন হ'ল পরেশের। ঝরামৌ! নামটা শুনেই চমকে উঠে সে। কৌতূহলী চাউনি মেলে ধরে পরেশ ভদ্রমহিলার মুখের উপর। ভদ্রমহিলার বয়স ত্রিশের বেশী হবে না। গোলগাল চেহারা। গালের কাছে অপ্রয়োজনীয় মেদ মুখশ্রীটাকে অনেকটা হরণ করে নিয়েছে। একটা দু-তিন বছরের ছেলে ভদ্রমহিলার সঙ্গে আছে। পরেশের মনে হ'ল এ মুখটার সঙ্গে সে যেন অনেকদিন থেকে পরিচিত। তবু সম্পূর্ণ ভাবে মনে পড়লো না কখন কিভাবে ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছিল। হঠাৎ নজর পড়ল ভদ্রমহিলার লেদার ব্যাগটার ওপর। চমকে উঠল ও। তড়িতাহত হ'ল যেন। আকস্মিক উন্মাদনায় কেঁপে কেঁপে উঠল ওর সর্বাঙ্গ। 'সুকণ্ঠা রায়'—মানে সুকণ্ঠা মুখোপাধ্যায়, পরেশের 'কণ্ঠা', হিমেলগঞ্জে কণ্ঠা?—হ্যাঁ, কণ্ঠাই তো। ওইতো কপালের ওপর কাটা দাগটা। চাঁদের ওপর যেমন কলঙ্ক। কথা হারিয়ে এবার পাথর হয়ে যায় পরেশ।

ভদ্রমহিলা আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—ঝরামৌ যাবার লাষ্ট ট্রেনটার আর কতো দেরি?

মনের আবেগকে নির্মম ভাবে রুদ্ধ করে পরেশ। ডান হাতের রিষ্টে বাঁধা স্কোয়ার ডায়ালের ঘড়িটার দিকে তাকায় একবার। কয়েক সেকেণ্ড কেটে যায়। তারপর উত্তর দেয় ও—এখনো মিনিট তিনেক বাকী আছে ঝরামৌ যাবার ট্রেন আসতে।

আর কোন কথা বলেন না ভদ্রমহিলা। এমনকি একটা ধন্যবাদও পর্যন্ত দেয় না। যেন প্রয়োজন নেই। ছেলের হাত ধরে ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ান তিনি। সঞ্চিত বেদনাকে লঘু করবার জন্য একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ছাড়ে পরেশ।

অনেকদিন পরে কণ্ঠার দেখা পেয়ে ওর মনের প্রাচীন ক্ষতটা দগদগ করে ওঠে। প্রচণ্ড ঘৃণায় সারা শরীরটা রিরি করে উঠেছিলো ওর। তার মনের শান্তি চুরি করে নিয়েছিলো কণ্ঠা। পরেশের সুখের নীড়টাকে

ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ঝ'ড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে ও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। ওকে পরেশ ঘৃণা না করে পারবে কেন? মানুষ যখন অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে পারে না, তখন সে অন্যায়কারীকে ঘৃণা করে। ঘৃণা করে তবেই সে পায় শান্তি।

ঝরামোগামী ট্রেন এসে থামে। যাত্রীদের ওঠানামা শেষ হয়। আবার ছেড়ে দেয় গাড়ী। চলন্ত গাড়ীটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে পরেশ। হিমেল হাওয়ার কানাকানি, বাতাসের ঢেউ-এ ভেসে আসা ফুলের মিষ্টি গন্ধ আর গগনতলে জোনাকির আলোর হরিলুট—সব কিছুর মধ্যে এক অপূর্ব তান খুঁজে পায় সে। তার নিজের হারিয়ে যাওয়া অতীতকেই ফিরে পায় যেন। তার চোখের সামনে চকচক করে ওঠে ছ'বছর আগের দিনগুলো। যেন ছাই চাকা আগুন! হাওয়ায় ছাই উড়ে যেতেই আগুনের দীপ্তি বেরিয়ে পড়েছে আবার। আঁধারের ঘোমটার আড়ালে চলন্ত গাড়ীটা মিলিয়ে গেল। চোখ ফিরিয়ে নিলো পরেশ।

অভিনয়! অভিনয় ছাড়া আর কি? সত্যি দীর্ঘ ত্ব' বছর ধ'রে নিখুঁত প্রেমের অভিনয় করেছে কণ্ঠা। ও সিনেমায় নামলে নিঃসন্দেহে একজন নামকরা পেশাদার অভিনেত্রী হতে পারতো। অভিনয়? না না, অভিনয় কেন বলছে পরেশ? এর নাম প্রতারণা! পরেশের সঙ্গে প্রতারণা করেছে কণ্ঠা। পরেশ একটি ইডিয়ট। কাচকে মনে করেছে হীরা, চকচকে তামাকে মনে করেছে গিনি-সোনা, পরিহাসকে মনে করেছে প্রেম, গরলকে মনে হয়েছে অমৃত।

ঝরামো কলেজে B. Com. পড়তো পরেশ। ওর চেহারাটা তখন বেশ সুন্দর ছিলো। যাকে বলে অনিন্দ্য-সুন্দর কান্তি। দেহের প্রতিটি অংশে মাখানো ছিল জুলিয়েটদের পাগল করে তোলার তীব্র ক্ষমতা। পরেশ জানতো অনেক মেয়েই ওকে চায়। ওর ক্ষণিকের সান্নিধ্যে নিজেদের ধন্য মনে করে। জমিদার বাড়ীর মেয়ে সুকণ্ঠা ওর জন্যে বিশেষ লালায়িতা। তবু পরেশ কারুর কাছে বিলিয়ে দেয়নি নিজেকে। নিজের গ্ল্যামার নিয়ে নিজেই আনন্দে থাকত সে। মাঝে মাঝে গর্বও হয়েছে নিজের রূপের জন্য।

কলেজে কি একটা বিচিত্রানুষ্ঠান হচ্ছিল সেদিন। অনুষ্ঠান শেষ হ'ল রাত দশটায়। গেট দিয়ে বেরুচ্ছিল ও। পেছন থেকে ডাকলো সুকণ্ঠা। সসংকোচে বলেছিলো—কিছু মনে করবেন না, অনেক রাত হয়ে গিয়েছে, একা বাড়ী যেতে পারছি না। তাই আপনাকে ডাকলাম। আপনি তো গৈপুর হোষ্টেলে থাকেন। আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়েই তো যাবেন। আমাকে একটু পৌঁছে দেবেন?

পরেশ নির্নিমেষে তাকিয়েছিল সুকণ্ঠার দিকে। সুকণ্ঠা সুন্দরী। গোলাপী ঠোঁটে আর সুডোল চিবুকে লাবণ্যের স্পষ্ট আভাস। চোখ ছুটো যেন অবিকল কাজল-লতা। একটা ছাপা শাড়ি ওর তুষার-ধবল দেহে। লজ্জা পায় সুকণ্ঠা। মাথা নীচু করে।

তরমুজ-লাল ছুটি ঠোঁট নেড়ে বলে—আপত্তি আছে নাকি?

অন্তরের লোভাতুর আত্মার আকস্মিক আত্মপ্রকাশে লজ্জা পায় পরেশ। অত্যন্ত লজ্জা পায়। নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলে—আপত্তি থাকবে কেন? চলুন।

এই পরিচয় হ'ল ওদের প্রণয়ের সূত্রপাত। প্রেমে পড়ল ওরা। মাঝে মাঝে পরেশের কোলে মুখ লুকিয়ে অনুযোগ করত কণ্ঠা। কাঁদতো। শুষ্ক মুখে বলতো—আমি যে আর পারছি না 'রেশ! যৌবন নিয়ে মেয়েদের যে কি জ্বালা, প্রতি মুহূর্তে সতর্ক হয়ে থাকার বেদনা যে কি তা' তুমি বুঝতে পার না? আমায় বিয়ে কর। না-না, আর এক মুহূর্ত আমি কুমারী হয়ে থাকতে চাই না।

পরেশ কথা দিয়েছিলো। কিন্তু ভয় ছিল। জমিদার বংশের আদরের দুলালীকে তার মত ছেলের ঘরনী-রূপে কি মানাবে? সংশয়ের অকূল সায়রে হাবুডুবু খাচ্ছিল সে। তবু কথা দিয়েছিলো। কে জানত সবই মিথ্যা হয়ে যাবে, জীবনটা ফাঁকা হয়ে যাবে!

নদীতে জোয়ারের পর আসে ভাঁটা। প্রেমের জগতেও অনেকটা তাই। প্রচণ্ড উন্মাদনার পর আসে ক্লান্তি। আসবেই। আসতেই হবে। ওদের ক্ষেত্রেও মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি সে কথা। হবার নয় বলে হয়নি হয়তো। কণ্ঠার প্রেমে ভাঁটা এসেছিলো। পরেশ টের পায়নি এই সত্যটা। কি করেই বা জানবে? মেয়েরা কেবল

প্রেম করার জন্যে, বোঝার জন্যে নয়। যে নারী চরিত্র স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার কাছে রহস্যময়, পরেশ কি করে বুঝবে সেই নারী চরিত্রটাকে ? তবে বুঝতে পেরেছিল একদিন। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন।

সব কিছুই জানতে পারল একদিন। লাল কালিতে লেখা সুকণ্ঠার বিয়ের চিঠি হাতে এসে পড়ল যেদিন। চিঠিটা বজ্রপাতের মত এসে পড়ল ওর স্বপ্নসৌধশীর্ষে। মেয়ে জাতটাকে চিনতে পারেনি সে। বুঝতে পারেনি একাধিক পুরুষের সঙ্গ লাভ করার জন্য মেয়েরা উন্মুখ হয়ে থাকবেই। নারীরা লোভী। শিশুর মতো লোভী। বুঝতে পারল পরেশ মরীচিকার প্রেমে পড়ে সে জীবন হারাতে বসেছিলো। আরো বুঝলো, বিলাস-সঙ্গিনীরা গৃহস্থালির বাইরেই মানানসই। তাদের গৃহস্থালি করার প্রচেষ্টা নিতান্তই হাস্যকর এবং ব্যর্থ। কিন্তু বুঝতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

তারপর বিগত চার বছরের মধ্যে আর দেখা হয়নি সুকণ্ঠার সাথে একবারও। অনেকদিন বাদে হঠাৎ দেখা হ'ল এঞ্জিনিয়ার চঞ্চল রায়ের স্ত্রী সুকণ্ঠা রায়ের সঙ্গে। পরেশ চিনলো। সুকণ্ঠা চিনলো না। চিনলেও হয়ত না চেনার অভিনয় করলো। চার বছর আগেকার সেই মোহময় দিনগুলোকে এরই মধ্যে ভুলে গেল সুকণ্ঠা। এতো সহজে ভুলে গেল। ভুলতে পারলো ? একটুও কষ্ট হল না ? আশ্চর্য ! অবশ্য জীবনের চলার পথে হামেশাই তো এ-রকম ঘটছে !

মনীষা

(গল্প)

নিতাই মৃধা

—আর ধৈর্য রাখতে পারছি না মনীষা,—তোমাকে-আমাকে নিয়ে হয়তো অনেক হাসাহাসি অনেক কানাকানি চলছে—তা' চলুক। সেজন্যে আমি এতটুকুও বিচলিত নই। এই তীব্র খরস্রোতা নদীর ঢেউ যেমন আছড়ে পড়ছে তার বেলাভূমিতে, আমার এ উন্মত্ত হৃদয় তেমনি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু কিনারা পাচ্ছে না। অকূলে কূল কি দেবে না মনীষা? আমি তোমাকে না পেলে যে পাগল হয়ে যাব।

—হা-হা-হা! পাগল হয়ে যাবে! বাঃ, বড়ো চমৎকার কথা তো! তোমার কথাটা শুনে খুব হাসি পাচ্ছে ডাক্তার!

—তুমি হাসছ মনীষা? তুমি আমাকে বিদ্রূপ করছ, তুমি আমার ভালবাসাকে উপেক্ষা করতে চাইছ? হয়তো আমি ভুল করেছি তোমার মতো একজন সামান্য নার্সকে·······

—Yes, Yes, Doctor, ঐ কথাটিই তোমাকে আমি বোঝাতে চাইছিলাম,—আমার মত একজন সামান্য নার্সকে ভালবেসে তুমি খুব ভুল-ই করছ? আমার মতো একজন নার্সের সঙ্গে তোমাদের মতো ভদ্রবেশী যুবকেরা কিছুক্ষণ প্রেম করতে পারে। কিন্তু বিয়ে?—ছি-ছি-ছি, বিবেকে বাধবে যে তাদের!

—একি বলছ মনীষা? তুমি এভাবে আমাকে বিদ্রূপ করতে পারলে? আমি ত তোমাকে আমার জীবন সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করতে কোনদিন কুণ্ঠিত হইনি, তবে কেন বৃথা আমাকে আঘাত দিচ্ছ?

—প্লীজ ডাক্তার! এতখানি উদারতা এ অভাগীর প্রতি নাই বা দেখালে! তোমার মতো নামকরা ডাক্তারের পত্নী কি এই সামান্য নার্সকে মানায়? আমাকে বিয়ে করে তুমি কিছুই পাবে না। পাবে শুধু কাঁটার জ্বালা। তার চেয়ে দেখ কোন ধনী তার দুলালীর জন্য বাড়ী-গাড়ী আর ভরি ভরি স্বর্ণ যৌতুক নিয়ে অপেক্ষা করছে। এ-যুগে গরীবের মেয়ে হয়ে জন্মান বড়ো একটা অভিশাপ—তাই না ডাক্তার?

—তুমি অন্যের দৃষ্টিভঙ্গীতে আমাকে বিচার করতে চাইলে খুব ভুল করবে মনীষা। আমি অর্থ-সম্পদ কিছুই চাই না।—চাই শুধু একজন উপযুক্ত জীবন সঙ্গিনী। জান মনীষা, আমি চিরদিন সুন্দরকে বেশী ভালবাসি। তাই সুন্দরের উপযুক্ত মূল্য দিতে কখনও ভুল করিনি। আমি চাই তোমার ঐ মনোহারিণী রূপের মাঝে, তোমার যৌবন-ভারাবনতা হৃদয়-সমুদ্রের মাঝে নিজেকে বিলীন করে দিতে। —বলো মনীষা, আমার এই তৃষ্ণার্ত হৃদয়কে তুমি শান্ত করবে কিনা?

—প্লীজ, হাত ছাড়ো ডাক্তার! আমার প্রতি এতখানি দুর্বলতা তোমার সাজে না। ফুলের জন্য কণ্টক সহ্য করা যায় ততক্ষণ—যতক্ষণ তাতে মধু থাকে।

—তুমি একি বলছ মনীষা! তোমার হৃদয় বলে কি কিছুই নেই? তোমার কি কাউকে ভালবাসতে ইচ্ছা হয় না? তোমার মন মাতানো রূপ কি শুধু মানুষকে মাতাল করবার জন্য—মানুষকে ভালবাসবার জন্য নয়?

—হা-হা-হা! ভা-ল-বা-সা—শুনতে খুব ভাল লাগে। ইংরাজীতে আরো ভালো লাগে—'Love' (লাভ)। সত্যই, জগতে সবাই লাভের আশায় ঘোরে, লোকসান কেউ-ই করতে চায় না। যখন কোন লাভের আশা থাকে না—তখন বাসী গোলাপের মতো ফেলে, দু'পায়ে মাড়িয়ে চলে যায়। ডাক্তার, অনুগ্রহ করে আমাকে মুক্তি দাও। জীবনে যে কটা দিন বাঁচি স্বার্থপর মানুষের একটু সেবা করে যাই।

—মানুষ সম্বন্ধে তোমার এত নীচ ধারণা কেন মনীষা?

—পশুদের সাথে মানুষের তফাত এমন কিছুই নেই ডাক্তার! পশুদের চিন্তা শক্তি নেই—আমাদের আছে, এইতো! মানুষ বেশী শিক্ষার অধিকারী হয়ে পশু-প্রেম আর মনুষ্য-প্রেমকে প্রায় সমপর্যায়ে এনে ফেলেছে। পশুরা মেলামেশা করে যেমন জৈবিক প্রয়োজনে—ইন্দ্রিয়ের

তাড়নায়, অধিকাংশ পুরুষেরা কি ঠিক তেমনি করে না?

—এভাবে বলতে তোমার বিবেকে কি আদৌ বাধছে না মনীষা? তুমি কি পুরুষকে এতই হেয় মনে করো? তোমার কি এতই গর্ব—এতই দাম্ভিকতা? যাকে স্ত্রীরা দেবতা জ্ঞানে পূজা করে—তা'কে তুমি এতখানি নীচে নামিয়ে দিতে চাও?

—Please doctor, excuse me. আমি হৃদয়ের মর্মবেদনায় সত্যই বিবেককে হারিয়ে ফেলেছি।—আচ্ছা ডাক্তার, তুমি বলো তো—যারা অর্থের বিনিময়ে, যৌতুকের মানদণ্ড দিয়ে নির্বাচন ক'রতে চায় তা'দের জীবন সঙ্গিনীকে—তা'র মধ্যে প্রকৃত প্রেমের চিহ্ন, ভালবাসার মূল্য কতখানি থাকতে পারে? কন্যার পিতামাতাকে চাহিদা-মুযায়ী অর্থ দিতে চোখের জল ফেলতে হয়। অপর দিকে সৌভাগ্যবানেরা সেই অর্থের বিনিময়ে কন্যাকে গ্রহণ করে। এ যেন ক্রেতা আর বিক্রেতার সম্বন্ধ। বড়ো চমৎকার এই জগৎ—তাই না ডাক্তার?

—আমি বুঝতে পেরেছি মনীষা, তোমার জীবনের বেদনা কোথায়! কিন্তু মনীষা, মুষ্টিমেয় শ্রেণীকে কেন্দ্র করে জগতের সকলকে বিচার করা চলে না। তুমি কি বলতে চাও—আমি তোমাকে জীবন সঙ্গিনী হিসাবে পেতে চাই অর্থ আর স্বর্ণ যৌতুকের আশায়? তোমাদের মেয়ে জাতটা কিন্তু বড়ো Sentimental—এমন কি আঘাত তোমার জীবনে এসেছে, যে জন্যে তুমি এমন দুঃখে-শোকে ভেঙে পড়েছ। আমি কোন স্বার্থের লোভে তোমাকে জীবন সঙ্গিনী হিসাবে পেতে চাইছি না। তোমাকে বিয়ে করলে অজ্ঞ সমাজের চোখে হয়তো অনেকখানি ছোট হয়ে যাব। কিন্তু মনীষা, আমি জানি স্বামী-স্ত্রীর চেয়ে মধুরতর সম্পর্ক আর কিছুতেই নেই। একি মনীষা, তুমি কাঁদছ!

—তুমি আমাকে ক্ষমা করো ডাক্তার। তুমি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছ, এর চেয়ে বড়ো সৌভাগ্যের বিষয় আমার আর কিছুই নেই। কিন্তু এ কলঙ্কিনীকে ভালবেসে তোমার জীবনকে কলঙ্কিত করতে চেয়ো না ডাক্তার।

—মিছে কেন চোখের জল ফেলছ মনীষা! সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন তো মানুষের জীবনে আছেই। তুমি একবার খুলে বলো, তোমার জীবনের এমন কি কলঙ্ক, এমন কি দুঃখ—যার জন্যে তুমি এমন ভাবে ভেঙে পড়েছ!

—তোমার কাছে ধরা যখন দিয়েছি, তখন আজ আর আমি কিছুই লুকাব না ডাক্তার। জানি, তখন আর এতখানি ভালবাসতে পারবে না। দূরে সরিয়ে নেবে নিজেকে—আমি তাই-ই চাই। শোন তা'হলে—

বাবা দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা গেলেন। টাকার শ্রাদ্ধ করেও তাঁকে বাঁচানো গেলো না। আমি সেবারে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা পাস করি। বাবার মৃত্যুর পর শোকে-দুঃখে মা নিরুপায় হ'য়ে পড়লেন আমাকে নিয়ে। আমাকে বিয়ে দিয়ে মা একটু নিশ্চিন্ত হ'তে চাইলেন। তাই মামারা আমার জন্যে পাত্র খুঁজতে লাগলেন। সৌভাগ্যবানেরা আসে, রূপে ভোলে বটে কিন্তু ভোলে না অর্থে! কারণ অবশ্য বুঝতে পারছ,—চাহিদা-মত মূল্য দিয়ে তাদের কিনবার শক্তি তখন আমাদের ছিল না। তাদের উপযুক্ত 'পণ' চাই। ওঃ, ভুল করলাম 'সভ্য' সমাজে বুঝি আর 'পণ' কথাটি চলে না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমাকে পাত্রস্থ করা আর সম্ভব হ'ল না। বাড়ী থেকে মাইল কয়েক দূরেই ছিল কলেজ। অগত্যা সেই মীর্জাপুর কলেজে ভর্তি হ'লাম। কলেজ-জীবন শুরু হ'লো। যেখানে পড়াশুনার অন্তরালেও চলে প্রেমাভিনয়।

প্রভাত রায় পড়তো ঐ কলেজে। থার্ড ইয়ারে পড়তো সে। ইকনমিক্সে অনার্স ছিল। শুনেছিলাম মস্ত বড়লোকের ছেলে সে। ট্যাক্সি করে আসতো কলেজে। সে আমার রূপে মুগ্ধ হয়েছিলো। কিন্তু বামন হয়ে চাঁদ ধরবার ইচ্ছা আমার কোনদিন-ই ছিলো না। সে একদিন পথের মাঝে আমাকে ডেকে বলল—মনীষা, অনেকদিন থেকে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছি, কিন্তু ভরসা পাচ্ছি না। ভালবাসা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আমিও তোমাকে সেইভাবে ভালবেসে ফেলেছি। জানি না কোন অপরাধ করেছি কিনা, হয়তো আমি তোমার অযোগ্য।

সে এসেছিলো আমার বাড়ীতে। মা'কে খুলে বলেছিলো সব কথা। মা সরল মানুষ, ভুলে গিয়েছিলো প্রভাতের কথায়।

মা সব কিছু শুনে বলেছিলো—বাবা, এতো আমার

খুব ভাগ্যের কথা। তুমি যদি গ্রহণ করো আমার মণিকে, তার চেয়ে সুখের বিষয় আমার আর কিছুই নেই বাবা।

এইভাবে ভুলে গিয়েছিলাম প্রভাতের স্বার্থপর ভালবাসায়। জগতকে চিনবার ক্ষমতা তখন আমার ছিল না। প্রথম জীবনে স্বপ্ন দেখেছিলাম—কপোত-কপোতী যেমন নীড় বাঁধে, সেই রকম নীড় বাঁধবার। এইভাবে চলেছিলো বেশ কিছুদিন আমাদের অবাধ মেলামেশা। মা কোনদিন বাধা দেন নি আমাদের এ ভালবাসায়।

তারপর প্রভাত অনার্স পাস করলো। নিজেকে তখন আরো ধন্য মনে হ'লো। প্রভাত একদিন এসে বললো—কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো, আমি বাবা-মা'কে রাজী করে তোমাকে আমার জীবন-সঙ্গিনী করব।

তারপর চলে গেল প্রভাত। পত্রের পর পত্র দিয়েও যখন কোন উত্তর পাওয়া যায় না, তখন খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমাদের সমাজের একটা বিশেষ গুণ আছে,—কোন উপকার কারুর করতে না পারলেও, নিন্দা বা কুৎসা রটাতে অন্য দেশ অপেক্ষা এরা অনেক উন্নত।

যাই হোক হঠাৎ একদিন প্রভাতের চিঠি পেলাম। লিখেছে—মনীষা, তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো। তোমাকে আমার জীবন-সঙ্গিনী করতে পারলাম না। বাবা-মা'কে অনেক বুঝালাম কিন্তু তারা রাজী হ'লো না।

তারপর শেষ কথাটি লিখেছে—গরীবের ঘরের সাথে নাকি ওদের কোন সম্বন্ধ চলে না। তাই ওর বাবা নাকি কলকাতার মস্ত বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছে।

এইভাবে প্রভাত সেদিন আমার জীবন থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছে। পায়ের তলা থেকে সমস্ত মাটি সরে গিয়েছিলো সেদিন। আর কোথাও দাঁড়াবার স্থান পাইনি।

—কি ডাক্তার নীরব কেন? এবার পারবে, পারবে আমায় গ্রহণ করতে?

—না মনীষা, আমাকে তুমি প্রভাতের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখ না। যে ভুল সে করেছে—আমাকে তুমি তার বন্ধু হিসাবে সুযোগ দাও সে ভুলের সংশোধন করতে।

গ্লানিভরা জীবনের অন্ধকার ঢেকে দিয়ে মনীষার জীবনে উদিত হ'লো প্রভাতের নতুন সূর্যালোক। সে আলোকে মনীষা দেখতে পেল প্রকৃত প্রেম—তার স্থান বহু ঊর্ধ্বে।

মেঘের মাদল বাজে

শ্রীমতী শান্তি বসু

মেঘের মাদল বাজে
আজি গুরুগুরু,
আনন্দেতে মাথা দোলায়
অবাধ্য ঐ তরু।
কাশের গুচ্ছগুলি
ঘন সুনিবিড়,
ছেয়ে গেছে আজিকে যে
নদীর দুই তীর।
বনভূমি সেজেছে আহা
কদম্ব কেশরে,
সোঁদা গন্ধ উঠেছে যে
মাটি সিক্ত করে।
নৃত্যরত কেকাদল
আজি হরষিত
নব ধারায় ধরাখানি
হল শুচিস্নাত।
মেঘের মাদল বাজে
গুরুগুরু আকাশে
কেয়ার সুরভি এল
বাতাসেতে ভেসে।

পার্কে সুপরিচিতা

কৃষ্ণকান্ত

অনেকদিন পরে পার্কে বেড়াতে চলেছি। কোন্ পার্কে জানি না। তবে চলেছি। অনেক কষ্টে এড়িয়ে ছিলাম। কেন জানি না পার্কের পূর্ণতা আমার মনের শূন্যতা বাড়িয়ে দেয়। মনে হয় বড় একা। মনটা বড় ভারী হয়ে উঠে। ঘাসের উপর কিছু সময় বসে উঠে আসতে হয়। মনে হয় ভীষণ ভাবুক হয়ে পড়েছি। কিন্তু জানি না কিসের ভাবনা। পথে এসে সব কিছু ভুলে যাই। হয়ে উঠি আগের সেই কর্মব্যস্ত স্বাভাবিক মানুষ—এই আমি। তবু স্বল্প সময় কম নয়। কী না-পাওয়ার বেদনায় মন গুমরে মরে।

ফাল্গুনের সন্ধ্যা। এলোমেলো হাওয়ায় মনটা আনমনা। ইডেন গার্ডেনের দিকেই চলেছি। অগোছাল ইডেনের বসন্তের কিছুটা পরিপাটি—যেন মেজে ঘষে যৌবনটা জোর করে ধরে রাখতে চেয়েছে। আকাশে চাঁদ ছিল। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না। সমস্ত ইডেন জুড়ে আলো-আঁধারের খেলা। এখানে-সেখানে, আড়ালে সামনে নানান গুঞ্জন—তবে মৃদু ছন্দে। অনেক ঘুরেও ঠিক মত বসার সুযোগ হল না। নিজেকে বড় বেমানান মনে হচ্ছিল। রিক্ত মনে এখানে যেন প্রবেশ নিষেধ। তবুও পা দুটো নিচের দিকেই টানে—এখানেই বিশ্রাম চায়। ভাল করে চারদিকে তাকিয়ে দেখি—না কোনও বেঞ্চ খালি নেই। হ্যাঁ দূরে গাছতলায় বোধহয় একটা খালি আছে মনে হচ্ছে। গাছের ছায়া এসে পড়েছে বেঞ্চটার উপর। দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় না। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই অন্যের আগে পৌঁছুবার আশায়। কাছে গিয়েই অপ্রস্তুত। খালি নেই, একজন ভদ্রমহিলা বসে আছেন। সঙ্গের পুরুষটি বোধহয় বসিয়ে রেখে কিছু কিনতে গিয়েছে। ফেরার জন্য পা বাড়িয়েছি, এমন সময় ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর কানে এলো—আপনি কি বসবেন? তাহলে আমি উঠছি?

ব্যস্তভাবে বলে ফেললাম—না না উঠবেন কেন? আমি ভেবেছিলাম—

মেয়েটি বোধহয় আমাকে দুর্বল ভেবে হাসল।

—এত সংকোচের কী আছে? আমার আপত্তি নেই, আপনি বসতে পারেন।

আমিও আর আপত্তি তুললাম না। কিছু ব্যবধান রেখে বসে পড়লাম। মনে হচ্ছিল দুঃসাহসিক কিছু একটা করে ফেলেছি। অবিশ্বাস্য কিছু একটা ঘটতে চলেছে যা কেবলমাত্র গল্পের আসরে স্থান পাবে। থাক ওসব চিন্তা। সঙ্গের ভদ্রলোকটি কী ভাববেন? শেষে আবার হাতাহাতি না হয়।

মেয়েটি আবার কথা বলল—বেড়াতে এসেছেন?

সংক্ষেপে বললাম—হ্যাঁ।

মেয়েটি বলল—আমিও।

—মানে! আপ্‌নি একা!

—আপনি কী ভেবেছেন, সঙ্গে কেউ আছে! থাকলে তো কাছেই থাকত।

আমি বেশ অবাক্ হয়েই মেয়েটির দিকে তাকালাম। এতক্ষণ পরে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেলাম। মেয়েটির গাম্ভীর্যের আড়ালে মৃদু হাসির আভাস। বেশভূষা বেশ অভিজাত। চোখে-মুখে যৌবন-সুলভ স্বাভাবিক চাঞ্চল্য। কলকাতার মেয়ে তাই বোধহয় একটু সংকোচের অভাব। দেখে বেশ শিক্ষিত মার্জিত মনে হচ্ছে। মনে হল আজ বেড়াতে আসা সার্থক হোল। এত কাছে বসে গল্প করা ....এ যে স্বপ্নেও ভাবা যায় না। নামটা জিজ্ঞেস করলে তো হয়। হয়তো সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। শেষকালে সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যাবে।

মেয়েটি বলল—অপরিচিত আপনার সাথে কথা বলছি বলে অবাক্ হয়ে অনেক কিছু ভাবছেন, তাই না?

—না না, সে সব তো কিছু ভাবিনি।

—অনেকক্ষণ একা বসে থেকে এত বিরক্ত লাগছিল। আপনাকে কাছে পেয়ে সেইজন্য সোজাসুজি আলাপ শুরু করলাম। অনেকে এ নিয়ে অনেক কিছু কুৎসিত সন্দেহ করে বসে। এরা নিজেরা সহজ হতে পারে না, অন্যকেও

হতে দেয় না। আপনিই বলুন একা চুপচাপ এখানে কতক্ষণ বসে থাকতে ভাল লাগে ?

—এক মুহূর্ত নয়। সেইজন্য তো বেশী সময় বসি না। আচ্ছা আপনার নামটা ?

—সুপরিচিতা রায়,—আপনার ?

—সুব্রত চট্টোপাধ্যায়।

দুজনেই হেসে উঠি। আবার যেন নতুন করে গল্প শুরু হয়। কত হাসি, কত কথা, মনে হচ্ছিল, সত্যি যেন কত কালের সুপরিচিতা।

সুপরিচিতা বলল—রোজই আসেন ?

—নাঃ, অনেকদিন পরে এলাম।

—কেন আসেন না ? সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বুঝি?

—না সংসার নেই। এখানে আসলে বড় একা মনে হয়, কিছু ভাল লাগে না।

সুপরিচিতা মাথা নেড়ে বলল—ঠিক বলেছেন। অবসর সময়ে একটু কথা বলার লোক না থাকলে বড় একা মনে হয়। সেইজন্যই তো নিতান্তই লজ্জাহীনার মত আপনার সাথে আলাপ শুরু করলাম।

এরপর কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। সুপরিচিতা আবার বলল—শুনছেন, কী এত ভাবছেন ?

কি সব ভাবছিলাম। মনে হোল অনেক ঘনিষ্ঠ ভাবে বসে আছি। ওর শাড়ীর আঁচল কখন দুজনের মাঝের বেঞ্চের ব্যবধান ঢেকে ফেলেছে।—বললাম, ভাবছি, আমরা দুজন দুজনের কাছে সহজ হতে পেরেছি। বাস্তবে খুব কমই দেখা যায়।

—সহজ সম্পর্ক তো আজকাল কেউ মেনে নিতে চায় না তাই। তাই শুধু মিথ্যে সন্দেহ আর ব্যবধান। আমরা দুজনে মেনে নিতে পেরেছি বলে দুজন দুজনের কাছে সহজ হতে পেরেছি। সেখানে কোনও খারাপ ইঙ্গিত আসেনি। রাত হয়ে গেল—এবার উঠতে হবে সুব্রতবাবু।

—কোন্ দিকে যাবেন ?

—আমি ঠিক চলে যেতে পারবো ; আচ্ছা, নমস্কার।—বেঞ্চ ছেড়ে উঠে পড়ে সুপরিচিতা।

—তাহলে চলি কেমন ? আবার দেখা হবে, নমস্কার। হেসে প্রতি নমস্কার জানালাম।

সুপরিচিতা চলে গেলো। দূরে গাছের ছায়ায় কোথায় যেন হারিয়ে গেল। পেছন ফিরেই দুজন লোকের সঙ্গে মুখোমুখি। কুৎসিত ইঙ্গিত করে হেসে চলে গেল তারা। ভাবলাম, সুপরিচিতা ঠিকই বলেছে—জীবন বড় জটিল হয়ে পড়েছে। এখানে সহজ সরল মধুর সম্পর্কটা কেউ মেনে নিতে পারে না—এমনকি হয়তো কেউ ভাবতেও পারে না।

চলতে শুরু করলাম। গেটের কাছে আসতেই সেই অন্ধ ভিক্ষুকটা পুরনো সুরে একটা পয়সা চাইল। পকেটে হাত দিয়েই, অবাক্! মনিব্যাগ নেই! অথচ অল্প আগেও তো ছিল। হাসতে হল। সুপরিচিতার সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠ ভাবে বসেছিলাম তখন একবার মনে হয়েছিল যে, পাঞ্জাবির বাঁ পকেটটায় টান পড়ল। কিন্তু তখন তো সুপরিচিতা সন্দেহের অবকাশ রাখেনি।

সকল সৌন্দর্য ও আদর্শ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো। হাত-ঘড়িতে দেখলাম রাত ৯টা। ইডেনের উদ্যান শান্ত। নিজেকে ভীষণ বোকা মনে হল। আজ সন্ধ্যায় যা কিছু ঘটেছে সবই অস্বাভাবিক। তাকেই স্বাভাবিক ভেবে মেতেছিলাম। নিজের উপর ঘৃণা জন্মাল। মনটা আরও দ্বিগুণ ব্যথায় ভরে উঠল। তবু সান্ত্বনা—মনিব্যাগটা প্রায় শূন্য ছিল। কিন্তু সু-পরিচিতার এখন সান্ত্বনা কোথায় ?

শান্ত ইডেনের দিকে তাকিয়েছিলাম। আপন মনে প্রশ্ন করেছিলাম সুপরিচিতা, তুমি সু-পরিচিতা, না অপরিচিতা !

———

৪৬শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৭৩ | ৩য় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

এ উচ্ছৃঙ্খলতার শেষ কোথায় !

আমাদের জাতীয় জীবনে সর্বনাশা-উচ্ছৃঙ্খলতার চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। সর্বত্র দেখা যাচ্ছে শৃঙ্খলাবদ্ধতার অভাব ও চরম অসহিষ্ণুতা। জনসাধারণের পুঞ্জীভূত অভাব অসন্তোষ এতদিন যেটা বারুদের স্তূপের ন্যায় চাপা ছিল, এখন সেই বিক্ষোভের আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়েছে।

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এটা প্রাক-নির্বাচনী কাল। তাই সরকারের বক্তব্য হল, বিরোধী পক্ষ চেষ্টা করছে যেন তেন প্রকারেণ সরকারকে জনসাধারণের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা। তাই একের পর এক আন্দোলন, বন্ধ্ আহ্বান ইত্যাদির দ্বারা গণ-জীবন বিপর্যস্ত করে দেওয়াই বিরোধীদের উদ্দেশ্য। কিন্তু সমস্যার একটু গভীরে প্রবেশ করলেই বেশ বোঝা যায় যে, সরকারী নিষ্ক্রিয়তা ও অপদার্থতার পূর্ণ

সরকার এক বিপজ্জনক নজীর সৃষ্টি করে চলেছেন যে, রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রকাশের আগে পর্যন্ত কোন সমস্যার প্রতি সরকারী দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। সাধারণ আবেদন-নিবেদন যখন ব্যর্থ হয়, স্বভাবতঃই জনসাধারণকে তখন রাস্তায় নেমে আসতে বাধ্য হতে হয়। এবং সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় যে, সমস্যার সমাধান বা দাবি পূরণের ব্যবস্থা তখন আপনা থেকেই হয়ে যায়। সেই বিপজ্জনক নজির অনুসরণ করে কারখানার কুলি থেকে শুরু করে কেরানী কুল, শিক্ষক, অধ্যাপক ইত্যাদি প্রত্যেকে বিক্ষোভ প্রকাশ করে দাবি আদায়ের সহজ উপায় বেছে নিয়েছেন।

সেই 'ঘেরা ডালো' নীতির সর্বত্র অবাধ প্রয়োগ চলেছে। চরম দাওয়াই এখন যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে এর কুফল এখনিই দেখা দিয়েছে। কলকাতায়

পরিণত হয়েছে। পালাক্রমে এক এক দল সেখানে পাড়ি জমাচ্ছেন, দাবি আদায় করে তারা আবার অন্য দলকে জায়গা করে দিয়ে যাচ্ছেন। এ-ছাড়া নাকি দাবি আদায়ের আর অন্য কোন উপায় নেই! এ-অসহনীয় অবস্থা সরকারের পক্ষে মোটেই গৌরবের বিষয় নয়।

শিক্ষকেরা এই নীতি অনুসরণ করে দাবি আদায়ের জন্য এখন রাজপথে নেমে এসেছেন। প্রাথমিক শিক্ষকেরা চলে গেছেন। এখন পালা চলেছে মাধ্যমিক শিক্ষকদের। স্বভাবতঃই সব মাধ্যমিক স্কুল বন্ধ। ছাত্ররা ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে, বছরের শুরুতেই নানা হাঙ্গামা ও বন্ধ্ আহ্বানের ফলে বেশ দীর্ঘদিন স্কুলগুলি বন্ধ ছিল। এখন আবার দ্বিতীয় ধাক্কায় স্কুলগুলি বন্ধ হল। এর ফলে লেখাপড়া সব পণ্ড হতে বসেছে।

শিক্ষকদের দাবি জাতীয় দাবি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আপামর জনসাধারণের প্রত্যেকেরই এ-দাবি নীতিগত ভাবে সমর্থন জানাবেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আজকের এই ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার যুগে শিক্ষকেরা এ কোন্ বিপজ্জনক উপায় অবলম্বন করেছেন! আর সরকার সেই শিক্ষকদের দাবির কি বিবেচনা করছেন?

পিতা-মাতা ও শিক্ষক, এঁরাই হলেন ছাত্রদের আদর্শ স্থানীয়। এঁরা যদি আদর্শ-চ্যুত হন, তাহলে ছাত্রদের সম্মুখে আর কি আদর্শের লক্ষ্য থাকবে? শিক্ষক-অধ্যাপক আজ সবাইকেই ন্যূনতম বাঁচার দাবি আদায় করতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে বাধ্য হতে হয়েছে। এর ফলে তাঁদের যতটা মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে তার চেয়েও বেশী মর্যাদা হানি হয়েছে আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের। আজকের সর্বত্র যে সমাজ-শৃঙ্খলার বন্ধন শিথিল হয়ে গেছে, তার মূল কারণ এখানেই নিহিত রয়েছে।

ছাত্রেরা জাতির ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যৎ গঠনের মহান কাজে যাঁরা ব্যাপৃত আছেন, তাঁদেরও একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। কিন্তু সেই দায়িত্ব আজ অবহেলিত। তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ জাতীয় জীবনে দেখা দিয়েছে গণ-উচ্ছৃঙ্খলতা। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানেই আজ ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় 'কামি' ও 'কাপ্পি'র ছাত্ররা এবং কম্যুনিষ্ট চীনে 'রেড গার্ড'-এর ছাত্ররা তাদের নিজেদের দেশে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে চলেছে। আমাদের দেশে সেই দুর্ঘটনার দিন বোধহয় এগিয়ে এসেছে।

কড়ি

কুমারী রেখারানী দাশ

(১)

অতি আশা সর্বনাশা, সুখভোগ মেকি!
জীবনের যত দুঃখ শোক,
সন্ধানের খুলে দেয় চোখ,
লোভের অন্তর ভরা, অতি বড়ো ফাঁকি॥

(২)

আপনারে বড়ো ভেবে
সবাকারে করি অবহেলা,
ব্যথা পেয়ে কাঁদে ভগবান।
মূলধন বেড়ে সুদে,
প্রত্যহের সাথে ফিরে, আনে
নিত্য নব শেল, অপমান॥

(৩)

সত্য মিথ্যা উভয়েই ধর্ম বিপরীত,
আলো-অন্ধকার সম হিত ও গর্হিত।
সত্য প্রত্যহের দ্বারে পরম আস্পদ,
মিথ্যার দুর্বহ বোঝা বাড়ায় বিপদ॥

রঙ্গ চিত্র

মনোভাব মোটেই পালটায় নি।

মুহূর্তের জন্যে

সংস্মিতা

যে দেশে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা কম, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও প্রমোদ পরিবেষণের মাধ্যম হিসাবে সে-সব দেশে বেতার এবং ছায়াচিত্রের প্রভাব নিঃসন্দেহে খুব বেশী। এ-দুটি মাধ্যমের বিষয়-সূচী ও তা প্রচারের ধারা তাই সর্বতোভাবে নিখুঁত এবং সযত্ন রচিত হওয়া দরকার।

হিন্দী ছায়াচিত্র সম্পর্কে এ-কথা না বলে উপায় নেই যে, আমাদের দেশে এই শক্তিশালী মাধ্যমটি অনেক সময়ই ঐ প্রয়োজনীয় কথা স্মরণে রেখে ব্যবহার করা হয় না। এ-কথা কেউ বলবেন না যে, ছবি শুধু সৎ শিক্ষা ও হিতোপদেশ দেবার জন্যেই তৈরি হবে; কিন্তু প্রেম, এ্যাডভেঞ্চার ও ফষ্টিনষ্টি নিয়ে যে ছবি তৈরি হয়, তা স্নায়বিক বৈকল্যের স্তরকে স্পর্শ করলে তা আর আর্ট থাকে না। এ-কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, হিন্দী ফিল্ম দেশের তরুণ-তরুণীদের কুরুচি শেখাচ্ছে; আর তারা উচ্ছৃঙ্খল, বেয়াড়া ও বাউণ্ডুলে হবার প্রেরণা পাচ্ছে এ থেকে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে হিন্দী ছবির অনুন্নত রুচি ও তরুণ সমাজে তার প্রভাব সম্বন্ধে এক বে-সরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করে শ্রীযতীন চক্রবর্তী এই সব ছবির প্রদর্শন বন্ধ করার দাবি তুলেন। শ্রম-মন্ত্রী শ্রীনাহার সহ অনেকেই এ-বক্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহৃত হলেও শ্রম-মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে, বাংলার সমস্ত প্রেক্ষাগৃহেই যাতে আবশ্যিকভাবে অন্যান্য ছবির সঙ্গে বাংলা ছবি নিয়মিত দেখানো হয় এবং বাংলা দেশেই যাতে রুচি সম্পন্ন হিন্দী ছবি দেখানো হয়, সে বিষয়ে সরকার দৃষ্টি দেবেন।

ফিল্ম দুনিয়ার কর্তৃত্বের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত। এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের, তবে রাজ্য সরকারসমূহ তাঁদের বক্তব্য যথাযথ-ভাবে পেশ করতে পারেন।

প্রত্যেক ছায়াচিত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের পূর্বে সেন্সার বোর্ডের অনুমতি-প্রাপ্ত হতে হয়। কিন্তু আধুনিক হিন্দী ছবির এতদূর রুচি বিগর্হিত রূপ দেখে স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে জাগে যে সেন্সার বোর্ডের কর্তাদের বিচারের মান কোথায় এসে পৌঁছেচে?

* * *

সমস্যা আমাদের হাজারো রকমের আছে ঠিকই, কিন্তু তা' সমাধানের জন্য আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গী হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা' মোটেই নেই। সেইজন্যই জনসাধারণের মধ্যে এত বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে। উপর তলার কর্তাদের অনুসৃত নীতি ও তাদের কর্তব্যপরায়ণতা সাধারণ মানুষের মনে হতাশার সঞ্চার করছে। এই কারণেই বছরের পর বছর পার হয়ে যায়, কিন্তু সমস্যার রূপ প্রায় একই থেকে যায়।

লোকসভায় ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া সরকারের বিরুদ্ধে চাল অদৃশ্য হওয়াব এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছেন। এর সঙ্গে ৪টি মন্ত্রী দপ্তর জড়িত এবং একজন মন্ত্রী ষড়যন্ত্র চাপা দেন এরূপ অভিযোগ আরও হতবুদ্ধিকর। ১৯৬২ সালে ভারত সরকার প্রায়ই দেখতেন যে, ব্রহ্মের বন্দরে বোঝাই করা চাল ভারতীয় বন্দরে নামানো হলে তা ওজনে কম হয়ে যায়। প্রকাশ, জাহাজ কোম্পানী এই ব্যাপারে মোটা খেসারতের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাঁদের বিভিন্ন জাহাজের ক্যাপ্টেনদের নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেন তাঁদের জাহাজের পাটাতনের তলায় অনেকগুলি খালি চটের বস্তা রেখে দেন। এই সব থলের উপরে যেন বর্মী চটের বস্তার মতো ছাপ বা মার্কা মারা থাকে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার ও শিপিং লাইনস্-এর মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বস্তার সঠিক সংখ্যা ডেলিভারী দেওয়া কোম্পানীর দায়িত্ব, বস্তার মালের পরিমাণ তাঁদের জানার দরকার নেই। ক্যাপ্টেনদের নিকট এই জাতীয় লেখা চিঠির একখানি ভারত সরকারের হাতে এসে পৌঁছায়।

ডাঃ লোহিয়া এই ধরনের কোন পত্র সরকারের ফাইলে আছে কিনা এবং কোন মন্ত্রী এই সব অপরাধী পোষণ করছেন কিনা, তা সরকারকে খুঁজে বার করার অনুরোধ জানান। ডাঃ লোহিয়া যে রহস্যময় নেপথ্য কাহিনী প্রকাশ করেছেন, তার কিছু অংশও যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের খাদ্য সঙ্কট ঘুচাবে কে?

মোনালিসা

কৃষ্ণদাস মণ্ডল

একক তানের মধুর মূর্চ্ছনায় জেগেছিল একটি হাসি।
ঠিক যেন মোনালিসার দীপ্ত
চোখের চাহনিতে বেঁধেছিল
একটি প্রাণের ফাঁসি।

অলক গুচ্ছের কঙ্কনখানি মেলেছিল ললাটভূমি।
শুভ্র চেলির বাধা মানে না
উচ্ছল যৌবনের রাশি,
স্ফুরিত অধরের মৌন হাসি।

চিকন সোনার, শরৎ হাসির শান্তির নীড়ে
সংযতহীন অকারণ হাসির
উদ্দামতায় জেগেছিল
একটি প্রেম ধীরে।

বলেছিলেম, হাসো তো মোনালিসা,
শিশিরে সিক্ত তৃণের মত,
জ্যোৎস্না পরিপ্লুতা রাত্রির মত
যেখানে পাই না দিশা।

দীঘল চোখের অমল মাখা একটুখানি চাওয়া
ভ্রান্তিতে ভরা এ জীবন শুধু
তোমারেই দিয়েছি
ওগো সন্ধ্যা শিশিরে হাওয়া!

ছুটি উচ্ছল যৌবনের বিকশিত বাঁধন হারা ঊর্মি।
মনের গোপনে আনে কামনার বহ্নি,
নিবৃত্তির শীতল বারিধারা—
যেন ছদ্মবেশী বর্মি।

অলৌকিক রহস্য — সত্য ঘটনা

জড় জগতের পরিবেশ ও আকর্ষণময়ী আলোক মণ্ডল

চক্রের অভিজ্ঞতা

আট

মিস আর. এফ. নামে একটি রমণী মাঝে মাঝে ভয়ানক উত্তেজিতা হ'য়ে উঠতেন এবং ঘর থেকে পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে যেতেন। তাঁকে আমাদের পরীক্ষাগারে আনা হয় এবং পরীক্ষাগারে প্রবেশ করবার পর তাঁর উন্মত্ততার এবং উত্তেজনার ভাব অনেকটা শান্ত হয়।

একজন মিডিয়ামকে ধরে রইলেন, কারণ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মিডিয়াম ছুটে পালাবার উপক্রম করছিলেন। সংযত হবার পর মিডিয়াম ক্রুদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ডাক্তার: আপনি বসবেন না?

প্রেতাত্মা: না।

ডাক্তার: কোথায় যেতে চাইছেন?

প্রেতাত্মা: ঘরে।

ডাক্তার: ঘর! কোথায় আপনার ঘর?

প্রেতাত্মা: সেই ত খুঁজছি, তাইত—(মুক্তিলাভের জন্য প্রচেষ্টা)।

ডাক্তার: কোথায় আপনি যাবেন বলুন, আপনার কোন ঘর নেই।

প্রেতাত্মা: আমি এখানে থাকতে চাই না। আমি যাবই—

ডাক্তার: কতদিন হ'ল আপনি মারা গেছেন?

প্রেতাত্মা: আমি মারা যাই নি—আমি চলে যাচ্ছি। ওই ভয়ানক জিনিসগুলো আমাকে দেওয়া আমি মোটেই পছন্দ করি না, গা জ্বালা ক'রে, (রুগিণীকে প্রদত্ত ইলেক-ট্রিক চিকিৎসা)। দু'দু'বার আমি পালাবার চেষ্টা করেও পারি নি—আমাকে ধরে আনা হয়েছে।

ডাক্তার: আপনি স্ত্রীলোকটির চুলগুলো কাটিয়ে ফেললেন কেন?

প্রেতাত্মা: আমি অপরের চুল কাটাই নি ত। এটা আমার নিজের দেহ। আমার ইচ্ছে হ'লে আমি আমার চুল কাটব না, বলতে চান? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুমিয়ে উঠে দেখি যে ইয়া বড় বড় চুল মাথায় গজিয়ে উঠেছে—অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম তাই বোধহয় মেয়েমানুষের মত লম্বা চুল মাথায় গজিয়ে উঠেছিল। আমি ত আর মেয়ে-মানুষ নই যে অত বড় চুল মাথায় রাখব। অত বড় বড় চুল নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে নাপিতের দোকানে যেতে আমার লজ্জা করল, তাই নিজেই চুলগুলো কেটে ফেললাম।

ডাক্তার: জানেন, আপনি আপনার নিজের চুল কাটেন নি—ওগুলো যে মহিলাটির উপর আপনি ভর করে-ছিলেন তাঁর চুল।

প্রেতাত্মা: ওগুলো আমার মাথার চুল। আমাকে এভাবে এখানে ধরে রাখবার মানে কি? আমি ত আপনাদের কারও কিছু করি নি।

ডাক্তার: আপনি একজন মহিলাকে বহু যন্ত্রণা দিয়েছেন। আচ্ছা, আপনি বলছেন যে আপনি পুরুষ-মানুষ; কিন্তু আপনার পরিধানে নারীর বেশ কেন বলতে পারেন?

প্রেতাত্মা: পুরুষের পরিচ্ছদ আমি পেলাম না, তাই—

ডাক্তার: এই ব্যাপারেই আপনার ধারণা করা উচিত নয় কি যে, আপনার মধ্যে কিছু একটা ঘটেছে।

প্রেতাত্মা: বসতে পারি?

ডাক্তার: হ্যাঁ স্বচ্ছন্দে। তবে শান্ত হয়ে বসতে হবে।

প্রেতাত্মা: আমি এখানে থাকতে চাই না। আমি বাড়ী যাচ্ছি—

ডাক্তার: আপনি যদি স্থির হয়ে বসেন এবং আমার কথা শোনেন, তা'হলে সব আপনাকে বুঝিয়ে দেব। হ্যাঁ,

আপনি মৃত, বুঝলেন—

প্রেতাত্মা : না আমি মৃত নই। ছেড়ে দিন আমাকে, এখনই আপনাকে দেখিয়ে দেব আমি কি—

ডাক্তার : আমি ত আপনাকে ধরে নেই, আমি আমার স্ত্রীকে ধরে আছি। আপনার অবস্থা বড় বিচিত্র। আপনি দেহত্যাগ করেছেন, কিন্তু সেই অবস্থাটাকেই আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন না।

প্রেতাত্মা : আমার হাত ছেড়ে দিন।

ডাক্তার : আমি আমার স্ত্রীর হাত ধরে আছি, আপনার নয়।

প্রেতাত্মা : আপনার স্ত্রীর হাত! কি পাগলের মত বকছেন। আমি আপনার স্ত্রী নই. পুরুষ পুরুষকে বিয়ে করে বলে আপনি মনে করেন নাকি? এ-রকম কথা ত আমি কখনো শুনি নি।

ডাক্তার : যা বলছি তা' সত্যি কথা। আপনি এক-জন অজ্ঞ প্রেতাত্মা, নিজের অবস্থা সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা নেই।

প্রেতাত্মা : ছেড়ে দিন আমাকে, যেতে দিন।

ডাক্তার : মৃত্যুর পর মানুষের কি হয় সে সম্বন্ধে কোন দিন কিছু চিন্তা করেছেন কি?

প্রেতাত্মা : আমি ত মারা যাইনি। আমি শুধু ঘুমিয়েছিলাম।

ডাক্তার : হ্যাঁ, ওইটাই 'মৃত্যুর ঘুমঘোর' (That was the sleep of death)।

প্রেতাত্মা : যদি আমি মারা যেতাম, তা'হলে ত আমি শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত কবরেই থাকতাম।

ডাক্তার : ওটা আপনার ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাস। আপনি জীবন-রহস্য উপলব্ধি করতে পারেন নি।

প্রেতাত্মা : আমি শিখেছিলাম যে মৃত্যুর পর ভগবানে বিশ্বাস থাকলে আমি স্বর্গে যাব।

ডাক্তার : তা'হলে মৃত্যুর পর আপনি স্বর্গে গেলেন না কেন? যাই হোক, শুনুন, আপনার জড়-দেহের সমাপ্তি ঘটেছে—জড়-জগতের দিক থেকে আপনি মৃত। আপনি এখানে রয়েছেন, কিন্তু আমরা কেউ আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না—আমি আমার স্ত্রীর দেহকেই শুধু দেখতে পাচ্ছি।

প্রেতাত্মা : আমি আপনার স্ত্রীকে কখনও দেখি নি, তাকে আমি চিনি না, জানি না।

ডাক্তার : আপনি 'মিডিয়ামের' কথা কখনও শুনে-ছেন কি?

প্রেতাত্মা : হ্যাঁ, শুনেছি বটে। কিন্তু ওতে আমার বিশ্বাস নেই।

ডাক্তার : আপনি একজন মিডিয়ামের মধ্য দিয়ে কথা বলছেন, বুঝলেন।

প্রেতাত্মা : মিথ্যে কথা, ডাহা মিথ্যে কথা।

ডাক্তার : মিথ্যে নয়, সত্যি। দেখতে পাচ্ছেন না আপনার দেহে নারীর পরিচ্ছদ। আপনার বোঝা উচিত যে, নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যাপার এর মধ্যে আছে। আপনি বোধহয় জানেন না যে, আপনি ক্যালিফোর্নিয়ার লস্ এঞ্জেলসে রয়েছেন?

প্রেতাত্মা : না, জানি না। আমি কিছুদিন ধরে খালি ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ডাক্তার : আপনার হাত দু'টি দেখুন ত। ওগুলো কি আপনার নিজের বলে মনে হয়? আপনি একজন স্ত্রীলোককে আশ্রয় ক'রে তাকে কষ্ট দিচ্ছিলেন, বুঝলেন?

প্রেতাত্মা : আমার কি হয়েছে? আমার মনে হচ্ছে আমার চারপাশে বেশ ভিড় জমে রয়েছে।

ডাক্তার : দেখুন, আমার মনে হয় আপনি বেশ বিরাটকায় ছিলেন। সেইজন্য ক্ষুদ্র একটি দেহের উপর আশ্রয় গ্রহণ ক'রে, আপনার খুব ভার বোধ হচ্ছে। আচ্ছা আপনি খোলা মনে সব বিষয়টি ভেবে দেখবার চেষ্টা করছেন না কেন? মনে হচ্ছে বহুদিন হ'ল আপনি দেহত্যাগ করেছেন। আচ্ছা এটা কোন সাল বলতে পারেন?

প্রেতাত্মা : আমি বহুক্ষণ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, সেইজন্য বলতে পারব না।

ডাক্তার : আচ্ছা আপনার বর্তমান অবস্থা আপনাকে নানা বিষয় জানবার জন্য আগ্রহান্বিত করছে না? আপনাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, খালি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি, বুঝলেন।

প্রেতাত্মা : যাকে দেখতে পাচ্ছেন না, তার সঙ্গে কথা বলবার কি মানে হয়?

ডাক্তার: এই মহিলাটি একজন মিডিয়াম। এঁর মধ্য দিয়েই আপনি কথা বলছেন।

প্রেতাত্মা: আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না।

ডাক্তার: আপনি একটি ধারণাশক্তিহীন অজ্ঞ প্রেতাত্মা। যে স্ত্রীলোকটিকে আপনি ইতিপূর্বে ভর করেছিলেন, তাঁর দেহযন্ত্র প্রেতাত্মা-আশ্রয়ের অনুকূল। আপনার প্রভাবেই সেই স্ত্রীলোকটি নানা পাগলামি করেছে। এসব কাজগুলোকে আপনার কি মনে হয়?

প্রেতাত্মা: আমি বলতে চাই না যে ওগুলো ভাল কাজ। তবে আমি ত কোন স্ত্রীলোককে জানি না—

ডাক্তার: আপনিই সেই স্ত্রীলোকটিকে তার চুল কাটতে এবং ছুটে পালাতে বাধ্য করেছিলেন।

প্রেতাত্মা: কেন কাটব না বলুন? ঘুম ভেঙেই দেখলাম যে মাথায় বড় বড় চুল গজিয়ে উঠেছে, সেইজন্যই ওগুলো কেটে ফেললাম।

ডাক্তার: কিন্তু ওগুলো সেই মহিলার কেশরাশি।

প্রেতাত্মা: কিন্তু ওগুলো যে বড্ড বড় হয়ে উঠেছিল।

ডাক্তার: সে ত আপনার দেখবার কথা নয়, সেটা তাঁর নিজের ব্যাপার। ধরুন, কেউ যদি আপনার নিজের চুলগুলো কেটে দেয়, তবে আপনার কেমন লাগবে? আচ্ছা, আপনার কি নিজেকে একটু স্বার্থপর বলে মনে হয় না?

প্রেতাত্মা: জানি না। আপনি যে বললেন আমি মরে গেছি, কিন্তু যদি মরেই গেছি, তা'হলে আমি স্বর্গে বা নরকে কোথাও গেলাম না কেন?

ডাক্তার: স্বর্গ বা নরক বলে কোন কিছু নেই।

প্রেতাত্মা: ঈশ্বর বা শয়তান কই কাকেও ত দেখলাম না। তবু আপনি বলবেন যে আমি মরে গেছি।

ডাক্তার: আপনি ত মরে যান নি।

প্রেতাত্মা: একটু আগেই ত আপনি তাই বললেন।

ডাক্তার: জড়-জগতের কাছে আপনি মৃত, (You are dead to the world) কারণ, আপনি আপনার জড়-দেহটাকেই শুধু হারিয়েছেন।

প্রেতাত্মা: অতশত জানি না। আপনিই ত বললেন যে আমি নাকি মারা গেছি।

ডাক্তার: দেখুন, যদি সব ব্যাপারটা ধৈর্য সহকারে উপলব্ধি করতে চেষ্টা না করেন, তা'হলে আমরা আপনাকে 'ইলেকট্রিক শক্' দিতে বাধ্য হব।

প্রেতাত্মা: দেখুন ওসব আমি পছন্দ করি না, আমার সর্বাঙ্গ জ্বালা করে। এসব দিয়ে আপনার কি লাভ? আমি যদি ওখানে (স্ত্রীলোকটির সহিত) থাকি তাতে আপনার কি ক্ষতিবৃদ্ধি? কেন আমাকে তাড়াতে চাইছেন বলুন ত? স্ত্রীলোকটির দেহ থেকে আমাকে মুক্ত করবার আপনার কোন অধিকার নেই (You have no right to get me a way from her)।

ডাক্তার: আপনি ওই স্ত্রীলোকটির উপর ভর ক'রে তাকে কষ্ট দেওয়া সঙ্গত কাজ বলে মনে করেন?

প্রেতাত্মা: কিন্তু মানুষের থাকবার একটা স্থান, একটা অবলম্বন চাইত!

ডাক্তার: যদি আপনার মা'র উপর কোন স্বার্থপর, দুষ্ট আত্মার আবির্ভাব হয় এবং তার প্রভাবে আপনার মা যদি উন্মাদিনীর মত ব্যবহার করেন, তা' হলে কি আপনি সেটাকে ভাল কাজ বলে সমর্থন করবেন?

প্রেতাত্মা: আমি পাগল নই, ওই স্ত্রীলোকটিকেও পাগল করি নি।

ডাক্তার: নিজের চুল চেঁচেপুঁচে কেটে ফেলে, ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে যাওয়া পাগলামি নয়?

প্রেতাত্মা: আপনি যদি পুরুষ হতেন তাহলে মাথায় বড় বড় চুল গজালে আপনার কেমন লাগত?

ডাক্তার: ওই দেহটি এবং কেশরাশি আপনার নয়, ওটা হচ্ছে ওই মহিলাটির। আপনাকে এখন ওই মহিলা-টির দেহ থেকে তাড়ান হয়েছে, এখন আপনার মতি পরি-বর্তন হওয়া উচিত। শুনুন, আমার স্ত্রী একজন মিডিয়াম। তিনি মূঢ় ও অজ্ঞ প্রেতাত্মাদের আত্ম-উপলব্ধির জন্য তাঁর দেহের উপর তাদের আশ্রয় গ্রহণ করান—যেমন এখন আপনি করেছেন। আপনার এই সুবিধাটুকু গ্রহণ ক'রে আত্ম-উপলব্ধির চেষ্টা করা উচিত। প্রেতলোকের অনেক উন্নত আত্মিকেরা এখানে রয়েছেন, আপনি আগ্রহান্বিত হলেই তাঁরা আপনাকে পরলোকে নিয়ে যাবেন। আপনার এখন সব বিষয়টা উপলব্ধি করবার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত।

প্রেতাত্মা: আমাকে কি করতে হবে?

ডাক্তার : পরলোক (Spirit-world) অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হোন এবং সেখানে উপনীত হবার চেষ্টা করুন।

প্রেতাত্মা : পরলোক! মানে স্বর্গ এই কথা বলছেন ত? (You mean 'Heaven')

ডাক্তার : মানুষের মনের মধ্যেই স্বর্গ-রাজ্য।

প্রেতাত্মা : প্রভু যীশু আপনার পাপের জন্যই প্রাণদান করেছিলেন, একথা কি আপনি বিশ্বাস করেন না? (Don't you believe that Christ died for your Sins ?)

ডাক্তার : এই বিশ্বাসের মধ্যে একটা কিছুর অভাব আছে বলে আপনার মনে হয় না? প্রভু যীশু আমাদের জীবনকে উপলব্ধি করবার উপদেশ দিয়ে গেছেন—কারও পাপের জন্য তিনি প্রাণদান করেন নি (He did not die for the Sins of any one)। যারা একথা অন্ধভা ব বিশ্বাস করে, তারা প্রভু যীশুর শিক্ষার মর্মগ্রহণ করতে পারে নি। এ-রকম ধারণা ঈশ্বরোপলব্ধির পক্ষে ক্ষতিকর।

যাই হোক, বন্ধু এখন আপনি আমার স্ত্রীকে ত্যাগ করুন। সেই মহিলাটিকেও আপনাকে ত্যাগ করতে হবে। যদি না করেন, তা'হলে আপনাকে অন্ধকারে রেখে দিতে আমরা বাধ্য হব।

প্রেতাত্মা : ঈশ্বর তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী আমার প্রতি ব্যবহার করবেন, এইটাই কি সঙ্গত নয়? আমি ...র্চ যেতাম, সেখানে প্রচুর অর্থ সাহায্য করতাম এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম। তারা বলত (সম্ভবতঃ ধর্মযাজকেরা) যে অর্থ সাহায্য না করলে, আমি মৃত্যুর পর স্বর্গে যেতে পারব না, নরকেই পচে মরব।

ডাক্তার : প্রভু যীশু কি বলেছেন? তিনি বলেছেন, 'God is spirit and they that worship him, must worship him in spirit and truth'. স্বর্গ, স্বর্গ বলে চীৎকার করছেন, আসলে স্বর্গটা কি? স্বর্গ হচ্ছে আপনার উন্নত মনের উচ্চ অনুভূতিময় অবস্থা।

প্রেতাত্মা : কেন স্বর্গ কি একটা মনোরম স্থান নয়! কেন বাইবেলে লেখা আছে যে, স্বর্গের সকল পথই সোনা দিয়ে মোড়া।

ডাক্তার : জীবনের বৃহৎ সত্যের অনেক প্রতীকময় আখ্যান বাইবেলে আছে।

প্রেতাত্মা : একটু আগে আপনি বলেছেন যে প্রভু যীশু আমাদের পাপের জন্য প্রাণদান করেন নি। তা'হলে আপনি কি বিশ্বাস করেন?

ডাক্তার : জড়-জগতের আমরা সবাই জড়-দেহধারী অমর আত্মা। পরিপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে যখন আমরা জড়-দেহ ত্যাগ করি, তখন আমাদের আর অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে হয় না—আমাদের আত্ম-দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়, উন্নত আত্মিকদের সাহায্যে তখন আমরা পরলোকে প্রবেশ করি। আপনারও এমন কয়েকজন বন্ধুরা এখানে নিশ্চয়ই আছেন। আচ্ছা, আপনার কোন পরিবর্তন হয়েছে, এটা আপনি এখনও কি উপলব্ধি করতে পারছেন না?

প্রেতাত্মা : আগেকার চেয়ে এখন আমি অনেক বেশী কথা বলতে পাচ্ছি। আপনি বললেন না যে আমি আপনার স্ত্রীর মধ্য দিয়ে কথা কইছি, কিন্তু এটা কি ক'রে সম্ভব? আপনার স্ত্রীর মধ্য দিয়ে আমি কি ক'রে কথা বলতে পারি?

ডাক্তার : আমার স্ত্রী একজন মিডিয়াম—তাঁর মধ্য দিয়ে প্রেতাত্মারা কথা বলতে পারে। উন্নত ও বিচক্ষণ আত্মিকেরা আপনার সাহায্যের জন্যই আপনাকে এখানে এনেছেন ও আমার স্ত্রীর উপর ভর করিয়েছেন।

প্রেতাত্মা : আমার এবার বেশ চমৎকার লাগছে, সব কিছুই কেমন যেন ভাল লাগছে।

ডাক্তার : পরলোকের মাধুর্যমণ্ডিত অবস্থার উপলব্ধি হ'লে, আরও আনন্দ অনুভব করবেন। আপনার নামটি কি, এবার বলুন।

প্রেতাত্মা : এডওয়ার্ড।

ডাক্তার : এডওয়ার্ড কি?

প্রেতাত্মা : জানি না।

ডাক্তার : কোথায় আপনি বাস করতেন? আপনি এখন কালিফোর্নিয়ার লস্ এঞ্জেলসে তা' জানেন কি? এটা কোন সাল বলতে পারেন?

প্রেতাত্মা : বলতে পাচ্ছি না।

ডাক্তার : কেন বলতে পাচ্ছেন না?

প্রেতাত্মা : আমার স্মরণ-শক্তি নেই। আমি চিন্তা করতে পাচ্ছি না।

ডাক্তার: এর কারণ কি জানেন? এর কারণ হচ্ছে যে আপনি বহুদিন অন্ধকারে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং তারপর ওই মহিলাটির দেহালোক (Aura) দেখে তাতে জড়িয়ে থেকে মহিলাটির উপর আশ্রয় করেছেন।

প্রেতাত্মা: আমি সুন্দর, শান্তিময় একটি আশ্রয় চেয়েছিলাম।

ডাক্তার: যে কাজ আপনি করেছেন সেটা কি ভাল কাজ?

প্রেতাত্মা: অন্ধকারে ঘুরতে ঘুরতে যদি আপনি আলো দেখতে পান, তা'হলে কি সেখানে আপনার থাকতে ইচ্ছা করে না?

ডাক্তার: ওই আলো কিন্তু প্রকৃত আলো নয়। প্রকৃত আলো হচ্ছে জ্ঞানের আলো—পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞানের আলোই আপনার প্রয়োজন, বুঝলেন।

প্রেতাত্মা: তা'হলে কি আপনি বলেন যে আমি পুনরায় চার্চে গিয়ে বাইবেল পাঠ এবং ভজনা শুরু করব।

ডাক্তার: বাইবেল রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে কোনদিন কিছু জানবার চেষ্টা করেছেন কি?

প্রেতাত্মা: 'বাইবেল' ঈশ্বরের প্রেরণায় লিখিত পুস্তক (It was God's inspired book)।

ডাক্তার: ঈশ্বর বাইবেল রচনা করেন নি, মানুষই বাইবেল রচনা করেছে (God did not write the Bible, the book is man-made)।

প্রেতাত্মা: বাইবেলের রচয়িতা কে?

ডাক্তার: কাল্পনিক স্বর্গ ও নরকের আতঙ্কের মধ্যে মানুষকে বন্দী ক'রে রাখবার জন্য বাইবেল যুগে যুগে বিভিন্ন সূত্রে গ্রথিত ক'রে রচিত হয়েছে—বাইবেল ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, রূপক এবং সত্য ও বৈপরীত্যের (Of contradictions and truths) চয়নিকা।

কিন্তু মানুষ বিশ্বাস করে যে বাইবেলের প্রতিটি কথা ঈশ্বরের নিজের মুখের কথা এবং সেই কারণেই অন্তর্নিহিত অর্থ অপেক্ষা শব্দার্থের উপর আস্থা স্থাপন করবার প্রবৃত্তি মানুষের খুবই প্রবল—এর ফলেই প্রকৃত সত্য-উপলব্ধি হয় না।

ধর্ম মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান, মানসিক ঊর্ধ্বমুখীতার মধ্যে, সত্যোপলব্ধির মধ্যেই ধর্মার্থের সার্থকতা। প্রভু যীশুর উপদেশের মধ্যে সেই বৃহৎ-সত্যের বাণীই নিহিত, কিন্তু চার্চে প্রভু যীশুর উপদেশের মধ্যে রূপকগুলিকেই ঐতিহাসিক ও বাস্তব বলে শিক্ষা দেওয়া হয় ও তার ফলেই উপদেশের আধ্যাত্মিক মর্মবাণী অপেক্ষা, অন্ধবিশ্বাস ও ধারণাই লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করে।

প্রেতাত্মা: ঈশ্বর ছ' দিনে এই পৃথিবী তৈরী ক'রে সাত দিনের দিন বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন, একথা কি আপনি বিশ্বাস করেন না?

ডাক্তার: না, ওটা হচ্ছে রূপক-কাহিনী। সাত দিন হচ্ছে প্রকৃতির সাতটি গুণের প্রতীক। ঈশ্বর স্বয়ং স্রষ্টা ও সৃষ্টি দুইই—(God is at once the creator and creation), ঈশ্বর যদি বিশ্রাম গ্রহণ করেন, তা'হলে ত তাঁর সৃষ্টিই স্তব্ধ হয়ে যাবে। জীবনকে প্রকৃত সত্যের আলোয় আমাদের চেনা ও জানা দরকার—কোন বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নয়।

যাই হোক, অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, আপনি আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবেন না। দেখুন ত আপনার পরিচিত কেউ এসেছেন কিনা?

প্রেতাত্মা: আমার মা'কে দেখছি। আমার মা বহুকাল আগে মারা গেছেন, যখন আমি নিতান্তই ছেলেমানুষ।

ডাক্তার: উনি আপনাকে সাহায্য করবেন—ওঁর কথা শুনুন।

প্রেতাত্মা: মা, তুমি আমাকে নিয়ে যাবে? সত্যিই নিয়ে যাবে? তাই ভাল মা, আমায় নিয়ে চল—আমি বড় ক্লান্ত, বড় শ্রান্ত।

ডাক্তার: উনি নিশ্চয়ই আপনাকে নিয়ে যাবেন, কিন্তু আপনাকে আপনার সব তথাকথিত অন্ধধারণা ও বিশ্বাসগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হবে, বুঝলেন।

প্রেতাত্মা: (উঠে পড়ে) আমাকে যেতে দিন (Let me go)।

ডাক্তার: আপনি আপনার মা'র সঙ্গে যাচ্ছেন এই চিন্তা করতে হবে। এই দেহ আমার স্ত্রীর, এই দেহকে আপনি নিয়ে যেতে পারেন না। আপনি ভাবতে থাকুন যে মার সঙ্গে চলে যাচ্ছেন, তা'হলেই মা'র সঙ্গে যেতে পারবেন।

প্রেতাত্মা : আমি বড় শ্রান্ত, বড় অবসন্ন। আমি মা'র সঙ্গে চলে যেতে চাই। ওই যে মা আবার আসছেন, একটু আগে উনি এখান থেকে কিছুক্ষণের জন্য চলে গিয়েছিলেন।

ডাক্তার : যান মা'র সঙ্গে চলে যান। ঈশ্বর আপনাকে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়েছেন, সেই বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণায় আপনি বিবেচক ও চিন্তাশীল হবেন—মা ও অপরের প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ করবেন, বুঝলেন!

প্রেতাত্মা : মা বলছেন যে আপনার কাছে প্রথমে খুব রূঢ় ব্যবহার করবার জন্য, আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। সেই স্ত্রীলোকটিকে যন্ত্রণা দেবার জন্য, মা আমাকে তাঁর কাছেও ক্ষমা চাইতে বলছেন।

ডাক্তার : আচ্ছা কোথা থেকে আপনি এসেছেন, তা' আপনার স্মরণে আছে কি?

প্রেতাত্মা : ঠিক মনে করতে পারছি না।

ডাক্তার : এটা কোন সাল ব'লে আপনার মনে হয়?

প্রেতাত্মা : বোধহয় ১৯০১ সাল।

ডাক্তার : উনিশ বছর আগে ওই সাল ছিল। আচ্ছা এখন প্রেসিডেন্ট কে?

প্রেতাত্মা : ম্যাকিন্‌লি (Mckinley)।

ডাক্তার : তিনি ১৯০১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর গুলিবিদ্ধ হ'ন এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর মারা যান। এখন ১৯২০ সাল।

প্রেতাত্মা : তা'হলে এতদিন ধরে আমি কি করছিলাম? ঘুমাচ্ছিলাম নাকি? ১৯০১ সালের শীতকালে আমার খুব অসুখ হয়—তারপর কিছু আর আমার মনে পড়ছে না। খৃষ্টমাসের কাছাকাছি সময়ে আমার খুব ঠাণ্ডা লেগে ভয়ানক অসুখ হয়, এটা আমার বেশ মনে আছে।

ডাক্তার : আপনার অসুখের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

প্রেতাত্মা : আমি বনে কাজ করছিলাম। আমি লুম্বারিং নগরে বাস করতাম। আমার মনে আছে মাথায় কিসের যেন ঘা পড়েছিল—ব্যাস আর কিছু মনে নেই। আমার মা বলছেন যে আমার নাম ষ্টারলিং।

ডাক্তার : লুম্বারিং-এ আসবার আগে কোথায় ছিলেন, আপনার মাকে জিজ্ঞাসা করুন না।

প্রেতাত্মা : মা বলছেন যে, আমি 'আইওয়া' (Iowa)-তে জন্মগ্রহণ করি। যখন আমি আঘাত পাই, তখন আমি উত্তর উইক্‌কনসিনের বনে কাজ করছিলাম—আমি 'Iowa'-তেই প্রায় থাকতাম।

ডাক্তার : বন্ধু, জীবনের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করুন, জনসেবার কার্যে আত্মনিয়োগ করুন—ধ্বংসের কাজে নয়। আপনি যে স্ত্রীলোকটিকে কষ্ট দিচ্ছিলেন, তিনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেন নি।

প্রেতাত্মা : আমি একাই তাকে কষ্ট দিই নি। আমার মত আরও দু'জন দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তি ছিল।

ডাক্তার : জীবন-চেতনা লাভ ক'রে স্ত্রীলোকটি যাতে অপর দু'জন দুষ্ট আত্মিকের কবল থেকে মুক্ত হতে পারেন, সে চেষ্টা নিশ্চয়ই করবেন, বুঝলেন!

প্রেতাত্মা : চেষ্টা করব। ধন্যবাদ! বিদায়!

———

অমর মুহূর্ত

(গল্প)

সুকুমার রায়

বসিরহাট রেলষ্টেশনে গাড়ীটা থামতে তাতে উঠে পড়ল প্রদীপ ওরফে পানু। প্রদীপ নাম হলেও পানু বলে ডাকে সকলে। কোণের দিকে খালি একটা সিট্ পেয়ে বসে পড়ল। সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক। দামী টেরিলিনের জামাটা ভিজে উঠেছে ঘামে—স্যুটের কুঞ্চিত স্তর ভেদ ক'রে স্থানে স্থানে ভেসে উঠেছে ঘামের বিন্দু। রামধনু রঙের রঙীন চশমাটা খুলে সেন্টেড রুমাল দিয়ে মুখটা মুছবার সময় কমপার্টমেণ্টটা ভাল করে দেখে নিল সে। ও ছাড়া আরও চারজন এই কমপার্টমেণ্টে—এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, তার স্ত্রী, তার ছোট্ট শিশুপুত্র কেবলমাত্র হাঁটতে শিখেছে আর তন্বী কান্তি, সুশ্রী সুরূপা ষোড়শী কন্যা।

রঙীন চশমাটা পরে নিয়ে বাইরের দিকে তাকাল পানু। যৌবন আকর্ষণ করে রূপকে—রূপ প্রকাশ পায় যৌবনে। আর এই দুটোই হল প্রেমের ধারক—আর এরই অগ্নিঝরা রোমাঞ্চ প্রভাব একই যৌবনের দুটো পৃথক সত্তাকে এক করে মিলনের স্বর্গীয় সুধায়।

সবাই বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। দৃষ্টি ছিল তাদের পরিবর্তনশীল সৌন্দর্য সম্ভোগের দিকে—মন ওদের উপ-ভোগের দিকে। ভেতরের দিকে তাকাল পানু—কিন্তু শিউরে উঠল ভেতরের দৃশ্য দেখে। বাচ্চা ছেলেটা দরজার একটা হাতল ধরে ঝুলে পড়েছে বাইরে—একি! হাত ফসকে গেলেই পড়ে যাবে ছেলেটি আর সঙ্গে সঙ্গে নির্ঘাত মৃত্যু। পানু চিৎকার করে ছুটে গেল ছেলেটির দিকে—'একি আপনাদের কোন লক্ষ্য নেই, ছেলেটি প'ড়ে গেল যে।'

সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে সমস্বরে আর্ত চিৎকার করে উঠল বাবা-মা, 'বাঁচাও বাবা বাঁচাও'!

ছুটে গিয়ে পানু যেইমাত্র ধরেছে তখনি ছেলেটি হাত ফসকে পড়ে যাচ্ছিল, অতি কষ্টে পানু ধরে ফেলল ছেলেটিকে।

ছেলেটিকে ধরে পানু উঠে দাঁড়াল, আর সঙ্গে সঙ্গে ওর

থাকলে যে কি হত বাবা,—তোমার শত শত বৎসর পরমায়ু হোক'!

—আপনারা খোকাকে বাঁচানো দেখছেন, এদিকে বেচারী ভয়ে কাঁদতেও পারছে না—পানু খোকনকে ওর মায়ের দিকে ধরে বলে।

মা ছেলেকে বুকে চেপে ধরেন।—আমার সোনা, আমার মানিক, উনি যদি না থাকতেন, তবে কি তোমাকে পেতাম! চোখ জলে ভরে এল তাঁর।

বাবা বললেন—বোস বাবা বোস, তুমি যা উপকার করলে তা কি বলব তোমাকে। তুমি বললাম—কিছু মনে করো না বাবা, তুমি ত আমার সন্তানের মত।

তা ঠিক; তা ছাড়া আপনি বৃদ্ধ, আমি যুবক—বয়সে কি বিরাট পার্থক্য।

একি! মেয়েটি পানুর একেবারে কাছে কখন এসে দাঁড়িয়েছে পানু জানতেই পারেনি—মেয়েটির কথায় ও ফিরে তাকাল।—একি আপনার হাত কেটে রক্ত বেরুচ্ছে যে,—পানুকে দেখবার সুযোগ না দিয়ে ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল। সর্বনাশ, রক্তে যে ভেসে যাচ্ছে।

—দেখছিস কি, রুমালটা দিয়ে হাতটা বেঁধে দে'না—বাবা বললেন চঞ্চল ভাবে।

পানু হাসতে হাসতে বলে—এর জন্যে আপনারা ব্যস্ত হবেন না, এত সামান্য কেটে গিয়েছে।

—থামুন আপনি—মেয়েটি ধমক দিয়ে বলে—কতোটা কেটে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে আর বলে কিনা ব্যস্ত হবেন না!

—যাঃ বাবা, ভাল—পানু মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে হাসে।

—আবার হাসি আসছে, একটু ব্যথা নেই গায়ে—আঃ হাতটা লম্বা করুন বেঁধে দি—পানুর হাত ধরে টান দিল মেয়েটি।

—না-না, আপনার দামী রুমালটা রক্তে লাগিয়ে নষ্ট

—যে মহৎ কাজ করতে গিয়ে আপনার হাত কেটে গিয়েছে তার প্রতিদানে এই সামান্য রুমালটাকে ব্যবহার করতে নিষেধ করবেন না। আর আপনার মহৎ কাজের মহত্বকে আর এই অমূল্য মুহূর্তকে চিরদিন প্রত্যক্ষ ভাবে মনে রাখতে আপনার পবিত্র রক্তে রুমালটা রাঙিয়ে নিচ্ছি। জানেন এই রক্তপাতের বিনিময়ে একটা বৃহৎ পরিবারকে রক্তপাতের হাত থেকে বাঁচালেন আপনি। আমাদের বংশের একমাত্র ছেলে ঐটি। ও যদি মারা যেত তবে এই পরিবারকে কেউ বাঁচাতে পারত না। নিজের রুমাল দিয়ে পানুর হাতটা বাঁধতে বাঁধতে মেয়েটি বলল।

পানু পাশের দিকে তাকাল। দেখল, মেয়েটির বাবা উঠে অন্যদিকে চলে গেছেন।

—বাবা আসছেন—বলেই মেয়েটা অন্যদিকে চলে গেল।

মালতিপুর ষ্টেশনে গাড়ী থামল। পানু উঠে দাঁড়াল।

—আমি এবার নামব।

—না-না—বাবা ছুটে আসলেন।—তা হয় না, আমাদের বাড়ীতে তোমাকে যেতে হবে।

—কিন্তু—পানু মেয়েটির দিকে তাকাল। কেমন যেন ওর ছলছল আঁখি আর অধর প্রান্তে বিদায়ী সূর্যের রক্তিমাভা। চলে যাওয়ার মত দৃঢ় মনোবৃত্তি ওর নষ্ট হয়ে গেল। তবুও পানু বলল একটু থেমে—কিন্তু ওদের যে ষ্টেশনে আসবার কথা ছিল।

—না পেলে চলে যাবে—মেয়েটি নিস্পৃহ হয়ে বলল।

—কিন্তু—মাথা চুলকে পানু বলে—না, ও ভাল দেখাবে না, ভদ্রতা-বিরুদ্ধ হয়ে যাবে।

—বেশ বুঝলাম। তবে একজনের অনুরোধ উপেক্ষা করে চলে যাওয়া কি ভদ্রতা-বিরুদ্ধ নয়! মেয়েটি ট্রেনের মেঝেতে পা ঘষতে ঘষতে বলে।

—তাত বটে, কিন্তু এ যে উভয় সংকট। একদিকে ভদ্রতা রক্ষা করতে গেলে অন্যদিকে ভদ্রতা নষ্ট হয়।

—এক্ষেত্রে যদি আপনার আত্মীয়দের ভদ্রতা না রেখে আমাদের ভদ্রতাটা রাখেন তবে কি আপনার খুব অসুবিধা হবে। আর যদি আমি না যেতে দি! আপনি এত বড় উপকার করলেন তার প্রতিদান এবং আমাদের কর্তব্য খাতিরে এখানে আপনাকে নামতে দেব না।—দৃঢ়কণ্ঠে মেয়েটি বলে পানুর মুখের দিকে তাকাল উত্তরের প্রতীক্ষায়।

পানু নীরবে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

মামার বাড়ীতে পানুর আর যাওয়া হল না। ওদের সঙ্গে যেতে হলে ওকে। পথে যেতে যেতে বৃদ্ধ বললেন—এতক্ষণ ত নানা কথা হল, কিন্তু তোমার পরিচয় কিছু ত পেলাম না বাবা—

—আমার পরিচয়—আড়চোখে পানু মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটি পানুর উত্তর শুনবার জন্যে আগ্রহী হয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিল। ভ্রমর-কৃষ্ণ চারি চোখে তৃষ্ণার ছায়া পড়ে—মৃদু হাসিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় ওরা। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে পানু বলে—আমার নাম প্রদীপকুমার সিংহ রায়, কিন্তু বন্ধুরা পানু বলে ডাকে। জাতিতে আমরা ব্রাহ্মণ। ওর এই কথার সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মা-মেয়ে চোখে চোখে তাকালেন। পানু ওদের এই পরিবর্তনে কিছু মনে না করে বলে—বাড়ী আমার মেরুদণ্ডী গ্রামে বসিরহাটের উত্তর দিকে।

বৃদ্ধ বললেন—ঐদিকে যাইনি বটে তবে ঐ গ্রামের নাম শুনেছি। ভীমপণ্ডিত মশাইয়ের বাড়ী ত ওখানে। বড় ভাল লোক উনি।

বৃদ্ধের বাড়ী চাঁপাপুকুর। চাঁপাপুকুর ষ্টেশন থেকে বেশী দূরে নয়। একটু পরে ওরা পৌঁছে গেল বাড়ীতে। পাকা দোতলা বাড়ী। উঠানের পাশে দুটো ধানের গোলা। তার পাশ দিয়ে সরু রাস্তা অন্দরের দিকে চলে গেছে। বৃদ্ধ বললেন মেয়েকে উদ্দেশ্য করে—আমরা ভেতরের দিকে যাচ্ছি, তুই বাবুকে বসতে দে। দেখিস কোন অসুবিধা না হয় যেন—বলে মা-বাবা চলে গেলেন।

—আসুন—বলে মেয়েটি ভেতরের দিকে পা বাড়াল।

পানু ওকে অনুসরণ করে বলে—বাঃ সুন্দর বাড়ী ত। আমি একটু আরাম-প্রিয়। একটু সুখ পেলে এমন বসা বসব যে ওঠায় কার সাধ্য!

—সে সৌভাগ্য কি আমাদের হবে! ভাল করে যদি জানেন, তবে যেটুকু বসবেন তার জন্যে আপনি অনুতপ্ত হবেন।

—তার মানে?

—আমরা মুসলমান।

—হুঁ মুসলমান।

—হ্যাঁ, দাঁড়ালেন কেন?

ওহো শব্দ করে হেসে উঠল। মুসলমান সেজন্য কি হয়েছে!

—প্রদীপবাবু!

—বলুন।

—আমরা মুসলমান জেনেও আমাদের বাড়ীতে থেকে আমাদের হাতে খেলে আপনার জাত যাবে না!

—জাতটা হাতের খেলা নয় ম্যাডাম, আর মাটির পাত্রও নয় যে ইচ্ছামত ব্যবহার আর নষ্ট করা যায়। যে জাত এত তাড়াতাড়ি আর সহজে যায় সেটা কবির ভাষায় জাতের নামে বজ্জাতি। আমরা শিক্ষিত, অথচ শিক্ষা যদি এই উদারতাটুকু না দেখায় তবে আমরা শিক্ষিত কিসে! এই জাত বিচার দেশের ঐক্যের পথে বড় বাধা, বুঝলেন!

—প্রদীপবাবু, সত্যি আপনি জাত মানেন না দেখছি।

—না।

—বেশ আমি দেখবো। আপনি বসুন ড্রেসগুলো ছাড়ুন—কাপড় গামছা তেল রইল। পাশের টিউবওয়েল থেকে স্নান করে ঠাণ্ডা হোন। এখন গরম মাথায় অনেক কিছু বলছেন। তখন বুঝতে পারবেন জাত ছাড়া বাংলা দেশের লোকগুলো বাঁচতে পারে না। আমি আসি প্রদীপবাবু।

—আসি মানে—

—বাঃ ড্রেসগুলো ছাড়তে হবে না!

—ও, তাই বলুন—তেল বিহীন প্রদীপ অচল, বুঝলেন? তাড়াতাড়ি আসবেন।

—আবার ভেজাল তেলেও কিন্তু প্রদীপ অচল।

কিছুক্ষণ পরে—

পানু স্নান করে এসে মাথা আঁচড়াচ্ছিল। এমন সময় মেয়েটি এসে ঢুকল।

—প্রদীপ জ্বলছে ত।

—এইবার জ্বলতে শুরু করল।

—ভাল। আসুন আপনার জলখাবার প্রস্তুত।

—সময়টা কত—একটু থেমে পানু বলে, আচ্ছা চলুন পেটে এখন আগুন জ্বলছে।

মেয়েটি পানুর কাছ থেকে একটু দূরে বসেছে। হ্যারিকেনের আলো পড়ে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল মেয়েটিকে। মেয়েদের এ রূপ ইতিপূর্বে পানু দেখেনি।

পানু খেতে খেতে বলে—আপনার পরিচয় কিন্তু এখনও পাইনি, বিশেষ করে আপনার নাম।

—ও, আমার নাম—ফতিমা।

—না আপনার ও রূপের সঙ্গে ফতিমা নাম খাটে না। আপনি যদি মমতাজ হতেন, তবে আমার সাজাহান হতে দ্বিধা ছিল না।

—না প্রদীপবাবু, আপনার সাজাহান হওয়ার দরকার নেই; আমি বরং আলো হই।

—অর্থাৎ—

—আপনি প্রদীপ—আমি তার আলো।

—তা মন্দ হয় না মমতাজ দেবী।

—মমতাজের সঙ্গে দেবী খাটে না বিবি খাটে। আমি আলো হলে আপনার আর ও ভুল হবে না।

—দেখুন, আপনার ইচ্ছা। তবে এত খাবার এনেছেন, আমি ত খেতে পারব না মমতাজ দেবী।

—আবার সেই ভুল করলেন। তার চেয়ে আলো দেবী বলুন—তাতে আমার কথাটা থাকবে আর আপনিও ভুলের হাত থেকে রক্ষা পাবেন। তাছাড়া আপনার মমতাজ নাম বজায় করতে গেলে দুটোকেই পরিবর্তন করতে হবে, সেটাও বিশ্রী।

—তাই হোক। সাজাহান হলে রাজাও হতে পারব না আর স্মৃতিসৌধ ত গড়তেই পারব না—সে একটা আরও বিশ্রী ব্যাপার হয়ে যাবে।

খাওয়া শেষে এঁটো পরিষ্কার করতে করতে ফতিমা বলে—আপনার খাটের পাশে আলমারিতে অনেক বই আছে, শুয়ে শুয়ে পড়ুন এবার।

—মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে—ও ভাল লাগবে না। আর তা' ছাড়া নীরস বস্তু থেকে রস বার করতে গেলে সময় লাগবে আর তাতে মানসিক অবস্থাও স্থিতিশীল হওয়া চাই।

—মনটা বড় চঞ্চল নাকি?

—হ্যাঁ, মমতাজের রূপ আর আলোর তাপ মনকে পাগল করেছে।

—আলোকে প্রদীপ বুকে ধরলে অমন মনে করে। কিন্তু যতক্ষণ আলো প্রদীপে না থাকে প্রদীপটা শূন্য বোধ করে। আবার আলো প্রদীপ বুকে ধরলেও বেশীক্ষণ রাখতে পারে

না—কারণ আলোর ত একটা তেজ আছে।

পাত্রগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল ফতিমা।

একটু বাদে রেডিওটা নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল—শুনুন এটা। আলো যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালে, পান্নু ডাকল—শুনুন।

—বলুন, কিন্তু আমার পূর্বের কথা সমালোচনা করে কিছু বলবেন না যেন।

—তা বলব না, তবে Don't mind, একটা কথা বলছি। আমি নেশাখোর মানুষ, Smoke করি। কিন্তু পকেট যে গড়ের মাঠ—এখন উপায়!

—ওজেন্স সম্মানিত অতিথিকে ভাবতে হবে না, খাটের ওপরে দেখুন—

—Good luck, আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব আলো দেবী—বলতে বলতে খাটের কাছে এসে দাঁড়াল পান্নু।—একি Number Ten,—আবার দু প্যাকেট! আচ্ছা, কি করে জানলেন যে আমি Number Ten খাই!

—ষ্টেশনে আপনাকে এই সিগারেট খেতে দেখেছি। জানেন প্রদীপবাবু, ষ্টেশনে এত লোকের ভিড়ের মধ্যে আমার দৃষ্টিটা ছুঁয়ে ছিল আপনাকে সর্বক্ষণ। যাক্‌গে চলি এখন, আপনি সিগ্রেট খান আর রেডিও শুনুন।

—বেশ—না হয় বুঝলাম সব, কিন্তু দু প্যাকেট কেন?

—দুই নিয়ে ত জগতের সব কিছু। সিগ্রেট আর এক প্যাকেট দি কি করে—উত্তরের অপেক্ষা না করে আলো চলে গেল।

সিগারেটের ধোঁয়ায় রিং তৈরী করতে করতে আলোর রূপটাকে মনের তরঙ্গায়িত পর্দায় তুলে ধরবার চেষ্টা করে পান্নু। পরিষ্কার টুকটুকে, তন্বী কান্তি মসৃণ পেলব মুখমণ্ডলে বাম গণ্ডের তিলটি যেন নির্মল মেঘমুক্ত আকাশের প্রাঙ্গণ তলে সৌন্দর্যের ইন্ধনবাহী চন্দ্রিমা। হাঁটার তালে তালে যখন দেহটা দোলে, তখন মনে হয় যৌবনের মায়া কাননে ছন্দের প্রবাহ তুলে নাচছে রঙ বাহারী দোলন চাঁপা।

দীর্ঘ পথশ্রান্তে কখন ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। আলোর ডাকে ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

—প্রদীপবাবু, প্রদীপবাবু—পান্নুর মাথায় মৃদু নাড়া দিয়ে বলে—এত সুন্দর গান হচ্ছে আর এর মধ্যে ঘুম আসে—আশ্চর্য!

ঘুম ভেঙ্গে গেল পান্নুর, তবুও চুপ করে পড়ে রইল। কেমন যেন আবেশ লাগছে রূপসীর করস্পর্শে,—ভাল লাগছিল প্রদীপবাবু ডাকটুকু।

—কই উঠুন, কি সুন্দর গান হচ্ছে এর মধ্যেও ঘুম এলো আপনার?

—ঘুম পাড়ানী গান গেয়ে ত আমাকে আপনি ঘুম পাড়িয়ে গেছেন, তবে আর ঘুমের জন্যে কেন অপবাদ দিচ্ছেন!

—ঘুম পাড়ানী গানে অবশ হয়ে গেলে চলবে কেন?

কান পেতে গান শুনে পান্নু বলে—তাইত বেশ সুন্দর গান ত!

—কথাটা কিন্তু আরও সুন্দর।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ, শুনবার চেষ্টা করুন।

—'মিলন তোমার আমার হবে এ বসন্তে'—বাঃ খুব সুন্দর ত!

—শুধুই কি সুন্দর, সত্যি নয়?

—হয়ত সত্যি, কিন্তু এখন ত গ্রীষ্মকাল; আর ওযে 'বসন্ত কাল'!

—ভুল বললেন, প্রদীপবাবু—প্রতিবাদ করে বলে আলো।—মিলনের ক্ষেত্রে যে বসন্ত তা প্রাকৃতিক বসন্তের ভিন্ন রূপ। আচ্ছা, উঠুন আপনার খাবার এসে গেছে।

—এর মধ্যে?

—এর মধ্যে আর কোথায়, রাত কটা বাজে দেখেছেন?

—ছোট কাঁটাটা দশটার ঘরে বটে, কিন্তু আমার মনের বড় কাঁটাটা বারোটার ঘরে এসে নিরন্তর খচখচ করছে।

—রোগের প্রাথমিক সূচনা কিনা তাই অমন মনে হচ্ছে—উঠুন! যুবক ছেলেরা এত অলস কেন—এ কিন্তু ভাল নয় মোটেই।

—তা বটে, কিন্তু এগুলো ত আপনাদের জন্যেই—উঠে বসল পান্নু।

—চলুন না—

—চলুন—

আমি এলেম, ভাঙ্গল তোমার ঘুম,

[illegible]

আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।

খাওয়া শেষ করে পান্থ ঘরে একটা চেয়ারে বসে সিগারেট টানছিল। আলো ওর শোওয়ার জন্তে বিছানা তৈরী করে দিল।

একগাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পান্থ প্রশ্ন করে—আপনার বাবাকে আর দেখলাম না ত ?

—অতিথি সেবা আমি করে থাকি—এ ভার বাবা আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন,—বিশেষ করে আজকের অতিথিটির ভার।

—কেন, কেন ?

মৃদু হাসল মেয়েটি। অনেক কথা বললাম, এবার আপনি ঘুমোন, আমি আসি, বলে আলো চলে গেল।

বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল পান্থ। কিন্তু চোখে ঘুম কোথায় ? যৌবনের পরশ ছুঁয়েছিল ওর মনের প্রান্তে, আর তখনই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল রোমাঞ্চকর প্রেমের রঙিন কল্পনা। কল্পনার রাজ্যে ও প্রেমের স্বপ্ন দেখত আর কেমন যেন মোহ জন্মাত। বহু কাম্য প্রেম আজ ধরা দিয়েছে কিন্তু সার্থকতা আর নতুনের আলো নিয়ে নয়। প্রেম—এ যে বিজাতীয় প্রেম। চিন্তার এলোমেলো ঝঞ্ঝায় ঘুম আসছে না।

রাত অনেক হয়েছে—অন্ধকার রাত্রি। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। অন্ধকার আর নিস্তব্ধতার মধ্যে পৃথিবী যেন বিলীন হয়ে গেছে।

হঠাৎ দরজায় শব্দ হল। পান্থ বিছানার ওপর শুয়ে তাকিয়ে রইল ওদিকে। আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে গেল। ধীরে ধীরে কে একজন এসে দাঁড়াল পান্থর বিছানার কাছে—কে ?

—আমি।

—আলো, তুমি !

—হ্যাঁ—একেবারে প্রদীপের খাটের কাছে মশারী স্পর্শ করে আলো বলে—আমার ঘুম আসছে না প্রদীপবাবু। আপনি আমাকে এমন করে চঞ্চল করে দিলেন কেন বলুন ত !

—তুমি কি আমাকে কম করেছ আলো—আমারও ত ঘুম আসেনি।

—তবে বলুন কাল আপনি চলে যাবেন না।

—তা হয় না আলো।

—কেন হবে না ?

—না, তা হয় না।

—তবে এখনই চলো না।

—কি বলছ তুমি ?

—ঠিকই বলছি। আমার মনে রঙ ধরিয়েছ তুমি। মনে হচ্ছে এ প্রেম আজকের নয়, বহু দিনের। তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না প্রদীপ। তুমি চলে গেলে আর আসবে না। আজ চলো না প্রদীপ, চলো কোথাও আমরা চলে যাই।

—না, তা হয় না। তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু বিয়ে !—না, তা আমি পারব না।

—কেন, কেন পারবে না ? কেন মুসলমান বলে আমি ভালবাসতে পারি না ? প্রেমে জাত নেই, ধর্ম নেই, সম্পর্ক নেই। প্রেম, প্রেম !—প্রদীপ বল, কথা দাও।

পান্থর বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ল আলো। প্রদীপের বুকে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল আলো—প্রদীপের বুক বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল বিছানার ওপর।

আশ্রয়

(গল্প)

শ্রীনিরঞ্জন সেন

দয়ারাম জবাব দিল রায় কর্তাকে—ওর চাষে আর খাটিবে না দয়ারাম। ঠেলাটা বুঝুক এইবার—এখন চাষ চলছে পুরাদমে—জমিতে জল লেগেছে, তাছাড়া অনেকের চাষ হয়েও গেছে। এখন লোকও পাবে না রায়কর্তা—যদিও পায় তবে অনেক টাকা খরচ করতে হবে, আর খরচকে বড় ভয় পায় রায়কর্তা।

—কি এমন কথা বললাম যার জন্যে তুই জবাব দিলি দয়া—নরম সুরে বলে রায়কর্তা।

—সামান্য কথা—রেগে ওঠে দয়ারাম। এইটা সামান্য কথা—আমার মা নাকি অধর বাউরীর ঘর করেনি!

অধর বাউরী দয়ারামের বাপ!

একবার আড়চোখে তাকায় দয়ারাম রায়কর্তার দিকে। মিষ্টি কথায় কম পয়সায় কার্জ করিয়ে নিতে রায়কর্তার জুড়ি নেই। মিষ্টি কথায় সব ভুলিয়ে দেয়। তবে একটা পশু প্রবৃত্তি ঘুমিয়ে থাকে ওর মনে, সুযোগ পেলেই জাগে—নেশা করে। নিকষ কালো অন্ধকারের মত ওর গায়ের রঙ।

দয়ারামের ঘরে ও যায়—বেলাকুঁড়ির দয়ারাম—এখন ঘন বনের! নয়নমণি দয়ারামের বউ—বিয়ে করা বউ। ঘন বনের নয়নমণি। বেলাকুঁড়ির কাছ দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে—পাথর ছড়ানো দেহটা নিয়ে সর্পিল গতিতে। বেলাকুঁড়ির কাছে ঘন বন।

বন এখন মোটেই নেই—আর ঘনর প্রশ্নই উঠে না। আগে হয়তো ঘন বন ছিল—এখন তাও নেই। গ্রামের মধ্যে কয়েকটা গাছের জটলা। সবুজ সবুজ ভাব। পাখীদের মিষ্টি কাকলি পরিবেশকে করে তোলে স্বপ্নময়।

ঐ দূরে পড়ে আছে অনুর্বর অনেকটা জায়গা—প্রাণ নেই মাটির—চাষের উপযোগী নয়—তাই ওর দিকে চেয়ে চাষীরা স্বপ্ন দেখে না—জলে ওঠে না ওদের সামনে আশার আলো!

এখানের ঘরের অবস্থা সকলের ভাল বললেই হয়, তবুও মেয়ে-পুরুষে কাজ করে—বসে খায় না।

* * * *

নয়নমণি ঘন বনের।

ঘন বনে ঘন সবুজ বন না থাকলেও নয়নমণির রূপ আছে—ঘর আলো করা রূপ।

খালে জল নিতে এসেছে নয়নমণি। গোপীনাথপুরের তাঁতের রঙিন শাড়ীটা জড়িয়ে যৌবন-ভরা দেহতে। নিস্তরঙ্গ খালের জলের ওপর মাটির কলসী রাখে—ঢেউ ওঠে আবার মিলিয়ে যায়—আবার ওঠে।

খালের পাড়ের বটগাছের তলায় বসে বাঁশী বাজাচ্ছে সাধু। বাঁশীর সুর ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে....কেমন মিষ্টি অথচ মন উদাস করা সুর। মনটা যেন কেমন হয়ে যায় নয়নমণির—কুমারী মন। কি যেন পেতে চায় নয়নমণি!

এমন সময় খালের পশ্চিম পাড়ের রাস্তাটা ধরে এসে ঘাটের বকুল গাছটার তলায় দাঁড়াল দয়ারাম। নিটোল স্বাস্থ্যবান দয়ারাম। তাড়াতাড়ি কলসী ভরে উঠে আসে নয়নমণি।

কিসের এক ডাক শুনতে পায় নয়নমণি।—গঙ্গারামের ঘর কুথা—নয়নমণির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে দয়ারাম। অদ্ভুত এক শিহরন অনুভব করে নয়নমণি।

—এস আমার সনে—কি মিষ্টি ডাক! আগে নয়নমণি চলে, পিছে দয়ারাম।

যেতে যেতে দয়ারাম হঠাৎ দাঁড়িয়ে স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে ধরে নয়নমণির ওপর। দাঁড়িয়ে পড়ে নয়নমণিও। গোপীনাথ-পুরের তাঁতের শাড়ীর ভেতর সঙ্গোপনে লুকিয়ে আছে যৌবন—এ-পক্ষের আমন্ত্রণ!

শান্তিময় একটি ছোট্ট ঘরের স্বপ্ন দেখে দয়ারাম। কত তৃপ্তি লুকিয়ে আছে ওর মধ্যে—ওকে কাছে পেতে চায় দয়ারাম। নিবিড় করে! নয়নমণির কপালের ওপর লতিয়ে

পড়েছে কয়েক গাছি চুল। মৃদু বাতাস এসে দোলা দিয়ে যায় ধীরে ধীরে।

তাকিয়ে আছে দয়ারাম মুগ্ধ দৃষ্টিতে। নয়নমণিও দাঁড়িয়ে থাকে কলসী কাঁখে নিয়ে—অনাগত বসন্ত দিনের স্বাগত সম্ভাষণ নয়নমণির চোখের দৃষ্টিতে। শেষে দু'জনেই চলতে শুরু করে।

পায়ে চলা পথটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই নয়নমণিদের ঘর—ঘরের অবস্থা ভালই।

গঙ্গারাম এগিয়ে আসে দয়ারামকে দেখে।

—আরে রাম যে—এস, এস।

দয়ারাম আগে আসেনি গঙ্গারামের ঘরে, আজই প্রথম এলো। গঙ্গারাম অধরের স্যাঙ্গাত ছিল। অধর রানীগঞ্জের কাগজের কলে কাজ করতো। ওখানে কলেরা হয়ে অধর মারা যায়। অধরের ঘরের অবস্থা খুব খারাপ—দিন চলতো না।

অধরের বউ বাপের বাড়ীতে থাকতো। মাঝে মাঝে আসতো—থাকতো দু' একদিন অধরের কাছে, তারপরে চলে যেত। তাই বেলাকুঁড়ির লোকেরা বলে অধরের বউ ঘর করে না, পালিয়ে যায়। ওর কেউ মনের মানুষ আছে! সত্যিই কোন একটা লছনা (উদ্দেশ্য) করে পালাত। অধরের বউ মাঝে মাঝে যেত গঙ্গারামের ঘরে। অনেক কিছু দিত গঙ্গারাম—সাহায্য করতো। তাই নিয়ে বেলাকুঁড়ির লোকেরা কথা বলত। ওদের একঘরে করে রেখেছিল—দয়ারামও একঘরে হয়ে আছে। দয়ারাম মায়ের আর কোন খবর জানে না বাপ মারা যাওয়ার পর থেকে। অবশ্য ইচ্ছা করেই খবর নেয়নি—মা যেন কেমন!

এখন আর বেলাকুঁড়িতে টিকতে পারে না দয়ারাম। ঘরের সব জিনিস পাড়ার বাউরীরা নিয়েছে জোর করেই। সাতপাঁচ কারণে গঙ্গারামের কাছে এসেছে দয়ারাম।

সব শুনে গঙ্গারাম বলে—ভয় কি! আমি আছি। আর তুমি এখানেই থাকবে। আমার তো বেটা নেই—তুমি বেটার মতন থাকবে। আছে কেবল ঐ মেয়ে নয়নমণি—অঙ্গুলি তুলে সঙ্কেত করে গঙ্গারাম দাঁড়িয়ে থাকা নয়নমণিকে। ওর নাম মণি, আমি ডাকি নয়নমণি বলে।

দয়ারাম তাকায় নয়নমণির দিকে—অদ্ভুত! সারা দেহে যৌবনের অপূর্ব শ্রী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নয়নমণি—পূর্ণতার স্বাক্ষর। স্বপ্ন দেখে দয়ারাম—নিটোল কামনা মাখা স্বপ্ন।

হাত-মুখ ধুতে এক ঘটি জল এগিয়ে দেয় নয়নমণি দয়ারামের দিকে।

এখানেই থাকবে দয়ারাম—আশ্রয় মিলল। বলিষ্ঠ আশ্রয়। বেরিয়ে যায় গঙ্গারাম।

এক গ্লাস জল এগিয়ে ধরে নয়নমণি—হাত বাড়িয়ে নেয় দয়ারাম। হাতে হাত লাগে। নিটোল নারী হাতের মিষ্টি অনুভূতি জাগানো স্পর্শ। নয়নমণির হাতের কাচের চুড়ির শব্দ ওঠে—মিষ্টি সুরেলা কামনা-জাগা শব্দ।

—মণি! ছোট্ট অথচ মিষ্টি করে ডাকে দয়ারাম।

—উঁ! হাসে নয়নমণি—মিষ্টি মন ভোলানো হাসি।

—তুমি আর যেও না—অনুরোধ ঝরে পড়ে নয়নমণির কণ্ঠ থেকে। ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে সে।

উঠানে কি একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে—যৌবন-ভরা সবুজ দেহ নিয়ে। ফুল ফুটে আছে তাতে অজস্র।

—এস, খাবে—সহজ ভাবে ডাকে নয়নমণি।

—চল! নয়নমণির হাত ধরে দয়ারাম। প্রতিবাদ করে না ও। আত্ম সমর্পণের পূর্ণ সঙ্কেত নয়নমণির দৃষ্টিতে।

বড় অসহায় আর সরল দয়ারাম—মমতা জাগে মনে—নয়নমণির কুমারী মনে!

পরের দিন নিজের সব জিনিসপত্র নিয়ে বেলাকুঁড়ি থেকে চলে আসে দয়ারাম। জিনিস বলতে এমন কিছু নেই, সব তো পাড়ার বাউরীরা নিয়েছে। আবার বলে দিয়েছে—

তুই যদি এখানে থাকিস তোকে কেটে দেব—তোর মা পালিয়েছে—আমাদেরও সমাজ আছে।

এখন দয়ারামের আশ্রয় স্থায়ী—আর নয়নমণি ওর বাঁচার উৎস। নতুন জীবন শুরু হল দয়ারামের।

রাতে নয়নমণিকে ডেকে বলে দয়ারাম—চল, মণি—চাঁদের আলোয় একটু বসি।

—চল।

নয়নমণির কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকে দয়ারাম।

মণি ওর কপালে হাত রাখে—মাদকতায় ভরা নেশা জাগানো স্পর্শ! কি যেন পেতে চায় মণি আপ করে!

এ-এক প্রেরণাময় আশ্রয়। মণির যৌবনের ত সান্নিধ্যে জেগে ওঠে দয়ারামের তৃষ্ণা—তারপরেই ওরা ঘ আসে।

সুপ্তি মগ্ন ঘন বন।

দিন আসে—যায়—আসে মাস।

ফাল্গুনের চার তারিখে ওদের বিয়ে হয়ে যায়। আ সেই থেকে দয়ারামের আশ্রয় হয় স্থায়ী।

দু'টি জীবন

(গল্প)

সুদত্ত

কালো মেঘ ছেয়ে ফেলেছিল সারা আকাশটাকে। তার উপর আবার পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ চুম্বন। চারিদিকে একটা জমাট আঁধার। এলোমেলো বিছানাটার ওপর অনেক কষ্টে উঠে বসলো সন্তোষ। আলোটা জ্বালা হয়নি। উঠে গিয়ে মোমবাতিটা জ্বালাবার ক্ষমতাটাও ও যেন হারিয়ে ফেলেছে এই ক'দিনের জ্বরে। কী ভীষণ ভোগাটাই না ভুগলো! পার্বতী না থাকলে ও হয়তো মরেই যেত। সে'টাই বোধহয় ভাল ছিল। জীবনে যার শান্তি নেই, দুঃখের দিনে দু'ফোঁটা সমবেদনার জলও যার ফেলার নেই, কি মূল্য তার বেঁচে থাকার? বেঁচে থাকা মানেই স্মৃতির বিশাল বোঝাটা আজীবন ব'য়ে চলা। একলা থাকা। অন্ততঃ তার কাছে তো তাই। পার্বতী ওকে বাঁচিয়ে তুললো। পাশের বাড়িতে থাকে পার্বতী। একা থাকে। এটা ওর বাপের বাড়ি। ওর বাবা হৃদয়নারায়ণ ছিলেন এই মৌশলী গাঁয়ের শেষ জমিদার। বছর তিনেক জমিদারী ভোগ করেছিলেন তিনি। মা'কে হারিয়েছিল পার্বতী অল্প বয়সেই। স্ত্রীর মৃত্যুর পর হৃদয়নারায়ণ আর বিয়ে করেন নি। কোন প্রয়োজন ছিল না বলেই। টাকা থাকলে যৌবনটাকে ভোগ করার জন্য বিয়ে করার প্রয়োজন হয় না। তাই তিনি আর সাত পাকের বন্ধনে নিজেকে বাঁধতে চান নি।

পার্বতী তাই স্ফূর্তিবাজ বাবার সান্নিধ্য পেত না বেশীক্ষণ। বাবার কাছে নিজেও যেত না ইচ্ছে ক'রে। হৃদয়নারায়ণকে ওর কেমন যেন কঠিন মনে হ'ত। মনে হ'ত তিনি বুঝি পাষাণ। বাবার চরিত্রটাকে পার্বতীর বুঝবার বয়স তখনো হয়নি। কতই বা ওর বয়স তখন। বার কি তের হবে। তবু ও ভয় করতো বাবাকে। এড়িয়ে চলতে চাইত।

গোটা দিনটা ঘরের মধ্যেই কাটতো ওর। বিকেল বেলায় একা একা পায়চারি করত বাগানে। কখনো উদাস চোখে চেয়ে থাকত আকাশ-মাটির কোলাকুলির দিকে। ওর কিশোরী মনটা কল্পনার পাখা মেলে উড়ে যেত এক অজানা স্বপ্নরাজ্যে। অনেক কিছু ভাবতো ও। মাঝে মাঝে মায়ের জন্য মন খারাপ করতো। ছুটে আসতো মায়ের ঘরে। খুঁজে পেত না মাকে। বিছানার ওপর ফ্রক পরা কচি দেহটাকে লুটিয়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত অনেকক্ষণ। তারপর ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়তো একসময়। ওকে কেউ সান্ত্বনা দিতে আসতো না। কোলে তুলে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে কেউ আদর ক'রে দুটো মিষ্টি কথা শুনাত না।

এমনি করেই পার্বতী কাটিয়ে দিয়েছিল বেশ কয়েকটা বছর। বোধহয় সারাটা জীবনই কাটিয়ে দিত ও। কিন্তু এবার এলো জীবনের গতি পরিবর্তনের পালা। সবে যৌবনে পা দিয়েছে ও। কিছুদিন থেকে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরতে শুরু করেছে। একদিন বাবা এসে বললেন—"বিকেল বেলায় তোকে আজ দেখতে আসবে পারু, ঠিক হয়ে থাকবি।"

বাবার কথাটা পার্বতী ঠিক বুঝতে পারে নি। দেখতে আসবে! কে? কেন? বুড়ী ঝি ব্যাপারটা পরিষ্কার ক'রে দিল।—"হ্যাঁলো দিদি, তুই কি কিছুই জানিস্ না? মহুয়াপুরের বাবুদের বড় ছেলে প্রবীরশঙ্করের সঙ্গে তোর বিয়ের কথা যে পাকা হ'য়ে গেছে রে। অমন সোনার চাঁদ ছেলে সাতখানা গাঁ খুঁজলে আর একটি মিলবে না। অনেক পাস দিয়েছে। দেখতেও রাজপুত্তুর। অমন ভাতার পাওয়া ভাগ্যের কথা"—রহস্য ক'রে বললো সে।

বিকেল থেকেই সাজাতে বসলো ঝি। ময়ূরকণ্ঠী রঙের একটা শাড়ি পরলো পার্বতী। মায়ের সমস্ত গয়নাগুলো এক এক ক'রে ওর গায়ে উঠলো। সাঁঝের প্রদীপ জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা নাচঘরে নিয়ে গেলেন পার্বতীকে।

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ছেলে প্রবীর। তাই সে নিজে

পাত্রী পছন্দ করে বিয়ে করবে। মেয়ে দেখতে আসতেও কোন দ্বিধা করেনি। ঘরের ভেতর বসেছিল ও। পার্বতীকে সাথে ক'রে হৃদয়নারায়ণ দাঁড়ালেন ওর সামনে। বাবার ইঙ্গিতে প্রবীরের পা ছুঁয়ে আলতো ভাবে ছোট্ট একটা প্রণাম করলো পার্বতী। ওর দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলো প্রবীর। যেন একটা ক্ষুধার্ত পশু প্রতি পলকে ওর সুকোমল দেহটাকে পিষে ফেলতে চাইছে। বড় অসহায় বোধ করল পার্বতী। সঙ্কুচিতা হ'ল। পুরুষের চোখে কামনার আগুন জ্বালিয়ে মেয়েরা পায় আনন্দ। এটা একটা সহজাত নারী-ধর্ম। কিন্তু পার্বতী যে আর পাঁচটা মেয়ের মত নয়। তাই লজ্জা পেল। রাঙা হবার মত লাল হয়ে উঠলো। মন্থর পদক্ষেপে অবজ্ঞার ভঙ্গিতে নাচঘর থেকে বেরিয়ে এলো সে।

তবু প্রবীর ওকে পছন্দ করলো। ওর বিয়ের কথা পাকা হ'য়ে গেল। নহবতখানায় সানাইয়ে কেঁপে কেঁপে বেজে উঠলো বেহাগের তান। আলোর মালা পরলো দু'মহলা বাড়িটা। লাল বেনারসী পরে প্রবীরের গলায় মালা পরালো ও। একটুও উত্তেজনা ছিল না ওর। শুভ-দৃষ্টির সময়ে প্রবীরের মুখের দিকে মাত্র একবার তাকিয়ে-ছিল ও। নিয়ম রক্ষার তাগিদেই—কৌতূহলের বশে নয়। এ বিয়েটাকে ও মনে মনে মেনে নিতে পারে নি। প্রবীরের ওপর ওর মনে প্রথম থেকেই কেমন একটা বিরূপতার ভাব সঞ্চার হয়েছিল। মনে হয়েছিলো প্রবীর ওকে বিয়ে করছে না, বিয়ে করছে ওর দেহটাকে।

ওর ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল কালক্রমে। প্রবীর শিক্ষিত, কিন্তু মার্জিত নয়। চরিত্রের কোন বালাই ওর নেই। ওর মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই, আছে লোভ। তাই প্রবীরকে সহ্য করতে পারতো না ও। তারপর একদিন জানতে পারলো ও, ওকে মাতৃত্বের অধিকার দেবার ক্ষমতা প্রবীরের নেই। সেদিন আর সহ্য করতে পারেনি পার্বতী। বলেছিল—"কোন্ অধিকারে তুমি আমার জীবনটাকে মাটি ক'রে দিলে?" কোন উত্তর না দিয়ে কেবল ক্রুর হাসি হেসেছিল প্রবীর।

পার্বতী ফিরে এলো হৃদয়নারায়ণের কাছে। ও মনে করেছিলো প্রবীর একদিন নিজের ভুল বুঝতে পারবে। আবার ফিরে আসবে ওর কাছে। কিন্তু প্রবীর আসেনি। বছরের পর বছর কেটে গেল। তবু প্রবীরের মনে পড়ে নি পার্বতীকে। পার্বতীও ফিরে যায় নি। যে নারীত্বের চরম অবমাননা করেছে, তার কাছে ফিরে যাবে ও হৃদয়ের ডালি সাজিয়ে? কিছুতেই না। হৃদয়নারায়ণও মহাকালের টেলি-গ্রাম পেয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন একদিন। যাবার বেলায় পার্বতীকে দিয়ে গেলেন অসহ্য নিঃসঙ্গতা, আর কিছু পার্থিব সম্পত্তি। সেই থেকেই পার্বতী একা, একেবারে একা।

পার্বতী নিজেই একদিন কোন এক দুর্বল মুহূর্তে ওর জীবনের করুণ কাহিনীটা প্রকাশ ক'রে ফেলেছিল সন্তোষের কাছে।

—আলোটা জ্বালেন নি কেন?

চিন্তার অশান্ত সাগর থেকে রূঢ় বাস্তবের বালুতটে ফিরে এলো সন্তোষ। একটু লজ্জিত হ'ল। নিরাসক্ত ভাবে উত্তর দিল—এমনি।

আলোটা জ্বেলে দিল পার্বতী। অসংযত আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে সামনে দাঁড়ালো সন্তোষের।

—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

তাড়াতাড়ি ঘরের কোণে রাখা টুলটা টেনে আনবার চেষ্টা করলো ও। বাধা দিলো পার্বতী।

—থাক, ওটা আমি নিজেই আনতে পারবো।

টুলটা টেনে আনলো পার্বতী। বসলো ওর সামনে। পিঠের ওপর ছড়ানো ঘন কালো চুলগুলো নিয়ে আপন মনে খেলা করলো কিছুক্ষণ। বোধহয় পরিবেশের উপযুক্ত ভাষা খুঁজতে লাগলো।

সন্তোষ রেহাই দিল ওকে, নিজেই শুরু করলো—আপ-নাকে ক'দিন খুব কষ্ট দিলাম, না?

—তা একটু দিলেন বই কি। শুভ্রা থাকলে আমাকে এত কষ্ট করতে হ'ত না।—মৃদু কৌতুকে অল্প একটু মুচকি হাসল ও।

—শুভ্রা!

পার্বতী শুভ্রাকে জানলো কি ক'রে? শুভ্রার চিঠি-গুলো তো ও পুড়িয়ে ফেলেছে। রোজনামচার খাতাটাও বাক্সের মধ্যে আছে। সন্তোষ নিজে ভুল ক'রেও ওর কাছে শুভ্রার কথা বলেনি। এমনকি ওর নামটাও উচ্চারণ করেনি। তবে?

—আকাশ থেকে পড়লেন মনে হচ্ছে? ওই নামের কোন মেয়েকে আপনি চেনেন না নাকি? মৃদু ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কথাগুলো।

—চিনি।

—তবে?

—ভাবছি আপনি জানলেন কি ক'রে?

চুপ ক'রে রইলো পার্বতী। কি যেন ভাবলো অনেকক্ষণ। তারপর বলল—আপনাকে কোনদিন কোন অনুরোধ করিনি। আজ একটা অনুরোধ করবো। রাখবেন?

—রাখার হ'লে নিশ্চয়ই রাখবো।

—না, আপনাকে রাখতেই হ'বে।

—আদেশ করছে পার্বতী। আশ্চর্য! সন্তোষ দফাদারকে আদেশ করার অধিকার ও পেল কোথা থেকে? সন্তোষ ওকে আদেশ করার অধিকার তো কোনদিন দেয় নি। তবে? রোগশয্যায় সন্তোষের অক্লান্ত সেবা ক'রে ও এই অধিকার অর্জন করেছে, অন্ততঃ ওর ধারণা তাই।

—অনুরোধটা আগে শুনি।

—শুভ্রা কে? বলুন চুপ ক'রে রইলেন কেন?

—সত্যিই কি শুভ্রার কথা আপনার জানা চাই-ই?

—হ্যাঁ

—কেন?

—অসুখের সময় আপনি বিকারের ঘোরে বার বার শুভ্রার কথা বলেছিলেন। তাই আমার জানা চাই শুভ্রা কে? কোথায় থাকে সে?

—আপনি যখন শুনতে চাইছেন, তখন নিশ্চয়ই আমি বলব সব কথা।—থেমে যায় সন্তোষ, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।

—কি হ'ল থামলেন কেন?

—হ্যাঁ বলছি। সবটা সাদা করেই বলছি। ছেলেবেলা থেকেই আমি ঠাকুরমার কাছে মানুষ। বাবা-মা সবাইকেই হারিয়েছি খুব ছোটবেলায়। নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই শৈশব হ'তে কৈশোরে, কৈশোর হ'তে যৌবনের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছি। গাঁয়ের হাই স্কুলের প্রয়োজন মিটিয়ে একটা ছোট শহর ঝাউডাঙ্গায় গিয়েছিলাম কলেজের পাঠ নিতে। ভর্তি হয়েছিলাম ওখানকার বেসরকারী কলেজে। কলেজের হোষ্টেল ছিল না। তাই কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে একটা মেস্ ক'রে থাকতাম। বাড়িটা ছিল গার্লস স্কুলের কাছে। আমার বন্ধুরা তাই নিয়ে মাতামাতি করতো। কিন্তু আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। মেয়েদের দেখলেই আমি নার্ভাস্ হ'য়ে পড়ি, হার্টের প্যালপিটেসন্ শুরু হয়। অন্ততঃ তখন তাই হ'ত। এটা হয়তো যৌবন ধর্মের বিরোধী। তবু আমার হ'ত। তাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম।

আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত শুভ্রারা। ওর বাবা অলকেশ মুখার্জী কোন একটা অফিসে কাজ করতেন। শুভ্রাকে প্রায়ই দেখতাম ছাদে দাঁড়িয়ে থাকতে। কোনদিন ওকে দেখে কোন রকমের উত্তেজনা বোধ করিনি আমি। আমার এক বন্ধু ওকে পড়াতো। ওর কাছে শুভ্রার গুণগান শুনতাম প্রায়ই। খারাপ লাগতো না।

শুভ্রার সঙ্গে কোনদিন কথা বলার ইচ্ছে আমার জাগেনি। তবে আমি বলতে বাধ্য যে, শুভ্রাকে আমার ভাল লেগেছিল। প্রশ্ন উঠতে পারে, ওকে দেখতে কেমন? যার জন্য আমি কঠোর সংযম হারিয়ে ফেলেছিলাম। না। ওকে দেখতে এমন কিছু রোমাণ্টিক নয়। অতি সাধারণ বাঙালী ঘরের একটা সহজ লভ্যা মেয়ে। দোহারা চেহারা, আঁটসাঁট গড়ন। গায়ের রঙ তেতো ফরসা নয়। শ্যাম বর্ণ। চোখ দুটো বৈচিত্র্যহীন। পটলচেরা বা টানা টানা দীঘল নয়। তবে ওকে আমার ভাল লেগেছিল। কারণ অবশ্যই আছে। ওর লাজুক লাজুক চাহনি আকর্ষণ করেছিল আমায়। ভাল লাগা একদিন ভালবাসায় পরিণত হল। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষায় পূর্বরাগ। ওর সঙ্গে পরিচয় হল আমার। আমরা একবার মেসে সরস্বতী পূজার ব্যবস্থা ক'রেছিলাম। পূজার দিন পুরুত না আসায় ওর বাবাকে ডেকে এনেছিল বাবুরাম। ও ওদের বাড়িতে পড়াতো। শুভ্রা বাবার সঙ্গে এসেছিল পূজার আয়োজন করতে। বোধহয় বাবুরাম ডেকে এনেছিল। সেই সূত্রেই ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। পরিচয় থেকে প্রেম।

ওর সঙ্গে পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হয়েছে, ওকে হারাবার ভয় যখন নেই, আমি তখন B. Com. পাস করলাম। M. Com. পড়বার জন্য গেলাম কলকাতায়। মাঝে মাঝে শুভ্রার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম ঝাউডাঙ্গায়। এইভাবেই 5th year কাটিয়ে দিলাম। 6th year-এরও অনেকটা

কেটে গিয়েছিল। পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছি। হঠাৎ একদিন বাবুরামের চিঠি পেলাম। শুভ্রা পালিয়ে গেছে একটা ছেলের সঙ্গে।

বিশ্বাস করতে পারলাম না। ছুটলাম ঝাউডাঙ্গায়। জানলাম ব্যাপারটা মিছে নয়। বড় আঘাত পেলাম। M. Com. পরীক্ষা দিতে পারলাম না। পড়াশুনা ছেড়ে দিলাম। তারপর এই মৌশনী স্কুলে একটা চাকরি জুটে গেল। চলে এলাম। বেদনার হাত থেকে একটু মুক্তি পাবার আশায় বেছে নিলাম এই অখ্যাত পল্লীটাকে। ইতিমধ্যে ঠাকুরমাও মারা গেলেন। তাই এখানেই থেকে গেলাম। হয়তো বাকী জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দেব।

কাহিনী শেষ ক'রে পার্বতীর মুখের দিকে চাইলো সন্তোষ। আনমনা পার্বতী তখন বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টির ঝাপটা এসে পার্বতীকে ভিজিয়ে দিলো। তবু ওর খেয়াল নেই। সন্তোষ ক্লান্ত পায়ে কোনমতে এগিয়ে এলো ওর কাছে। দাঁড়ালো ওর পেছনে। আলতো ক'রে একটা হাত রাখলো পার্বতীর কাঁধে। চমকে উঠলো ও। ফিরে তাকালো। সন্তোষকে দেখে বললো—আপনি উঠে এসেছেন!

—তুমি ভিজে গেলে যে!

—কিন্তু তোমার যে অসুখ। বৃষ্টিতে ভিজলে অসুখ বাড়বে না?

—ক্ষতি কি, তুমি তো আছো।

—আমাকে তুমি সহ্য করতে পারবে না। আমাকে কেউ সইতে পারেনি।

—আমি পারবো।

—বীর পুরুষ! তাই প্রেমে ব্যর্থ হয়ে জীবনটাকে নষ্ট করছিলে!

—নইলে তোমায় পেতাম না যে।

—দুষ্টু।

অপূর্ব আবেশ সন্তোষকে আলিঙ্গন করে পার্বতী।

গান

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ

ওরে, ভাবে মাতোয়ারা হরি বল,
মেরুদণ্ড সোজা করে
একবার তোরা দাঁড়া ওরে
একবার সবে বদন ভরে
বল বল ওরে হরি বল।

ওরে হরি বিনে গতি নেই—
অগতির গতি সদা সেই
ভুলে থেকে দেখি তাহারেই
সবি গেল হায় রসাতল
ওরে, আকুল হইয়ে হরি বল।

অপরাধ ভারে মাথা হেঁট করে
লাজে অবনত ঘরে কিবা পরে
কতকাল আর রবি সবে ওরে
সত্যের পথে ফিরে চল,
ওরে মন প্রাণ খুলে হরি বল।

সেই পথ পানে, যেথা নিশিদিনে
সবে গৌরবে চলে পথ চিনে
মাথা উঁচু করে চলে দিন কিনে
সেই পথে তোরা ফিরে চল,
ওরে ভাবে মাতোয়ারা হরি বল।

শারদীয়া সংখ্যা | আশ্বিন | ১৩৭৩

শ্রীমন্ত সদাগর

—:○•○:—

'কমলে কামিনী' মা যার—
সে শ্রীমন্তের কথাই কহি।
সকল পথই জয় পথ তার
মা যে তার আনন্দময়ী।

ভীম তরঙ্গ, গর্জে সাগর,
ডুব্‌লো 'চাঁদর' আর মধুকর।
ডোবা তরী উঠ্‌লো তাহার
অমৃতের যে বার্তা বহি।

হার মানি' সিংহলের রাজা—
জয়মালা তার দিল গলে
রাজেন কমল-কামিনী মা
শ্রীমন্তের যে হৃদ্‌কমলে।

কণ্ঠে পরি' 'রত্নমালা'
এবার তাহার ফেরার পালা
সপ্ত ডিঙা সাজাইয়া
ফির্‌লো ঘরে সে কালজয়ী।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

স্মৃতিরূপা

ডক্টর রমা চৌধুরী

যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫।৬৪)

"যে দেবী সর্বভূতে স্মৃতিরূপে বিরাজিতা। তাঁকেই প্রণাম, তাঁকেই প্রণাম, তাঁকেই প্রণাম, অনিন্দিতা।"

শ্রীশ্রীমাতৃলীলার মহাগ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্ডীর অন্যান্য বহু স্তুতিমণিক্যর অন্যতম এটি—কি অভিনব, কি কৌতূহলজনক কি অত্যাশ্চর্য! কারণ স্মৃতি, একটি সামান্য—সাধারণ মনোবৃত্তিই মাত্র। যোগ-দর্শনের পঞ্চ চিত্ত-বৃত্তির মধ্যে এটিও একটি:—প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতি। সেজন্য যে যোগ "চিত্তবৃত্তি-নিরোধ" সেই যোগে স্মৃতিরূপ চিত্তবৃত্তির স্থান যে একেবারেই নেই, তা বলাই বাহুল্য। সেক্ষেত্রে পরমমঙ্গলময়ী বিশ্বজননী এরূপ "স্মৃতিরূপা" হবেন কিরূপে? তিনি বরং প্রত্যক্ষরূপা হতে পারেন—যেহেতু তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করাই হল আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রত্যক্ষের ন্যায় স্মৃতি সাক্ষাৎ জ্ঞানের কারণ নয়; স্মৃতি পরোক্ষ জ্ঞানই মাত্র। যেহেতু বস্তুর উপস্থিতিতে যে জ্ঞানলাভ হয়, তা "প্রত্যক্ষ"-জ্ঞান। কিন্তু বস্তুর অনুপস্থিতিতে তার বিষয় জ্ঞানলাভ হল "স্মৃতি"র সাহায্যে পূর্বদৃষ্ট বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা। সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, প্রত্যক্ষ অপেক্ষা স্মৃতি বহুলাংশে নূন এবং অল্প নির্ভরযোগ্য। অতএব, প্রশ্ন হতে পারে যে এরূপ একটি অপকৃষ্ট, অপ্রশস্ত, অবিশ্বাসযোগ্য—এমন কি, ব্যবহারিক দিক থেকেও ঠিক তাই—প্রমাণের সঙ্গে তুলনীয় হলেন কেন প্রকৃষ্টতম, প্রশস্ততম, বিশ্বাস্যতম জগজ্জননী।

তার উত্তর হল এই যে, স্বয়ং জগজ্জননী পৃথিবীর দিক থেকেই "স্মৃতি"-রূপা; যথেষ্ট গৌরবের সঙ্গেই তা। "স্মৃতি" কি? সাধারণ দিক থেকে যা উপরে বলা হয়েছে, স্মৃতি হল একটি অসন্নিহিত, অদৃষ্ট বিষয় সম্বন্ধে চিন্তামূলক জ্ঞান। সেদিক থেকে দেখতে গেলেও, এক অর্থে "স্মৃতি" "প্রত্যক্ষ" অপেক্ষা বিস্তৃততর, প্রয়োজনীয়তর, কঠিনতর প্রমাণ। কারণ প্রত্যক্ষ দ্বারা কেবলমাত্র সেই সকল বস্তুর জ্ঞানই সম্ভবপর যা আমাদের সম্মুখে বর্তমান; এবং সেজন্য দূরের বস্তু, অতীত ও ভবিষ্যতের বস্তু প্রভৃতির জ্ঞান এর দ্বারা সম্ভবপর নয় বলে', এর সীমা সঙ্কীর্ণ। উপরন্তু, বস্তুটি আমাদেরই সম্মুখে বিদ্যমান আছে বলে', তার সম্বন্ধে জ্ঞানও বহুলাংশে সহজতর। অপর পক্ষে, স্মৃতির দ্বারা যা' আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান নেই, যা দূরের বস্তু, অতীত ও ভবিষ্যতের বস্তু, সে সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করা যায়। এই কারণে, স্মৃতির সীমা বিস্তৃততর; এবং কেবল বর্তমান নিয়েই আমাদের চলে না বলে, এ-হ'ল আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়তরও নিশ্চয়ই। পুনরায়, যা' সম্মুখেই রয়েছে তার সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অপেক্ষা, যা' আমাদের সম্মুখে নেই তা' সম্বন্ধে চিন্তাপ্রসূত জ্ঞান নিশ্চয়ই কঠিনতর। এই অর্থে, স্মৃতিকে প্রত্যক্ষ থেকেও উচ্চতর বলা চলে।

অবশ্য অন্য অর্থে, প্রত্যক্ষই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, যেহেতু

সকল জ্ঞানের শেষই দর্শনে। এই "দর্শন" অবশ্য সাধারণ ইন্দ্রিয়জ দর্শন নয়—এই দর্শন মানসিক প্রত্যক্ষ, এই দর্শন আত্মিক উপলব্ধি। এই ভাবে, পার্থিব দিক থেকে মানসিক প্রত্যক্ষ, এবং পারমার্থিক দিক থেকে আত্মিক উপলব্ধিই হল "স্মৃতি"র মূল উদ্দেশ্য।

এই কারণেই, "স্মৃতির" অপর নাম হল "নিদিধ্যাসন" বা "ধ্যান"। এরূপ ধ্যানের অতি সুন্দর সংজ্ঞাদান করে' বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য রামানুজ বলছেন—

"তৈলধারাবদবচ্ছিন্না স্মৃতি সন্তান-রূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ।"

(শ্রীভাষ্য ১।১।১)

অর্থাৎ, ধ্যান হল একটি বিশেষ বস্তুর বিষয়ে অনবরত, স্থির স্মৃতি বা চিন্তা। যেমন তৈলধারা অনবরত বয়ে চলেছে ধারাবাহিক ভাবে কোনো 'ফাঁক' না রেখে, তেমনি সেই একটি বিষয় অবলম্বনে আমাদের চিন্তাধারাও অনবরত বয়ে চলেছে ধারাবাহিক ভাবে কোনো 'ফাঁক' না রেখে। তারই ফলে, পরিশেষে, সেই বস্তুটির সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, বা আত্মিক উপলব্ধি হচ্ছে। অতএব, "স্মৃতি"র শেষ "দর্শনে"। সেজন্যই, অতি সুন্দর ভাবে রামানুজ বলছেন—

"এবং রূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে, উপাসনা-পর্যায়-ত্বাদ্‌ভক্তিশব্দস্য।"

"সা চ স্মৃতিদর্শন-সমানাকারা।"

অর্থাৎ, এরূপ ধ্রুবা স্মৃতিই হল "ভক্তি"; এবং "ভক্তি" ও "উপাসনা" এক ও অভিন্ন।

"এরূপ স্মৃতিই হল দর্শন-তুল্য।"

বস্তুতঃ, "শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন"-রূপ প্রখ্যাত সাধন প্রণালীরই আভাস পাই আমরা এক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে ব্রহ্মোপলব্ধি হবে কি করে আমাদের? তার জন্য, প্রথমে প্রয়োজন "শ্রবণ"—অথবা গুরুবাক্য ও শাস্ত্রোপদেশ থেকে সেই তত্ত্ববিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানলাভ। তারপরে প্রয়োজন "মনন"—অথবা, সাময়িকভাবে গৃহীত সেই তত্ত্ব-বিষয়ে নিজস্ব যুক্তি-বিচারমূলক চিন্তা। সর্বশেষে প্রয়োজন "নিদিধ্যাসন"—অথবা যুক্তি-বিচার দ্বারা গৃহীত সেই তত্ত্ব-বিষয়ে নিরন্তর চিন্তা বা ধ্যান। এরই ফলে, শ্রবণ ও মননের স্তরে পরোক্ষভাবে জ্ঞাত সেই তত্ত্বটির অবশেষে অপরোক্ষ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ বা "দর্শন" উপলব্ধি হয়।—এই ত হল ব্রহ্মোপলব্ধি, এই ত হল মুক্তি।

এরূপে, "স্মৃতিরূপা" জগজ্জননী ধ্যানরূপা, ভক্তিরূপা, উপাসনারূপা, উপলব্ধিরূপা, মুক্তিরূপা। আমাদের জীবনের যা শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, আমাদের জীবনের যা বরিষ্ঠ সাধনা, আমাদের জীবনের যা গরিষ্ঠ সিদ্ধি—তিনি ত তাই। এরূপে, তাঁকে আমরা পাচ্ছি নিরন্তর আমাদের শোভন স্মৃতিতে, আমাদের গভীর চিন্তায়, আমাদের নিগূঢ় ধ্যানে, আমাদের মোহন ভক্তিতে, আমাদের নির্মল উপাসনায়, আমাদের স্নিগ্ধ উপলব্ধিতে, আমাদের মধুর মুক্তিতে। কি পরম সৌভাগ্য আমাদের; এবং শ্রীশ্রীচণ্ডী এই সৌভাগ্যের বার্তাই বহন করে এনেছে আমাদের নিকট।

॥ তবু সূর্য অস্ত যায় ॥

নচিকেতা ভরদ্বাজ

তবু সূর্য অস্ত যায়। দিন মাস বর্ষ ঘুরে আসে।
আমার আকাশে
সব রোদ-রূপ-রঙ, হাসি-গান কিছু নেই আর—
অবসন্ন আসন্ন সন্ধ্যার

প্রতীক্ষায় বসে আছি। সেদিনের সব পথ
হারিয়েছি নির্মম ধুলায়,—
তীক্ষ্ণ ঝড়ে। নীল চোখে তবু স্বপ্ন অঞ্জন বুলায়,

নরম নিটোল এক হীরে-কাঁপা উজ্জ্বল ভোরের
মুগ্ধ ছবি ফেলে আসা দূর ওপারের—
হৃদয়ের অন্তরালে জাগে—
কত অনুরাগে!

স্ফটিক পাত্র

(গল্প)

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীরঞ্জন রায় বি, এস-সি প্রশংসনীয় মনোযোগ সহকারে শেঠ বুলচাঁদ লোহিয়ার আদেশ প্রণিধান করলে। শেঠজি শেষে স্পষ্ট করে নির্দেশের সারাংশ বুঝিয়ে দিলে—বুঝলেন বাবু, মেজর সাহেব চাহিবে কণ্ট্রাক্টের মোট টাকার উপর শতকরা দশ টাকা। কিন্তু শেষে পাঁচ টাকায় রাজি হবে। সাক্ষাৎ সাহেবের সঙ্গে বন্দোবস্ত করবেন। কোনো বাবুর মারফত এসব করবেন না। সবাই লোভী। দেশে ধর্ম নেই। কলিকাল। ১৯৪৪ সাল।

রঞ্জন নীরবে শুনলে। বুলচাঁদ একটু দম নিয়ে আবার বল্লে—মোট কথা চনচনিয়ারা যেন এ কাজটা না পায়, ওরা ফেরেবী।

রঞ্জন বল্লে—মেজর যদি সহি করবার আগে কিছু অগ্রিম চায়?

লোহিয়ার বিচার-বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। সে বল্লে—সম্ভব। মোট ঠিকা নব্বই হাজারের, দশ টাকা শ'করা হোলে ভি ওর পাওনা সেটা হবে ন'হাজার। তা' আপনি দু' হাজার টাকা নগদ দেবেন।

নীরবে শুনলে রঞ্জন। শেষে যখন লোহিয়া বল্লে—বাবু আট নম্বর বুইক নিয়ে যান আর ভালো ইংরাজি পোষাক পরবেন। এ কাজটা সারা হ'লে আপনি আর একটা বিলাতী সুট্ করাবেন। বুঝলেন?

যুবক হাসলে। গরজ বড় বালাই। বস্ত্রদানের মূল অভিসন্ধি কর্মচারীর মারফত নিজের কারবারের সম্ভ্রান্ততা প্রমাণ। বুলচাঁদ তার হাসির অর্থ বুঝলো। বল্লে—এটা সাফ্ কথা বাবু। আজকাল কি গুণের আদর আছে না ধর্মের, এটা বারফট্টাইয়ের দিন, কাপড়ের যুগ।

রঞ্জন রায় বিষণ্ণ হ'ল। সত্যই সে ছায়ার যুগের লোক। কায়ার কথা কেহ ভাবে না, ছায়া নিয়ে বিচার—বিদ্যাবুদ্ধি, সংস্কৃতি বা চরিত্র, পাঠ্য-পুস্তকের প্রবন্ধের কবন্ধ। ছায়াচিত্রের যুগ—তাই অলিতে গলিতে সিনেমা। প্রাচীন মন্দির জীর্ণ।

গাড়িতে তার রসবোধ ফিরে এলো। আক্ষেপে কি ফল? পরিশ্রম সে গ্রাহ্য করতো না। বাঙ্গালী তরুণের আর্থিক জগতে উন্নতির অন্তরায়, শ্রম-বিমুখতা। সংসার কর্মক্ষেত্র। পরিশ্রমই জীবন। তার বিদ্যা বা বুদ্ধির মূল্য সেই সনাতন নিয়মে নির্ণয় হয়, যে পদ্ধতিতে চাল, ডাল, কমলালেবু বা মানকচুর দাম ঠিক হয় বাজারে। চাহিদা যার অধিক দাম তার বেশী। গ্রাজুয়েটের চাহিদা অপেক্ষা ঘুষ-দেনেওয়ালার কদর অধিক। সে যেটুকুও রোজগার করে, ঐ গুণে।

বারাকপুরের পথে আট-সিলিণ্ডার বুইকের গতির সঙ্গে তার মনের গতি পরিবর্তিত হ'ল। যা অনিবার্য এবং স্পষ্ট তার জন্য পরিতাপে রক্তের উত্তাপ বাড়ে। যে উষ্মায় বিক্ষোভ বাড়ে, শান্তির সে অন্তরায়। আট-নম্বর বুইক-গাড়ির কথা স্মরণ ক'রে তার হাসি এলো। সে যখন ব্যবসায়ীর জগতের রীতিনীতি সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ এমন দিনে সে গাড়ি চেয়েছিল বুলচাঁদের কাছে, জননীকে কালীঘাটে নিয়ে যাবার জন্য। শেঠ বুলচাঁদ তেলের দোহাই দিয়ে তার দীন অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিল। সে তার কর্মচারী। তৈলদান কর্লে বরষার স্রোতেরমত তৈল-প্রবাহ বহে ব্যবসায়ী বাজারে। কলেজে পাওয়া বিদ্যা পটে আঁকা ছবির মত, জীবনের আসল শিক্ষা-যজ্ঞ কর্মক্ষেত্রে।

মেজর হজপজের কথা স্পষ্ট। সে রঞ্জনকে বুঝিয়ে দিলে যে তাদের প্রতিযোগী চনচনিয়া কোম্পানী শতকরা পনেরো টাকা কমিশন দিতে চায়, সাহেব চায় বিশ। তারা দু'ঘণ্টার সময় নিয়ে গেছে। প্রথমে যে আসবে, সাহেব

তার টেণ্ডার নেবে। স্পষ্ট কথার কষ্ট নাই।

শ্রীযুক্ত রায়ের আট সিলিণ্ডার বুইক ছুটলো স্থানীয় উকীলের বাড়ি। সে টেলিফোনে সকল সমাচার শ্রীযুক্ত ঝুলচাঁদ লোহিয়াকে নিবেদন করলে।

তারের উপর দিয়ে বিজলীর সাহায্যে তার মোটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—বাবু ধর্মের দিকে তাকাও। তোমাকে আমি নিশ্চয় পরে বখশিস দেব। দশ পারসেণ্ট বহুৎ।

ক্রোধে ও ক্ষোভে নির্লোভ রায়ের হাত কাঁপছিল। সে স্পষ্ট স্পষ্ট শব্দে বল্লে—শেঠজি, আমি নয়, মেজর সাহেব চায়—ঠিকার মোট টাকার উপর শতকরা কুড়ি টাকা। আচ্ছা আমি তাকে সংবাদ দিচ্ছি, আপনি ও সর্তে রাজি নন। আচ্ছা।

—বাবু—রন্‌জোন বাবু। হাঁ, লাইন রাখুন দেখি—

রঞ্জন কুড়ি সেকেণ্ড নীরবে কাণে চোঙা লাগিয়ে অপেক্ষা করলে। তার পর।—

—হ্যালো। হ্যাঁ। রনজোন বাবু। দেখেন গোসা হবেন না। ব্যবসা আপনকার বুঝলেন—

রঞ্জন বল্‌তে যাচ্ছিল—শয়তানের, তা বুঝে চক্ষু বুজে আছি পেটের দায়ে। কিন্তু সামলে বল্লে—সময় কম। ঢনঢনিয়া—

—হালো। বাবু ধর্মের দিকে তাকাইয়ে যেটি ভালো খাটে করুন। হালো, এ ব্যবসা আপনার। আপনি আমার ধরম ছেলে—হালো—

বিরক্ত হয়ে এবার রঞ্জন বল্লে—বিচার করতে গেলে ঢনঢনিয়া—

ঢনঢনিয়ার নামে ঝুলচাঁদের শিরে ঢনঢন কোরে বাজে প্রলয়ের ঘণ্টা। সে বল্লে—আচ্ছা বাবু—না হয় একটা নোকসানের কাজ হ'ক। সাহেবটা যে হারামি।

(২)

ইডন উদ্যানের প্রকাণ্ড কেয়াগাছের আড়ালে রঞ্জন বল্লে—মীনা, আমি এবার একটা নতুন বিদ্যে শিখ্‌ব—চুরি বিদ্যে।

মীনা বুঝেছিল তার বন্ধুর মন কিসের একটা ভারে যেন অবসন্ন। সে নিজেও সারাদিন পরিশ্রম করেছিল। তার মন চাইছিল, খেলা, সুখের অভিনয়, মনের ভার-নামানো প্রসঙ্গ।

সে বল্লে—ও বিদ্যে তো তোমার সাধা বিদ্যে। ডিরেক্টর জেনারেল অফ্ সাপ্লাইজ অফিসের ষ্টেনোগ্রাফার মিস্ মীনা সেন ভুক্তভোগী।

হঠাৎ সারা পৃথিবীটা যেন অপার্থিব রশ্মিকিরণে রঙীন হ'ল। কি অপূর্ব রক্তিম রাগস্নাত উদ্যানের ক্ষীণদেহ সরোবরে সুধা-স্রোত।

সে তার পাশে সুষমা দেখ্‌লে—সকল সৌন্দর্য একত্র করে বিধি গড়েছেন কুমারী মীনা সেনকে। কিন্তু তুচ্ছ রঞ্জন রায়, নির্ধন, নির্গুণ, অসুন্দর, এত বড় কথাটা বিশ্বাস করে সে কিরূপে? আর সুন্দরীর কোন বস্তুই বা অপহরণ করেছে সে? যে বস্তু সে ভাব্‌ছে হয়তো অপহৃত পদার্থ তা হ'তে ভিন্ন।

সে সাহসী। যা থাকে কপালে—স্পষ্ট প্রতীতি অনাদি জ্ঞানের মত। সে বল্লে—তোমার কি চুরি করেছি মীনা।

যুবক তার মুখের দিকে তাকাবার মত দুঃসাহস আয়ত্ত করতে পারলে না। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল—যুবতীর ভ্যানিটি ব্যাগে আঁকা নৌকার পালের উপর।

মীনা হাসলে। বল্লে—বোকামীর ভান কোর না।

অপহৃত পদার্থের নাম করলে না। বুকের উপর হাত রাখলে, অপাঙ্গে হাসলে।

কৃতজ্ঞতায় রঞ্জনের নিজের চিত্ত হ'ল ভরপুর। দারুণ শ্রদ্ধা জন্মালো নিজের উপর—ধন্য চুরি বিদ্যা। সত্যই তো সনাতন প্রবচন—মারি তো হাতী, লুটি তো ভাণ্ডার। সে তিনবার জিজ্ঞাসা করলে—মীনা, সত্য? মীনা তিনবার বল্লে—ভণ্ড, জানো না?

সন্ধ্যাকে মধু-সন্ধ্যা করতে মীনা কৃতসংকল্প। বেচারা রঞ্জন—বহুদিনের বন্ধু,—চিরদিন নিকষ হেমের মত খাঁটি, বিকচ কমলের মত প্রসন্ন। মীনার সে সহপাঠী—উভয়ে একত্র কিছুদিন ল কলেজে পড়েছিল, দুজনের কেউই পাশ করেনি।

মীনা বল্লে—তুমি অত প্রলাপ বক্‌চ কেন রঞ্জন। দণ্ড-বিধি আইনের পঁচানব্বই ধারা মনে আছে?

—আঃ! এমন সন্ধ্যাটা আইনের কথা বলে নষ্ট ক'রনা মীনা। ছিঃ!

সুন্দরী হাসলে। বল্লে—ছেলেদের অপেক্ষা মেয়েদের স্মরণ-শক্তি ভালো।

যে শ্রেণীর মধ্যে শ্রীমতী মীনা রায় বিরাজিত, তারা বড় নয় তো বুলচাঁদের জাত, পুরুষ মানুষ বড় ? সে সাগ্রহে বল্লে—এক বার নয় সহস্র বার। ও ছাই-ভস্ম আইনের কথা আমি কেন, উকীল বন্ধুরাই ভুলে গেছে এখন স্মরণ কর কবিতা—

মীনা বল্লে—তা স্মরণ করলে হবে কেন চোর ? তোমাকে অপরাধী করেছি। চোর অপবাদ দিয়েছি। তবে আইনের অল্প-বিদ্যার ফল শোনাই। পঁচানব্বই ধারা—

—চুলোয় যাক্ পঁচানব্বই ধারা। আমি যদি চোর হই—সেকন্দর, অশোক প্রভৃতির মত বিশ্ব-চোর। কারণ যা' চুরি করেছি তা যে আমার রঙীন দুনিয়া—মীনা।

আবার যুবতী হাসলে। তার প্রাণ চাইছিল, আরো শুনতে, আরো শুনতে, তার প্রলাপ, তার রুদ্ধভাবের মুক্ত উচ্ছ্বাসের সজীব কল-গান।

সে বল্লে—তোমার দণ্ড মকুব হবে পঁচানব্বই ধারায়। তাতে বলে, অপরাধী দণ্ডনীয় হয় না, অপরাধ যদি হয় তুচ্ছ। যেমন নগণ্য জিনিষের চুরি যথা মীনার ক্ষুদ্র হৃদয়—

এবার সে লাফিয়ে উঠ্‌লো। বল্লে—ছলনাময়ী, তুচ্ছ তোমার প্রাণ? তাহ'লে গোলকণ্ডার হীরার খনির কি মূল্য, চাঁদের কি দাম—

সে হেসে পরিহাস ক'রে তাকে চুপ করালে। তার সহায়তা করলে তিনটে মার্কিনী গোরা। মুখের ভাষা না বুঝালেও মূক অভিনয়ের ভাব বোঝার মত তারা বে-মালুম বুঝে ফেল্লে ব্যাপারটা। তাদের নির্নিমেষ পলক এবং রহস্যের হাসি প্রেমিকের উৎস-মুখে পাথর চাপা দিলে। মার্কিণ দেশকে প্রশান্ত এবং অতলান্তিক মহাসাগর ভাগা-ভাগি করে উদরস্থ করুক এই রকম শুভ প্রার্থনা ক'রে মিঃ রঞ্জন রায় শুদ্ধ হ'ল। আঃ মোলো! গায়ে প'ড়া গণ-তান্ত্রিক মার্কিনীর চেয়ে দূরে থাকা দাম্ভিক সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ ভালো।

আসল ব্যাপার, আজ কয়েকদিন রঞ্জন রায়ের চিত্ত ছিল অপ্রসন্ন। সে আইন ভাঙ্‌ছিল, দুর্নীতি পোষণ করছিল পরের হিতে। অথচ সেই পরে সন্দেহ করছিল, সে নিজে চোর, উৎকোচের দালালী লাভ করে। সে একবার ভাবতো বুলচাঁদের ভুলের শাস্তির জন্য কমিশনের কমিশন

আজ আবার কথা প্রসঙ্গে সে বল্লে—মীনা, পৃথিবী পাপে কেঁপে উঠেছে। চারিদিকে অনাচার—

—অনাচার ? নোংরা, পচা, পূতি-গন্ধ, আমি নরকে বাস করি—চারিদিকে লোভী মানুষ কেবল পয়সার ধান্দায় ঘুরছে।

রমণী-রত্ন, ভাবলে রায়। ঐ কথাই তার হৃদয়ের অন্তস্তলকে আলোড়িত করছিল। সে বল্লে—ঘুষ-খোর লোক দেশ ছেয়ে ফেলেছে।

রমণী রত্ন বল্লে—ঘুষ-খোরের একটা গুণ আছে, সে ভদ্র, মুখ-মিষ্টি লোক। ভাণ করে বন্ধুত্বের। ভণ্ডামী করে কিছু আদায় করে। কিন্তু আমার আপিসের লোক এক্স্‌টরসানার। বুকে পিস্তল দেখিয়ে, সরকারী চাকরীর উদ্ধত ভাব ষোল আনা বজায় রেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে পয়সা আদায় করে। এ শোষণ দস্যুতার কনিষ্ঠ সহোদর।

তার বিশ্লেষণ শক্তির অজস্র প্রশংসা ক'রে রঞ্জন তাকে নিজের দুঃখের কথা শোনালে।

যুবতীর মুখ গম্ভীর হ'ল, দরদ ফুটে উঠলো বাক্যে ও চক্ষে। সে বল্লে—মাপ কর রঞ্জন, যখন—না কিছু না।

কিন্তু বাকীটুকু শোনবার জন্য ব্যাকুল হ'ল রঞ্জন।

কাজেই বুদ্ধিমতীকে বল্‌তে হ'ল—এমন কাজ করে লাভ কি ভাই ?

রঞ্জন বল্লে—এ কাজে ঢুকেছিলাম একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। কোনো কাজ না শিখে ব্যবসা হয় না। ব্যবসা শেখবার জন্য—

—কী ব্যবসা ? ঘুষ নেওয়া ? ছ' আনা মাল দিয়ে ষোল আনার রসিদ নেওয়া ? এলসেসিয়ান বায়না ক'রে খ্যাঁকশিয়ালী সরবরাহ করা ?

রঞ্জন অপ্রস্তুত হ'ল। বল্লে—সত্য কথা বলি, দেবি শোনো, পেটের দায়ে। আমার অন্ন নিষ্পাপ। পাপের ধন যায় ধনী লোহিয়ার মোটা উদরে।

এবার তারা হাসলে। উভয়ে একমত হ'ল—দারিদ্র্য-দোষো গুণরাশিনাশী।

শ্রীমতী বল্লে—আমার প্রতি ভগবানের এই দয়া যে মাত্র নরকে রেখেছেন। নিজের হাতেও আমাকে পাপ

ডুবো রবির ম্লান রশ্মিতে রঞ্জন দেখলে উজ্জ্বল চাঁপার কলির মত আঙুল আর তার শ্রীমুখে পরিহাস-ম্লান হাসি।

(৩)

রঞ্জন ভাবে, ক্ষুদ্র হৃদয়ে হায়, ধরেনা ধরেনা তায়। মনটা যেন বহির্জগতের প্রতিফলক। বর্মা সীমান্তের যুদ্ধক্ষেত্রের মত তার চিত্তে দুটো বিরোধী ভাব সদাই সংগ্রামরত। মনের পটভূমি উজ্জ্বল—ভাবীকালের সংসার—যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীমতী মীনা রায় বি, এ।

এই পটভূমির নায়িকার প্রোজ্জ্বল চিত্র ছিল তার মানসিক সংগ্রামের প্রধান কারণ। সে ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি, দু'শো একটাকা বেতন। কাজের মধ্যে জুয়াচুরি, ঘুষের দালালী। দিনের পর দিন তার প্রভুর ভাণ্ডার পূর্ণ হচ্ছে, তারই কর্মে। এ ঐশ্বর্যের ভোগী সে স্বয়ং হ'তে পারতো যক্ষের ভাণ্ডার ভর্তি না ক'রে। এই চিন্তার অব্যবহিত পরেই তার বিবেক তাকে কষাঘাত করত। বজ্র-শাসনে তার অন্তরাত্মা রঞ্জনকে কর্তব্য-পথ দেখিয়ে দিত।

গঙ্গার ধারে বসে সে ভাবতো, উদয়ের মুখে জাহ্নবীকেও কাদামাটি কাঁকরের সঙ্গ করতে হয়। এই খরস্রোতের নিচের ভূমি কর্দমময়। সত্যই জগত শ্রদ্ধা করে বাহিরের চাকচিক্য। জীর্ণবাস ভিখারীর অন্তরে কি আছে স্পষ্ট জানলে, অনেকের পদধূলি গ্রহণ করা উচিত। কাঞ্চন-কৌলিন্যই সামাজিক উচ্চভূমি। কিন্তু মানুষের চরিত্র, তার ধর্ম, তার বিবেক-বুদ্ধিই তার নিজের সম্পদ, আত্মসম্ভ্রমের কারণ। এই বিচারে সে সুখ পেতো যখন লোভে তাকে প্রণোদিত করত—উৎকোচের ভাগ গ্রহণ করতে, লোভীর অধর্মের লাভের অংশ হ'তে তাকে বঞ্চিত করতে।

আবার ভাবতো এ আত্মসাৎ হবে গঙ্গোত্রী পথের কাদার মত। এই অর্থে ব্যবসা বাণিজ্যে লাভবান হ'লে সে প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধ হবে। তার কোষে অর্থ থাকলে বহু গুণী নির্ধন সহায়তা লাভ করবে। কিন্তু তার বিবেক ছিল শুদ্ধ। তার রসবোধ ছিল যথেষ্ট। সে হেসে বলতো—মাষ্টার শয়তান সরে পড়। এ দোকানে নয়।

একদিন রঞ্জন অন্তরালে দাঁড়িয়ে শুনলে তার মনিব শেঠ বুলচাঁদ লোহিয়া এবং তার অন্তরঙ্গ শেঠ ঝব্বরমল খস্‌খসিয়ার কথোপকথন।

ঝব্বরমল বল্লে—বুলচাঁদজি, তুমি বাজার মাটি করছ। তোমার কমিশনের হার বড় বেশী।

বুলচাঁদ বল্লে—ভেইয়া, অধরমের যুগ। তবুও দিয়ে নিয়ে মুষ্টিভোর থাকে। যা দেন পরমাত্মা।

ঝব্বরমল বল্লে—হাঁ। তবে আরও থাকতো। তোমার বাঙ্গালী খেয়ে নেয়।

শিহরে উঠলো গোপন-শ্রোতা।

বুলচাঁদ বল্লে—দুনিয়াদারী। তবে ওর চেহারাটা ভালো, মুখের আংরেজি বুলি মিষ্টি। দেশী বিলাতী সব সাহেব ওকে পেয়ার করে।

নিজের স্থূল উদরে হাত বুলিয়ে ঝব্বরমল খস্‌খসিয়া বল্লে—হাঁ। ওরা চোরতো হয়ই।

এবার বুলচাঁদ বল্লে খাঁটি কথা অন্তরঙ্গকে—কি জানি ভাই অর্থ বরাতে। ঠিক ভাগ্যে ভাগ্যে না মিললে দৌলত আসে না। এটা স্বীকার করতে হবে যে, রঞ্জোন বাবুর তকদির আমার নসীবের সঙ্গে মেলে। আমাদের তারায় তারায় মিল আছে।

শ্রীযুক্ত রঞ্জন সেন, বি, এস্-সি বুঝলে তার অবস্থা। সে কলিকালের চোর, তার চেহারা ভালো, তার ইংরাজি মিষ্ট এবং বুলচাঁদের তারা তার ভাগ্য-তারার অন্তরঙ্গ। সে ইংরাজিতে বল্লে—বুল্, ষাঁড় না হলে পয়সা হয় না।

সেইদিন সে একটা কাজে নগদ দু'হাজার টাকা নিজের জন্যে রাখলে। ব্যবসায় পাঁচ হাজার টাকা লাভ করলে। প্রথম রাত্রি অনিদ্রায় কাটালো। তার মন বল্লে—এ আত্মসাৎ নয়, শাস্তি; মানহানিকর উক্তির শাস্তি, মিথ্যা অপবাদের ক্ষতি-পূরণ। ভরসা ক'রে মীনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারলে না, বুলচাঁদের এ শাস্তি কোন্ আইনের কোন ধারা অনুসারে।

তারপর বিবেক তাকে শাসন করে না। শুদ্ধ-বুদ্ধি ধিক্কার দেয়না। বরং লাভ কম হলে তার বুদ্ধি তাকে দোষ দেয়, অবিবেচক, অলস বলে। সূর্য পূর্বের মত ওঠে ও অস্ত যায়, কিন্তু প্রতিদিন দেখে রঞ্জন রায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি। সে বোঝে সকাম ও নিষ্কাম কর্মের পার্থক্য। তার সকাম কার্য সাধনায় বুলচাঁদেরও লাভের মাত্রা বৃদ্ধি হচ্ছিল। তাকে নিঃসন্দেহ করবার জন্য রঞ্জনবাবুর ভাষা সশ্রদ্ধ হ'য়েছিল। আর অতি লাভের লোভে বুলচাঁদজি রঞ্জন-

বাবুকে কালাবাজারের ভালো সার্জের পোষাক তৈরি করে দিলে।

১৯৪৪ সালের শেষ দিনে মিঃ রঞ্জন রায়ের তহবিলে ছিল নগদ টাকা প্রায় একলক্ষ।

(৪)

নববর্ষে সে মীনাকে নিয়ে গেল চিড়িয়াখানায়। যুদ্ধের দিনে বছরের প্রথম দিন তেমন সুখের ছিল না—অভাব, অভিযোগ, নিরাশা, দুরাশার কুহেলিমাখা। তবু জন্তুনিবাস আজ এদের মিলনভূমি সুতরাং পবিত্র। দুটি প্রণয়ীর প্রাণও চাইছিল স্ফূর্তি, অবাধ আনন্দ। হাসি, পরিহাস, কাজের ও নিরর্থক কথায় কোথা দিয়ে দিন কেটে গেল, কেউ বুঝলো না। একবার দার্শনিক মীনা বল্লে—বন্ধু, এটা লক্ষ্য করেছ যে, এই জানোয়ারের মেলায় আজ আমরা অমরাপুরীর সুখ উপলব্ধি করছি।

রঞ্জন বল্লে—অমরাপুরী ভূগোলের মানচিত্রে নেই। স্বর্গ মনোবিজ্ঞানের রচা পুরী। না—না স্বর্গ মাত্র একটা প্রতিফলিত ছবি, যার আসল রূপ তুমি।

এবার যুবতী হাসলে। সে বল্লে—যার বসতি নরকে—ডিরেক্টর জেনারেল অফ্ সাপ্লিজের দপ্তরখানায়।

রঞ্জন গম্ভীর হ'ল। তার নিজের দপ্তর এখন আর নরক নয়, মাত্র দুনিয়া, সে কথা সে মুখ ফুটে বলতে পারলে না।

মীনা বল্লে—জাল-জুয়াচুরির সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করে আমার সহকর্মীদের আবার দেখছি একটা নতুন সখ গজিয়ে উঠেছে।

যুবক নিজের চিন্তায় মসগুল ছিল। সে অন্যমনে বল্লে—কী?

মীনা হেসে বল্লে—ছোট বড় সবাই ভাবে দরিদ্র কেরাণী মীনা এবং তার মত অন্য শ্রমিক মেয়েগুলো তাদের প্রেমের জন্য অফিসে রাখা হয়েছে। সবাই ইঙ্গিত করে প্রেমের।

রঞ্জন তাদের গালি দিল।

মীনা খুব হাসলে। বল্লে—পাগলা, জেলাস্ ছোকরা, ওদের কর্তব্য প্রেম করতে আসা, আমাদের কর্তব্য প্রত্যাখ্যান করা, চাবুক খাওয়া কুকুরের মত পালায়, আবার

রঞ্জন বল্লে—আমি কাজ ছেড়ে দেব মীনা। তুমিও ছেড়ে দাও। আমরা দুজনে এবার বাসা বাঁধি।

তারপর সুর করে বল্লে—যৌবন সায়রে পড়িলে যে ভাঁটা, পুনঃ না আসিবে জল।

মীনা বল্লে—সেই বহুগুণনাশী দোষটা? কবিতায় কি পেট ভরবে? আমার বিধবা মা আছেন, অনাথা পিসিমা আছেন, শিক্ষার্থী ভাই আছে তোমারও—

বাধা দিয়ে রঞ্জন বল্লে—কারবার করব মীনা। অনাহারে মরব না।

মীনা বল্লে—মূলধন?

—তা আমার সংগ্রহ হ'য়েছে। কারখানা খুলব। আমাদের কারবার ভালোই চল্‌বে।

মীনা সুখী হ'ল। বেচারা এক অর্থবান ভাগীদার পেয়েছে। ভালো।

সে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার ভাগীদার কে? তোমরা কারা?

রঞ্জন সগর্বে বল্লে—যে সুখদুঃখের সারা জীবনের ভাগীদার। ফার্ম হবে—সেন রায়—না না রায়-রায় কোম্পানী—মীনা রায়—আর রঞ্জন রায়।

বিস্মিত মীনা আবার বল্লে—কিন্তু মূলধন?

—তবে বলি শোন মীনা, আমি প্রায় লাখ টাকা জমিয়েছি।

—কেমন করে?

সে সব কথা বল্লে। মীনার হৃদ্‌পিণ্ড মোচ্‌ড়াচ্ছিল দানবে। রক্তধারা বন্ধ করবার জন্য সে কাঠ-হাসি হাসছিল। সকল কথা শুনে সে একটি ছোট শব্দ উচ্চারণ করলে—ছিঃ!

যুবকের চমক ভাঙ্গলো। সে বল্লে—সব ঠিক হবে মীনা। বড় বড় অট্টালিকার ভিতে থাকে জল-কাদা-মাটি।

সে অনেক বোঝালে।

অবোধ বালিকা। সে বল্লে—দোষ দেবার ক্ষমতা নেই। ভালো মন্দ বিচারের শক্তির গর্ব করি না বন্ধু। তবে বুঝেছি আজ হ'তে তোমার-আমার জীবনের চলার পথ ভিন্ন-মুখ।

অসাধ্য সাধন !

(গল্প)

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

'মেয়েদের মন, সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন !' কচকে উদ্দেশ করে দেবযানীর মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন কবি ।

কিন্তু লক্ষ বছরের সাধনাতেও তার রহস্যের একটুও কি টের পাওয়া যায় ?

পরিণামে শুধুই কচকচি !

বাইরে অন্ধকার বেশ জমে এসেছে, এমনি সময়ে কল্পনা এল লাবণ্যর ঘরে । প্রথম যে চেয়ার পেল তাতেই সে নিজেকে এলিয়ে দিল ।

'উনি গেছেন এক বাল্য বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে । যশিডিতে । এখনো যখন ফিরলেন না তখন বুঝতে হবে সেখানেই মজে রয়েছেন । রাত্রিতে ফিরবেন কিনা কে জানে !' লাবণ্য একটু থামে, 'কাল সকালে আমাদের তাহলে আর ত্রিকুট বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে না কনু !'

কল্পনা চুপ করে থাকে ।

'থাক্, তুই খুব স্ফূর্তিতেই কাটিয়েছিস বিকেলটা । কি বলিস ? কোথায় গেছলি বেড়াতে ? গণেশবাবু কই ? তাঁকে দেখছিনে ?'

অশ্রুর উচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে পড়ে কল্পনা ; কোনো জবাব দেয় না ।

'য়্যাঁ ? কোনো য়্যাকসিডেণ্ট ঘটেছে না কি তাঁর ?' লাবণ্যর স্বরে উদ্বেগ । কল্পনার দিকে সে এগিয়ে আসে ।

'তাঁর ? না তাঁর আবার কী য়্যাকসিডেণ্ট হবে ?' কনুর বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে যেন কৈফিয়তের দাবী ।

'ভালো, তাহলে তোরই কিছু হয়েছে যেন মনে হচ্ছে ।'

'যা হয়েছে তাকে য়্যাকসিডেণ্ট বলা যায় কিনা জানিনে । তবে তোমাকে জানানো দরকার । সেজদি, গণেশবাবু বিয়ের কথা পেড়েছেন । এই একটু আগেই ।'

(পূর্ববর্ত্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ)

রঞ্জন চীৎকার ক'রে বল্লে—সব মিথ্যা ? প্রেম যে অনন্ত, মীনা, আমি পাপী, তাই আমায় ত্যাগ করবে ?

মীনা সংযত হয়েছিল । সে বল্লে—পাপ-পুণ্য উপলব্ধি । তুমি যাকে ভালো ভাবো, সে কাজ তোমার কাছে পাপ নয় ।

ন্যায়শাস্ত্রের অবকাশ ছিল না । সে বল্লে—মীনা, তুমি-আমি শাশ্বত সত্য । এক । আমার হাত-পা ভাঙ্লে, কুষ্ঠ হ'লে আমায় ত্যাগ করতে পার, এ কথা তো কোনো দিন ভাবিনি মীনা । আমায় ক্ষমা কর ।

মীনা বল্লে—কুষ্ঠ বা রোগ দেহের । সে করুণা জাগায়, কিন্তু ব্যক্তিত্বই ভালবাসার জিনিষ । তোমার ব্যক্তিত্বকে ভালবেসেছিলাম । সে আজ নেই, সে পরলোকে ।

—তা হ'লে পরলোকে গেলে প্রেম যায় ?

—মোটেই না । যাকে ভালবেসেছিলাম, তাকে বুকে ক'রে রাখব । সরল, সম্ভ্রান্ত, ধার্মিক, নির্লোভ একটা সত্তা । তার স্মৃতিকে ফেলব না । তুমি পদ ও সম্পদ-লোভী মহিলা খোঁজ, নতুন জীবনের সহচরী হবার জন্য ।

রঞ্জন বল্লে—আমি টাকা জাহ্নবীর জলে ফেলব ।

মীনা বল্লে—তাতেও প্রেম ফিরবে না । প্রেম কাঁচের বাসন । ভাঙ্গলে জোড়া লাগে না । আমাদের বাসন ভেঙ্গেছে মিঃ রায় ।

এ গল্পে বর্ণিত ব্যাপার অবশ্য কাল্পনিক । ঘটনা ১৯৪৪ সালের । গল্পে বর্ণিত নর-নারী এবং দপ্তরের বাবু বা সাহেব সব কাল্পনিক ।

লেখক

শেষের কথাগুলো কল্পনা একটু কঠোর স্বরেই উচ্চারণ করে। গুরুতর বিষয়ের উপযোগী গুরুত্ব দেবার জন্যই বোধ করি।

'তাই ভালো!' স্বস্তির নিশ্বাস ফ্যালে লাবণ্য। শোভনীয় যোগাযোগ ঘটলে পটীয়সী ঘটকী যেমন পুলকিত হয়ে ওঠে, তেমন কিছু আহ্লাদের আতিশয্য দেখা যায় না তার চেহারায়। বিয়ে জিনিষটা লোভনীয়ই বটে, তা নিজেরই কি আর নিজের বোনেরই কি! যতক্ষণ তা অব্যক্তের মধ্যে রসায়িত হয়, ততক্ষণ তার চমৎকারিত্ব নিয়ে সন্দেহের অবকাশই নেই, কিন্তু যখনই বাস্তবে রূপ নিতে লাগে তখনই তার নানাদিক থেকে নানান জিজ্ঞাসার চিহ্ন খাড়া করে—নানাবিধ বাস্তবিক প্রশ্ন উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকে।

সত্যি কথা বলতে কি, কল্পনার পাত্র হিসেবে গণেশবাবুকে সে কল্পনাই করতে পারে না। গণেশবাবুর সম্বন্ধে তাদের জানাশোনা এতই কম, এবং সুচারুরূপে অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, গণেশের দিকে মনের টানটা কম আরও। এটা অবশ্য সে আবিষ্কার করল এই মুহূর্তেই, এবং করে নিজেকে পীড়িত বোধ করল। অমন চমৎকার স্মার্ট মেয়ে ওই কনু আর তার সঙ্গে কিনা ওই অজ-উজবুক! এক-আধদিনের জন্য নয়, সারা জীবনব্যাপী! একথা ভাবতেই পারা যায় না। এমনই ওই লোকটা যে, ওর বিনম্র ব্যবহারেই যেন গা জ্বালা করে, সৌজন্যের আতিশয্যে মাথা ধরে যায়, শিভালরির বাড়াবাড়ি দেখে এইসা এক চড় কষিয়ে দেবার জিঘাংসা জাগে যে—কনুর অতঃ পরবর্তী ফটোতে উনিই হবেন কিনা পাশের মূর্তিমান? ভাবতেও ছিছিছি। ওই ভোঁতা তলোয়ারের সঙ্গে আজীবন খাপ খাইয়ে চলতে হবে আমাদের কনুকে....ধারণা করতেই লাবণ্যর মাথা ঘুরতে থাকে। ভাঙা গলায় ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে: 'তুই কি রাজি হয়েছিস?'

'আমি?' কল্পনা জবাব দেয়, 'না।'

'তাই ভালো।' লাবণ্যর অন্তর্গত দীর্ঘনিশ্বাস আরামের মধ্যে মুক্তিলাভ করে।

কিন্তু ক্রমশই তার চিন্তা ঘনীভূত হয়ে ওঠে। এই প্রত্যাখ্যানটা কি সমীচীন হোলো? কনুর দিক থেকেই? বিয়ে তো ওকে করতেই হবে। আর পাত্ররূপে গণেশবাবু এমনই বা কি মন্দ? চেহারাটা তো খারাপ নয়। খুঁটিয়ে দেখলে সুশ্রীই বলতে হবে। আর পয়সাকড়িও আছে বেশ। উভয়ের মধ্যে যাতে দাম্পত্য যোগাযোগ ঘটে যায় এ বিষয়ে বেশ সজাগ ভাবেই দু'জনকে সুযোগের প্রশ্রয় সে দিয়ে এসেছে এতোদিন। এই তথ্য ক্রমশই তার মনে উদিত হতে থাকে। তাছাড়া, গণেশবাবুকে গায়ে পড়া হয়ে নিমন্ত্রণ করে এতদূরে টেনে আনার আর মানেই বা কী থাকতে পারে?

'কী যে করব, কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে সেজদি।' কনু আস্তে আস্তে মাথা তোলে, 'তুমি আমাকে পরামর্শ দাও।'

'দেব বই কি, কনু। কিন্তু আমার পরামর্শ কোনো কাজের হবে কিনা বুঝতে পারছি না। ভাবতে সুরু করলে এমন সব উল্টোপাল্টা আমি ভাবতে থাকি, এমন সব আজগুবি ভাবনা আমার মাথায় আসে যে আমি নিজেই কিছু ঠাওর করে উঠতে পারি না।'

সেজদির সাফ স্বীকারোক্তিকে আমলই দেয় না কনু। সমস্ত ব্যাপারটার চেহারা সে সুস্পষ্ট দেখতে চায় নিজের সামনে। আগাগোড়া ঘটনাটা সে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রকাশ করে চলে। ঘরের বাইরে অন্ধকার তখন ঘোরালো, ঘরের ভেতরে তার আবছায়া। এক কোণে একটা মিটমিটে আলো জ্বলছে, রহস্যময় অন্তরালের মতো। সাহসী হয়ে ওঠে কল্পনা। অভাবিতপূর্ব এবং অভাবনীয় এই আকস্মিক ঘটনাটার—কিম্বা দুর্ঘটনার—সম্পূর্ণ মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় সে।

'এমন গুরুগম্ভীর ভাবে সুরু হোলো, বলব কি সেজদি, একেবারে ঘাবড়েই গেছলাম। গণেশবাবুর মুখ থেকে এ হেন প্রস্তাব, আমি ভাবতেই পারিনি। কিন্তু আমি সতর্ক ছিলুম, মাথা ঠিক রেখেছিলুম, বুঝলে সেজদি? 'হ্যাঁ' বলিনি। কিছুতেই বলিনি ওই জন্যে যে, ও বলা খুব সোজা, বলে ফেললেই হোলো। আর বললেই গেল চুকে। কি বলো সেজদি, ঠিক করিনি কি?'

সেজদির দিক থেকে কোনো সাড়া আসে না।

'গণেশবাবুকে আমি বলেছি—জানি না। জানিই না তো। তা ছাড়া, আমায় তো ভেবে দেখতে হবে। বিয়ে হেন ব্যাপার—একটা ভাবনার বিষয় নয় কি, সেজদি? কিন্তু গণেশবাবুর কেমন অন্যায় আবদার! বলেন, ভাববার

আবার কী আ'ছে? ভাবনার নাকি যথেষ্ট সময় আমি পেয়েছি। ওঁর ভাবখানা ঠিক বোঝা যায় না। মানেটা যেন, বিয়ে—এ, আর এমন কি! কী আর সাংঘাতিক? সামান্যই একটা কাণ্ড যেন, করে ফেললেই হোলো!'

'তাই যদি ভাব হয়ে থাকে তো তেমন দোষ ওঁর দেয়া যায় না। তুমি ওঁকে এতদিন উৎসাহ দিয়ে এসেছ এ কথাও তো মিথ্যে নয়। এ অভিযোগও উনি করতে পারতেন অনায়াসে।' লাবণ্য এবার চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়।

'আমি উৎসাহ দিয়েছি? তাঁকে?' কল্পনা অবাক হয়ে যায়, 'য়্যাতো বড়ো বেহায়াপনার দোষ তুমি দাও আমায়?'

'উৎসাহ দেয়া আর বেহায়াপনা, এক নয়। পুরুষ মানুষদের উৎসাহিত করতেই হয়, তা না হলে কি কোন দিনই এক পা-ও এগুবার সাহস হবে? এমনিতেই ওরা এতো ভীতু। ভয় খাওয়াই ওদের স্বভাব!'

'গণেশবাবু ভীতু একথা ভাবাই যায় না। ওঁর ব্যাপার দেখে মনে হোলো এরকম একটা প্রস্তাব করতে হয় তাই করা। স্রেফ ফরম্যালিটি। তাছাড়া কিছু না। আসলে এ ব্যাপারে আমার যেন কিছু বলবার নেই। আমি সায় দেব, দিতে বাধ্য, এটাই যেন স্বতঃসিদ্ধ।' কল্পনা ক্রমশঃ গরম হয়, 'কেন বাপু, উনি কী করেছেন আমার জন্যে? ভাবখানা যেন আমার মাথা কিনে রেখেছেন। এক এক সময়ে এমন রাগ হয় যে মনে করি—'

যা মনে করে কল্পনা তা উহ্যই রাখে।

'বাস্তবিক। এই পুরুষ মানুষগুলো এমন গোঁয়ার-গোবিন্দ কে জানতো আগে? মনে করে যেন ওঁদের পুরুষদের মতো, মেয়েরাও নিজের মতামত সর্বদা তৈরী করে রেখেচে। আর যদি তৈরী করাও থাকে, ওঁদের মুখের কথা খসা মাত্র প্রকাশ করে ফেলতে বাধ্য অমনি। যেন ভারি গরজ মেয়েদের!'

'সত্যিই!' কল্পনার উচ্ছ্বাসে লাবণ্য বাধা দেয়, 'মেয়েদের ধরণই ওই। বিশেষ করে, তোর মতো মেয়েরা যারা সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছে। প্রেম করতে গিয়ে পরিণামে বিয়ে করতে হবে এ তারা ভাবতেই পারে না। তারা চায় চিরদিন—সেই রোমান্সের চূড়ান্ত পরিণতির দিকে মুখ ফেরাতে চায় না কিছুতেই। মেয়েদের অবশ্যি এজন্যে দোষ দেয়া যায় না, যদিও একচোখো লোকেরা মেয়েদেরই দোষ দিয়ে থাকে।'

কল্পনা মনোযোগ দিয়ে দিদির লেকচার শোনে: 'ঠিক বলেছ সেজদি। আমিও তো তাই বলছিলাম। এই কারণেই, বিয়ের মতো হেস্তনেস্ত ব্যাপারের আগে ভালো করে ভাববার যথেষ্ট সময় নেয়া দরকার, নয় কি? মেয়েকে নিজের মন জানতে হবে, নয় কি? কী বলো তুমি? তুমি নিজেও কি সময় নাও নি সেজদি?'

'হ্যাঁ নিয়েছিলাম, নিয়েছিলাম বই কি!' লাবণ্য বলে, 'দু-মিনিট কেবল। বেনারস ইঞ্জিনিয়ারিং-এ উনি ভর্তি হয়েছিলেন, স্টেশনে যাবার পথে আমাদের বাড়ী এলেন। ট্রেন ফেল করার খুব বেশি সময় ছিল না। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়েই প্রশ্নটা করলেন। আমি বল্লাম—না!' তারপরই কিন্তু তাঁকে ডেকে ফিরিয়ে নিজের ভুল শুধরে নিলাম। তক্ষুনি তক্ষুনি।'

কল্পনা কিছু বলে না,—চোখ বড়ো করে চেয়ে থাকে।

'আমার চেয়ে বেশি ভাববার সময় তুই পেয়েছিস।' লাবণ্য অনুযোগ করে, 'আরও কত সময় তুই চাস?'

'আমি বলেছি, মধুপুর থেকে যাবার আগে জবাব দেব।'

'কেন, কী বলবি, এখনো ঠিক করতে পারিস নি তুই?'

'জানি না' কল্পনা জবাব দেয়, 'কী বলব তাই তো আমি ভাবছি।'

লাবণ্য কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। 'বেশ, তাহলে আগাগোড়া সমস্তটাই ভেবে দেখা যাক। আমরা দুজনেই ভাবি আয়।'

কল্পনা ঘাড় নাড়ে। তার ঈষদুষ্ণতা তখন জুড়িয়ে এসেছে।

'প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাতেই ওর ওপর তোর মন পড়েছিল। গোড়া থেকেই ওকে তোর ভাল লেগেছিল—কেমন কি না?' লাবণ্যর জেরা সুরু হয়।

'হ্যাঁ,' কল্পনা ক্ষীণস্বরে জানায়: 'তবে ঠিক কি ধরনের ভালো লাগা তোমাকে আমি বলতে পারব না, সেজদি। দেখতে মন্দ নয়, আদব-কায়দা ভালো; চমৎকার ষ্টাইল,

নিভে আসে।

'থামলি কেন ?' লাবণ্য উসকে দেয় ওকে : তারপর বেশ কিছুদিন ঘনিষ্ঠভাবে মেশার পর—?'

'বাঃ সে তো একটু আগেই তোমাকে বললুম না ? সেই কথাই তো বলছি সেজদি।'

'ওঃ! আজকের এই বিয়ের প্রস্তাব! তা—তা—এই প্রস্তাবের পরে তোর মনের অবস্থাটা এখন কেমন ?'

'এখন তো আমি মাথা ঘামাচ্ছি তাই নিয়ে।' কল্পনা উত্তর দেয় : 'গণেশবাবুকে আমি ভালবাসি কিনা, ভালবাসতে পারব কিনা, উক্ত ভদ্রলোক ভালবাসবার উপযুক্ত কিনা, গণেশ নামের কাউকে ভালবাসা আধুনিক কালে সম্ভব কিনা, সঙ্গত কিনা, এই সবই তো ভাবছি। আমার সব চেয়ে আশ্চর্য লাগছে মানুষটার অদ্ভুত ধরন। ছেলেরা প্রেমে পড়লে ওই রকমই হয় বুঝি! ইতিমধ্যেই ওঁর ধারণা হয়ে গেছে যে আমি যেন ওঁরই জিনিস।'

লাবণ্য ভাবে, কি বলবে ভেবে পায় না। কিছুক্ষণ যায়, সে জিজ্ঞাসা করে, তুই ওর জিনিস, ওর এই ধারণাটাই কি ওকে না পছন্দ করার কারণ ?'

'তাও বলতে পারি না। কিরকম অদ্ভুত ধারণা ভাবো তো সেজদি। এরকম ধারণা হয় কেন ?' কল্পনা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

'এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলাম!'—লাবণ্যর দু' চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, 'আমার মনে হয় তুই—'

'কি—?'

'তুই গণেশবাবুকে—'

ঠিক সেই মারাত্মক মুহূর্তে লাবণ্যর 'উনি' এসে আবির্ভূত হন। কল্পনাও তৎক্ষণাৎ পাশের ঘরে পল্লবিনী লতার মতো লতিয়ে যায়। নিঃশব্দে, বিনা বাক্যব্যয়ে।

'ওগো শুনছো ?' লাবণ্যর কণ্ঠস্বর রীতিমত ভাবাত্মক, 'কী হয়েছে জানো কিছু ?'

বলার ধরনে মনে হয়, যেন সব দোষ সমস্ত অজ্ঞানতার জন্য অকস্মাৎ আগত এই ব্যক্তিটিই একমাত্র দায়ী।

'না, জানি না তো। কিন্তু জেনে নেবো। তুমি নিজেই যখন সশরীরে বর্তমান আছ', উনি জানান : 'তখন জানতে কতক্ষণ ?'

'না', ঠাট্টার কথা নয়। তোমাকে নিয়ে কি করব বলত! সব কথাই তুমি হেসে উড়িয়ে দাও। কবে যে একটু বুঝদার হবে ? সত্যি, ভারি বেয়াড়া ব্যাপার। বুঝেচ, গণেশবাবু—হ্যাঁ, গণেশবাবু—'

উনি উদ্‌গ্রীব হবার চেষ্টা করেন, হ্যাঁ, বুঝেছি।'

'গণেশবাবু কনুর কাছে বিয়ের কথা পেড়েছেন আজ।'

এবার সত্যিই উনি চমকে যান, 'হ্যাঁ, বলো কি!' তারপর নিজেকে সামলে নেন : 'তা, তা, তাতে আর হয়েছে কি ?'

'কী হয়েছে! অবাক করলে তুমি! নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যাবে না, বুদ্ধিশুদ্ধি আর হবে না তোমার কোনো কালে। ঐ হোঁৎকা গণেশবাবুর সঙ্গে কিনা আমাদের কনুর—তুমি বলো কি গো ? মাথা খারাপ হোলো নাকি তোমার ?

'তা বটে। ওটা একটু হোঁৎকাই বটে।' পত্নীর সার্টিফিকেটে উনি একবাক্যে সায় দেন। 'কিন্তু আমার ধারণা ছিল ছোকরাকে তুমি পছন্দই করতে।'

'পছন্দ কোনদিনই করিনি।' লাবণ্যর দিক থেকে প্রবল প্রতিবাদ আসে।' তবে আমি ভেবেছিলুম গণেশবাবুর সঙ্গে যদি সম্বন্ধটা বেধে যায় তাহলে এমন মন্দ কি ?'

'তা বাধছে না কেন ?' ওঁর চোখ কপালে ওঠে : 'কনু—কনুরও কি ওকে অপছন্দ ?'

'কনু এখনও কিছু ঠিক করতে পারেনি।'

'তাহলে তো মুস্কিল!' ওঁর মাথা ঘামতে থাকে। 'ভারি মুস্কিল তো! পছন্দ কিনা ঠিক করে উঠতে না পারলে কি করে তবে বিয়ে হবে ? বিয়ের পরে ওসব খুঁটিনাটি না হলেও চলে যায়, কিন্তু বিয়ের আগে ? উহুঁ, পছন্দ চাই-ই।'

'হুঁ।' লাবণ্য তার গম্ভীর গ্রীবা আন্দোলিত করে জানায় : 'নিশ্চয়!'

'কনু কী জবাব দিয়েছে গনুকে ?'

'বলেছে, মধুপুর ছাড়বার আগে জানাবে।'

'সে তো দু' হপ্তার ধাক্কা! কনুর পছন্দর প্রত্যাশায় কি বেচারাকে এতদিন ধরে খাবি খাওয়ানো ঠিক হবে ? এত সময় হাতে পেলে ভেবে চিন্তে আত্মহত্যা করে ফেলতেও পারে, হার্টফেল করাও সম্ভব।'

'আমি তার কি করছি?'

'ভারি হাঙ্গামা তো! আচ্ছা, আমি কল্লুর সঙ্গে কথা কই। দেখি পছন্দ করানো যায় কিনা!'

'তাহলেই তুমি গোল বাধাবে। অমন কাজও কোরো না।'

'কেন? আমি কি কথা কইতে জানি না?'

'দেখো, খুব সাবধান কিন্তু! কল্লু কি রকম সেন্‌সিটিভ মেয়ে, জানো তো?'

'জানি জানি! আমাকে আর তোমায় অতো করে বলতে হবে না।'

হঠাৎ কিছু বেমক্কা বলে বোসো না যেন। খুব আস্তে আস্তে কথাটা শুরু করো। বুঝলে? মেয়েদের মন হচ্ছে কাঁচের বাসনের মতো। ভারি ঠুনকো, কথার ঘায়ে বাজানোও যায়, ভাঙাও যায় তেমনি আবার।'

'সাহিত্য সুরু করলে যে!'

'আমাদের মনের কি জানবে তোমরা? আমরাই জানিনে! সত্যি, বোকার মতো যা তা বলে' বোসো না যেন। ছিপি খুলে একটু বুদ্ধি না হয় খরচই করলে। জীবনে একটা দিন হাঁদা না হলেও তেমন বিশেষ ক্ষতি হবে না তোমার।'

'ভেব না, ভেব না। খুব কৌশলে আমি কথাটা পাড়ব। হঠাৎ কিছু বলব না, সোজাসুজিও বলব না। ফস করে বেঁফাস কিছু নয়। খুব ঘুরিয়ে, ফিরিয়ে, কায়দা করে ইনডিরেক্টলি কথাটা পাড়তে হবে তো? এখনই আমি যাচ্ছি ওর কাছে!'

কিন্তু ওঁকে আর জয়যাত্রায় বেরুতে হয় না। কল্লু নিজেই বাতি হাতে কি খুঁজতে ঘরের মধ্যে আসে। ওর মুখের চেহারা দেখেই বোঝা যায় একটু আগেই ও কেঁদেছে। লাবণ্যর চোখে তা ধরা পড়ে। লাবণ্য ওর দিকে হাত নেড়ে ইঙ্গিত জানায়, যার অর্থ হচ্ছে, এখন নয়, এখনই নয়, এখন ও-কথা নয়। কিন্তু সে ইশারা উনি গ্রাহ্যই করেন না। ওঁর সমস্ত মুখ তখন ভয়ানক খুশীতে ভরে উঠেছে। বাল্মীকির প্রথম বাক্যের মতো ওঁর মর্মভেদী বাণী বহির্গত হয়ে গেছে—'এই যে কল্লু! হোঁৎকা গণেশ কি বলছিল আজ তোমায়?'

লাবণ্য সোফায় এলিয়ে পড়ে। কে যেন তাকে গুলি করেছে। দু' হাতে সে মুখ ঢাকে।

কল্লু যেন ওঁর কথা শুনতেই পায় না। মুখ ফিরিয়ে একবার তাকায় ওঁর দিকে, কিন্তু সে মুখে ভাবের ছায়ামাত্র নেই। চোখে যেন সে দেখছেই না। তার দৃষ্টি যেন ভগ্নিপতিকে ভেদ করে দু-হাজার মাইল দূরে প্রসারিত। যেমন স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো সে এসেছিল, তেমনি চলে গেল আবার।

'আচ্ছা মেয়ে বাবা!' অনেকক্ষণ পরে ওঁর বাক্যস্ফূর্তি হয়, 'বেশ একখানা লেডি ম্যাকবেথিশ্‌ ষ্টাইল ঝেড়ে গেল! এমন নিশির ডাকে পাওয়ার আর্টিষ্টিক অভিনয় থিয়েটারের বাইরে দেখার সৌভাগ্য আমার কমই হয়েছে। তুমি যদি অমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কায়দা করে কথা না কইতে বলতে, পুরুষ মানুষের মতো সোজাসুজি কথা পাড়তে দিতে আমায়—'

'দোহাই তোমার পায়ে পড়ি! আর কথা কইতে হবে না তোমাকে।'

'কইবই না তো! আধখানা কথা পেটে, আধখানা মুখে....অমন করে কথা বলতে কেবল মেয়েরাই পারে। আমরা পুরুষ মানুষ—সোজা কথা সোজাসুজি বলে ফেলতেই ভালবাসি।'

উনি গজগজ করে গজরাতে থাকেন।

দিদির ঘর থেকে বেরিয়েই গণেশের সঙ্গে মুখোমুখি হোলো কল্পনার। গণেশ এগিয়ে আসে। 'কল্লু!' নরম গলায় ডাক দেয়।

'একটি কথাও না এখন।' কল্লুর কণ্ঠস্বর পৃথিবীর মতোই, উত্তর-দক্ষিণে চাপা।

গণেশ আঙুল দেখায়, 'ও! তোমার দিদি আর উনি ঐ ঘরে বুঝি? বুঝেছি। কিন্তু সব ঠিক তো আমাদের?'

'সেজদিকে বলেছি আমি।'

'য়্যাঁ?' গণেশ বিচলিত হয়! 'সমস্ত? বলো কি? আজ রাত্রে এখান থেকে পালিয়ে কলকাতায় গিয়ে আমাদের বিয়ের কথাও?'

'সেসব প্ল্যান কি আউট করি? পাগল!' কল্পনা জবাব দেয়।

কুকুর-বেড়াল

[একাঙ্কিকা]

নাট্যকার মন্মথ রায়

[বিখ্যাত এ্যাডভোকেট গম্ভীরানন্দ মিত্রের চেম্বার। শ্রীযুক্ত মিত্র একটি ফাইল পাঠরত। চেম্বারের পরদা সরাইয়া একটি মহিলা দেখা দিলেন।]

মহিলা ॥ আসতে পারি ?

[মিত্র আসিতে ইঙ্গিত করিলে অতি আধুনিক একটি তরুণী উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন]

তরুণী ॥ আমি বড় বিপন্ন শ্রীযুক্ত মিত্র। স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। আমি জানি, এ বিষয়ে আপনার চেয়ে বড় উকিল আর নেই বললেই হয়, কিন্তু তাতেই হয়েছে বিপদ। আমার স্বামীকেও দেখলাম, আপনার এই চেম্বারের দিকে আসছেন। কিন্তু আমি এসেছি আগে। আশা করি আপনি আমাকেই সাহায্য করবেন। আমি আপনাকে আপনার পুরো ফি একশ' টাকাই দেব।

[চেম্বারের দরজায় স্বামীর কণ্ঠও শোনা গেল]

স্বামী ॥ আসতে পারি স্যার ?

[শ্রীযুক্ত মিত্র এই অনুমতি যাহাতে না দেন তাহার জন্য স্ত্রী হাত নাড়িয়া ব্যাকুল মিনতি জানাইলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত মিত্র তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না।]

স্বামী ॥ আসবো স্যার ?

[অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই তিনি ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। মিত্র অঙ্গুলী নির্দেশে তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। স্বামীটি স্ত্রীর দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া চেয়ারে বেশ গ্যাঁট হইয়া বসিলেন]

স্ত্রী ॥ (স্বামীকে) তুমি ভেবেছ কি ? তুমি এখানেও আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে নাকি ?

স্বামী ॥ আমি জানি, শ্রীযুক্ত মিত্র বিবাহ বিচ্ছেদের সবচেয়ে বড় উকিল। তুমি যে ওঁর কাছে এসে আমার নামে কতকগুলো মিথ্যে কথা লাগিয়ে ওঁর মন গলিয়ে দেবে—আমার বিরুদ্ধে ওঁর মন বিষিয়ে দেবে—এ আমি হতে দেব না।

স্ত্রী ॥ (মিত্রকে) আমি আগে এসেছি। আমি আপনাকে পুরো ফী দেব। আশা করি আপনি আমার কথাই শুনবেন শ্রীযুক্ত মিত্র।

মিত্র ॥ (মৃদু হাস্য।)

স্বামী ॥ (মিত্রকে) আমিও আপনাকে আপনার পুরো ফী একশ' টাকাই দেব, আমার কথাও আপনাকে শুনতে হবে স্যার।

মিত্র ॥ (এবারও মৃদু হাস্য।)

স্ত্রী ॥ লোকটি কেমন জুলুমবাজ, আশা করি আপনি এতেই বুঝে গেছেন শ্রীযুক্ত মিত্র। দরকার হলে লোকটি খুনও করতে পারে, এও আপনাকে বলে রাখছি স্যার।

স্বামী ॥ বিনা দরকারেই তুমি আমাকে প্রায় খুন করেছো। কি বলবো স্যার,—কি বলবো স্যার, একটা জলন্ত চিমটা দিয়ে আমাকে পুড়িয়েছে।

স্ত্রী ॥ তুমি একটা জলন্ত সিগারেট আমার হাতের উপর ঠেসে ধরেছিলে ! তাই না আমি নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে ঐ জলন্ত চিমটা দিয়ে তোমাকে ঠেঙিয়ে আত্মরক্ষা করেছি। নইলে কি কেউ সাধ করে স্বামীর গায়ে হাত তোলে !

স্বামী ॥ স্যার আপনিই বুঝে দেখুন, কেউ কি সাধ করে স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে ? আদরের স্ত্রীর গায়ে ? যখন দেখলাম, না, আর উপায় নেই, তখনি না আমি—

স্ত্রী। উপায় ছিল না—একথা ধর্মতঃ বলতে পারো

তুমি? ঐ বাঘাটা—কুকুরটা তোমার না পুষলে কি কিছুতেই চলতো না?

স্বামী॥ আমি তোমাকে বিয়ের আগেই বলেছি, বিয়ের পরেও বলেছি, দেখ, আমি সব সইতে পারি, কিন্তু বেড়ালের 'ম্যাঁও ম্যাঁও' ডাক সইতে পারিনে। তবু কিনা তুমি সেই বেড়ালই পুষলে গণ্ডায় গণ্ডায়?

স্ত্রী॥ লোকে হাতি পোষে, বানর পোষে, আর আমি স্ত্রী বলে আমার কি এটুকুও স্বাধীনতা নেই যে আমি একটা বেড়াল পুষবো? বেড়াল পুষেছি বেশ করেছি।

স্বামী॥ ঐ বেড়াল তাড়াতে আমিও বাঘা কুকুর পুষেছি—বেশ করেছি।

স্ত্রী॥ বেশ করেছো? বেশ, আমিও তাই তোমাকে চাবির রিং ছুঁড়ে মেরে অন্যায় করিনি।

স্বামী॥ আর তাই আমিও তোমার গায়ে এক বালতি গরম জল ঢেলে দিয়ে কোন অন্যায় করিনি।

স্ত্রী॥ (মিত্রকে) আপনি শুনেছেন স্যার?

মিত্র॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইলেন 'হ্যাঁ')

স্বামী॥ আশা করি আপনি আমার কথাগুলোও শুনেছেন।

মিত্র॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইলেন 'হ্যাঁ')

স্ত্রী॥ এই লোকটির এই সব অত্যাচারে আমাকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছে তিন মাস।

স্বামী॥ হ্যাঁ, নিজের খরচে নয়, আমার খরচে। আর তোমারও ঐ সব অত্যাচারে আমাকেও হাসপাতালে থাকতে হয়েছে পুরো তিন মাস। তার খরচ তুমি দাওনি—সে খরচ বইতে হয়েছে আমাকে।

স্ত্রী॥ এই তিনটি মাস হাসপাতালে পড়ে থাকায় আমার যে কী নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে তা' তুমি জানো?

স্বামী॥ তোমার আবার কি নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে? নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে আমার। হাসপাতাল থেকে বাড়ি গিয়ে দেখি আমার বাঘা নেই। তার বকলসটাই শুধু পড়ে আছে। বেচারি আমার শোকে তিলে তিলে কাঠ হয়ে মারা গেছে।

স্ত্রী॥ আর আমার? আমার ক্ষতি হয়নি? হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে দেখি আমার ধাড়িটা গেছে পালিয়ে, বাচ্চাগুলো সঙ্গে নিয়ে। (ক্রন্দন)

স্বামী॥ আর আমার বাঘাটা? তার লাশটা পর্যন্ত আমি দেখতে পেলাম না। (ফুঁপাইয়া ক্রন্দন)

স্ত্রী॥ (ধরা গলায়) একি! পুরুষ মানুষ হয়ে তুমি ভেউভেউ করে কাঁদছো? স্যার কি মনে করছেন বল তো? না না, শোনো, তুমি কেঁদো না! আমি সব সইতে পারি—তোমার কান্না সইতে পারিনে। তুমি কাঁদলে আমার কান্না পায়। তুমি কেঁদো না। বেশ, বেড়াল আর আমি পুষবো না; পুষবো না।

স্বামী॥ তুমি বেড়াল না পুষলে, আমারো কুকুর পোষার কোনো মানে হয় না। বেড়াল যদি না থাকে কুকুরও থাকবে না।

স্ত্রী॥ তবে তো ঝগড়া-ঝাঁটির আর কোনো কারণই থাকে না। (মিত্রকে) আপনি কি বলেন স্যার?

মিত্র॥ (মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন)

স্বামী॥ তবে তো বিবাহ বিচ্ছেদের কথাই উঠছে না। কি বলেন স্যার?

মিত্র॥ (মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন)

স্ত্রী॥ তাহ'লে আমরা আর এখানে কেন! কি বল গো?

স্বামী॥ তা তো বটেই। চলো—বাড়ি চলো।

স্ত্রী॥ (হাসিমুখে) তাহলে এখন থেকে আমাদের কুকুর-হীন জীবন—

স্বামী॥ এবং বেড়াল-হীন জীবন, কেমন তাই তো?

স্ত্রী॥ নিশ্চয়! নিশ্চয়! এখন শুধু তুমি আর আমি।

স্বামী॥ হ্যাঁ, আমি আর তুমি। কুকুর বেড়াল ভুলে গিয়ে—

স্ত্রী॥ একমন একপ্রাণ হয়ে—(অনুরাগ ভরে স্বামীর হাত ধরিতে গেলেন)

স্বামী॥ আঃ! দেখছো না, স্যার—

স্ত্রী॥ ওঃ! (সংযত হইয়া) আচ্ছা স্যার, তাহলে আমরা আসি।

মিত্র॥ (সস্মিত মুখে সম্মতি জানাইলেন।)

স্বামী॥ চললাম স্যার।

(শেষাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ

আত্মিক-চেতনায় কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঋষিদৃষ্টিতে দেখেছেন পরমসত্যের বিস্ময়কর রূপ—সৌন্দর্য ও আনন্দের উপলব্ধিতে স্পন্দিত। রবীন্দ্রনাথ এই অনন্তের রূপকেই উদ্‌গীত করেছেন উপলব্ধির বিচিত্র প্রকাশে—মৃন্ময়কে অতিক্রম করে চিন্ময়ের আনন্দ রূপে। তাই প্রাণের যোগে উদ্বোধিত হয়ে উঠে দেখেন বিশ্বস্পন্দনে অণু-পরমাণু কম্পমান, চেতনার তালে তালে সঞ্চারিত এক রস-ধারা অনন্তের দিকে প্রবাহিত, অনন্তের আনন্দে জেগে আছে চরাচর—দুঃখের ঊর্ধ্বে এই আনন্দের নিবিড়তায় ধ্বনিত নিত্যসঙ্গীতে চিরন্তন। সেখানে সীমার মধ্যে অসীমের সুর। কবি দেখেছেন, নিত্য লীলায় অনন্তের প্রকাশকে—তাই বলেন, "আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।"

বিচিত্রের দূতরূপে কবি বলেছেন নিজেকে—এই বিচিত্রের দূত। এই বিশ্বসংসারে দেখেছেন, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে চলছে এই সীমা-অসীমের পালাগান। সীমার মধ্যে বিচিত্রকে দেখেছেন—অসীমের আনন্দে খুঁজে পেয়েছেন মুক্তি-রসের আস্বাদ।

এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই আত্মকথায় বলেছেন—

"প্রকৃতি তাহার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধি-মন তাহার স্নেহ-প্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে, তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই। নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণ-পাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে। প্রেম ও প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়; যে জিনিষটাকে সন্ধান করিতেছি, দীপালোক কেবলমাত্র সেই জিনিষটাকে প্রকাশ করে তাহা নহে, সমস্ত ঘরকে আলোকিত করে। জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদের টানিতেছেন—আর কাহারও টানিবার ক্ষমতা নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যে সেই অরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুক্ত, সেই মোহেই আমার মুক্তি-রসের আস্বাদন।"

কবির মহাজীবনের পরিচয় ফুটে উঠে সৃষ্টির ক্ষেত্রে—কবির জীবন দ্রষ্টা ও স্রষ্টার জীবন। চিন্তার তরঙ্গে তরঙ্গে

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ)

[মিত্র সস্মিত মুখে সম্মতি জানাইলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নমস্কার করিয়া যাইতেছেন। এমন সময় শ্রীযুক্ত মিত্র টেবিলে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া হুংকার দিয়া হাত পাতিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চমকাইয়া উঠিলেন।]

স্ত্রী ॥ ও! তাই তো! ফী! ১০০৲ টাকা! (পার্স খুলিয়া টেবিলের উপর ১০০৲ টাকা রাখিলেন)।

স্বামী ॥ বটে'ই তো! (মানি ব্যাগ হইতে ফী'র টাকা শ্রীযুক্ত মিত্রের সামনে রাখিলেন)

উভয়ে ॥ (স্বামী ও স্ত্রীর মুখ বাঙলা পাঁচ-এর আকার ধারণ করিল) আচ্ছা চলি!

মিত্র ॥ [নোটগুলি গুনিতে লাগিলেন]।

॥ যবনিকা ॥

কবি-হৃদয় জগৎ-রহস্যকে তাই উদ্ঘাটন করে। দেখে, বিশ্ব-জগতের হৃদয় স্পন্দিত হয়ে নিত্যকালের রস-উৎস অবিরাম উৎসারিত হয়ে চলেছে—কাল থেকে কালে, যুগ থেকে যুগে বিচিত্র রূপে সেখানে আনন্দ বেদনার গান। ব্রহ্মদর্শী কবির মত ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন অনন্তকে। মুক্তিলাভের জন্য সংসার-বৈরাগ্য এবং ইহ-বিমুখতার প্রয়োজন কবি কখনো অনুভব করেননি—দ্রষ্টার দৃষ্টিতে দেখেছেন অন্তরের প্রকাশকে। মুক্তি ও বন্ধনের সমন্বয়ের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মুক্তি-ভাবনাবোধের প্রকাশ নানাভাবে বিকশিত। ইন্দ্রিয়ের সীমায় অতীন্দ্রিয় অনুভূতির আস্বাদন, সীমার মধ্যে অসীমের রাগিণী শ্রবণ, রূপের মধ্যে অপরূপকে দর্শন, কবির অধ্যাত্ম-চিন্তাকে বিকশিত করেছে সহস্রদল পদ্মের মত। এখানে কবির অনুভূতি আধ্যাত্মিক চেতনায় একটি নতুন ভাবস্বর্গ বিরচিত করেছে। ভাবলে বিস্ময় লাগে যে, সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময় বিশ্বৈক্যানুভূতির আলোকে বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির আলোক বিকীরণ দেখেছে কবির আধ্যাত্ম-মানস। এখানে কবি বৈরাগ্যবাদী উদাসীনতার সঙ্গে সংসারকে ত্যাগ করার চা[illegible]—[illegible] বন্ধনের মধ্যেই অপরিণামের আনন্দকেই সন্ধান করে। আমরা শুনতে পাই—

"যেনাক্ষং পুরুষং বেদং সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥"

—বেদান্তের সেই চরম ও পরম কথা। সেই সত্যরূপী অমর পুরুষের, সেই সত্যস্য সত্যং ব্রহ্মতত্ত্বের বাণী।

দার্শনিকতার দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চিন্তার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সংসারকে স্বীকার করেই মুক্তি—সাধনার দর্শন। কবির কথাতেই দেখতে পাই, বিশ্বজীবনের সঙ্গে সংযুক্তির পথে আত্মার আনন্দ বিহারের কথা। কবি বলছেন—

"আজ বুঝিয়াছি সে সকল লেখা উপলক্ষ্য মাত্র, তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন রচনাকারী আছেন। তাঁহার সম্মুখে সেই ভাব তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান। শুধু কবিতা লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন তাহা নহে।....আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন। তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা বিচ্ছেদের দ্বারা বিশ্বের সহিত বিরোধের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন। তাই যে কবি, যিনি সমস্ত ভালো-মন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল-প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে "জীবন দেবতা" নাম দিয়াছি।"

'জীবন দেবতা'র লীলাসঙ্গীতেই বিশ্বজীবন ও বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্মুখীন রহস্য উদ্ঘাটিত করে কবিমানস ব্রহ্মসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে—এই ব্রহ্মসত্য রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চিন্তার চরম প্রকাশ। কবি সীমার মধ্যে অসীমকে দেখেছেন বলেই রস সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে' আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করেছেন, বিশ্বের অনিত্যের মধ্যে সত্যের চিদ্ঘন নিত্যরূপ দেখেছেন, কবি চিরবন্ধন-মুক্ত প্রাণের আলোকে অখণ্ড সত্যের সমগ্র রূপকে প্রত্যক্ষ করেই বলেছেন—

জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের লীলায় সংসারে লীলার আনন্দ। মর্ত্যে অমর্ত্যের আলো ঝরে পড়ে বলেই সীমা অনন্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে রচনা করে ব্রহ্মভাবদ্যুতিতে সচ্চিদানন্দের আনন্দরূপ।

কবি তাই দেখেন—

"কুসুম আপন গন্ধে সমস্ত সংসার
সম্পূর্ণ করিয়া তবু সম্পূর্ণতা নয়;
তোমারি পূজায় তার শেষ পরিচয়।
সংসার বঞ্চিত করি' তব পূজা নহে।"

সংসারকে বঞ্চিত করে নয়, সংসারকে স্বীকৃতি দিয়েই বিশ্বদেবের পূজা। বিশ্ব-সত্তার পরশে সুন্দরের আনন্দ তরঙ্গিত হয়—দুঃখের ঊর্ধ্বে মৃত্যুর ঊর্ধ্বে মানবাত্মার ভূমা-নন্দের মহাসঙ্গীত ধ্বনিত হয়ে বিশ্বসত্তায় ভাগবতসত্তার পরমানন্দকে সমুদ্ঘাটিত করে, প্রকাশিত করে। সংসার লীলাতেই কবি মুক্তির আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন বলেই কবির দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়ে—

"এই বিশ্বসত্তার পরশ,
জলে স্থলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরশ
তুলি লব অন্তরে অন্তরে,
সর্ব দাহ রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে কণ্ঠস্বরে,

জাগরণে যেথানে তন্দ্রায়,
বিরাম সমুদ্রতটে জীবনের পরম সন্ধ্যায়।"

বৈষ্ণব কবির দৃষ্টিতে ভগবানের চিদ্‌রসঘন যে মূর্তি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে বিদ্যাপতির কাব্যে তা বাঙ্ময়—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাথ লাথ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

প্রেমধর্মের এই অপূর্ব রস বৈষ্ণব কবিবৃন্দের পদাবলীতে অলৌকিক প্রেমের রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতাও প্রেমধর্মের দ্যুতিতে ভাস্বর। তিনি বলেন—

"সংসার বঞ্চিত করি' তব পূজা নহে।"

"বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে,
আমি একা বসি' রব মুক্তি আরাধিতে?
জন্মেছি যে মর্ত্যলোকে ঘৃণা করি তা'রে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।"

অন্তরে প্রেমধর্মের নির্ঝর ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে বলেই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা প্রেমসুন্দর। কবি বিশ্ব ও প্রকৃতিকে জীবনে বারংবার নব নব রূপে দেখেছেন, অন্তরের আনন্দ-বেদনায় সংসারকে স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার মর্মবাণী প্রেমের মাহাত্ম্য—মিলনের আনন্দ ও বিরহের অশ্রুতে। কবির জ্ঞান-ধ্যান, তপস্যা-ত্যাগ, অনুরাগ-বৈরাগ্য-পন্থীর সংসার দুঃখের মূলে, পরে নয়।

এ যেন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডকে বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যকে খুঁজে পাওয়া। অব্যক্ত ব্যক্ত এখানে—নিত্যলীলার সঙ্গীতে সঙ্গীতে গভীরতম ও নিবিড়তম ভাবে কবি জীবনদেবতার বন্দনা করেছেন—'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' দেখেছেন অরূপকে সংসারের তীর্থভূমিতে রূপময় গুণময় আনন্দময়রূপে। সংসারের বন্ধন মধুর হয়ে উঠেছে পরশাতীতের পরশে। কবি তাই বলেন—

"মর্তবাসীদের তুমি যা দিয়েছ প্রভু
মর্তের সকল আশা মিটাইয়া তবু
রিক্ত তাহা নাহি হয়। তার সর্বশেষ
আপনি খুঁজিয়া ফেরে তোমারি উদ্দেশ।"

চরম সত্য, চরম সৌন্দর্য, চরম মঙ্গল অন্তরানুভূতিতে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতায় এই সত্যই তুলে ধরেছে অনির্বচনীয় আনন্দের নিত্যআস্বাদনের রসানুভূতি।—

সূর্য কি আমায় চেনে?

উমাদেবী

সূর্য কি আমায় চেনে? আমি সন্ধ্যাতারা,
পশ্চিমের বিগলিত-স্বর্ণালোকচ্ছায়ে
সূর্যকে দেখেছি আমি স্তিমিত সন্ধ্যায়—
ধীরে ধীরে মিলেছে সে রাত্রির তিমিরে।
রাত্রির তিমিরে দিক থেকে দিগন্তরে
অনেক খুঁজেছি তাকে তন্দ্রাহারা হয়ে—
বিলাপ করেছি কত—"হীন অন্ধকার,
সূর্য-সঙ্গে যা এনেছে সুচির বিচ্ছেদ।"

—হে সূর্য, মুহূর্ত শুধু ফিরে চেয়ে দেখো—
আমি শুভ্র শুকতারা উজ্জ্বল আকাশে—
যাই—যাই—ডুবে যাই—আলোক-প্রবাহে—
আলোক-প্রবাহে ডুবে যাই সর্বহারা।
বন্ধু ফেরো—ফিরে চাও একটি নিমেষ—
—কে জানে, আলোকও আনে সুচির বিচ্ছেদ!

অলৌকিক রহস্য — সত্য ঘটনা

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রত্যক্ষদর্শীর কথা

অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং প্রেততত্ত্ব নিয়ে যাঁরা অনুশীলন করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে বলেন, ভূতে পায়নি, এমন কোনো ব্যক্তিকে যদি চক্রবৈঠকে মিডিয়াম করা হয়, তাহলে তার তন্দ্রাবস্থায় সে যে-কথা বলে, সে-সব কথা তার নিজের মনের বা নিজের থেকে বলা কথা নয়....তার উপর তখন কোনো মৃতের আত্মার ভর হয় এবং সেই আত্মার দ্বারা সম্পূর্ণ আবিষ্ট হয়ে মিডিয়াম তখন কথা বলে, প্রশ্নের জবাব দেয়।

এ-সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শী এ-ব্যাপারে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় যে-বিবৃতি লিখেছেন, তার মর্ম সঙ্কলন করে দিচ্ছি।

তিনি লিখেছেন—১৯০৩ সাল থেকে তিনি এ-বিষয়ে অনুশীলন করছেন এবং এর মূল তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য তিনি বহু পরীক্ষা করেছেন।

তাঁর প্রথম পরীক্ষা হয় কলিকাতা দর্জিপাড়ার কবিরাজ অন্নদাচরণ সেন মহাশয়ের গৃহে। কবিরাজ মহাশয়ের একটি ছাত্র....তাঁর বয়স তখন আঠারো বছর। তিনি কবিরাজ মশায়ের গৃহে থেকে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করছিলেন। বালকটি শুদ্ধাচারী এবং সত্যপরায়ণ....বিনয়ী এবং বুদ্ধিমান। কবিরাজ মশায়ের গৃহে সাইকিক চক্রবৈঠক বসতো হপ্তায় দুদিন নিয়মিত ভাবে এবং সে-বৈঠকে বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি, উকিল, ডাক্তার এবং পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা উপস্থিত থাকতেন। লেখক লিখেছেন—দু চার বার এ-ছেলেটিকে আমি মিডিয়াম হতে দেখেছি। বৈঠকের পরে যখন তিনি সচেতন ভাবে নিজের পড়াশুনা বা কাজকর্ম করতেন, তখন তাঁকে এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন—Trance হলে তিনি কি করেন, কি বলেন, সে সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন না....তবে তাঁর মনে হয়, তিনি যেন 'তিনি' নন....আর কেউ! সচেতন অবস্থাতেও মাঝে মাঝে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি হয়, তাঁর মধ্যে যেন তিনি ছাড়া আর একজন আছেন....He felt himself conscious of two consciousnesses...অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে যেমন তাঁর নিজস্বতা আছে, তেমনি সেই সঙ্গেই তিনি উপলব্ধি করেন, যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর একটা সত্তাও তাঁর আছে....He has a feeling that there is another self separate and distinct from the first.

কবিরাজ মশায় বলতেন—ঘরে সাতজন, দশজন, তিনজন অর্থাৎ যত লোক থাকুক....বৈঠক হলে এই ছেলেটিই হন তন্দ্রাবিষ্ট অর্থাৎ ওঁর উপরে হয় স্পিরিটের ভর! মিডিয়াম হিসাবে এঁর যোগ্যতা আর সকলের চেয়ে বেশী।

লেখক লিখেছেন—এর আবেশ হবামাত্র লক্ষ্য করেছি, He was completely metamorphosed. তাঁর মন যেন হয়েছে আর একজনের মন....তাঁর নিজের মন থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন....দেহের ভঙ্গী যায় বদলিয়ে এবং কণ্ঠের স্বর তখন হয় অন্যরকম। সে-স্বর শুনলে তাঁর কণ্ঠস্বর বলে মনে হয় না। তাছাড়া দেখেছি, নাড়ীর গতি হয় ধীর মন্থর....গায়ের তাপ এক ডিগ্রী কমে যায়....দেহ যেন হয় একটা কাষ্ঠখণ্ডের মতো নিশ্চল, নিস্পন্দ!

এ-আবেশ পরিপূর্ণ হবার আগে পর্যন্ত তাঁর অনুভূতি থাকে সজাগ অর্থাৎ হাতে পিন ফোটালে তিনি ব্যথা পান। আবেশ পরিপূর্ণ হলে তখন গায়ে পিন ফোটালেও কোনো সাড়া থাকে না। তিনি থাকেন জড় পদার্থের মতো নির্বিকার। জ্ঞান হবার পনেরো মিনিট পরে দেখেছি,

মিডিয়ামের দৃষ্টি পূর্ণ বিস্ফারিত। জ্ঞান হবামাত্র ডান হাতের আঙুল দিয়ে ডান নাক চেপে ধরলো....বুড়ো আঙুলে পৈতা জড়ালো....ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ছাড়লো। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে এই অনুষ্ঠান....তারপর দেখি, নাড়ীর স্পন্দন হলো স্বাভাবিক। ঘরশুদ্ধ সকলেই এ-সব লক্ষ্য করলেন। একজন আরো একটি জিনিষ লক্ষ্য করেছিলেন....ইসারায় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন....তখন দেখি, যে-তক্তাপোষে তিনি বসেছিলেন.... সেই তক্তাপোষ থেকে তিনি প্রায় আধ ইঞ্চি উঁচুতে অবস্থিত....অর্থাৎ দেহ তক্তাপোষ স্পর্শ করে নেই।

তারপর আর একদিন দেখলুম, আবেশকালে তাঁর দেহ অচেতনের মতো তক্তাপোষে লম্বালম্বিভাবে শায়িত.... মাথার উপরে দেখি, দুটো গোলা ভাসছে....নীলাভ আলোর ছটা সে-দুটি গোলায়....গোলা দুটির সঙ্গে অতি মিহি কুয়াশা রেখাসূত্র দিয়ে মিডিয়ামের দেহের যোগ রয়েছে।

আমাদের তরফ থেকে প্রশ্ন হলো—তুমি কে?

মিডিয়ামের কণ্ঠে স্পষ্ট জবাব ফুটলো—যত মূর্খ অবিশ্বাসীর দল! তোমরা জানো না, আমার কতখানি ক্ষতি করেছো তোমরা।

—কিন্তু আমরা তো আপনাকে ডাকিনি।

—আমার আসার জন্য তোমরাই দায়ী।

—তোমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলবে না?

—বলতে পারি....কিন্তু তোমরা অবিশ্বাসী....তা বিশ্বাস করবে না।

—আপনি জীবিত আছেন? না, পরলোক-গত?

—একদিন আমি জীবিতদের সঙ্গে জীবলোকে ছিলুম।

—এই মিডিয়ামের দেহে আবিষ্ট হবার পূর্বে আপনি কোথায় ছিলেন?

—এখান থেকে কাছে একটা বেলগাছ আছে....সেই বেলগাছে।

—আপনি কে?

—আমি কে, তা জেনে লাভ নেই। যদি তোমরা স্পিরিটের দ্বারা হিতসাধন চাও, তাহলেই স্পিরিটদের ডেকো। স্পিরিটের পরিচয় জেনে কোনো লাভ হবে না। তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে....জিজ্ঞাসা করতে পারো।

অবস্থার সঙ্গে হবে আমার সংযোগ-স্থাপন....তাতে আমি ব্যথা পাবো।

—এখানে আপনি কত কাল আছেন?

—বহু কাল।

—কিন্তু কে আপনি?

এ-প্রশ্নে মিডিয়াম যেন ক্ষেপে উঠলো....তার শরীরে এমন শক্তি সঞ্চারিত হলো যে স্পষ্ট তা লক্ষ্য করলুম। তীব্র চীৎকার করে উঠলো সে....তারপর যাতনায় গোঙানি! বহু কাকুতি-মিনতি জানিয়ে তাকে শান্ত করলুম....তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ...সে একেবারে স্থির।

এই সময়টায় দেখি, সে জপ করছে যেন...নিশ্বাস বন্ধ করে যেন প্রাণায়াম করছে! মিডিয়াম প্রাণায়াম করে....এই আমি প্রথম দেখলুম। তখনো আমরা সকলে দেখছি, মিডিয়ামের মাথার উপর দুটো আলোর গোলা। সে-দুটি গোলা মিডিয়াম নিলে দু-হাতে....তখন গোলার রঙ ধোঁয়াটে নীল....তারপর গোলা দুটি মুখে পুরলো।

এক্ষেত্রে তার কাছ থেকে দুটি তথ্য পেলুম—(১) মৃত ব্যক্তির আত্মার ভর হয়েছে; (২) সে-আত্মার আবির্ভাব (বিনা আহ্বানে) সকলের হিত সাধনার্থে।

তারপর আমরা মিনতিভরে অনুরোধ নিবেদন করলুম—দয়া করে আপনার পরিচয় দিন।

জবাবঃ আমার পরিচয়....আমি স্পিরিট...আমি আত্মা। এ-ব্যাপার নিয়ে কৌতুক করো না....নিষ্ঠাভরে অনুশীলন করো....ভক্তিপূত চিত্তে। তোমাদের চারিদিক ঘিরে কত-না রহস্য রয়েছে....ভক্তিভরে অনুশীলন করলে সে-সব রহস্য জানতে পারবে।

এরপর মিডিয়ামের অবস্থা হলো এমন....যেন সে Collapse করবে। ডাক্তার ছিলেন আমাদের সঙ্গে...তিনি তার নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন—আর নয়...একে মুক্তি দিন।

আমি তখন স্তম্ভিতপ্রায়....মিডিয়ামের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছি...চেয়ে থাকতে থাকতে দেখি, তার দেহ থেকে ছায়ার মতো কি যেন বিনির্গত হলো....বিনির্গত হয়ে সে-ছায়া আকার ধারণ করলো ধীরে ধীরে....বেশ জোয়ান

তীব্র দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ। সে-দৃষ্টি আমি জীবনে ভুলবো না!

আমি যেন মন্ত্রস্পৃষ্ট····নিজেকে প্রকৃতিস্থ করবার প্রয়াস পেলুম····মুখে কথা ফোটে না—যেন Auto-hypnotised! আমার চোখের সামনে কুয়াশা-জাল বিস্তারিত হলো···· মিডিয়ামের দিকে আমি চেয়ে আছি একাগ্র দৃষ্টিতে! হঠাৎ কানে শুনলুম মিডিয়ামের কণ্ঠে বাণী···এ-কণ্ঠ গম্ভীর···· মিডিয়ামের কণ্ঠ নয়। বাণী শুনলুম—দেহে মনে শুদ্ধাচারী হও····আমি ব্রাহ্মণ, আমাকে একটা ঝুলি দাও। তামাসা দেখতে এসেছো····ঝুলি দিয়ে ছাখো, কি তখন দেখবে।

এ-কথায় চেতনা হলো। কিন্তু কোথায় পাবো ঝুলি? একজনের উড়ানি নিয়ে উড়ানির চার কোণ বেঁধে উড়ানিকে ঝুলির মতো করে বেঁধে দিলুম মিডিয়ামের হাতে। সেটা মিডিয়াম হাতে নিতেই দেখি, ঘরে আলোর লহর····নানা বিচিত্র শব্দ হতে লাগলো····আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন বিদ্যুতের প্রবাহ বইছে। তার পর দেখি, ঝুড়ি থেকে বেরুলো অনেক ঔষধ····আয়ুর্বেদীয় ঔষধ।

মিডিয়াম বললে—ঔষধ রাখো····বহু রোগীর রোগ সারবে এ-ঔষধে।

ঔষধ সত্য····রাখা হলো এবং এইখানেই সে-রাত্রির বৈঠক শেষ।

আশীর্বাদ

শ্রীতারাপদ দাশ

জীবনের কূলে কূলে
যতো দুঃখ-অশ্রু-অপমান,
তারি অন্তরালে দিলে
মহত্তর স্মরণীয় দান।
যত দেখি ভাবি মনে,
তত স্পষ্ট হয় মোর চোখে,
বিপুল সান্ত্বনা সেই
জন্মে জন্মে লেখা রবে বুকে॥

কুড়ায়ে যদিও কিছু
রাখি নাই অনিত্য সঞ্চয়,
দুরন্ত চলার বেগে
আপনারে করেছি তো ক্ষয়।

অতীত ও ভবিষ্যতে
দিই নাই স্থান কোল পেতে,
চুপে চুপে বর্তমানে
বরিয়াছে নিশীথে প্রভাতে॥

সংশয়-বিদ্বেষ-ভীতি,
জীবনের যত শোক-তাপ,
কলুষ-কামনা জাত
একান্ত-ই সে আমার পাপ।
অশান্তি-বিদ্রূপ হিংসা,
পদে পদে নির্লজ্জ অন্যায়,
আঘাতে সংঘাতে কতো
অপমানে মরেছি লজ্জায়।

অকম্পিত বক্ষে তবু বুঝি নাই দীনতার স্বাদ,
এ যে তব কতো দয়া, এই তব পূর্ণ আশীর্বাদ॥

নো ভেকেন্সি

কুমারেশ ঘোষ

আজ বাঙ্গালীর চারিদিকে 'নো ভেকেন্সি' বোর্ড ঝুলিতেছে! অবশ্য আগেও ঝুলিত—তবে এমন চারিদিকে নয়!

তাছাড়া আগে চাকরির চেষ্টায় বাঙ্গালী তরুণরাই জুতা ছিঁড়িত, এখন তরুণীরাও স্যাণ্ডাল ছিঁড়িতে শুরু করিয়াছে: চাকরি চাই, কিন্তু চাকরি নাই!

কিন্তু সত্যই কি চাকরি নাই? আছে। বহু চাকরি আছে এবং স্বাধীন ভারতে আরো চাকরির পদ সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু চাকরি দিবে কে? সরকার ছাড়া আজ চাকরি দিবার মালিক হইল—সাহেব, মাড়োয়ারী, গুজরাটি প্রভৃতি—অবাঙ্গালী। সাহেব বাঙ্গালীকে হাড়ে হাড়ে চিনে, মাড়োয়ারী-গুজরাটিরা জাত ভাইকে ডাকিয়া আনে, কারণ ইহারা সকলেই জানে—বাঙ্গালীকে চাকরির চেয়ারে বসাইলে—দুদিন পরেই হয়তো তাহাদেরই গদী ছাড়িতে হইবে—শুরু হইবে ইনক্লাব জিন্দাবাদ! মাদ্রাজী-বিহারী 'ইনক্লাব' করে না, কাজে কামাই করে না, কথায় কথায় তর্ক করে না, কাজ দিলে ফাঁকি দেয় না—তাই তাহারা চট্‌পট চাকরিও পায় এবং সে চাকরি বজায় রাখিতেও জানে। কারণ মালিক নিজের সাহায্যের জন্যই লোক চায়, তাহাকে খুঁচাইবার জন্য বা তাহার কাজ কাঁচাইবার জন্য মাহিনা দিবে কেন?

তাই আজ অবাঙ্গালী ব্যবসাদার বাংলার টাকা দুই হাতে লুঠিলেও বাঙ্গালীকে চাকরি দিয়া তাহার হাতে এক-পয়সাও তুলিয়া দেয় না। অথচ আমরা বাঙ্গালী কিন্তু উদার! আমরা মাদ্রাজী শাড়ী পরিয়া আঁচল উড়াইয়া বেড়াই, পাঞ্জাবীর দোকানে রুটি-মাংস সাঁটিয়া ঢেঁকুর তুলি, মাদ্রাজীকে বাড়ি ভাড়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই, হিন্দুস্থানীর মশলাদার পান চিবাইয়া ঠোঁট রাঙাই, উড়িয়ার তেলেভাজা আনাইয়া আড্ডা জমাই;—তাছাড়া আমাদের কাপড় কাচে হিন্দুস্থানী ধোপা, গেট পাহারা দেয় নেপালী দারোয়ান, রান্না করে উড়িয়া বামুন, মোটর চালায় বিহারী ড্রাইভার, জুতা পরায় চীনা—আরো কত বলিব! তালা-মেরামতী, জলের কল মেরামতী, বাড়িতে রং-য়ের কাজ, কাঠের কাজ, রাজমিস্ত্রির কাজ, জুতো সেলাই (অবশ্য চণ্ডী পাঠটি বোধহয় এখনও বাঙ্গালী পণ্ডিত মশায়দের আয়ত্তেই আছে)—ইত্যাদি সব কাজেই অবাঙ্গালীরই আবির্ভাব—বাঙ্গালী সেখানে অনুপস্থিত।

কিন্তু কই, কোন মাদ্রাজী তো বাংলা মিলের বা তাঁতের কাপড় পরে না! কোন মাড়োয়ারী তো বাঙ্গালীর দোকানে কিছু কিনিতে আসে না! কোন পাঞ্জাবী বা হিন্দুস্থানী তো বাঙ্গালীর রেষ্টুরেণ্টে বা খাবারের দোকানে ঢোকে না। এই বাংলা দেশেই তাহারা বাঙ্গালীকে বয়কট করিয়াছে, কিন্তু বিশ্বপ্রেমিক বাঙ্গালী গদ্‌গদ হইয়া দুই হাত বাড়াইয়া তাহাদের বুকে জড়াইয়া রাখিতে চায়! 'প্রেম' অতি উত্তম জিনিস, তবে পেট ভরা না থাকিলে উহা কিন্তু ঠিক জমে না।

অথচ এই অতি বড় সত্য কথা, আমাদের খেয়ালে নাই। বাংলার 'সবেধন নীলমণি' শহর কলিকাতার পথে-ঘাটে পয়সা ছড়ানো আছে। বাংলার বাহির হইতে লোক আসিয়া তাহা দুই হাতে কুড়াইতেছে—আর আমরা শুধু ভিক্ষা করিতেছি কিংবা ভাবের ঘোরে চোখ বুজিয়া 'কলা-চর্চা' করিতে ব্যস্ত। তাই 'কলা'-ই আমাদের ভাগ্যে জুটিতেছে! তা'ও পাকা জোটা ভার—কাঁচাই মিলিতেছে!

আসল কথা, চাকরি গাছের ফল নয় যে, কেহ পাড়িয়া আমাদের হাতে তুলিয়া দিবে। তাই চাকরি জোটে ভালো, নতুবা এত রকমের কাজ পড়িয়া থাকিতে অকেজো হইয়া বসিয়া থাকিবার তো কোন কারণ নাই। ভিক্ষা করার

(শেষাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আজব জগৎ	বিস্ময়কর হলেও সত্য	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

কালঞ্জেশ্বরী দেবী

কালঞ্জেশ্বরী দেবীর আবির্ভাব ও প্রভাব কতকালের তাহা বলা কঠিন। বাঙ্গলা দেশে তান্ত্রিক উপাসনা প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই দেবীর ইতিহাসও চলিয়া আসিতেছে। এই ইতিহাস জনশ্রুতিমূলক ইতিহাস। কালঞ্জেশ্বরী দেবী কালঞ্জ নামক গ্রামে বিরাজিতা। কতকালের এই দেবী এখানে অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন সে ইতিহাস বলা কঠিন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, সাধকশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ কালঞ্জ গ্রামে দেবী আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যে স্থানে দেবীর ভগ্নমন্দির পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বেও দেখা যাইত, ঐ স্থান পূর্বে ছিল এক মহাশ্মশান। ঐ মহাশ্মশানে মহাপুরুষ সাধক ব্রহ্মানন্দ শ্মশানবাসিনী দেবীর আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং উক্ত স্থান সিদ্ধপীঠ বলিয়া অভিহিত হইতেছে। এইখানে যেমন হইত নরবলি তেমনি এইখানেই ব্রহ্মানন্দ শব সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন।

আমাদের দেশে তান্ত্রিক সাধকদের জীবনী এবং তাঁহাদের ক্রিয়া-কর্ম সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা হয় নাই। জনশ্রুতি এই যে, তন্ত্রসার রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের পূর্বে মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায়।

সাধক ব্রহ্মানন্দের নাম অনেকের মুখেই শোনা যায়। কাহারও কাহারও মতে—ব্রহ্মানন্দ রাজসাহী জেলার অন্তর্গত শ্যামনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। ব্রহ্মানন্দ ইঁহার সাধন নাম।

তন্ত্রশাস্ত্রে দেখা যায় যে, শক্তিমন্ত্রের উপাসকগণের মধ্যে আচার-ভেদ আছে। পশ্বাচারী, কুলাচারী, দিব্যাচারী প্রভৃতি। সম্প্রদায় ভেদে সাধকগণের সাধনা-ভেদ দেখা যায়। কৌয়ল গণ তন্ত্রোক্ত পঞ্চতন্ত্রের দ্বারা ইষ্টদেবতার আরাধনা করেন। তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণের পর এই সম্প্রদায়ের পূর্ণাভিষেক হইবার বিধি আছে। পূর্ণাভিষেক সমাপ্তে সম্প্রদায়ের আনন্দ শব্দান্ত কোন একটি নাম পূর্ণাভিষেককারী গুরু কর্তৃক রক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ত্রিপুরানন্দ, উমানন্দ প্রভৃতি। ব্রহ্মানন্দ ত্রিপুরানন্দের শিষ্য ছিলেন। ব্রহ্মানন্দও এই পূর্ণাভিষিক্ত মহাপুরুষের অভিষেক কালে গুরু-প্রদত্ত নাম।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অপেক্ষা জুতা পালিশ করা ঢের সম্মানের। এবং অন্যের চাকচিক্যে না ভুলিয়া নিজের ঘরের টুকুতেই তৃপ্ত হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

তবে হ্যাঁ, আমার মুখের ভাত অন্যে অন্যে আসিয়া খাইতে থাকিবে—তাহা কেন সহ্য করিব? আমার দেশের চাকরি অন্যে আসিয়া ছিনাইয়া লইবে আর আমরা ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিব নাকি? এ অন্যায় বাড়িয়াই চলিয়াছে—আর চলিতে দেওয়া যায় না। আজ আমাদের অন্নের জন্যই অন্যকে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

তাই আজ আমাদের অনুনয় নয়, দাবি: ঘরের চাকরি ঘরের ছেলেকে দাও।—অবশ্য সেই সঙ্গে আর একটি 'কথা'ও দিতে হইবে: চাকরি করিতে গিয়া আর খেলা করিতে বসিব না।

কারণ, আমাদেরই এক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, 'চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য সাধিত হয় না।'—সে কথা আর আমরা ভুলিব না।

ব্রহ্মানন্দ শক্তিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তাঁহার বিরচিত "তারারহস্য" ও 'শাক্তানন্দতরঙ্গিনী' নামে দুই-খানি বই এখনও বিদ্যমান আছে এবং ইহা হইতে তাঁহার সাধন প্রণালী সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যায়।

ব্রহ্মানন্দগিরি যখন কালঞ্জেশ্বরী সিদ্ধ পীঠে সাধনা করেন, তখন সেই সিদ্ধপীঠের তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে "জাতা লক্ষ বলির্যত্র হোমো বা কোটিসংখ্যকঃ। মহাবিদ্যাজপঃ কোটি সিদ্ধপীঠ প্রকীর্তিতঃ।" সাধকগণের কোনও সিদ্ধপীঠ ব্যতীত জপোপাসনা হয় না। মহাপীঠের ন্যায় সিদ্ধপীঠেও উপাসনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা যায়। ব্রহ্মানন্দ প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র কালঞ্জ গ্রামে জগন্মাতার উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া মাতৃ-দর্শনে কৃতার্থ হইয়া ব্রহ্মানন্দ নাম সার্থক করিয়াছিলেন। যে স্থানে দস্যু ডাকাতের ভয়ে সাধারণ লোক সচরাচর অগ্রসর হয় না, সেই স্থানে সাধকপ্রবর ব্রহ্মানন্দ পুরশ্চরণাদি দ্বারা উপাস্যদেবভাবে ভাবিত চিত্ত হইয়া সিদ্ধির অভিলাষে উপাসনায় বসিয়াছিলেন। সংসারী মানুষ যে শ্মশানকে অপবিত্র ঘৃণিত ও অগম্য মনে করে, সাধক ব্রহ্মানন্দ তাহাকে পরম পবিত্র, পরম রম্য ও পরম পূজনীয় সাধক-গম্য মনে করিয়া সেই শ্মশানে শ্মশান-বাসিনীর আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জগজ্জননীও তাঁহার সেই পবিত্র আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া সাধকের হৃদয়-শ্মশানে নিয়ত অবস্থান করিয়া সাধককে অণিমাদি সিদ্ধির অধিকারী করিয়াছিলেন। তাই মহাত্মা পরমহংসদেব গাহিয়াছিলেন :

"শ্মশান ভালবাসিস বলে,
শ্মশান করেছি মাগো
থাকবি বলে নিরবধি।

নরবলি ও শব সাধনার জন্য বিখ্যাত কালঞ্জেশ্বরী দেবীর মহাশ্মশানে ব্রহ্মানন্দের সাধনা-সিদ্ধ হইয়াছিল।

আমি বাজাইব বাঁশী

বন্দে আলী মিয়া

মেঘ-ঢাকা দিন—বসে আছি একা
কোনো কাজ নাহি হাতে,
ঝাঁকে ঝাঁকে প াখীউড় যায় হেরি
আকাশের আঙিনাতে।
তুমি আসিয়াছ মোর ঘরে যদি
আজ তবে থাকো প্রিয়া—
সাতনরী হার গাঁথিয়া ফুলেতে
দেবো গলে পরাইয়া।
তোমার নয়নে তুলি মোর আঁখি
সাধ যায় আজ চেয়ে শুধু থাকি
একটি গোপন কথা গো তোমায়
কহিব অনেক রাতে,
মিনতি তোমারে শোনো প্রিয়তমা
থাকো আজ মোর সাথে।

চেয়ে দেখ দূরে কাশফুল দল
বাতাসেতে দোল খায়
আজ সারা নিশি শিউলি ঝরিছে
আমাদের আঙিনায়।
এমন দিনেতে আসিয়াছ তুমি
নাহি দেব যেতে আজ
তোমার মনের পরশ লেগেছে
মোর অন্তর মাঝ।
তুমি আর আমি শুধু দুইজন
মোদের ভুবনে রচিব স্বপন
আজ সারা নিশি ঘুমাবো না কভু
বসে রবো পাশাপাশি,
তুমি গান গেয়ো স্বপনের গান
আমি বাজাইব বাঁশী।

থিয়েটারে বঙ্কিম

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আদর সর্বত্র। কিন্তু থিয়েটারে বঙ্কিমবাবুর যে আদর তাকে সমাদর বলা যেতে পারে। পঞ্চাশ বছর আগেও এর যেমন সমাদর ছিল—আজও তেমন-ই আছে। এ-কখনও 'ধ্যাক ডেটেড' হতে পারে না।

জগৎসিংহ, তিলোত্তমা ও বিমলা

'দুর্গেশনন্দিনী' বই-এ বঙ্কিমবাবু যুবরাজ মানসিংহের বীরত্বব্যঞ্জক প্রতিমূর্তির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু থিয়েটারে সেই জগৎসিংহের পুত্রের—রান্না ঘরের ধোঁয়ায় কাঁচা কঞ্চির ছিপের যে অবস্থা হয়,—গঞ্জিকার ধূমে তাঁর বক্ষোবিশালতাও সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে গেছে—কিন্তু তাতে কি আসে যায়?

জগৎসিংহ, আয়েষা ও ওসমান

বন্দী আমার প্রাণেশ্বর !

'দুর্গেশনন্দিনী' বই-এর একটি পরিচ্ছেদ—মুক্তকণ্ঠ। বঙ্কিমবাবু পঞ্চাশ পাতায় যে দৃশ্য দেখাতে চেয়েছেন, এক মুহূর্তে থিয়েটারে তার সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়ে', ঝরে পড়ল !

চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনী

বুড়ো চন্দ্রশেখর কিশোরী শৈবলিনীকে বিয়ে করে যে অন্যায় করে ফেলেছিল, তাই দেখাতে বঙ্কিমবাবুকে 'চন্দ্রশেখর' বইখানি লিখতে হয়েছিলেন। "চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সুষুপ্তি-সুস্থির মুখমণ্ডলের সুন্দর কান্তি দেখিয়া" অশ্রুত্যাগ করছেন। চন্দ্রশেখর বলছেন—"এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত। শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কুটীরে এ আনিলাম কেন?"

এত বুড়ো, এমন ঘিয়ে ভাজা না হ'লে কি চন্দ্রশেখর এত আপশোষ করত!

নির্মলকুমারী ও মাণিকলাল

থিয়েটারের ষ্টেজে ঘোড়া বার করতে পারা একটা মস্ত বাহাদুরীর কাজ। কিন্তু সেই অশ্বপৃষ্ঠে চড়া মোটেই সোজা কাজ নয়। সে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করলে জীবহত্যা-জনিত পাপে লিপ্ত হতে হয় এবং নিজেরও হাড়গোড় ভেঙে ফেলবার সম্ভাবনা প্রচুর!

চঞ্চলকুমারী ও রাণা রাজসিংহ

—"আপনি আমায় পরিত্যাগ করিলে আমি রাজ সমন্দরে ডুবিয়া মরিব"—বলে চঞ্চলকুমারী মরাল-গমনে চলে যেতে উদ্যত হ'লে ; রাজসিংহ পরের পার্ট সব ভুলে গিয়ে হাঁ!—ডুবে মরবে কি বাবা? শেষে কি হাতে দড়ি পড়বে?

নির্মলকুমারী ও আলমগীর

নির্মলকুমারী যখন বাদশাহের "মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইবে" ব'লে ভয় দেখাল, তখন "বাদশাহ বাক্‌শূন্য। যিনি পৃথিবীপতি বলিয়া খ্যাত, পৃথিবীময় যাঁহার গৌরব ঘোষিত; যিনি সমস্ত ভারতবর্ষের ত্রাস, তিনি এই অনাথা নিঃসহায় অবলার নিকট অপমানিত, পরাস্ত হইয়াছিলেন।" অপমানিত ও পরাস্ত ভাবটা প্রকাশিত হয়েছে কি? বাদশাহের কিন্তু কোমর আর সোজা হ'ল না, বাপ—সাত পয়জার! উঃ!

হীরা ও দেবেন্দ্র

সুনির্জনে অফার (offer) করবার এমন সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। থাক আর নাই থাক— সাধবার সৌভাগ্য পেয়েছে! সেই যথেষ্ট! ফুল ফোটে, সে কি তোয়াক্কা রাখে—কে তার গন্ধ নিল না নিল!

বঙ্কিমবাবু লিখেছেন—"সেই বহুসুন্দরী শোভিত রমণীমণ্ডলেও, কুন্দনন্দিনী ব্যতীত তাহা হইতে (অর্থাৎ দেবেন্দ্র [হরিদাসী] হইতে) সমধিক রূপবতী কেহই নহে।"—দর্শক যদি বলে, ভেজাল চালাচ্ছ বাবা!—উজ্জ্বল বলা যেতে পারে, এ যে যুগ-ধর্ম!

তবু প্রণিপাত

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

অয়ি দুর্গে, তব পাশে মিছে বর মাগি।
তোমার উদ্ভব হ'ল ত্রিদিবের নিরাপত্তা-লাগি'।
কবে কোন্ বিস্মৃত অতীতে
আশামুগ্ধ চিতে
সৃজেছিল দেবতারা মিলিয়া তোমারে—
বধিবারে
দুরাধর্ষ মহিষ-অসুরে।
ক্রন্দন উঠিয়াছিল স্বর্গরাজ্য জুড়ে।
সেদিন ধরিলে তুমি দশ হস্তে দশ প্রহরণ,
কেশরীরে করিলে বাহন,
রণচণ্ডী-রূপে
আহ্বানিয়া অমরা-লোলুপে,
বহু শ্রমে
বহু পরাক্রমে
করেছিলে অরাতি-নিধন।
তারপর ফুরাইল তব প্রয়োজন।
অকস্মাৎ তুমি মিলাইলে
কোনো চিহ্ন না রাখিয়া নশ্বর নিখিলে।

মধ্যযুগে কিসের আশ্বাসে
তোমারে বসালো কোন্ কবি-ঋষি মহেশের পাশে,
উমারূপে বরণ করিল।
তোমার বিচিত্র মূর্তি শিল্পীরা গড়িল।
দশ হস্তে দশায়ুধ দানি,
অসুরের সাথে দিল চারি পুত্র-দুহিতারে আনি'।
রাজা সুরথের কাল হ'তে
প্রতিটি শরতে
বাঙলার নগর-পল্লীতে
দেবী-রূপে, কন্যা-রূপে আস পূজা নিতে।

পুষ্পপত্রে-অগুরু-চন্দনে,
শ্রদ্ধান্বিত উলসিত প্রাণের স্পন্দনে
বাঙালী তোমারে পূজে,
মাতঃ দশভুজে!

লক্ষ কোটি পশু-রক্ত রাঙায়েছে তব পূজা বেদী;
উঠিয়াছে নভো ভেদী
শঙ্খ-ঘণ্টা-ঢক্কা-বংশীনাদ;
স্তবে মন্ত্রে নৃত্যে গীতে ভুলেছে বিষাদ
অগণিত শিশু-নর-নারী।
কত আঁখিবারি
ঢালিয়াছে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকামী
ত্রিদিবস-যামি
করিয়াছে তব ধ্যান, পুত নাম গান।
শত দুঃখ, ব্যথা, অভিমান
জানায়েছে তোরে
কোটি কোটি ভক্ত তিতি' নয়নের লোরে।

এতকাল এত আরাধনা,
তবুও কি বাঙালীর ফলিল সাধনা?
পুরিল কি কোনো মনস্কাম,
শুভ পরিণাম
আসিল কি জাতির জীবনে?
অসুর-পীড়নে
জর্জর, জীবন্মৃত ভক্তের সমাজ।
সুরলোক আজ
নিরুদ্বেগে সুখে নিদ্রা যায়।
অসত্য প্রবল হ'ল দেবতা-কৃপায়

(শেষাংশ ১৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সম্পত্তি সমর্পণ

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমর গল্পার্ঘ্য অবলম্বনে]

শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য

চরিত্রলিপি

যজ্ঞনাথ কুণ্ড .... অবস্থাপন্ন গৃহস্থ।

বৃন্দাবন .... ঐ পুত্র।

গোকুল .... ঐ পৌত্র।

(পরে নিতাই)

শ্যামাকান্ত
হরমোহন
মন্মথ
} .... গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণ।

কবিরাজ, বাউল [নেপথ্যেও চলবে], ভিখারী, পথিক, দুজন গ্রামবাসী, গ্রাম্যবালকগণ।

প্রথম দৃশ্য

[যজ্ঞনাথ কুণ্ডের বাড়ীর ভিতরের ঘর। অতি সাধারণ, অনাড়ম্বর ভাবে সাজানো। একটি তক্তপোশের ওপর যজ্ঞনাথ বসে আছে, নিবিষ্ট মনে একটি কাগজে কি লেখা আছে পাঠরত। বেশবাসে কৃপণতার প্রকাশ।]

যজ্ঞনাথ। (পাঠান্তে) মহাশক্তি রসায়ন, যত সব ফন্দিবাজি! টাকা লুটে নেবার ফিকির, দেখাচ্ছি মজা। (কাগজটা মুড়ে মুঠোর ভিতর পুরে, বাড়ীর ভিতর দিকে উদ্দেশ করে) বৃন্দাবন, বলি ওহে ধনীর পুত্র বৃন্দাবন, ঘরে আছো না এই দিন-দুপুরেই নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছো—

(বৃন্দাবনের প্রবেশ। বেশভূষায় বেশ আধুনিকতা, অবশ্য এদেশে ইংরাজের নতুন আগমনের সময়কার দিনে যতটা আধুনিকতা সম্ভব ছিলো, তেমন।)

বৃন্দাবন। কি, বাড়ীতে একটা মরমর রোগী, আর তুমি বে-আক্কেলের মত গলার পর্দা চড়িয়েই যাচ্ছো, একটু বিবেচনাও কি নেই?

যজ্ঞনাথ। থামো, আমাকে আর শিক্ষা দিতে এসো না। বলি ভেবেছো কি, আমাকে কি স্বয়ং যক্ষরাজ কুবের ঠাওরেছো যে এই সব রাজারাজড়ার ঘরের মত লম্বা-চওড়া ওষুধের ফর্দ বানিয়েছো, এত টাকা দেবে কে?

বৃন্দাবন। কবিরাজ মশায় বললেন যে, ব্যাধিটা বড়ই গুরুতর, এ যাত্রা রক্ষা পেতে হলে ভালো ভাবে চিকিৎসা আর পথ্যাদি করতেই হবে।

যজ্ঞনাথ। তবে আর কি, এ বৃদ্ধকে পথে বসাও। বলি, কবিরাজের কি আর অন্য ওষুধ জানা নেই, যা দামেও এমন আকাশকে ছোঁয় না অথচ কাজেও আশ্চর্য ফল দেয়? বেশী দামের না হলে বুঝি বেশী কাজেরও হয় না? বলিহারি তোমাদের আধুনিকতা আর ফ্যাশান্ মার্কা ওষুধ-পত্তরের বহর। এ ফর্দ পত্রপাঠ ফেরত পাঠাও। এত দাম দিতে আমি অক্ষম মোদ্দা কথাটি এই জানিয়ে দিলাম।

বৃন্দাবন। কিন্তু যে রোগের যে ওষুধ—

যজ্ঞনাথ। থামো। কটা রোগ তুমি দেখেছ শুনি, কটা রোগে ভুগেছ? এ-বাড়ীতে তোমার মা, দিদিমা কিছু কম রোগে ভোগেন নি, তাঁরা কত পাত্র পাত্র এমন দামী ওষুধ খেয়েছেন, একবার শুনি। এ-বাড়ীর সনাতন প্রথা ছিল, রোগ হোক, আর যাই হোক, কবিরাজের বা বৈদ্যের প্রবেশ একেবারে নিষেধ। আমি তো তবু আজকাল এ

নিয়ম ভেঙ্গেছি, তাই বলে এমন ভাবে শত্রুতা করা আমার সঙ্গে কিছুতেই চলবে না। (কাগজটা বৃন্দাবনের হাতে জোর করে গুঁজে দিয়ে) এই নিয়ে যাও তোমার মহা-পণ্ডিত কবিরাজের এক-কাঁড়ি টাকা শ্রাদ্ধ করার ফর্দ।

বৃন্দবন। (যজ্ঞনাথের পায়ে পড়ে) বাবা, শোনো, দয়া করো, এ ওষুধ না হলে তোমার একমাত্র ছেলের বউ অকালে প্রাণ হারাবে।

যজ্ঞনাথ। ওসব আমি কিছু শুনতে চাই না। (কবি-রাজকে এমন সময় আসতে দেখে) এই যে কবিরাজ মশাই, আপনি কি জ্যান্ত মানুষকে খুন করার ফন্দি করেছেন নাকি?

[কবিরাজের প্রবেশ]

কবিরাজ। আজ্ঞে? আপনার কথা সম্যক্ উপলব্ধি হচ্ছে না।

যজ্ঞনাথ। রোগ হলো কি না হলো অমনি চড়চড় করে এতবড়ো একখানা ফর্দ তো বানিয়ে দিলেন, এক-বারও কি ভেবেছেন যে কি সর্বনাশ করতে চলেছেন এই গরীব গৃহস্থের? কত টাকার হিসাব দিয়েছেন তা জানেন? দিনের বেলায় ডাকাতি করবেন,—ভাবছেন, কেউ টেরটি পাবে না, না?

কবিরাজ। আজ্ঞে, কি বলেন যে। ডাকাতি করা আমার পেশা নয়। তবে পীড়ার গুরুত্ব অনুসারে এই ঔষধ অপরিহার্য জ্ঞানেই।

যজ্ঞনাথ। অপরিহার্য!

কবিরাজ। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার পুত্রবধূর পীড়া এক্ষণে বিশেষ চিন্তার উদ্রেক করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নিরর্থক। নিয়মিত ভাবে ঔষধ সেবন, পথ্য গ্রহণ ও পরি-চর্যাদির আশু প্রয়োজন। অন্যথায়—

যজ্ঞনাথ। আপনার বুদ্ধিবৃত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি ক্রমেই সন্দিহান হয়ে উঠছি মশায়। মহার্ঘ ওষুধ সেবনেই কেবলমাত্র রোগ নিরাময় হয়, এ কথার সত্যতা আমি স্বীকার করি না।

কবিরাজ। আজ্ঞে, ব্যাধি যেখানে প্রবল, তার চিকিৎসাদিও সেখানে প্রবলতর করা প্রয়োজন। তাই আমি 'মহাশক্তি রসায়ন' অমিততেজ 'স্বর্ণবটিত অমৃত-আদর্শ সালসা মহর্ষি চরকের আবিষ্কৃত ৬৪ প্রকার জীবনী-শক্তি বৃদ্ধিকর। আয়ুর্বেদীয় ভেষজ সংযোগে এবং ভারতীয় ধাতুর ও ভারতবাসীর প্রকৃতি অনুসারেই প্রস্তুত। বিধিমত ব্যবহারে—

যজ্ঞনাথ। অনুগ্রহ করে আপনার শাস্ত্র ব্যাখ্যা বন্ধ করুন। এখন আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে চিকিৎসা বিষয়ে আপনার জ্ঞান-আদি অতিশয় সীমাবদ্ধ। যে কারণে এক-জন পীড়িতকে নিরাময় করতে শুভাগমন করে গৃহস্থ অবশিষ্ট সুস্থ মানুষকেই অসুস্থ করবার উপক্রম করেছেন। অতএব, যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর এ গৃহের চিকিৎসাকার্য হতে বিরত হওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।

কবিরাজ। (আশ্চর্য হয়ে লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন) অ্যাঁ, বলেন কি! রোগিণীর জীবনের এমত আশঙ্কাজনক অবস্থায়—

যজ্ঞনাথ। ততোধিক আশঙ্কাজনক অবস্থায় এ গৃহের হতভাগ্য গৃহস্বামী উপনীত হয়েছেন, অতএব—(যাবার ইঙ্গিত)

কবিরাজ। (বৃন্দাবনকে) বৃন্দাবনবাবু, নিতান্ত দুঃখিত অন্তরেই অগত্যা আমি বিদায় নিচ্ছি। তবে, আপনার সহ-ধর্মিণীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কেবলমাত্র একটি কথা বলে যাচ্ছি যে অতি সত্বর সুচিকিৎসা, সুপথ্য ও সুপরিচর্যা বিষয়ে বিশেষ তৎপর না হলে তাঁর জীবন সম্বন্ধে নিরতিশয় আশঙ্কা বর্তমান। দুর্গা দুর্গম হরে, দুর্গা দুঃখ হরে........(প্রস্থান)

বৃন্দাবন। অ্যাঁ, সত্যিই তাড়িয়ে দিলে? ওর রোগের এই বাড়াবাড়ির সময়! তবে ও মরুক, মরেই শান্তি পাক। বাবা, তুমি এমন পাষাণ, হৃদয়হীন! এ সময়ে একটা জীবনের চেয়ে ঐ কতকগুলো রূপোর খণ্ডই বড় হলো? ওঃ ভগবান, পিতাপুত্রের এই সম্বন্ধ! না, না, আর এক-মুহূর্ত এ বাড়ীতে নয়। দেখি অন্যত্র নিয়ে গিয়ে বাঁচাতে পারি কিনা।

যজ্ঞনাথ। অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ। ছেলেবেলা থেকে তোকে খাওয়াতে পরাতে যে ব্যয় হয়েছে তা পরিশোধ করার নাম নেই, আবার বড় বড় কথার ফুলঝুরি কাটা হচ্ছে।

(চীৎকার শুনে শ্যামাকান্ত, হরমোহন ও মন্মথ এই

এই শোনো শ্যামাকান্ত ভায়া, গুণধর ছেলের বাক্যিগুলো। বলে কিনা কতকগুলো রূপোর খণ্ড। চিরটা কাল বাপের পয়সায় রাজা-উজীর মেরে এলেন বাবু, একটা কানাকড়ি রোজগারের নাম নেই, আবার কুলোপানা চক্কোর দেখানো হচ্ছে!

শ্যামাকান্ত। কি হলো দাদা, ভোর হতে না হতেই পাড়া যে মাথায় উঠলো, ইয়ে হয়েছে—

যজ্ঞনাথ। তা চলে যাবি তো যা, ভয় দেখাচ্ছিস কাকে?

[এমন সময় গোকুল (চার পাঁচ বছর বয়স) কাঁদতে কাঁদতে এলো।]

গোকুল। (বৃন্দাবনকে) বাবা, মা কত্তা বলচে না কেন, আমার খিদে পেয়েছে।

বৃন্দাবন। কথা বলচে না কিরে! অ্যাঁ, কি হলো তবে, কথা বলচে না কেন······(বলতে বলতে ভিতরে গমন)

গোকুল (যজ্ঞনাথকে) দাদু, খিদে পেয়েছে।

যজ্ঞনাথ। যা, যা, কৃতঘ্ন সব। খিদে পেয়েছে তা আমি কি জানি। তোর বাপকে বলগে যা, সেই খাওয়াবে।

গোকুল। (ক্রন্দন) অ্যাঁ······(এমন সময় ভিতর থেকে বৃন্দাবনের কান্না ভরা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।)

বৃন্দাবন। একী হল, তুমি কোথায় গেলে চলে, ও হো হো হো।

পাড়ার লোকেরা। অ্যাঁ, কি হলো হে (সকলে ভিতরে গেল। যজ্ঞনাথ মুখ কঠিন করে তক্তাপোশেই বসে রইলো)।

যজ্ঞনাথ। মরবেই তো, অকৃতজ্ঞতার সাজা হবে না ভগবানের রাজত্বে! আর এদিকে হয়েছে যত জ্বালা, দুটো খুদকুঁড়ো কুড়িয়ে বাঁচিয়ে অসময়ের জন্য তুলে রেখেছি, তা কারুর সইবে! পাড়া ঝেঁটিয়ে সব এলেন দুঃখু দেখাতে। হুঁ, দরদ একবারে উথলে উঠছে! (গোকুলকে দেখে, সে তখনো চোখ মুছছে)

আর এই এক আছেন ক্ষুদে শাহজাদা। মিনিটে দু'বার করে খিদে পায়। ভিটে মাটি সব উচ্ছন্নে যাবে অপোগণ্ড পুষতে। এদিকে আয় হতভাগা, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পৃথিবী শুদ্ধ লোককে কান্না শোনাতে হবে না।

(শেষটায় স্নেহের সুর)

(গোকুল এক পা এক পা করে তাঁর দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ঝড়ের বেগে বৃন্দাবন ঢুকলো। পিছনে পাড়ার লোকেরা।)

বৃন্দাবন। (গোকুলের হাত ধরে টেনে এনে) খবরদার, যাবি না গোকলে ঐ খুনে দাদুর কাছে, গলা টিপে মেরে ফেলবে তোকে। দেখলি না, ওষুধ না খাইয়ে কেমন করে তোর মাকে মেরে ফেললো!

যজ্ঞনাথ। থাম্ অর্বাচীন, বেহেড কোথ কা!। কেন, ওষুধ খেয়ে কি কেউ মরে না? (পাড়ার লোকদের উদ্দেশে) দামী দামী ওষুধ খেলেই যদি বাঁচতো, তবে রাজা-বাদশারা মরে কোন্ দুঃখে? (বৃন্দাবনকে) যেমন করে তোর মা মরেছে, তোর দিদিমা মরেছে, তোর স্ত্রী তার চেয়ে কি বেশী ধুম করে মরবে?

বৃন্দাবন। ছি! ছি! টাকার চুড়োয় বসে তুমি ধর্ম-অধর্ম, ন্যায়-অন্যায় সব ভুলে গেছ, কিন্তু ভুলো না যে ভগবানের বিচার থেকে রেহাই পাবে। জলজ্যান্ত একটা মানুষকে তুমি হত্যা করলে, তার শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। চল্ গোকলে, এ পাপের বাড়ী ছেড়ে এখনি চলে যাই।

শ্যামাকান্ত। আহা বৃন্দাবন, ইয়ে হয়েছে, এ সময়ে জ্ঞান হারিও না। এত বড়ো ভুল কোরো না।

হরমোহন। স্থির হও, অত উত্তেজিত হওয়া সমীচীন নয়। এত বড়ো বিষয় আশয় একদিন তোমারই হবে তো। উনি বুড়ো হয়েছেন—

মন্মথ। পত্নীশোক নিদারুণ জানি। তবুও তুমি বড়ো হয়েছ, সব দিক বিবেচনা করে কাজ করো।

বৃন্দাবন। না, না, আপনারা বৃথা উপদেশ দেবেন না। আপনারা তাহলে এখনো ওঁকে চেনেন নি।

যজ্ঞনাথ। দূর হ এখনি আমার বাড়ী থেকে। তোকে যদি কখনো একটি পয়সাও দিই তা হবে গো-রক্তপাতের তুল্য, এই আমি বলে দিলাম। তোকে আমার ত্যাজ্যপুত্র করলাম। আজ থেকে জানবো যে আমার কোনো ছেলে নেই।

বৃন্দাবন। বেশ, তাই হবে। আজ থেকে আমিও জানবো যে আমি পিতৃহীন। আর তোমার পয়সা! আমারও প্রতিজ্ঞা, যদি একটি পয়সাও তোমার কোনদিন গ্রহণ করি, তা হবে মাতৃ-রক্তপাতের তুল্য মহাপাপ। চল্, চল্ গোকুল, আর এক মুহূর্ত এখানে নয়।

পাড়ার লোকেরা। বৃন্দাবন, যজ্ঞনাথবাবু, এসব কি করছেন।

(গোকুলের হাত ধরে বৃন্দাবন সবেগে প্রস্থান করলো।

বৃন্দাবন, বৃন্দাবন, শোনো, শোনো (তাদের পিছনে) পিছনে পাড়ার লোকেরাও বেরিয়ে গেল)।

যজ্ঞনাথ। (দরজায় খিল দিয়ে) এই আমিও তোদের দরজায় চিরকালের মত খিল এঁটে দিলাম। দেখি কোন্ নবাবের বেটা আর এ বাড়ীর চৌকাঠও মাড়াতে পারে! তেজ দেখালি কাকে, ওসবে আমি ভয় পাই না। আমিও পরমানন্দ কুণ্ডুর বেটা যজ্ঞনাথ কুণ্ড।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গ্রামের বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপের নিকটস্থ পথ; শ্যামাকান্ত, হরমোহন ও মন্মথের প্রবেশ।]

শ্যামাকান্ত। দিনে দিনে পৃথিবীটা কোন্ রসাতলে চলেছে, ইয়ে হয়েছে, একবার বিবেচনা করে দেখেছ হরমোহন?

হরমোহন। এরকমটা যে হবে তা আমি পূর্ব হতেই অনুমান করেছিলাম। ওই যে কথায় বলে না 'সর্বমত্যন্তম্‌-গর্হিতম' এক্ষেত্রেও হয়েছিলো তাই। অর্থাৎ কিনা, মনুষ্য জাতি বর্তমানে সর্ব স্তরেই ধীরতার পরিবর্তে লম্ফপ্রদান করবার প্রয়াসী হয়েছে এবং তারি অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ এমন একটি অশুভ ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, অর্থাৎ কিনা, এই গ্রামেরই একটি পরিবারে।

মন্মথ। ভায়া হরমোহন, তোমার ঐ চিরকেলে বঙ্কিমী ঢাঁটটি পরিত্যাগ করতে এখনো পারলে না, এখন ভায়া সরলীকরণের যুগ, তোমার বক্তব্য একটু সোজা বাংলা করে বলো।

হরমোহন। তোমার মস্তিষ্কটি বরাবরই একটু স্থূল, মন্মথ। যে পূজার যে নৈবেদ্য। কথা হচ্ছিল যে, আমাদের যজ্ঞনাথবাবুর গৃহের, অর্থাৎ কিনা, ঘটনাবলী অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার ফলেই না এমন একটা অঘটন—

শ্যামাকান্ত। ইয়ে হয়েছে, অঘটন কেন বলছো, বলো এই হওয়া উচিত। সামান্য একটা বউ-এর জন্য বাপের সঙ্গে বিবাদ করা কেবল এ-কালেই সম্ভব এবং তার বিষময় পরিণতিও অবশ্যম্ভাবী। ইয়ে হয়েছে, যজ্ঞনাথবাবু উচিত কার্যই করেছেন।

মন্মথ। মানে, তিনি তাঁর পত্নী-বশীভূত পুত্রকে এটাই স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, একটা বউ গেলে অনতিবিলম্বে আর একটা বউ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু বাপ গেলে দ্বিতীয় বাপ মাথা খুঁড়লেও পাওয়া যায় না। বৃন্দাবনের এ হতেই চৈতন্যোদয় হওয়া উচিত। কি বলেন শ্যামাদাদা?

শ্যামাকান্ত। ইয়ে হয়েছে, তা কিন্তু হবে না। কারণ কলিকালের বিশিষ্টতা এই যে এ সময় ধর্মাধর্ম লোপ পায়।

হরমোহন। অর্থাৎ কিনা, ঘোর পাপে তমসাচ্ছন্ন হয় মনুষ্য জাতি, যে কারণে—

মন্মথ। আঃ, ভায়া হরমোহন, আবার বঙ্কিমী আরম্ভ করলে।

শ্যামাকান্ত। আমি কি ভাবছি জানো? ইয়ে হয়েছে, এই দুরারোগ্য পিতাপুত্র বিবাদের ব্যাধি আজকাল যেরকম সংক্রামক আকার ধারণ করছে, তাতে যদি তা এখন বাহুবিস্তার করে তোমার আমার ঘরেও এসে ঢোকে, তাহলে বিশেষ দুর্বিপাকে পড়বারই সম্ভাবনা। (আর দুজনে ভয় পেয়ে আঁতকে উঠলো।)

মন্মথ। অ্যাঁ!....সেক্ষেত্রে তা যে সত্যি আশঙ্কার বিষয় হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

হরমোহন। অর্থাৎ কিনা, যজ্ঞনাথবাবুর অশুভ উদাহরণের বিষময় শিশুবৃক্ষ—

মন্মথ। আঃ অসহ্য, ভায়া হরমোহন, এই দারুণ দুশ্চিন্তার সময়েও তোমার বঙ্কিমী গেল না।

[যজ্ঞনাথের প্রবেশ]

এই যে যজ্ঞনাথবাবু, আমরা পরামর্শ করছি যে কেমন করে আপনার এই দুঃসময়ে—

যজ্ঞনাথ। দুঃসময়? কে বললে? সুসময়, সুসময়, আমার জীবনে এমন আনন্দের দিন আর আসেনি। সবাইকে বিদেয় করেছি। মুক্তি পেয়েছি মুক্তি পেয়েছি।

শ্যামাকান্ত (আড়ালে হরমোহন ও মন্মথকে) শোকে দুঃখে মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। (প্রকাশ্যে) আমরাও তাই বলাবলি করছিলাম যে আপনার এ সময়ে আমাদেরও তো কিছু করণীয় আছে।

যজ্ঞনাথ। কিছু নেই, কিছু নেই। সব অকৃতজ্ঞ, যতই করো, শেষকালে সব ফুঃ।

হরমোহন। আমরাও তাই বলি, অর্থাৎ কিনা, বিষয় সম্পত্তি সব হারালি, তবু এখনো টনক নড়লো না। আরে বাপু, বউ গেল তো কি হোল, বেটাছেলে, আবার বিয়ে থা কর্। কিন্তু বাপ গেলে—

মন্মথ। আর একটা বাপ পাবি কি? সব কালের দোষ, বদ হাওয়া বইছে। সেদিক দিয়ে দেখুন আমার ছেলেকে। সাতটি চড় এ-গালে মারলে চোদ্দটি চড়ের জন্য ও-গাল পেতে দেবে, তবু বাপের কথায় টুঁ শব্দটি করবে না। কথায় বলে বাপ্‌কা বেটা।

শ্যামাকান্ত। কি বকর্ বকর্ করছো মন্মথ, এখন এই শোকের সময় ওঁকে এসব কথা বলা কি উচিত হচ্ছে? তা ছাড়া, ইয়ে হয়েছে, আমার ভোলার মত অমন সোনার প্রতিমে ছেলে থাকতে, ওনার কাছে তোমার ছেলের কথা কইতে সাহস পাও! বলে কিনা, চাঁদে আর বাঁদরে!

হরমোহন। বলেছি তো, ওনার মস্তিষ্কটা বরাবরই একটু স্থূল। তা, বৃন্দাবনকে কি সত্যিই ত্যাজ্যপুত্র করে দিলেন? মানে, অর্থাৎ কিনা, এতবড় বিষয়-আশয়—এই বৃদ্ধ বয়স—

যজ্ঞনাথ। নিজে থেকেই বিদেয় হয়েছে, ভালোই হয়েছে, নাহলে ঘাড় ধরে বার করে দিতাম। এককাঁড়ি টাকা যাচ্ছিল অপোগণ্ড পুষতে। তারপর ঐতো ভক্তির বহর, কোনদিন আমার ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিতো! দিনরাত ঘরের ভিতর বউ-এর সঙ্গে ফিসফিস পরামর্শ, বিষ মেশাবো, বিষ মেশাবো। ভগবান বাঁচিয়েছেন। এবার একলা ঘরে নিশ্চিন্ত হয়ে খাবো, ঘুমুবো। (একটু থেমে) তবে ঐ গোকুলটাকে, ঐ দুধের বাচ্চাটাকে নিয়ে গেল। মারবে ওটাকে না খাইয়ে, বেশ দেখতে পাচ্ছি। মার্‌গে যা, আমার কি, আমার শত্রু বইতো নয়, আমার কি, আমার কি····(বলতে বলতে প্রস্থান। শ্যামাকান্ত অপর দু'জনকে ইঙ্গিতে জানালো যে যজ্ঞনাথের মাথাটা একেবারে গেছে।)

তৃতীয় দৃশ্য

[যজ্ঞনাথ তক্তাপোশে বসে একটি খাতায় হিসাব করছে। মাঝে মাঝে একটু চিন্তা করছে, আবার লিখছে। লেখা শেষ হলে—]

যজ্ঞনাথ। তাহলে দাঁড়ালো—দুধ এক টাকা, ভাত, ডাল, মাছ, তরকারি ইত্যাদি দু'টাকা, পরনের জন্য বারো আনা, জলখাবার চার আনা, এ ছাড়া বইপত্তর, খেলনা, মোটামুটি একুনে পাঁচ পাঁচটি টাকা প্রতি মাসে, অর্থাৎ পাঁচ বারো ষাট টাকা বার্ষিক একেবারে জলের মত বাজে খরচ হচ্ছিল, শুধু ঐ দুধের বাচ্চা গোকুলটার জন্যই। তারপর ঐ বেইমান বেন্দাটা আর ওর বউটার জন্যও কোন্ না-এর তিন গুণ টাকা!····ওঃ, আমাকে একেবারে মাঝ দরিয়ায় ডোবানোর পাকা ব্যবস্থা! কেমন জব্দ করেছি এইবার। এত টাকা সুদ শুদ্ধ—আঙুলে গুণে পাওয়া যায় না, সব যেতে বসেছিল। ভগবান দয়াময়, রক্ষা করেছেন।

(উদ্দেশে প্রণাম)

[এমন সময় একজন ভিখারীর প্রবেশ]

ভিখারী। ভগোমান যে সত্যিই দয়াময় গো, তাই-তো আমরা বেঁচে আছি। দাও বাবা, দুটি ভিক্ষা দাও। তিনির দয়ায় তোমার সব ভ.ল হবে।

যজ্ঞনাথ। কে বললে ভালো হবে? মিথ্যে কথা সব, আমার ভালোয় দরকার নেই। মিথ্যাবাদী ভণ্ড কোথা-কার, একদানা চালও ভিক্ষা দেব না।

ভিখারী। মিথ্যে কথা নয় বাবা। তিনি ঠিক তোমার ভালো করবেন, দেখে নিও। সবার দুঃখ তিনি দূর করে দেন।

যজ্ঞনাথ। আমার কোন দুঃখ নেই, আমি বেশ সুখে আছি। শুধু ঐ গোকুলটার জন্যেই যা একটু। নইলে দুঃখে তো আমার ঘুম হচ্ছে না!

ভিখারী। তেনাকেও ফিরে পাবে গো। ঐ, তিনি যে দয়ার (প্রণাম) শরীর। তুমি মিছে তিনির ওপর অভিমান করছো।

যজ্ঞনাথ। (চমকে) তাকেও ফিরে পাবো? গোকুল ফিরে আসবে? না, না, তা সম্ভব নয়, তা কি কখনো হয়?

ভিখারী। দাও বাবা, দুটি ভিক্ষা। তিনির রাজত্বে সবি সম্ভব, তিনি অঘটন ঘটায়, লীলেময় (প্রণাম)।

যজ্ঞনাথ। অ্যাঁ, তাই যেন হয়, যেন অঘটনই ঘটে। এই নাও, চার আনা পয়সা।

ভিখারী। (আনন্দে) তোমার হারানিধি ফিরে পাবে, দেখে নিও। (প্রস্থান)

যজ্ঞনাথ। ফিরে পাবো, গোকুল ফিরে আসবে।

আবার আমার পুজোর সময় কাঁধে চেপে বসবে, খাওয়ার সময় থালা থেকে মাছ নিয়ে পালাবে, লেখার সময় দোয়াত উলটিয়ে দেবে! এইযে মাতুরটার ওপরে সেদিন দাতু আমার কত হিজিবিজি এঁকেছে, ঐযে কাঁথাখানা অতখানি ছেঁড়া, সেই গুণধরেরই কীর্তি। ভিখারীটা ঠিকই বলেছে, ফিরে সে আসবেই। কিন্তু কবে, ভগবান, কবে? (উঠে আলনার কাছে গিয়ে একটা কাপড় দেখে) এই কাপড়খানা তু'বছরেই গেল্লায় দিয়েছিল বলে কত বকেছিলাম অবোধ ছেলেটাকে। (চোখের জল মুছলো। কাপড়খানা একটা সিন্দুকে রেখে) এই তোর কাপড় সিন্দুকে রেখে দিলাম, কাউকে দেবো না। তুই প্রতি বছর একটা করে কাপড় ছিঁড়িস দাতু, আর আমি কখনো বকবো না। তুই শুধু আমার বুকে একবার ফিরে আয় ভাই, একবার ফিরে আয়!

(এমন সময় বাইরের পথ দিয়ে বাউল গান গেয়ে যাচ্ছিল, উৎকর্ণ হয়ে যজ্ঞনাথ শুনতে থাকে।)

(গান)

পরবাসী, চলে এসো ঘরে।
অনুকূল সমীরণ ভরে॥
ঐ দেখ কতবার হল খেয়া পারাপার,
সারি গান উঠিল অম্বরে॥
আকাশে আকাশে আয়োজন,
বাতাসে বাতাসে আমন্ত্রণ।
মন যে দিল না সাড়া, তাই তুমি গৃহছাড়া,
নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে॥

(গান শেষ হলে তু'হাতের মধ্যে যজ্ঞনাথ মুখ লুকালো।)

চতুর্থ দৃশ্য

[গ্রামের পথ। কয়েকটি ছেলে জটলা করছে। এদের মধ্যে একজনের নাম নিতাই পাল, দেখা গেল সেই সর্দার হয়ে বসেছে।]

নিতাই। দেখ্ ভাই, সেদিন আমি বলছিলাম না যে আমাদের পাঠশালার বুড়ো পণ্ডিত মশায় বড্ড রাগী মানুষ। আমি বাংলা বানান ভুল করেছিলাম, তাই যতুনাথ নামে

দিলেন! আমি যতুকে চুপি চুপি বললাম, এই আস্তে মোল্। কিন্তু ও শুনলো না, খুব কষে মলে দিল, আর আমার কান তুটো রাঙা জবার মত লাল হয়ে উঠলো।

অন্য সবাই। তারপর তুমি কি করলে?

নিতাই। কি করলুম? তখন যতুকে কিছু বললাম না। তারপর যেই না পাঠশালা ছুটি হয়েছে, অমনি হিড়-হিড় করে টানতে টানতে একটা কুয়োর কাছে নিয়ে গেলাম।

সকলে। (সভয়ে) অ্যাঁ, কুয়োর কাছে?

নিতাই। হ্যাঁ। তারপর দিলাম ইয়া এক চড় গালে। বললাম, কিরে, তখন যে খুব কান মলেছিলি, এখন যদি তার ঠ্যাং তুটো ধরে ঝপাং করে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিই, কেমন হয়?

সকলে। সে কি বললে?

নিতাই। বলবে কি, ভয়েই কেঁচো। এমনি করে সটান শুয়ে পড়ে আমার পা ধরে ভেউভেউ করে কান্না। আমি বললাম, আচ্ছা যা, এবার তোকে ক্ষমা করলাম, কিন্তু ফের যদি আমার কথা না শুনিস তাহলে মেরে একেবারে ঠাণ্ডা করে দোব।

সকলে। (হো হো হাসি) ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে।

নিতাই। এই চলো, শ্যামাকাকার বাগানে এত বড়ো বড়ো জামরুল ফলেছে, সব সাবাড় করে দিতে হবে। রাজী সবাই?

সকলে। (সমস্বরে) হ্যাঁ।

নিতাই। তাহলে সবাই আমার পেছনে এমনি করে পা টিপে টিপে চলো........

(নিতাই-এর সঙ্গে বালকদের প্রস্থান)

[একটু পরে যজ্ঞনাথের প্রবেশ, হাতে হুঁকা]

যজ্ঞনাথ। আঃ, এখানে বেশ ছায়া আছে, এই গাছটার নিচে একটু বসি। (গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে) বাড়ী যেন শ্মশানের মত হাঁ করে খেতে আসছে সর্বক্ষণ, এতটুকু টিকতে পারি না। নইলে এই ভরতুপুর বেলা, সারা গাঁ ঝিমুচ্ছে, রোদে পুড়ছে মাঠ-পথ সব, আর আমি ঘরছাড়া বিবাগীর মত হা গোকুল, হা গোকুল বলে ঘুরে মরছি।

বয়সে বুকে আগুন জ্বেলে দিয়েছ। পথে পথে আর খুঁজে ফিরি কেন, সে শত্রুর কি আর ফিরে আসবে। (এমন সময় পথ দিয়ে বাউল গাইতে গাইতে গেল, শুনতে শুনতে তন্দ্রাচ্ছন্নের মত যজ্ঞনাথ গাছের গায়ে হেলে পড়ে।)

গান

পথ দিয়ে কে যায়গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়,
আমার ঘরে থাকাই দায়।
পথের হাওয়ায় কী সুর বাজে,
বাজে আমার বুকের মাঝে,
বাজে বেদনায়।
পূর্ণিমাতে সাগর হতে ছুটে এলো বান,
আমার লাগলো প্রাণে টান।
আপন মনে মেলে আঁখি
আর কেন বা পড়ে থাকি
কিসের ভাবনায়।

[যজ্ঞনাথ বেশ ঘুমিয়ে পড়েছে, দুজন গ্রামবাসীর প্রবেশ।]

১ম জন। ওঃ, গরমটা এবার অসহ্য মনে হচ্ছে, না?

২য় জন। কলিযুগে মন্দই যে বেশী। তাই শুধু গরম কেন, বর্ষাও আসবে বান ডাকিয়ে, শীতও হাড়ে-মাষে কামড় লাগাবে, দেখে নিও।

১ম জন। তা যা বলেছ। জষ্ঠির অদ্ধেক পেরিয়ে গেল, পোড়া আকাশে এক টুকরো মেঘের দেখা নেই। (হঠাৎ ঘুমন্ত যজ্ঞনাথকে দেখে) আর হবেই বা কি করে (যজ্ঞনাথকে দেখিয়ে) এইরকম সব মনিষ্যি থাকতে কি দেবতার কৃপা হবে!

২য় জন। কে ঘুমুচ্ছে এখানে (ভাল করে দেখে) আমাদের 'যজ্ঞনাশ' না? গাঁয়ের লোক ওনাকে নতুন নাম দিয়েছে 'যজ্ঞনাশ'।

১ম জন। ঠিকই দিয়েছে। সর্বস্ব নাশ করেছে বলেই তো এমন একখানা খাসা উপাধি দিয়েছে। (হাস্য)

২য় জন। সর্বস্ব না খোয়ালে আর এই দশা হয়। বুড়ো বয়সে কোথায় বেটা আর নাতি নিয়ে সুখ করবি, তা নয় ঐই আগুনের হলকার মধ্যে এসে ঘুমোয়! বলি, ও যজ্ঞনাশবাবু—

১ম জন। থাক্ ভায়া, আর এখন ডেকো না। উঠলেই তো গালমন্দ শুরু করবে, এই রোদের তাতে তা মুখরোচক হবে না। মানে মানে সরে পড়ি চলো।

২য় জন। তাই চলো, ওনাকে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই, এখনি গোকুল, গোকুল বলে চেঁচাতে থাকবে। সরে পড়াই ভালো। (উভয়ের প্রস্থান)

[নিতাই ও বালকদের প্রবেশ। সকলেই জামরুল খাচ্ছে।]

নিতাই। কেমন মজা হোল, এখন আরাম করে বসে কোঁচড় ভর্তি জামরুল খাওয়া যাক। (যজ্ঞনাথকে দেখে) এখানে আবার কে ঘুমুচ্ছে দেখো।

বালকেরা। ওরে বাবা, এ যে আমাদের 'চামচিকে'!

নিতাই। (আনন্দে) কি বললে, চামচিকে? ও হো হো হো, দাঁড়াও, একটা খুব মজা করি। (যজ্ঞনাথের মাথার কাছে চাদর ঝাড়া দিতেই একটা গিরগিটি যজ্ঞনাথের ওপর লাফিয়ে পড়লো। যজ্ঞনাথ ধড়মড় করে উঠে পড়তেই বালকেরা হো হো করে হেসে উঠলো।)

যজ্ঞনাথ। এই, কে রে? (নিতাই ছাড়া বালকেরা সবাই পালালো।) এই ছেলেটা, তুই কে? এতবড় সাহস আমার গায়ে গিরগিটি ছাড়িস্? (নিতাই ভ্রূক্ষেপ না করে চট্ করে যজ্ঞনাথের গামছাখানি টেনে নিয়ে একটু সরে গিয়ে মাথায় পাগড়ী করলো।) কি, এতখানি আস্পর্দ্ধা ঐটুকু ছেলের, দাঁড়া দেখাচ্ছি। (লাঠি খোঁজার ছল) এই, এই ছোঁড়া, তোর নাম কি?

নিতাই। নিতাই পাল। (জামরুলে কামড় দিয়ে দেখিয়ে বললো) খাবে (আধ-খাওয়া জামরুলটা যজ্ঞনাথের গায়ে ছুঁড়লো।)

যজ্ঞনাথ। (কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে) ওরে বদমাশ কোথাকার, তোকে ধরলে একবারে আছড়ে মারবো।

নিতাই। (একটু সরে গিয়ে) উঃ, মারলেই হোলো।

যজ্ঞনাথ। এই তোর বাড়ী কোথায়?

নিতাই। বলব না।

যজ্ঞনাথ। বাপের নাম কী?

নিতাই। বলব না।

যজ্ঞনাথ। কেন বলবি না?

নিতাই। আমি বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।

যজ্ঞনাথ। কেন?

নিতাই। আমার বাপ আমাকে পাঠশালায় দিতে চায়।

যজ্ঞনাথ। ঠিকতো। তোর মত বখাটেকে পাঠশালায় দেওয়া মানে নিষ্ফল অপব্যয়। তোর বাপের বেশ বিষয়-বুদ্ধি আছে বুঝছি। তা, আমার বাড়ীতে এসে থাকবি? আমি কোনোদিন তোকে পাঠশালার ত্রিসীমানায় যেতে দেব না।

নিতাই। (নিঃসঙ্কোচে) হ্যাঁ থাকবো, চলো নিয়ে।

যজ্ঞনাথ। (কাছে এসে আদর করে) সত্যি বলছিস্ নিতাই, আমার বাড়ী যাবি, আমার কাছে থাকবি?

নিতাই। সত্যি বলছি তো, কেন থাকবো না।

যজ্ঞনাথ। (নিতাইকে বুকে টেনে নিয়ে) ওরে, ওরে নিতাই, তুই আমার গোকুল রে। নিতাই বেশে আবার এ ভাঙ্গা বুকে ফিরে এসেছিস। আজ আমার কী আনন্দ। দাদু আমার, এতদিন আসিস নি কেন ভাই, এতদিন কেন আসিস নি? (বুকে তুলে নিলো)

পঞ্চম দৃশ্য

[যজ্ঞনাথের বাড়ী। নানারকম খাদ্যের রাশি নিয়ে যজ্ঞনাথ নিতাইকে কোলে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে।]

যজ্ঞনাথ। লক্ষ্মী দাদু আমার, এই সন্দেশটা খেয়ে নে।

নিতাই। না সন্দেশ নয়, রাবড়ি খাবো। রোজ রোজ সন্দেশ খেয়ে অরুচি ধরেছে।

যজ্ঞনাথ। আচ্ছা, রাবড়ি ও-বেলা আনবো। তবে এই ক্ষীরটুকু খা। তাও না? তবে ঐ সরওলা দুধটা?

নিতাই। কিপটে কোথাকার! আমি আর কোনো-দিন দুধ খাবো না। এবার রাবড়ি, রাজভোগ, মালপোয়া, ক্ষীরমোহন না দিলে আমি ঠিক চলে যাবো।

যজ্ঞনাথ। (দুধের বাটি নিতাই-এর মুখে ধরে) অমন কথা বলিস নি ভাই, চলে যাবি কোন্ দুঃখে? তুই চলে গেলে আমি আর একদিনও বাঁচবো না।

নিতাই। তবে যা খেতে চাই, দাওনা কেন? কত ভালো ভালো খাবার আছে, কিছু আনো না।

যজ্ঞনাথ। সব আনবো রে ভাই, নিশ্চয় আনবো। আমার আর খাবার অন্য কে আছে রে বোকা, সবি তো তুই পাবি।

নিতাই। সব মিথ্যে কথা। এই যে আমি বললাম, আমার জন্য ভালো সিল্কের জামা, ভালো কাপড়, চকচকে জুতো এনে দাও, তুমি কিসব বাজে জিনিস এনেছো। না, না, আমি ঠিক চলে যাবো।

যজ্ঞনাথ। বারে বারে ওসব কথা বলিস নি দাদু। সব এনে দেব তোকে। বুড়ো কিনা, তাড়াতাড়ি সব আনতে পারি না। দেখ্ না, আস্তে আস্তে তোকে সব এনে দেবো। এখন আমার মাথা থেকে পাকাচুল তুলে দে দিকি।

নিতাই। তাহলে পয়সা দেবে তো? এক একটা চুলের জন্য এক একটা পয়সা দেবে তো?

যজ্ঞনাথ। (হেসে আদর করে) দেবো রে, তাই দেবো।

[নিতাই পাকাচুল তুলতে থাকে। শ্যামাকান্ত ইত্যাদির প্রবেশ]

শ্যামাকান্ত। ইয়ে হয়েছে, এই যে যজ্ঞনাথবাবু, নাতির হাতের আদর উপভোগ করছেন বুঝি, তা ভালো, ভালো।

হরমোহন। অর্থাৎ কিনা, বুড়ো বয়সে আপনার আবার এক অনর্থক ঝঞ্ঝাট হলো।

মন্মথ। ঝঞ্ঝাট বলে? কোথায় এ বয়সে একটু শান্তিতে থাকবেন, তা নয়, মিছে জঞ্জাল কুড়োনো আর কি!

শ্যামাকান্ত। আর ছেলেটাও কি, ইয়ে হয়েছে, একটু শান্ত থাকে এক মুহূর্ত? চোপর দিন নাকে দড়ি দিয়ে চরকির মত ঘোরাচ্ছে।

হরমোহন। অর্থাৎ কিনা, এ বয়সে এতখানি শারীরিক ঝক্কি, কোনোমতেই সমীচীন নয়।

মন্মথ। বৃন্দাবন কাজটা উচিত করলো না শ্যামাদাদা।

শ্যামাকান্ত। সেতো আকাশের মত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তুই গেলি গেলি, সঙ্গে গাধাবোটের মত ছেলেটাকে নিয়ে গেলি কোন্ আক্কেলে। ইয়ে হয়েছে, পরের কে একটা কে উড়ে এসে এখন তো জুড়ে বসলো? একটা কুটো আর তুই পাবি এর পরে?

হরমোহন। অর্থাৎ কিনা, তাও বলি—আমাদেরও

তো সোনার মত ছেলেপুলে ছিলো, যদি পালন করতেই হয়, পাড়া-প্রতিবেশীকে সরিয়ে কোথাকার একটা কে, কি জাত, কি ধর্মো—

মন্মথ। বিশেষ করে, আমার যখন অমন ক্ষণজন্মা ছেলে—

শ্যামাকান্ত। আঃ মন্মথ, সব সময় নিজের কোলেই ঝোলটা নাই টানলে! ইয়ে হয়েছে, আমারও তো—

মন্মথ। দুত্তোর, তোমার ইয়ের।

(যজ্ঞনাথের এসব আলোচনা ভাল লাগছিল না, তাই এদের কথায় কোনো সায় না দিয়ে নিতাইকে নিয়ে ঘর ছাড়ার উপক্রম করলো।)

যজ্ঞনাথ। চল্ দাদু, পুকুরে ছিপ ফেলে তোর জন্য বড় একটা মাছ ধরে দিই।

(সকলের দিকে তির্যক ভাবে একটা অগ্নিদৃষ্টি দিয়ে নিতাইকে নিয়ে প্রস্থান।)

শ্যামাকান্ত। দেখ্‌লে একবার ভাবখানা? আমাদের কথাগুলো যেন শুনতেই পেল না।

হরমোহন। অর্থাৎ কিনা, ব্যাপার যেরকম বর্দ্ধিত হারে কলেবর স্ফীত করছে—

মন্মথ। আঃ, ভায়া হরমোহন, ফের্ বঙ্কিমী শুরু করলে?

হরমোহন। ওহে স্থূলবুদ্ধি, অনুধাবন করো। এখন এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে যজ্ঞনাথবাবু এমতাবস্থায় আর বেশীদিন বাঁচবেন না এবং সেক্ষেত্রে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ঐ অজ্ঞাতকুলশীল নিতাইকেই বন্দোবস্ত করে দিয়ে যাবেন।

মন্মথ। সে কখনোই করতে দেওয়া যায় না। গ্রামস্থ প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ, অর্থাৎ আমরা—

শ্যামাকান্ত। এর একটা বিহিত করবোই। আমাদের পুত্ররত্নদের মত সুযোগ্য উত্তরাধিকারীরা বর্তমান থাকতে, ইয়ে হয়েছে, একটা যে কেউ এসে সব লুটে নেবে, এ কোনোমতেই সহ্য করা হবে না।

হরমোহন, মন্মথ। কিছুতেই না।

[যজ্ঞনাথ আর নিতাইকে আসতে দেখে সবাই চুপ করে গেল। নিতাইকে বুকে নিয়ে যজ্ঞনাথের প্রবেশ]

নিতাই। মাছ না ছাই, সব মিথ্যে কথা! না, না, এবার আমি ঠিক চলে যাবো বলছি।

যজ্ঞনাথ। চুপ চুপ দাদু, ওরা সব শুনতে পাবে যে।

নিতাই। জানি না।

যজ্ঞনাথ। ভাবিস কেন ভাই। তোকে আমার সমস্ত বিষয়-আশয় দিয়ে যাবো।

নিতাই। ঠিক বলছো, সব দেবে তো?

যজ্ঞনাথ। সব দেবো, সব দেবো। (সেইভাবে প্রস্থান)

শ্যামাকান্ত। শুনলে তো সব? ওঃ অসহ্য। যজ্ঞনাথবাবু যেন আমাদের দেখতেই পাচ্ছেন না। এখনি এই, ইয়ে হয়েছে, এরপর এ-বাড়ীর চৌকাঠ মাড়ানোও যাবে না।

হরমোহন। অর্থাৎ কিনা, আমাদের দিনও অবসানপ্রায়। এখন কিংকর্তব্যমিতি?

মন্মথ। আমার পরামর্শ শোনো। এখনো সময় আছে, ছেলেটার বাপের খোঁজ করা যাক্, তারপর তার হাতে ওকে তুলে দাও। অন্যথায় আমাদের চোখের সামনে সব কর্পূরের মত উবে যাবে।

শ্যামাকান্ত। আরে, ইয়ে হয়েছে, ছেলেটাও তো এসে ইস্তক চলে যাবো, চলে যাবো কচ্ছে। যজ্ঞনাথবাবুই আদর দিয়ে মাথায় তুলছেন আর সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে আটকে রাখছেন। রকম দেখে তো তাজ্জব বনে যাচ্ছি।

হরমোহন। আর এদিকে ছেলেটার বাপ-মা'র মনেও না জানি কত কষ্টই হচ্ছে। ছেলেটাও তো পাপিষ্ঠ কম নয়। তুই-ই বা পড়ে আছিস কেন হতভাগা, পাজী কোথাকার! অর্থাৎ কিনা, মুখেই শুধু চলে যাবো, চলে যাবো রব, আসলে ষোল আনা সেয়ানা, এতবড় বিষয় সম্পত্তি, বাচ্চা হলে কি হয়, পুরোনজর সেদিকে।

মন্মথ। তাইতো বলছি, চলুন শ্যামাদাদা, ওর বাপ-মা'র খোঁজ নেওয়া যাক্। তবে যদি তাড়ানো যায়।

শ্যামাকান্ত। তাই চলো, অগত্যা। (সকলের প্রস্থান)

[নিতাই-এর হাত ধরে চারদিক দেখতে দেখতে যজ্ঞনাথের প্রবেশ।]

যজ্ঞনাথ। পাড়া-প্রতিবেশীর সোহাগের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি। তোদের এত গাত্রদাহ কেন শুনি! বুড়ো বয়সে কুড়িয়ে পেয়েছি অন্ধের যষ্টি, সব হিংসেয় ফাটছে। চল্ দাদু, স্নান করিয়ে দিই, বেলা বাড়ছে।

[একজন পথিকের প্রবেশ]

কে বাপু তুমি, একেবারে বাড়ীর অন্দরে সেঁধিয়ে আসো?

পথিক। (কাতর স্বরে) বাবু, একঘটি জল খাওয়াতে পারেন? অনেক দূর থেকে আসছি, পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে গলা শুনতে পেলাম, তাই এলাম। অপরাধ নেবেন না, বাবু।

নিতাই। তুমি জল খাবে?

পথিক। হ্যাঁ, খোকাবাবু, এনে দাও না।

নিতাই। বোসো, আমি এখনি আনছি। (ভিতরে গেল)

যজ্ঞনাথ। আমি ভেবেছিলাম বুঝি গাঁয়ের কেউ। গাঁয়ের লোকের ওপর আমার শ্রদ্ধা কমে গেছে।

পথিক। কেন বাবু?

যজ্ঞনাথ। বুড়ো মানুষকে ভগবান একটু দয়া করেছেন, পথ থেকে ঐ মানিক কুড়িয়ে পেয়েছি, তা এ গাঁয়ের লোকদের সইছে না।

পথিক। কুড়িয়ে পেয়েছেন? (নিতাই জল এনে পথিককে ঢেলে দিল। জলপানের পর তৃপ্ত হয়ে) আঃ, বাঁচলাম, রাজা হও খোকাবাবু। এই আপনার মানিক, বাবু? খাসা ছেলে। তা....(একটু যেন ভেবে) একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আপনাকে বলে যাই বাবু। কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে বলেই বলছি। আগের গ্রাম দিয়ে আসতে আসতে শুনলাম, দামোদর পাল নামে কে একজন তার হারানো ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর এই গাঁয়ের দিকেই নাকি আসছে।

নিতাই। (ব্যস্ত হয়ে) কি নাম বললে, দামোদর পাল?

পথিক। হ্যাঁ গো খোকাবাবু। (যজ্ঞনাথকে) আচ্ছা, চলি বাবু। আঃ, জল খেয়ে প্রাণটা বাঁচলো। (প্রস্থান)

নিতাই। দাদুভাই।

যজ্ঞনাথ। কেন রে?

নিতাই। যার নাম বললো তার সঙ্গে আমি দেখা করবো।

যজ্ঞনাথ। সেকি, ওকথা বলো না। কোথাকার কে, তার সঙ্গে কেন দেখা করবি। চল্, স্নানের বেলা হল।

নিতাই। না দাদু, আমার এখানে থাকতে ভাল লাগছে না, সেই লোকটার সঙ্গে দেখা করবো।

যজ্ঞনাথ। কি যে বলিস দাদুভাই, যার তার সঙ্গে কি মেলামেশা করতে আছে?

নিতাই। না, না, আমি আর থাকবো না এখানে।

যজ্ঞনাথ। এই পাগল ছেলে, তোকে আমি এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবো, কেউ খুঁজে পাবে না।

নিতাই। (কৌতুকের সুরে) অ্যাঁ, লুকিয়ে রাখবে? কোথায় রাখবে দাদু, দেখিয়ে দাও না।

যজ্ঞনাথ। এখন দেখাতে গেলে প্রকাশ হয়ে পড়বে, রাত্তির বেলায় দেখাবো।

নিতাই। (উৎফুল্ল ভাবে) রাত্তির বেলায় দেখাবে? বেশ হবে। (মনে মনে চিন্তা) আমাকে খুঁজে না পেয়ে বাবা যেই-না চলে যাবে, অমনি সব বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে লুকোচুরি খেলবো। কেউ খুঁজে পাবে না, কী মজা হবে! (যজ্ঞনাথকে) দাদু, ঠিক নিয়ে যাবে তো?

যজ্ঞনাথ। নিশ্চয় নিয়ে যাবো।

নিতাই। কি মজা, লুকিয়ে থাকবো, কী মজা।

(প্রস্থান)

যজ্ঞনাথ। আর দেরি নয়, চারদিকে শত্রু। সারা জীবন বুকের রক্ত জল করে যা খুদকুঁড়ো জমিয়েছি, তার যোগ্য পাহারাদার এতদিনে পেয়েছি। এত কষ্টের ধন, একটা কানাকড়িও কাউকে দোব না, সব তোকেই দিয়ে যাবো দাদুভাই। আর এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখে আসবো যে পৃথিবীর একটি কাক-পক্ষীও তোর সন্ধান পাবে না, হা হা হা হা হা হা....(পর্দা নেমে এলো)।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[বালিশে মাথা রেখে নিতাই শুয়ে আছে। ঘরের এককোণে হ্যারিকেন জ্বলছে। আস্তে আস্তে যজ্ঞনাথ প্রবেশ করে নিতাইকে দেখতে থাকে। একসময়ে নিঃশ্বাস মুখে পড়তেই নিতাই ধড়মড় করে উঠে পড়লো।]

নিতাই। দাদু এসেছ? নিয়ে চলো। আমাকে একলা ফেলে কোথায় গিয়েছিলে? দরজায় খিল দিয়ে রেখেছিলে কেন দাদু?

যজ্ঞনাথ। (গম্ভীর মুখ) পাছে কেউ এসে বাধা দেয় সেই জন্যে। চুপি চুপি যেতে হবে কিনা।

নিতাই। কখন যাবে বলো না দাদু?

যজ্ঞনাথ। এখনো রাত্তির হয়নি।

নিতাই। হয়নি বৈকি, ঐতো হয়েছে (বাইরে নির্দেশ) ও দাদু, চলো।

যজ্ঞনাথ। দেখছিস না, এখনো পাড়ার লোক ঘুমোয় নি।

নিতাই। (উঠে জানলা দিয়ে দেখে) ঐতো ঘুমিয়েছে, এবার চলো।

যজ্ঞনাথ। (বসলো) আরো একটু অপেক্ষা কর্ ভাই, তারপর দুজনে মিলে গটগট করে যাবো। (নিতাই-এর মাথা কোলে টেনে নিয়ে ঘুম পাড়াতে লাগলো।) আর একটু ঘুমিয়ে নে দাদু, অনেকটা পথ হাঁটতে হবে তো।

(একটু পরে নিতাই ঘুমিয়েছে দেখে আস্তে আস্তে উঠে একটা পুঁটলিতে কি সব ভরতে থাকে। তারপর জানালার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো, আবার ফিরে এসে নিতাই-এর মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর নিতাই-এর পাশে বসলো।)

নিতাই। (যেন দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে) দাদু, দাদু, কই চলো। কত রাত্তির হয়ে গেল।

(উঠে বসলো। এমন সময় দেওয়াল ঘড়িতে দুটো বাজলো।)

যজ্ঞনাথ। চল্ দাদু, এবার সময় হয়েছে।

(নিতাই-এর একটা হাত ধরলো। পুঁটলিটা হাতে তুলে নিয়ে, ইষ্ট দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে, হ্যারিকেনটা নিবিয়ে দিল। তারপর ধীরে ধীরে উভয়ে বেরিয়ে গেল।)

সপ্তম দৃশ্য

(জঙ্গলের মধ্যে একটি দেবতাহীন ভাঙ্গা মন্দিরের অভ্যন্তর। একপাশে কতকগুলি পিতলের কলস, মধ্যে একটি আসন, সিন্দুর, চন্দন, ফুলের মালা—পূজার উপকরণ। প্রদীপ জ্বলছে, ধূপের ধোঁয়ার পবিত্র গন্ধে চারিদিক আমোদিত। আর একপাশে একটি কাঠের মই, ওপর থেকে ওঠা-নামার জন্য, কারণ ঘরটি মাটির নীচে। মঞ্চ আধো-অন্ধকার। দেখা গেল মই বেয়ে যজ্ঞনাথ ও নিতাই নামছে।]

যজ্ঞনাথ। আস্তে আস্তে নাম্ ভাই।

করছে।

যজ্ঞনাথ। এই দেখ্ না কেমন লুকোবার জায়গা।

(নেমে এলো উভয়ে)

নিতাই। (কলস দেখে) ওসবে কি আছে দাদু?

যজ্ঞনাথ। (ঈষৎ হেসে) হাত ঢুকিয়ে দেখ্ না।

নিতাই। (১টি কলসের মধ্যে হাত দিয়ে) ওরে বাবা, এ যে সব টাকা। (সব কলসগুলোর ভেতর হাত ঢুকিয়ে) টাকা, টাকা, এত টাকা, দাদু? শুধু মোহর আর টাকা। সব তোমার দাদু?

যজ্ঞনাথ। হ্যাঁ, সব আমার। কেমন, আমি তোকে বলছিলাম না যে আমার সমস্ত টাকা তোকে দেবো? তবে, আমার অধিক কিছু নেই, সবে এই কটিমাত্র ঘড়া আমার সম্বল। আজ আমি এর সমস্তই তোর হাতে দেব।

নিতাই। (আনন্দে লাফিয়ে উঠে) সমস্তই? তুমি কি ভালো, দাদু। এর একটা টাকাও তুমি নেবে না?

যজ্ঞনাথ। যদি নিই তবে আমার হাতে যেন কুষ্ঠ হয়। কিন্তু একটা কথা আছে। যদি কখনো আমার নিরুদ্দেশ নাতি গোকুলচন্দ্র কিম্বা তার ছেলে কিম্বা তার পৌত্র কিম্বা তার প্রপৌত্র কিম্বা তার বংশের কেউ আসে, তবে তার কিম্বা তাদের হাতে এই সমস্ত টাকা গুনে দিতে হবে।

নিতাই (বিস্মিত ভাবে যজ্ঞনাথের দিকে চেয়ে রইলো, ভাবলো যজ্ঞনাথ বুঝি পাগল হয়েছে) আচ্ছা, তাই দেবো।

যজ্ঞনাথ। তবে এই আসনে বোস্ নিতাই।

নিতাই। কেন?

যজ্ঞনাথ। তোমার পূজো হবে।

নিতাই। কেন?

যজ্ঞনাথ। এই রকম নিয়ম।

(নিতাই আসনে বসলো। যজ্ঞনাথ তার কপালে চন্দন, সিঁদুরের টিপ ও গলায় মালা দিল। তারপর হাতজোড় করে, চোখ বুজে কি যেন বিড়বিড় করে বলতে থাকে। তাই দেখে ভীত ভাবে নিতাই বললো)

নিতাই। দাদু, কি বলছো অমন করে, আমার বড় ভয় করছে। ও দাদু—

(যজ্ঞনাথ নিরুত্তর। একটু পরে চোখ খুলে এক একটি করে ঘড়া নিতাই-এর সামনে এনে বললো)

কুণ্ডের পুত্র গদাধর কুণ্ড তস্য পুত্র প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ড তস্য পুত্র পরমানন্দ কুণ্ড তস্য পুত্র যজ্ঞনাথ কুণ্ড তস্য পুত্র বৃন্দাবন কুণ্ড তস্য পুত্র গোকুলচন্দ্র কুণ্ডকে কিংবা তাহার পুত্র অথবা পৌত্র অথবা প্রপৌত্রকে কিংবা তাহার বংশের ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে এই সমস্ত টাকা গণিয়া দিব।"

(নিতাই প্রতিবারই যজ্ঞনাথের সঙ্গে এক একটি ঘড়ার সামনে কথাগুলো আবৃত্তি করলো। শেষ বারের করার পর নিতাই-এর জিহ্বা জড়িয়ে গেল। সে হাতে হাত ঘষতে থাকে, শেষে শ্বাসরোধের মত হওয়ায় চোখ দুটো বড় হল। অত্যন্ত পিপাসা বোধ হল।)

নিতাই। এ-ক-টু জ-ল খা-বো। তে-ষ্টা পে-য়ে-ছে।

(বলতে বলতে মুখ ঢেকে দু'হাতে মাথা নীচু করলো। এসময়ে যজ্ঞনাথ ফুঁ দিয়ে দীপ নিবিয়ে আস্তে আস্তে নিতাইকে দেখতে দেখতে মই বেয়ে ওপরে উঠে যেতে থাকে। হঠাৎ নিতাই মুখ তুলে তাই দেখে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলো)

নিতাই। দাদু, কোথায় যাচ্ছ ?

যজ্ঞনাথ। আমি চললাম। তুই এখানে থাক্! তোকে আর কেউ খুঁজে পাবে না। কিন্তু মনে রাখিস্ যজ্ঞনাথের পৌত্র, গোকুলচন্দ্রের নাম। আমার এত কষ্টের সম্পত্তি আগ্‌লাবার জন্য তোকে যক্ষ করে রেখে গেলাম, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

(ওপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল)

নিতাই। (কাঁদতে কাঁদতে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে) দাদু, আমাকে একলা ফেলে চলে যেও না। আমি বাবার কাছে যাবো, বাবা, বাবা........

(অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লো)

অষ্টম দৃশ্য

[অন্ধকার মঞ্চ। দেখা গেল যজ্ঞনাথ সেই মন্দিরের একটি পাথর খণ্ডের ওপর প্রথমে মাটি, ঘাস ও পরে গাছ-পাতা, ডালপালা এনে চাপা দিচ্ছে।]

যজ্ঞনাথ। ব্যস্, আর কেউ দেখতে পাবে না, কেউ জানতে পারবে না। নিশ্চিন্ত, একেবারে নিশ্চিন্ত। আমার বুকের পাঁজরের মত এক একখানা মোহর আর টাকা ভর্তি ঘড়া এখন থেকে চিরদিন ধরে পাহারা দেবে যক্ষের মত ঐ সোনার বরন ছেলে, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। পাজী হিংসুটে বদমাশগুলো ফন্দি এঁটেছিল বুড়োকে মেরে সব লুটে খাবে, কেমন হয়েছে এইবার, সব জব্দ করে দিয়েছি একেবারে। হা হা হা হা হা.......

(কে যেন ডাকলো, "বাবা"। যজ্ঞনাথ চমকে ওঠে)

কে, কে ডাকে, ওরে আবার কে ডাকে।

(সেই স্তূপের ওপর বসলো)

না, না, উঠে আসতে দেবো না, উঠে আসতে পাবি না, যতই দাদা, বাবা বলে ডাক্।

(স্তূপের বুকে কান পাতলো)

দেখি, দেখি, শুনতে পাই কিনা। কেউ ডাকছে কিনা শুনি। না, না, কেউ না। ভ্রম, ও আমার মনের ভ্রম।

(আবার কান পেতেই লাফিয়ে উঠলো)

ওইযে, ওইযে ডাকছে, বাবা, বাবা বলে কাঁদতে কাঁদতে ঐ কে ডাকছে।

(দূরে অন্ধকার জঙ্গলের দিকে চেয়ে)

ঐ জঙ্গলের গাঢ় অন্ধকারের বুক চিরে কে যেন কেবলি গুমরিয়ে উঠছে না ?

(আবার কে যেন ডাকলো "বাবা")

ওরে, ঐ সর্বনাশা ডাক যে আমায় পাগল করে দিতে চায়। (সভয়ে সরে গেল) কে, কে ওখানে ? খবরদার, খবরদার বলছি ডাকবি না।

(আবার বসে স্তূপের ওপর আদর করে চাপড় দিতে দিতে)

ওরে দাদু, চুপ কর, চুপ কর, সবাই শুনতে পাবে যে। বোকা ছেলে, বুঝতে পারিস্ না, আমি যে তোর দাদু। অত আদর যত্ন করলাম, আর তুই আমার একটা উপকারও করবি না ?

(আবার কে ডাকলো "বাবা"। যজ্ঞনাথ সভয়ে পালাতে গেল। বৃন্দাবনের প্রবেশ। বেশবাস বিস্রস্ত, ডাকলো)

বৃন্দাবন। বাবা।

যজ্ঞনাথ। কে, কে ডাকলো ? স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

(মুখ ফেরাতেই বৃন্দাবনকে দেখে বিষম চমকে উঠলো)

কে, কে তুমি ?

বৃন্দাবন। বাবা, আমি বৃন্দাবন।

যজ্ঞনাথ। কে, বৃন্দাবন ?

বৃন্দাবন। হ্যাঁ। বাবা, আমি সন্ধান পেলাম আমার ছেলে তোমার ঘরে লুকিয়ে আছে, তাকে দাও।

যজ্ঞনাথ। (দারুণ বিস্ময়ে চোখ-মুখ বিকৃত করে বৃন্দাবনের ওপর ঝুঁকে পড়ে) তো-র-ছে-লে ?

বৃন্দাবন। হ্যাঁ, গোকুল। এখন তার নাম নিতাই পাল। আমার নাম দামোদর। কাছাকাছি সর্বত্রই তোমার খ্যাতি আছে, সেইজন্য আমরা লজ্জায় নাম পরিবর্তন করেছি, নইলে কেউ আমাদের নাম উচ্চারণ করতো না। দাও, গোকুলকে দাও, বলো সে কোথায় আছে ?

যজ্ঞনাথ। নিতাই....নিতাই....তোর ছেলে....মানে, আমারই নাতি গোকুল সে........অঁ্যা....এ আমি....এ আমি কি করলাম রে। ভগবান, আমাকে বধির করে দাও, অন্ধ করে দাও, আমার এই হাত দুখানায় বজ্রপাত করে ভেঙ্গে, পুড়িয়ে, গুঁড়ো করে দাও। (বলতে বলতে জ্ঞান হারালো। বৃন্দাবন দু'হাত দিয়ে ধরলো।)

বৃন্দাবন। বাবা, এসব কি বলছো ? গোকুল, আমার গোকুল, কি নেই ?

(যজ্ঞনাথ একটু সম্বিৎ ফিরে পেয়ে)

যজ্ঞনাথ। বাতাসে কি কারোর কান্না শুনতে পাচ্ছিস্ বৃন্দাবন, ঐ ঘন অন্ধকারের পাষাণ ফাটিয়ে একটা কাতর আর্তনাদ কি তোর কানে ভেসে আসছে বৃন্দাবন ?

বৃন্দাবন। (অস্থির ভাবে) বাবা, কি হয়েছে শীঘ্র বলো। আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না।

যজ্ঞনাথ। (স্তূপের কাছে নিয়ে গিয়ে) এখানে কান পেতে শোন্ দিকি, বাবা বলে কেউ কি ডাকছে ?

বৃন্দাবন। (স্তূপে কান পেতে) না, কই না।

যজ্ঞনাথ। শুনতে পাচ্ছিস্ না ? পাবি কি করে ? সে যে বাবা, বাবা বলে ডাকতে ডাকতে নিশ্চিন্ত ভাবে শেষ ঘুমে ঢলে পড়েছে এতক্ষণ, ওরে সে যে এখন তাল তাল মোহর আর টাকার নরম নরম গদীতে যক্ষ হয়ে গ্যাঁট পাকিয়ে বসে এই বুড়োর পাঁজর খসানো সম্পত্তির পাহারাদার হয়ে রয়েছে। তাকে তুই পাবি কি করে, হা হা হা হা হা হা....সে যে এখন সকলের মায়ার দড়ি ছিঁড়ে ঐদিকে (আকাশ দেখিয়ে) নৌকো ভাসিয়ে তরতর করে চলেছে, হা হা হা হা হা হা.... ....কেউ পাবি না আর, কেউ খুঁজে পাবি না তাকে....হা হা হা হা হা....

(উন্মাদের মত হাসতে হাসতে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল)

বৃন্দাবন। বাবা, বাবা, এ তুমি কি করলে বাবা........ ওঃ গোকুল রে, গোকুল আমার, ফিরে আয়, ফিরে আয় (কাঁদতে কাঁদতে সেই স্তূপের জঞ্জাল আছড়ে ফেলতে লাগলো)।

(ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এলো।)

—যবনিকা—

মুখের দুর্গন্ধ
অতি অপ্রীতিকর!

মুখে দুর্গন্ধ থাকিলে সমাজে অবাধ মেলামেশা করা যায় না। কাজেই ইহা অনেকের জীবন দুঃখময় করে। প্রতিদিন সাধনা দশন ব্যবহার করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, মুখ জীবাণুমুক্ত হয় ও দন্তরাজি সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

সাধনা
দশন
SADHANA
DASAN
PURE
AYURVEDIC
TOOTH
POWDER
আদর্শ দন্তমঞ্জন
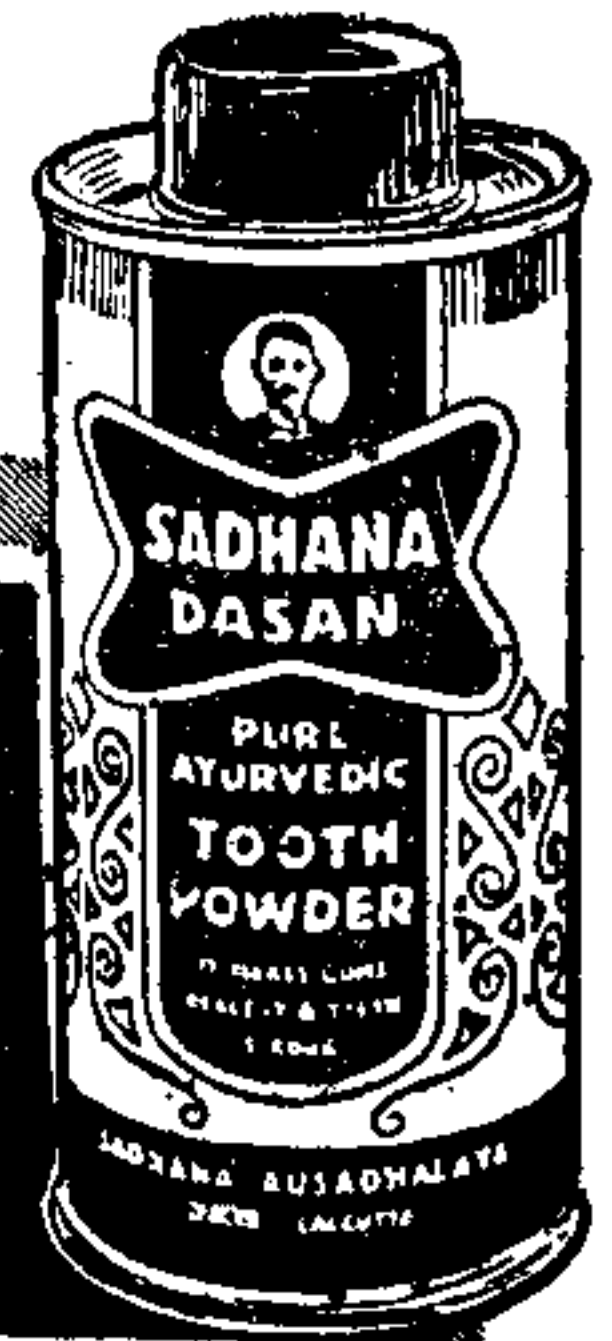
সাধনা ঔষধালয় — ঢাকা
১০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর
কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন)
এম. সি. এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য।

টাকার রং লাল

(সম্পূর্ণ উপন্যাস)

শ্রীআদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(এক)

মরণ। জন্মের কারণ।

আশা নিয়ে ভবিষ্যৎ বাঁধার সংকল্পে চিরসমাধি। দুর্মদ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক আর নাই-ই হোক, থাক হৃদয়ে যতই মৌনমূক বেদনা—বর্তমানের জন্য আকুল আর্তনাদ, সব ফেলে যেতে হবে সে কঠিন নির্মম কালো মৃত্যু-বাসরে।

মহা সমাদরে নিয়ে যাবে মহাকাল। বাধা মানবে না। শুনবে না কারো কথা। সে অজানা—অদ্ভুত।

প্রিয়জনের আকুল আর্তনাদ, সজল চোখে শ্রাবণের ধারা, সহস্র স্মৃতির অকারণ স্মরণ, কাল্পনিক ভবিষ্যৎ ভাবনার কলরোল গ্রাহ্য না করে সবার চোখের সামনে থেকে হাসতে হাসতে প্রাণ ছিনিয়ে নেওয়া প্রধান বৈশিষ্ট্য তার।

পৃথিবীতে সবার উচ্চে স্থান তার। এ-এক পরম সত্য শব্দ। শ্রুতিকটু হলেও সর্বপ্রাণী-গ্রাহ্য, আঁতে ঘা মারা কথা—মরণ!

অগ্রাহ্যর অহমিকাময় অন্তরের অস্ফুট শব্দ সে শুনেও শোনে না। পরম ঘৃণাভরে তার বাণী সর্বজন গ্রাহ্য করতে করতে সেই মহাকাল চলতে শুরু করেছে কোন আদিম কাল থেকে। থামছে না, থামবে না কোনদিন। বড় জোর পরমায়ু বাড়িয়ে দিতে পারে প্রয়োজন বোধ করলে। কিন্তু পরম ঘৃণার পরাকাষ্ঠা সে দেখাবেই অর্থাৎ তার ঐতিহ্য বজায় রাখবেই।

সব একদিক, মৃত্যু একদিক। তবু সে জিতছে। জিতেন্দ্রিয় পুরুষের মত নির্ধারিত জয়োল্লাসে লাল জবার মত লাল টকটকে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বালিয়ে রেখে লকলকে শাণিত জিভটাকে উন্মত্ত লেলিহান শিখার জ্বলন্ত প্রতীকের সদা জাগ্রত প্রহরী যেন সে।

ফাঁকি দেবার উপায় নেই তার দৃষ্টিকে। পলক বিহীন সে স্বচ্ছ দৃষ্টি সার্চ লাইটের মত অত্যন্ত কড়া। বজ্র কঠিন বাহু দুটো বাহাত্তুরে বুড়ো থেকে আতুর ঘরে সদ্য প্রসূত বার সেকেণ্ডের শিশুকেও দেয় না রেহাই। অর্থাৎ তার কারবারে ঘুষ নেই, ভেজাল নেই—ফলাও কারবার।

নির্ভেজাল সে কারবার ফলাও করে বিজ্ঞাপনের নিয়ন লাইটে মহাশক্তিশালী সুললিত ভাব ভাষায় জাদুস্পর্শে মোহিত করবারও প্রয়োজন নেই।

অতএব মরণ ধ্রুবসত্য।

তার যাত্রাপথ সত্য। সত্য তার নাম-মহিমা। তুলনা-বিহীন তকমাধারী বিশিষ্ট সেবাব্রতী যেন সে।

তুলনা ও উপমার ধার ধারে না সে সেবাব্রতী। নিষ্ঠুর নিয়তির পরম বিশ্বস্ত ভৃত্য। বিশ্বজোড়া তার খেলা চলেছে অবিরাম। তোয়াক্কা করে না কারো সমালোচনার, কেননা কারো ত পরিত্রাণ নেই মৃত্যুর হাত থেকে।

পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে মানুষ তার কাছে পরাজিত। সবার পরাজয়, সুতরাং লজ্জার কিছু নেই। সুললিত লজ্জার শাখা লবঙ্গ-লতিকার ন্যায় ললাটে ধারণ করে সব মানুষ এক সূত্রে গাঁথা।

মরণের বিপরীত দিক জন্ম।

জন্মের পর আসে কর্মের স্থান। পৃথিবীর বুক মসৃণ সমতল তুলতুলে জাজিমের মত নয়, দুর্গম যন্ত্রণার্ত বিশাল পৃথিবীর বুকে মানুষকে অহরহ যুদ্ধ করে আগিয়ে যেতে হয়।

দুর্ভিক্ষ, মহামারী, হানাহানির প্রবল প্রতাপের কাছে বশ্যতা স্বীকার করাও মানুষের ধর্মে সয় না, তাই অহর্নিশি চলেছে আশা আর আশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে তার চলার পথ সুগম করবার প্রয়াস। অর্থাৎ নতুন স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভাতের রক্তিম চূড়ার দিকে তার তীক্ষ্ণ প্রখর দৃষ্টি। কল্পনার আলোকিত জীবনের নতুন আশ্বাসের ভৈরবী সংগীত। হৃদয় মন্দিরের বদ্ধ প্রকোষ্ঠে সে এক মধুর স্বরে একাকী একতারা বাজাচ্ছে। কখনও আশা কখনও নিরাশার ছবি পর পর চলচ্চিত্রের ন্যায় হৃদয় গুহায় দেখাচ্ছে নির্ভয় ও ভয়ের স্বরূপ। মানুষ টলছে আবার টলতে টলতে সামলাচ্ছে। অনন্ত কাল থেকে তাই চলেছে মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা আর টানা পোড়েনের খেলায় খেলোয়াড় হয়ে দিগ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ছুটে বেড়ানো।

সাধারণতঃ মানুষ ভাবে এক একটা দিক। কেউ পৃথিবীর কথা, কেউ দেশের কথা, কেউ নিজের কথা। ভেবে ভেবে দুশ্চিন্তায় তলিয়ে যাচ্ছে—তবু ভাবছে। ভাবাটাই তার কাছে সাধনা। ভেবেই তার আনন্দ। ভাবনার একটা কিনারা আবিষ্কারের প্রচেষ্টা।—সে ভালই হোক আর মন্দই হোক।

ব্যক্তিগত ভাবনাটাই আজকের মানুষের মনে প্রবল। সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে তেমন কেউ ভাবে না—আত্মকেন্দ্রিক সুখাভিলাষই প্রধান কাম্য। তা' হলে পৃথিবীর এত দুর্দশা কেন হবে? কেন এ মাটির পৃথিবীতে নেমে আসবে না স্বর্গরাজ্য, কেন তার জন্য পাড়ি দিতে হবে ঘরের রাজ্য ফেলে অন্য রাজ্যে?

উপাধির সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকলেও মুকুল সর্বাধিকারী মশাই নিজেকে তাই মনে করতেন। ধন-মান-গর্ব-অহঙ্কারের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন তিনি সুতরাং তার ওপর কার কি বলবার আছে? আর বললেই বা তিনি শুনবেন কেন—তিনি না লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক?

কালবাজারের দৌলতে তিনি প্রচুর টাকাকড়ি অন্যায় ভাবে উপার্জন করেছিলেন। ভাবেন নি দরিদ্রের রক্ত চুষেই তাঁর এ রোজগার। আর বটেও ত, সে ভাবনা ভাবলে আর অর্থ রোজগার হয় না? তাই রাতদিন ছিল তাঁর অর্থোপার্জনের অন্ধিসন্ধির পথ

ইদানীং তিনি অনুতাপ ভোগ করছিলেন, কিন্তু মরতে চাননি। তবু তাঁকে মরতে হলো, রেহাই পেলেন না মরণের কাছে, হঠাৎ এসে প্রাণ ছিনিয়ে নিয়ে গেল মহাকাল।

ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, ছ'মাস আগে পর্যন্ত নানাবিধ বিপদ থেকে রেহাই, অথণ্ড পরমায়ুর জন্য তিনি করেন নি এমন কাজ নেই। মাসে একবার করে বিখ্যাত জ্যোতিষীদের দ্বারা করকোষ্ঠী বিচার, নানাবিধ বহুমূল্য কবচ-পাথর ধারণ এবং বার বার যাগযজ্ঞের জন্য তিনি লক্ষাধিক টাকা খরচ করেছেন।

মহাশক্তিশালী মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ বাঁচাতে পারলে না সর্বাধিকারী মশাইকে। অর্থাৎ তাঁর সর্বাঙ্গে মেশানো কালবাজারী প্রসিদ্ধ দেহ-মনটা আর চাঙ্গা হয়ে উঠলো না।

(দুই)

স্ত্রী-পুত্র শেষ বিদায় দিলেন সর্বাধিকারীকে।

বিদায়ের ঘটা রীতিমত জাঁকজমকপূর্ণ। বড় ঘরের বড় কথা। সুতরাং কেউ বিস্মিত না হয়ে বরং সাগ্রহে শেষের দিকে তাকিয়ে রইলো।

সর্বাধিকারীর বিপুল নশ্বর দেহ সাধারণ মানুষের বহনোপযোগী নয়, তাই দেহখানা সুশোভিত হলো একখানা ট্রাকে। পূর্বেই ট্রাকখানা সাজানো হয়েছিলো নানা ফলফুলের লতাপাতা এবং বিবিধ ফুলের মালা দিয়ে। আলোকমালা সুসজ্জিত মৃত সর্বাধিকারী যে কোথায় যাচ্ছেন তা' সর্বসাধারণকে জানাবার উদ্দেশে আগে-পিছে ছিল ট্রাক ভর্তি হরিনাম সংকীর্তন দল আর দুপাশে শবানুগামীর দল।

মুহূর্তে ধূপ-দীপ আতরের গন্ধে পথ বিমোহিত হয়ে উঠলো। হতচকিত হয়ে উঠলো পথচারীরা।

যারা সর্বাধিকারীর গুণমুগ্ধ তাদের মধ্যে কেউ বললে, 'একজন দিকপাল গেলেন, কেউ বললে, 'দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো'। যারা শত্রু, তারা আড়ালে বলাবলি করলে, 'বাঁচা গেল, মূর্তিমান পাপ বিদায় হলো'।

সেসময় লোকসভার অধিবেশন চলছিলো। সেদিন

পত্র পড়েছেন নিশ্চয় সর্বাধিকারী মশাইয়ের আত্মার প্রতি সম্মানার্থে সভায় দু'মিনিট দাঁড়িয়ে মৌনতা পালন এবং তাঁর অন্যান্য গুণাবলীর কথা সংক্ষেপে জানতে পেরেছেন। যাঁরা নিয়মিত সংবাদপত্র পড়েন, তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, ক'দিন পর অসংখ্য সর্বাধিকারী মশাইয়ের গুণমুগ্ধ বন্ধুর শোকজ্ঞাপনের উত্তরে তাঁর স্ত্রী-পুত্রের সবিনয়ে পত্রপ্রাপ্তি স্বীকার এবং শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হ'বার সানুনয় প্রার্থনা। আমরা জানি, যদিও পরে উত্তম কাগজে মুদ্রিত নিমন্ত্রণ পত্র যথাযোগ্য পাত্রে যথাসময়ে বিলি বন্দোবস্ত হয়েছিলো। বেশ কিছু গাড়ী বিশেষ অতিথিদের আনবার জন্য সকাল থেকে ছোটাছুটি করছিলো। অন্ততঃ বিশটা বিশেষ ব্যক্তি তুবড়ির মত ছুটে বেড়াচ্ছিলো ঘরে বাইরে।

মৃতদেহ সৎকার হলো সগৌরবে। জনকয়েক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং মিনিট পাঁচেকের জন্য একজন প্রাদেশিক উপ-মন্ত্রীর উপস্থিতি আরও শোভাবর্দ্ধন করলো শ্মশানের।

পাড়া-প্রতিবেশী সবাই জানলে, সর্বাধিকারী মশাই মরার মত মরেছেন, সুতরাং একটা কাজের মত কাজ হবে। কাজ করে নাম পাবে তাঁর একমাত্র পুত্র রামগোপাল সর্বাধিকারী, ধনী ব্যবসায়ী মহলেও বাহবা পাবে। এক-সূত্রে গেঁথে নেবেন তাঁরা। চাই কি, পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে একটা কিছু করলে এম. এ. পাস করার পর ডক্টরেটের যে সম্মান সেরকম সম্মানও পাবে বিভিন্ন মহলে। অতএব সে পিতার শূন্যস্থান পূরণার্থে উঠে পড়ে লাগবে, এ আর বেশী কথা কি?

মৃতদেহ সৎকার করতে খরচ হলো সাড়ে তিন হাজার টাকা। বলা বাহুল্য হাজার টাকার চন্দন কাঠ আর পাঁচশো টাকা নেশা ভাঙ্ ফূর্তির জন্য খরচ হলো শুধু।

চন্দন কাঠের চিতায় পুড়লে মানুষ কোন্ লোকে যায় জানি না, তবে ধনীর ঘরে সে রেওয়াজ আছে অর্থাৎ চন্দন কাঠের চিতায় পুড়ে মরবার মত সামর্থ্য আছে তাই তারা পোড়ে। হায়! দরিদ্রের পুড়ে মরবার মত কাঠও জোটে না। তবে শবদাহ মাত্রই দু-পাঁচজন নেশাখোরের আবদার মেটাতে হয়, তা' না হলে কাজ হয় না। শ্মশান-বন্ধু বলে মানায়ও না যে—যেমন উগ্র কাজ তেমনি উগ্র নেশা করা চাই ত!

রামগোপাল দিলদরিয়া তখন। যার যা' আবদার মেটাচ্ছে বেশ খুশী হয়ে। মাঝে মাঝে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে, 'আহা, বাবা চলে গেলেন—কিভাবে যে সবদিক সামলে উঠবো!'

সাহস দিলে বন্ধু-বান্ধব ও পিতৃবন্ধুরা। তার কোন চিন্তা নেই। তারা প্রাণটুকু ছাড়া বাকী সব দিয়ে সাহায্য করবে তাকে। আজকের মানুষ সব পারে, পারে না শুধু মৃতে প্রাণ দান করতে, সুতরাং সর্বাধিকারীর মৃত্যুর জন্য তার এতখানা ভেঙে পড়লে চলবে কেন?

একজন পিতৃবন্ধু ইঙ্গিতে ইশারায় প্রকাশ্যেই রাম-গোপালের কজন যুবক বন্ধুকে বললেন, 'বাবাজীকে সামলাও তোমরা, আমরা ওদিকটা সামলাচ্ছি—' বলেই তিনি শ্মশানের দিকে মুখ ফিরিয়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলেন, 'চিতা যা' জ্বলছে, আহা—পুণ্যাত্মা মানুষ—' বলেই তিনি দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন।

বাবাজী কিছুক্ষণ আগে ক'-আউন্স ইম্পিরিয়াল ক্রাউন আর গোটা ছয়েক সেদ্ধ ডিম শেষ করেছে, এটা নাকি সে কলেজ-লাইফ থেকেই শুরু করেছে। যেহেতু তেমন বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা করতে হলে এবং কচি দেহমনে অহরহ একটা খুশীর আমেজ রাখতে হলে এটা নাকি অপরিহার্য। দেহে ভেজাল না দিলে মনে ভেজাল আসবে কেন!

সামনে গোল্ডফ্ল্যাক সিগারেটের কৌটোটা খোলাই ছিল। বাবাজী নাকি চেইনস্মোকার। ফের একটা ধরিয়ে কা'কে যেন বললে, 'বড় অনুতাপ যে বাবাকে বাঁচাতে পারলাম না; ষাট বছর বয়স এমন বেশী কি? সেদিন কাগজে দেখলাম, আমাদের দেশের এক বৃদ্ধা একশো আট বছর বয়সে বেশ বেঁচে আছেন, রাশিয়াতে নাকি 'লংজিবিটি' আরো বেশী।'

আর একটা ইম্পিরিয়াল ক্রাউনের বোতল খুলে গেলাসে খানিকটা ঢেলে কে যেন সামনে ধরলে বাবাজীর।

বাবাজী বিনা দ্বিধায় পান করে এবার মনের ঝাঁপি খুললে, 'তোমরাই বল—এ দুঃসময়ে লীনার ডিভোর্স কেস স্টার্ট করা কি ঠিক হয়েছে? একদিকে আমি বাবাকে নিয়ে শশব্যস্ত, আর তুই কোন আক্কেলে

তুই কি করবি ?—নিজেই আদালতে স্বীকার করবো। কেন, লীনার বাবা মদ খান না, সপ্তাহে একদিন করে গ্রাণ্ড হোটেলে যান না? তাতে তাঁর কোন অসম্মান হয়েছে, না ব্যারিষ্টারী মন্দা যাচ্ছে? আর একথা যদি আমি প্রমাণ করিয়ে দিতে না পারি ত—' মাথা ঝাঁকড়ে এবার সে বলে, 'তা' হলে আমার শাশুড়ীকে ত ডিভোর্স কেস করতে হত আগেই—হুঁ, আভিজাত্যের মুখে ঝাড়ু মারো।'

বন্ধুরা সবাই এক বাক্যে বললে, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়—আরে তুমি রাজী থাকলে বলো না শ্মশানেই তোমার বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ নিয়ে তুলব! সর্বাধিকারী মশাইয়ের ছেলে বিয়ে করতে রাজী থাকলে লীনার মত আই. এ. পাস নয়, কত বি.এ., এম. এ. পাস মেয়ের বাপ তোমার পায়ে গড়াগড়ি দেবে! এইত কেস ষ্টার্ট হয়েছে শুনেই কত ভদ্রলোক তোমাকে কন্যাদান করবার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে। লীনা লীন হয়ে যাক তোমার মন থেকে। আসল কথা নাকি, তোমার সঙ্গে বিয়ের আগে কোন এক সিনেমা-আর্টিষ্টকে সে মন-প্রাণ সমর্পণ করেছিলো....বাপের নাকি তাতে ঘোর আপত্তি ছিলো, তাই ধরে বেঁধে বিয়ে হয়েছিলো—এখন মন ফের উড়ুউড়ু করছে, তাই নানারকম গলদ দেখিয়ে ডিভোর্স কেস করা। ফুঃ....

লীনার কাকা অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন। ওদের কথা-বার্তা শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে বুঝে আগিয়ে এসে বলেন, 'ছি ছি বাবাজী, এসময় ওসব কথা কেন? তুমি কি এতদিনেও বুঝতে পারনি লীনা কেমন মেয়ে? পরের মুখে বাজে কথা শুনে শ্মশানে কেন তড়পাচ্ছো? নিজের ঘরের কেলেঙ্কারী এভাবে প্রকাশ করার কি কোন বাহাদুরী আছে? তোমরা বিশ্বাস কর আর নাই কর, যেমন লীনা, তেমনি তার বাবা। অমন মানুষ এ-যুগে খুব কমই মেলে!—উঠে গিয়ে দেখোগে, চিতার পাশে বাপ মেয়েতে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। লীনা ত তার শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ শুনে থেকে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে, শ্মশানেও দু'বার অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল'।

'তবে কেস করেছে কেন মশাই? কেসটা তেমন জমবে না বুঝে বাপ মেয়েতে সময় বুঝে এখানে এসেছেন বুঝি?'

'সব কথা তোমাকে এখানে বলা উচিত নয় বাবাজী, তবে না বললে তোমার বন্ধুরা অন্যরকম ধারণা করতে পারেন তাই এবার আমাকে আসল কথাটা বলতে হল। তোমাকে সংশোধনের জন্যে তোমার বাবার পরামর্শতেই ডিভোর্স কেস করা হয়েছে—মান ইজ্জতের ভয়ে যদি তোমার চরিত্রের সংশোধন হয়, তাই! কিন্তু আজ ত তোমার বাবা বেঁচে নেই, সবদিক সামলানো দায় হবে, এসব চিন্তা করেই—'

'ব্যারিষ্টারী চাল আমি বুঝি খুড়োমশাই, আমি মুকুল সর্বাধিকারীর ছেলে—ওসব ছেলে ভুলানো কথা বলে আমাকে ভোলাতে পারবেন না।—আমি যে কি 'চীজ' তা' বুঝতে জানতে আপনাদের বহু দেরি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—'

আমার কথা বিশ্বাস কর বাবাজী, তোমার মা'-ও একথা জানেন। তা' ছাড়া তোমার সন্তান লীনার গর্ভে, এসময় ওসব করবার সময়ও নয়। বেশী ঘাঁটিয়ো না, তোমার বাবার হাতের লেখা চিঠিও আছে আমাদের কাছে।

লীনা কাছে এসেছে তখন। ভিজে গলায় বলে, 'বিশ্বাস কর সব সত্যি, মরণ যেমন সত্যি তেমনি এসবও।—পরে তোমাকে সব খুলে বলবো।'

'শ্মশান নয় যেন ষ্টেজ'—দূর থেকে কে যেন বলে।

রামগোপাল ধীর কণ্ঠে জবাব দেয়, 'জীবনটাই অভিনয় দাদা, ভেবে দেখলে, না—মনে হবে না'। এবার লীনার দিকে চেয়ে বলে, 'এসো লীনা, আমরা আবার সংসার পাতিগে সুখে স্বচ্ছন্দে,—ভুলে যাও অতীতের কথা। তা' ছাড়া জন্ম হলেই মৃত্যু আছে। সেজন্য আকুল হলে চলবে না। আমাদের বাঁচতে হবে, তারপর বাবার মতই একদিন আসতে হবে শ্মশানে। মরণ ধ্রুবসত্য—মরণ অজেয়।—তুমি কি তা' বিশ্বাস কর না?'

ধরা গলায় লীনা বলে, 'করি বই কি! চলো, ওদিকের কাজ সারা হয়েছে, আমরা স্নান করে বাড়ী ফিরে যাই। তোমার জামা কাপড় আমার সঙ্গেই আছে।'

রামগোপালের বন্ধুরা পরস্পর মুখ তাকাতাকি করে বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে।

(তিন)

অখণ্ড পরমায়ুর স্বত্বাধিকার নিয়ে মানুষ জন্মেছে এ তার কপট ধারণা। কিন্তু মানুষ বুঝেও বুঝতে চায় না,

সে জন্মের দিনই মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়ে এসেছে। এসেছে তার পরমায়ুর দণ্ড-পল-অনুপলের নির্ভুল হিসাবের নিশান হাতে করে।—সময় হলেই যেতে হবে সে অনন্ত লোকে।

প্রভাত সূর্য যখন রক্তিম আভায় পূবের আকাশের কোলে আবীর ছড়িয়ে দেয়, আঁধার লজ্জায় মুখ লুকায়। আবার যখন অস্ত যায় প্রভাত-সূর্য, আঁধার এসে জাঁকিয়ে বসে। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে চলেছে তাই আলো আঁধারের মত জনম-মরণের চক্রাকার খেলা।

জন্ম থেকেই মানুষ মৃত্যুর দিকে আগিয়ে যাচ্ছে। যাবার আগে নানা খেলায় মত্ত হচ্ছে। হাসি-কান্না ভরা এ পৃথিবী যেন তাকে নিত্য নতুন আলেয়ার মরু সাগরে স্নান করাচ্ছে। যদিও পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে কোটি কোটি মানুষের চরণ স্পর্শে এ ধরণী ধন্য। পাহাড়-নদী-অরণ্য-রাজপথ তার ইতিহাস জানে এবং মিছিলও চলেছে তাই বহুদিন থেকে। বিচিত্র এ-মিছিলের চরিত্র, চলমান আলেখ্য বৈচিত্র্য প্রতিটি ধূলিকণাও যেন বিস্মিত হয়, মানুষ কিন্তু বিস্মিত হয় না। মানুষের কাছে পরম বিস্ময় মৃত্যু।

বিধাতার কি অদ্ভুত ইঙ্গিত। অথচ মানুষ জন্ম থেকেই সহজ সত্য পথ মেনে নেয় না। সহজ-সত্য-অনাড়ম্বর জীবন যাপনে মানুষের বুঝি শান্তি নেই—বৈচিত্র্য না থাকলে জীবনই যে বৃথা।—আশ্চর্য, আলেয়ার পিছে মানুষ ছুটছে, ছুটে ছুটে হয়রান হয়ে যাচ্ছে—তবু ছুটছে, ছুটেই তার শান্তি। আত্ম অহমিকা—অখণ্ড পরমায়ুর অধিকারী হয়েছে সে জন্ম থেকে—এ অলীক ধারণার বশবর্তী হয়ে চলে তার মায়ামৃগের পিছে নিরন্তর পশ্চাদ্ধাবন।

মুকুল সর্বাধিকারী মশাই জন্ম থেকেই ধন-মান-যশের অধিকারী ছিলেন না। ছলে বলে কৌশলে তিনি সেসব অধিকার করেছিলেন। দরিদ্র-দুর্বল মানুষ যারা তারা বলেছিলো 'ভাগ্য', আর যাদের চোখ টাটিয়েছিলো তারা আড়ালে বলাবলি করেছিলো, 'সব অধর্ম আর মুরুব্বির জোরে'। সহজ সত্য পথে চললে মানুষের চলে যেতে পারে, কিন্তু এতখানা হতে পারে না, অধর্মের আশ্রয় বিনা।

মুকুল সর্বাধিকারী বলতেন, 'এ বাহু দুটোর জোর আর তার সঙ্গে চাই ভাগ্যের প্রসন্নতা আর অবিচলিত সাহস।

অবশ্য অস্বীকার করা যায় না তার সুপ্রসন্ন ভাগ্যের কথা, যদিও প্রচুর বাধা বিপত্তির মধ্যে তাকে তাল সামলাতে হয়েছে। বালিগঞ্জের বিরাট বিরাট সৌধের পাশে যখন তাঁর আধুনিক ছকের বাড়ীখানা আকাশ-ছোঁয়া আশা নিয়ে হুহু করে বেড়ে ফুল-ফলগাছ থেকে যেখানে যেমনটির প্রয়োজন সেসব স্থাপিত হয়ে তাক লাগিয়ে দিলে প্রতিবেশীদের, সেসময় তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আড়ালে মুচকে হেসেছিলেন, সবার অলক্ষ্যে বুকখানাও স্ফীত হয়ে উঠেছিলো গর্বে, তাঁর দীর্ঘদিনের একটা মস্ত বড় কামনা আজ পূর্ণ হয়েছে।'

আশা আর আশ্বাসে বিশ্বাসী মুকুলের হৃদয়ে ছিল আরও অনেক আশা। স্বপ্নের মাধুরী মাখা মনের কোণে সেগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল। ধীরে ধীরে করতলগত করতে হবে কামনা-বাসনা।—ছকে বাঁধা হাসি, মেপে মেপে কথা বলা তার দীর্ঘদিনের মক্সো করা, সেসবের মোক্ষম প্রয়োগে সব সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণ হবে। ধৈর্য ধরে পুষিয়ে নিতে হবে তার কাম্যবস্তু। এ তার চাই-ই চাই।

অতবড় ইমারত দেখে চোখ টাটিয়েছিলো অনেকের। তাই এনফোর্সমেণ্ট বিভাগে খবরও গিয়েছিলো তড়িঘড়ি।

মৃত্যুবাণ!

তদন্তের পূর্বাভাস পেয়েছিলেন মুকুল। তার কুটিল কালো শয়তানী চোখ দুটো প্রথমটা টাল খেয়ে গিয়েছিলো। দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তারপর সামলে নিয়ে সোজা চলে গিয়েছিলেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিষ্টার সোমের কাছে।

মিষ্টার সোম বছরে বহু টাকা পান মুকুলের কাছে, আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এবং নানা ফন্দি ফিকিরের পরামর্শ দিয়ে। এবারও পরামর্শ দিলেন কিভাবে তিনি উতরে যাবেন এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের শ্যেনদৃষ্টি থেকে। আইন আর রীতির ধার ধারেন না মুকুল। কিভাবে টাকার জোরে সব উলটে দেওয়া যায় তিনি জানেন। আসল কথা এ বিপদ থেকে উদ্ধার না পেলে তিনি সম্মান বাঁচাবেন কি করে? কি ভাবে আশায় আশায় জিইয়ে রাখা হৃদয়ের

মিষ্টার সোমকে মোটা টাকা 'ফি' দিয়ে সন্ত কেনা নতুন মডেলের গাড়ীখানা জোর স্পীডে চালিয়ে উৎফুল্ল-চিত্তে বাড়ী ফিরেছিলেন মুকুল। তিনজন সি. এ. সাতদিন গলদ্‌ঘর্ম হয়ে এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের কর্তাদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী করে দিয়েছিলেন মোটা টাকা দক্ষিণা নিয়ে।

মুকুলের সামান্য বিদ্যে-বুদ্ধি আজ বেড়ে গেছে অনেকখানি। তিনিই বাড়িয়েছেন ঠকতে ঠকতে। এ না হলে কেমন করে সবদিক বজায় রাখবেন তিনি? পরস্পর প্রতারণা করার যুগ এটা। সুতরাং তীক্ষ্ণ প্যাঁচালো বুদ্ধির প্রয়োজন। প্রয়োজন মিটিয়েছিলেন তিনি সবার অলক্ষ্যে, গোপনে পড়াশোনা করে। কাউকে জানতে দিতেন না, ধরাও পড়েন নি তিনি সামান্য বিদ্যের মানুষ।

(চার)

তৈরী কাগজপত্রগুলো চোখ বুলিয়ে মনোমত হয়েছে কিনা পরীক্ষা করছিলেন তিনি সেসময়।

গভীর রাত্রি তখন।

চিন্তিত মুখে উঠে এসেছিলেন পারুল সর্বাধিকারী। তাঁর স্ত্রী। মুখ চোখে তাঁর ঘুমের ছায়া।

খুঁটিনাটি ভাবে কাগজপত্র পরীক্ষা করছিলেন মুকুল। সেসময় তিনি ডুবে গেছেন গভীরে। সে-গভীরতার পরিমাপ পারুলের দ্বারা সম্ভব নয়। রাত ন'টা থেকে একটা পর্যন্ত তিনি একটি বারও ওঠেন নি। চাকর চা দিয়ে গেছে মাঝে মাঝে, তিনি কখনও খেয়েছেন কখনও খান নি। অনবরত টেনেছেন কড়া চুরুট। কাউকে বিশ্বাস নেই, কারও যোগ-বিয়োগ সঠিক বলে গর্ব করার নেই, অতি বড় বিজ্ঞেরও ভুল হয়। তাই পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন। এসব চিন্তা করেই তিনি কাগজপত্র নিয়ে বসেছেন। গোপনীয় কাগজপত্র সব বাক্সবন্দী করে রেখে এসেছেন এক বিশ্বাসী বন্ধুর কাছে। সময় থাকতে সাবধান, তবু মনটা অস্থির হয়ে আছে।

পারুল অধৈর্য হয়ে ওঠেন :—'শোবে চলো কত রাত হয়েছে!'—ঘুম জড়ানো কণ্ঠ তার।

কথাগুলো কানে যায় না মুকুলের। ফের একটা খাতার হিসাব বজায় আছে কিনা, থাকলেও তা' বাস্তবের সঙ্গে কতখানি মিল সেসব চিন্তা করতে থাকেন। মনের দর্পণে হৃদয়ের জোরালো সমর্থনে মিলিয়ে নিতে চান। যেন তিনি পরাজিত না হন, ধরা না পড়েন আইনের প্যাঁচে।

ফের একটা চুরুট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়েন মুকুল।

বিরক্তির ঝাঁজ প্রকাশ করেন পারুল দেবী।—'ঘরখানা কড়া চুরুটের গন্ধে ভরপুর, চলো শোবে—রাত হয়েছে অনেক—কি করছো তুমি ছাইপাঁশ হিসেব-নিকেশ!'

মুখ তুলে মুকুল এবার পারুলের দিকে তাকান। বলেন—'এ অগ্নি পরীক্ষার সময় এরকম ব্যবহার আশা করিনি তোমার কাছে?'

ভয় পেয়ে যান পারুল। মৃদু মোলায়েম কণ্ঠে বলেন, 'এত রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে না?'

বজ্রকঠিন কণ্ঠে মুকুল বলেন, 'না! কেন কাজের সময় বিরক্ত করো? খাওয়া-শোওয়া ছাড়া মুকুল সর্বাধিকারীকে আরও অনেক কাজ করতে হয়—অনেক কিছু চিন্তা করতে হয়। ভুলে যাচ্ছো কেন—তা' যদি না করতাম, বালীগঞ্জের এ-সৌধ আমার স্বপ্নেই রয়ে যেতো, বাস্তবে পরিণত করতে পারতাম না কোনদিন। এত টাকার মালিকও হতে পারতাম না।'

'এত সব ঝামেলায় দরকার কি বাপু, তার চেয়ে সুখ শান্তি অনেক ভাল। এর চেয়ে নবীন কুণ্ডু লেনের ভাড়া বাড়ীটাই ছিল ভাল।'

'হুঁ—বসো সামনের চেয়ারখানায়, আর দশ মিনিট মাত্র।' আবার কাজের মধ্যে ডুবে যান মুকুল।

ভীত ভাবে চেয়ারে বসেন পারুল। বুঝতে পারে না সে এভাবে তাকে বসতে বলার অর্থ কি! কেনই-বা বসতে বললে—কোনদিন ত তাকে এ-রকম গম্ভীর কণ্ঠে কথা বলে না।

কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রেখে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে মুকুল বলেন, 'নবীন কুণ্ডু লেনের ভাড়া বাড়ীর কথা বলছিলে না?'

'হ্যাঁ, অতসব হাঙ্গামার চেয়ে তাই ভাল নয় কি? অন্ততঃ সে সুখের ছিলো—শান্তির ছিলো, আমার মতে!'

হাঙ্গামা যদি না করতাম, আজ গ্রামের সে মেটো বাড়ী

কোনদিন ? তুমিও আমায় ভালবেসেছিলে আমার হাঙ্গামার জন্যেই—সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বালীগঞ্জের লেক থেকেই আমার সঙ্গে চলে এসেছিলে আমার অর্থ দেখেই, তাই না ?—আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবার কথা উঠতেই কেন তোমার বাবা 'না—না' করে উঠেছিলেন, জান ? কিন্তু আমি জানি, সে আমার দারিদ্রের জন্যই ! তারপর এক দরিদ্র ঘরের মেয়ে শ্যামলী এলো আমার জীবনে। পাঁচটা বছর যুদ্ধ করলে আমার সাংসারিক দারিদ্রের সঙ্গে, কিন্তু শান্তি পেলে না একবিন্দু, তারপর একদিন বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। রেখে গেল পতিব্রতার চিহ্ন, আমার বিপদ-আপদের প্রাণদানের সঙ্গিনীর শেষ স্মৃতি চিহ্ন হাসিমুখে। সে কোনদিন হার মানলে না, আমার দারিদ্র, আমার অক্ষমতার কথা মনেও ঠাঁই দিলে না। আজও আমার মনে পড়ে, চোখের সামনে ভাসে তার মধুর হাসি, তার সান্ত্বনার বাণী আজও আমার কানে বাজে পারুল। তাই মনে হয় বিপদে যে ধৈর্য ধরে স্বামীর বিপদকে নিজের বিপদ মনে করে সব দুঃখ হাসিমুখে সহ্য করলে তার অদৃষ্টে কেন সুখভোগ হল না ? জানো পারুল, জগতে আসল-নকলের পার্থক্য কি জান, আসল ফাঁক ও ফাঁকি জানে না, কিন্তু নকল ফাঁক ও ফাঁকি খোঁজে—তার সবেতেই ভেজাল। আমি জানি ভাল ভাবে ভেজাল কাকে বলে, যেহেতু আমি ভেজাল নিয়ে কারবার করি। অনেক তফাত পারুল, শ্যামলীর সঙ্গে তোমার অনেক তফাত। হোক না সে দরিদ্রের মেয়ে, তবু সে তোমার চেয়ে অনেক বড়।'

'আমি কিন্তু তোমাকে সেভাবে একথা বলিনি। তুমি বিশ্বাস কর—' ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন পারুল

'চুপ কর, ন্যাকামি রাখ—আর কোন কথা বলে আমাকে বিরক্ত কর না। যদি বাড়াবাড়ি কর, দেখেছো—' বলে দেওয়ালে ঝুলানো রিভলভারটার দিকে একটা আঙুল দেখাল মুকুল।

'সেই ভাল, শেষ করে দাও আমার এ ধিক্কৃত জীবনটা। সবার অলক্ষ্যে এখানে রয়েছি, কিন্তু আমার বিশ্বাস, গ্রামের লোক আজও আমার কথা নিয়ে কুৎসা রটায়, আমার

হঠাৎ প্রচণ্ড রবে হেসে ওঠেন মুকুল। একদিন যারা আমায় বিদ্রূপ করেছে আজ তাদের মুখে চুনকালি লেপে দিয়ে তোমাকে নিয়ে ঘর বেঁধেছি। কিন্তু কেন জান, তাদের আভিজাত্য আর অহঙ্কার ভাঙবার জন্যেই। আজ তাদের মত দশ-বিশটা সংসারের সম্পদ আমি যে কোন মুহূর্তে কিনতে পারি। দরিদ্র মুকুল সর্বাধিকারী গ্রামের মধ্যে ধনী প্রশান্তবাবুর বিধবা কন্যাকে অর্থ মাহাত্ম্য দেখিয়ে নিমেষে টেনে এনে তুলেছে কলকাতার বালীগঞ্জে। যদিও তারা নকল স্বামী-স্ত্রী, তথাপি সবাই জানে, পারুল সর্বাধিকারী তার বিয়ে করা বউ। কিন্তু তাদের সম্পর্ক ভেজাল। ভেজালের কারবার করে মুকুল সর্বাধিকারী বড় হয়েছে, তার স্ত্রী ভেজাল হবে, আরও পাঁচটা ভেজাল উপপত্নী থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য কি বলো ?'

টেবিল থেকে মাথা তুলে সরবে কেঁদে ওঠেন পারুল। বলেন, 'না—না, আমি বিশ্বাস করি না।—আমি ছাড়া তোমার কেউ নেই।'

'তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আমার কিছু এসে যায় না।'—কথাগুলো এমন ভাবে মুকুল বলেন, পারুলের সর্বাঙ্গে যেন তাচ্ছিল্যের বিছুতি ছুঁয়ে যায়। জ্বালা করে ওঠে গোটা শরীর।

একটা চুরুট ধরিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল মুকুল। তারপর জোর জোর কয়েকটা টান দিয়ে বলতে শুরু করেন, 'গ্রামের হীন দরিদ্র মুকুল সর্বাধিকারীর সঙ্গে বিয়ে দেবার প্রস্তাব প্রথমে তোমার বাবাই করেছিলেন। যেহেতু আমার আর কিছু না থাক, আমি নাকি রূপবান। মনে আছে বোধহয়, ছোটবেলায় আমাকে অনেকে 'শিমুল ফুল' 'পিতলের কাটারি' বলে ধিক্কার দিতো। সে যাই হোক, তিনি অবস্থাপন্ন মানুষ, তাঁর বিষয়-সম্পত্তি থেকে আমাদের অর্থাৎ তাঁর মেয়ে-জামাইকে কিছু দেবেন এ-কথাই শুনেছিলাম। হঠাৎ একদিন শুনলাম, তিনি তাঁর মত বদলেছেন। তোমার বিয়ে হলো সুশীলবাবুর সঙ্গে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, বিধাতা বিয়ের তিন বছরের মধ্যে সুশীলবাবুকে ছিনিয়ে নিলেন তোমার কাছ থেকে। অর্থাৎ তোমাকে আসল সংসার থেকে সরিয়ে এনে আমার নকল সংসারে নকল জীবন যাপনে বাধা হবার পথ প্রশস্ত করে দিলেন।'

আমি পুরোপুরি সংসারী, যদিও দারিদ্রের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছি। ভাবলাম, এভাবে বাঁচা যায় না। যে কোন প্রকারে অর্থ রোজগার করতে হবে আমাকে। পেটে বিদ্যে-বুদ্ধি নেই তেমন, চাকরি দেবে কে? কি ভাবে কোথায় অর্থ পাব?'

কথা বলতে বলতে বাইরের ফ্লাটে এলেন মুকুল। আকাশে তখন শুক্লপক্ষের দশমীর চাঁদ সকরুণ ভাবে তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। নিঝুম শহর। মাঝে মাঝে দু-একখানা গাড়ী বোধহয় বিশেষ প্রয়োজনে যাতায়াত করছে।

(পাঁচ)

পুনরায় ঘরে এসে ঢোকেন মুকুল।

পারুল তখন বিপর্যস্ত ভয়ে।

কি যেন একবার ভেবে নিলেন মুকুল। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'তারপর এলো আমার জীবনে পরম শুভলগ্ন। শোন কিভাবে—'

সেবার মহেশগঞ্জের জমিদার কৃষ্ণকান্ত পাল মশাই নায়েব-গোমস্তা এবং ক'জন পেয়াদা নিয়ে গ্রামের কাছারিতে এসেছেন।

শুনলাম গ্রামের অধিকাংশ প্রজার পাঁচ-ছ' সনের খাজনা বাকী। তাই তাঁর সদলবলে আগমন। তিনি যে কোন প্রকারে খাজনা আদায় করবেন।

প্রবল প্রতাপান্বিত কৃষ্ণকান্তবাবু ছিলেন সে চাকলার যম। প্রজা ঠ্যাঙাবার পদ্ধতি ছিল তাঁর অভিনব। তবে শুনেছি, শুধু হাতে না পেরে ভাতে মারবার কাজেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অপূর্ব কৌশলে প্রজার ঘরে আগুন, হালের বলদের জাবনায় গোপনে বিষ প্রয়োগ, পেয়াদা দিয়ে বাড়ীর বউ-ঝিদের অপমান—এসব ছিল তাঁর প্রজা জব্দ করবার প্রথম শ্রেণীর কৌশল।

পেয়াদা এসে আমায় ডাক দিলে।

জবাব দিলাম, 'যাচ্ছি—'।

রান্নাঘর থেকে ছুটে বেড়িয়ে এলো শ্যামলী।—'তোমার পায়ে পড়ি, যেও না—তুমি যেও না—। শুনেছি, জমিদার-বাবু লোক ভাল নয়, কারও সম্মান রাখেন না।'

'অপমানিত হয়ে আসব না, প্রয়োজন হলে অপমান করে আসব।'

'সে অধিকার তোমার নেই, পাঁচ সনের খাজনা বাকী যাদের, তাদের অহঙ্কার করা সাজে না।'

'কিন্তু তাদের দেবার সামর্থ্য থাকলে অকারণ যে অপমানিত হতে চায় না, সে-কথাটাই তাঁকে জানিয়ে দিতে চাই। তুমি বাধা দিও না।'

শ্যামলী ভয় পেয়ে কেঁদে ফেললে।

আমি বেড়িয়ে এলাম ঘর থেকে।

রোয়াকে একটা আরাম চেয়ারে বসে আছেন কৃষ্ণকান্ত-বাবু। দু-পাশে জনকয়েক তাঁবেদার। যার মধ্যে প্রধান স্তাবকের ভূমিকায় ছিলেন তোমার বাবা। নায়েব-গোমস্তারা আপনাপন কাজে মগ্ন। উঠানে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন প্রজা করজোড়ে বসে আছে—যেন তারা পূজার উৎসর্গীকৃত বলি।

আমি পৌঁছোতেই গোমস্তা আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন কৃষ্ণবাবুর সঙ্গে এবং আমার দারিদ্রের কথা জানিয়ে দিয়ে আমার পাঁচ সনের খাজনা বাকীর কথাটা বললেন অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ভাবে।

আমি নামক অপদার্থ তখন লজ্জায় মাথা হেঁট করেছি। আমি দরিদ্র, আমি জমিদারের খাজনা শোধ করতে পারিনি অতএব আমি তাঁর কাছে ঘৃণ্য। তাঁর কাছে আমার অক্ষমতা বুঝি অমার্জনীয়—কিন্তু কেন?

গড়গড়ার নলে কয়েকটা ঘন ঘন টান দিয়ে কৃষ্ণবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'খাজনার টাকা এনেছো?'

'আজ্ঞে না—'

'কেন?'

'যোগাড় করতে পারি নি—'

'এ'টা কি একটা কথা—? খাচ্ছো-দাচ্ছো দিব্যি, চেহারাখানাও দেখছি বেশ নাদুসনুদুস, অথচ সামান্য খাজনার টাকাটা যোগাড় করতে পার না? হাল সন পর্যন্ত কত বাকী হে?'

গোমস্তা বললেন, 'চার পাঁচ বিঘা ত জমি মাত্র। সুদ, তস্য সুদ নিয়ে আঁজ্ঞে—পঞ্চাশ টাকা বার আনা।'

'কিন্তু এ-বছর অজন্মা, তা' ছাড়া এ আষাঢ় মাসে আমার পক্ষে টাকা পয়সা যোগাড় করা বড় কঠিন। বৃদ্ধ মা-বাবা, বিয়ের যোগ্যা দু'টি বোন আমার ঘাড়ে—তাদের খাওয়াতে পারতেই আমি হিমশিম খাচ্ছি, একটা চাকরি না হলে—'

আমার কথা শেষ না হতেই ব্যঙ্গকণ্ঠে তিনি বলেন, 'হাসালে যে হে, মা-বাবাকে বুড়ো বয়সে দেখবে না, বোনেদের বিয়ে দেবে না—হুঁ, দেখছি এখনও কচি খোকাটি হয়ে থাকতে চাও—বলি, ওহে শুনছো তোমরা—' বলেই কৃষ্ণবাবু পার্শ্বচরদের দিকে চেয়ে সরবে হেসে উঠলেন।

'হো-হো, হি-হি, হাঃ-হাঃ'—বিচিত্র ভঙ্গীতে হেসে উঠলেন পার্শ্বচররা।

তাঁদের হাসি থামতেই আমি বললাম, 'দেখুন, অক্ষমতার গ্লানি আমার মনেও ধাক্কা দেয় কিন্তু নিরুপায় হলে তাকে যতই পীড়ন করা হোক বেদনা ছাড়া কিছু লাভ হয় না।'

'হুঁ, তত্ত্ব কথাও বেশ জানো দেখছি, যাকগে, তিন দিন সময় দিলাম, এর মধ্যে খাজনা মিটিয়ে দিতে হবে,—আমার এখন অনেক কাজ!'

'চেষ্টা করবো—' বলে আমি চলে এলাম।

শ্যামলী একটা কিছু অঘটন ঘটার আশঙ্কায় ঘর বার করছিলো অনেকক্ষণ ধরে। আমাকে চিন্তিত ভাবে ফিরতে দেখে বললে, 'কি খবর?'

'তিন দিনের মধ্যে খাজনা শোধ করতে হবে—এই তাঁর আদেশ।'

ছিল একগাছা লিকলিকে হার ভরি খানেকের—সেটা খুলে দিলে সে। 'জমিদারের ঋণ শোধ করো আগে।'

'না—' বলে হারগাছা খুলে দিলাম শ্যামলীর হাতে।

'ও, আমার জিনিস বুঝি নিতে নেই! তোমার অপমানের চেয়ে হারগাছাটাই আমার বেশী হলো বুঝি? বেশ!

মাত্র চার ভরির মত সোনার গহনা ছিল শ্যামলীর। হারগাছা ছাড়া আর সবই আগে শেষ হয়েছে। সেটা আর নিতে মন সরলো না। বললাম বুঝিয়ে তাকে, দুদিন চেষ্টা করে দেখি, যদি যোগাড় না হয় তখন না হয় এটা বিক্রি করা যাবে।'

'দেখো যেন লজ্জা করো না' বলে নিজের কাজে চলে যায় শ্যামলী।

অন্তরে এক অনির্বচনীয় অনাবিল আনন্দ পেলাম সে-সময়। ভগবান আমাকে দরিদ্র করে সংসারে পাঠিয়েছেন, কিন্তু সেদিন সে-মুহূর্তে যে স্বর্গীয় আনন্দ পেলাম তার তুলনা হয় না। চলচ্চিত্রে সাজানো দৃশ্য দেখে এবং বানানো সংলাপ শুনে যদি আমরা তা' সংসারে প্রত্যাশা করি—ভুল হবে। কিন্তু আমি বোধহয় তার চেয়েও বেশী পেয়েছি। সত্যকার প্রেমে মুগ্ধ হয়েছি তার। কিন্তু তাকে কিছুই দিতে পারিনি, এমনকি তার মৃত্যুকালে সুচিকিৎসারও ব্যবস্থা করতে পারিনি।

তিনদিন পর ফের আমার ডাক পড়ল জমিদারের কাছারিতে। গেলাম রিক্ত হস্তে। দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে। অবশ্য ঠিক করেছিলাম আগে থেকে যদি আজ কোন কটু মন্তব্য শুনতে হয় যথোচিত উত্তর দেবো। কিন্তু কেন জানি না, কৃষ্ণবাবু যাওয়া মাত্র বললেন, 'সেদিন তুমি চাকরির কথা বলছিলে না? আমার একজন ভ্রাম্যমান রাঁধুনীর প্রয়োজন। এই ধর না আমার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে যাবে, খাওয়া পরা বাদে মাসে পনের-ষোল টাকা মাইনে পাবে, পারবে তুমি? শুনেছি, লোকের ভোজ কাজে ভাল রান্না করো—এ চাকলায় বেশ সুখ্যাতিও আছে তাতে তোমার?'

বেকার বাড়ীতে বসে আছি তখন আমি। বললাম, 'খুব পারব, তবে মাইনেটা কুড়ি টাকা করে দিতে হবে।'

'আটকাবে না তাতে—'

আমার খাজনা বাকীর কোন কথা উঠল না। পরদিন থেকেই চাকরিতে বহাল হলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, ছুঁচ হয়ে ঢুকবো আর ফাল হয়ে বেড়োবো। এই সুযোগ, ধনী হতে হলে এরকম পরগাছা চাই।

চাকরিতে বহাল হওয়ার কিছুদিন পর শ্যামলী আমায় ছেড়ে চলে গেল। আমার মনে রেখে গেল একটা কালোছায়া। অতৃপ্তিকর হৃদয়াবেগ। শোক সন্তপ্ত আমি নিজেকে শক্ত করলাম। যে যায় আর ফিরে আসে না। আমার টাকা চাই। টাকা ছাড়া এ-যুগে এক পা ফেলা বিপজ্জনক। সংসার চালানো ত বটেই। এখন সব ভুলে আমাকে অর্থ উপার্জন করতে হবে। দরিদ্রের শোক প্রকাশের ত সময় নেই।

আমার দিদির বহুদিন আগেই বিয়ে হয়েছিলো। বোনেদের চেহারা ভাল ছিলো এক [illegible]

তাদের দেখেই বিনা পণে তাঁর দুই ছেলের বিয়ে দিতে রাজী হলেন। আমি কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম। মা-বাবা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

(ছয়)

বছর তিনেক পর।

আমি তখন কৃষ্ণবাবুর কাছে রীতিমত স্নেহের পাত্র হয়ে পড়েছি। আমার রান্না ছাড়া তাঁর খেয়ে তৃপ্তি হয় না। কি ঘরে, কি বাইরে।

সেদিন লাটের টাকা দাখিলের শেষ দিন। কৃষ্ণবাবু আমাকে সঙ্গে নিয়ে জেলা সদরে গেলেন।

হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার ডাকলাম। তিনি তঁকে পুরোপুরি বিশ্রামের পরামর্শ দিলেন সেদিনটা। প্রেশার বেড়েছে।

কৃষ্ণবাবু কাছে ডাকলেন আমাকে। 'টাকাটা তুমিই জমা দিয়ে এস। ট্রেজারীতে মোক্তারবাবুর কাছে গেলে তিনি সব ঠিক করে দেবেন। শুনলেন ত ডাক্তারের কথা? কি চুপ করে রইলে যে—পারবে না?'

আমি বললাম, 'পারব'!

কৃষ্ণবাবু আমার হাতে দশ হাজার টাকার থলিটা দিয়ে বললেন, 'খুব সাবধান'!

সে বাজারে দশ হাজার টাকার মূল্য অনেক। এখনকার একলাখ টাকার মত।

আমার গোটা শরীরে রক্ত চলাচল দ্রুত হল, বুকের স্পন্দনও গেল বেড়ে। দারিদ্র কবলিত তীক্ষ্ণ লালায়িত চোখ দুটো হয়ে উঠলো উজ্জল দীপ্তিতে ভরপুর।—দশ হাজার টাকা! আমার কাছে ত'র মূল্য অনেক—অনেক। সারা জীবনেও হয়ত এত টাকা রোজগার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

অবশ্য আমার দুর্ভাগ্য যে আমি সংসারে দরিদ্র হয়ে জন্মেছি। তবে দুনিয়া সুদ্ধ সবাই যদি ধনী হয়, ধনাঢ্যের মহিমা থাকবে কি! মানুষের মনুষ্যত্ব যে কোথায় গুঁড়িয়ে মিশিয়ে যাবে ধরণীর বুকে তারও কুল-কিনারা পাওয়া যাবে না। কিন্তু এভাবে কি বাঁচা যায়? সংসারের দারিদ্রের এক ভয়ঙ্কর রূপ সদাসর্বদা আমাকে খোঁচা দিচ্ছে। আমি মরছি। স্ত্রী দারিদ্র বরণ করে নিয়েছিলো বটে, কিন্তু আমি যে তার মৃত্যুকালে সুচিকিৎসা করাতে পারিনি। সে কি আমার কম দুঃখের? বছর খানেক আগে মা-বাবা ছ-মাস আড়াআড়ি মারা গেছেন, তাঁদের উপযুক্ত মত সেবা-যত্ন করতে পারিনি—সে কি আমার মন-বিদীর্ণ দুঃখের নয়?

তবে কি আমার দস্যু রত্নাকরের মত হওয়া উচিত ছিল? এ-যুগে ত রত্নাকর ভিন্ন ধনী হওয়া যায় না। পরস্ব অপহরণ—সে যেভাবেই হোক—এ ভিন্ন জগতে সৎ ভাবে ধনী হওয়া কজনের পক্ষেই-বা সম্ভব? আজ যে ধনী তার অতীতের কথা জানলেই বুঝতে পারা যাবে, তার ভিত একদিন নড়বড়ে ছিল কিনা, তার মূলধনের টাকা কিভাবে পেয়েছিলো তার পূর্বপুরুষ?

দশ হাজার টাকা!

আমার জীবন্মৃত মন মুহূর্তে সজীব হয়ে উঠলো। ভবিষ্যৎ অন্তরে রুদ্ধ থাক। আপাত সুখই কাম্য! দারিদ্র থেকে আমাকে মুক্তি পেতে হবে। পাপপুণ্যের হিসাব করা আমার নয়, যিনি অলক্ষ্যে তা' করেন, তিনিই করুন। তা'ছাড়া বর্তমান নিয়ে যারা সর্বদা হিমশিম খাচ্ছে তাদের এত জমা-খরচের হিসেব কেন পাপপুণ্য নিয়ে? যুক্তিতর্ক মানবার প্রয়োজন কি?

কাতরাতে কাতরাতে কৃষ্ণবাবু বললেন, 'টাকাগুলো আর একবার গুনে নাও ভাল করে।'

আমি ভাগ্যবান। থলির মুখটা খুললাম।

অধিকাংশ একশো টাকা—কিছু দশ টাকার নোট। আমার জীবনে কোনদিন একশো টাকার নোট হাতে পাইনি। রাজমুকুটের ছাপ শোভিত একশো টাকার নোট ছোঁয়া আর আকাশ ছোঁয়া একই বলে মনে হলো তখন আমার। ভাগ্যবান রাজা। আর একশো টাকার নোটগুলো যারা কাগজের মত বাণ্ডিল বেঁধে সিন্দুকে রাখে তারাও সৌভাগ্যবান। অর্থ মহিমাতে তারা গোটা দুনিয়া মুঠোর মধ্যে রাখতে পারে। দেহের বল থাক আর নাই-ই থাক, এই টাকার খেলা চলেছে দুনিয়া জুড়ে আর বুদ্ধির মারপ্যাঁচ!

নব্বইখানা একশো টাকার নোট আর বাকী সবই

প্রতিটি একশো টাকার নোট গুনি আর কপালে ছোঁয়াই কৃষ্ণবাবুর অলক্ষ্যে।

সব টাকা গুছিয়ে থলিতে পুরে ফেললাম। থলিটা বুকে ছোঁয়ালাম।—দশ হাজার টাকা!

কৃষ্ণবাবু এবার বলেন, 'যাও, দেরি করো না, তিনটে বাজে। হ্যাঁ আর এক কথা, পঁচিশটা টাকা বেশী নিয়ে যাও—প্রয়োজন হতে পারে।'

'দুর্গা দুর্গা'—বলে বেড়িয়ে পড়লাম। বুঝিবা চিরবিদায় এখন থেকে।

অলক্ষ্যে লোভ নামক রিপুটা তখন আমাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছে। আমার মত মক্কেল পেয়ে সে যেন ভীষণ খুশী। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার ইঙ্গিত-আভাসে আমাকে এখান থেকে সরে যাবার তীব্র ব্যাকুল অনুরোধ। অন্তরের কল্পিত প্রাসাদ, অজস্র অর্থ যেন আমার সামনে তখন সুস্পষ্ট।—ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসতে লাগল আমার অতীত।

কিন্তু সব কিছুর ওপর রয়েছে মানুষ। মানুষের জীবনে একদিকে আছে দুঃখ, বেদনা, ব্যর্থতা, আর অন্য দিকে অবশ্যই আছে প্রীতি-প্রেম-সত্যনিষ্ঠার মহান আদর্শ। তবু দারিদ্র্য, আদর্শের দেবতার করুণ মুখচ্ছবিকে কিছুতেই মনে প্রাণে গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না সব সময়। তখনও আমার মন মলিন হয়নি, আমি হলফ করে বলতে পারি, এত দুঃখ কষ্টেও অন্তর দীপ আমার তখনও মহান সত্যের জ্যোতিতে অনির্বাণ। দুঃখ কেবল, দারিদ্র্যের আগুন নেভাতে পারিনি আমি। মন সদা বুভুক্ষু। আমি কি শুধু বিশ টাকা মাইনের চাকরিতেই জীবনভোর তৃপ্ত থাকব? নামগোত্র-হীন মুকুল সর্বাধিকারী কি অপরিচয়ের ধূম্রজাল ছিন্ন করে মনোমত সংসারের সন্ধানে যাত্রারম্ভ করতে পারে না আর? বুক ফুলিয়ে যারা তাকে এতদিন ঘৃণা করেছে তারা কি তার এ অপকর্মের কথা মনে রাখবে তখন?—কেউ রাখে না, বরং ধনী-মানীদের অতীতের ইতিহাস ছাই চাপা দিয়ে তাকে কৌলীন্যের আঙিনায় এনে স্তবস্তুতিতে মুখর হয়ে ওঠে। আড়ালে ঘৃণা করলেও সামনে রাখে নকল সম্মানের উপঢৌকন। দম্ভের কৃত্রিম জগতে মিথ্যার কঠিন আবরণ উন্মোচন হয় একদিন বটে, কিন্তু সেজন্য কেউ মাথা ঘামায় না তেমন। আর যারা ঘামায় তাদের ঘা' খেতে খেতে জীবন যায়। দারিদ্র্য পঙ্গু সমাজকে এক ধাপ আগিয়ে দেয় মাত্র।—যার ধাপ হাজার হাজার। লক্ষ্যে পৌঁছোতে অনেক দেরি।

ইচ্ছা-অনিচ্ছার সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলাম আমি। কি করি? মাথাটা গুলিয়ে উঠছে বার বার। তবু যেন স্বপ্নময় কল্পনার ছবিগুলি চোখের ওপর পিপাসাময় হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। সর্বগ্রাসী আগুনের দিকে ধাবমান হলাম আমি।

দশ হাজার টাকা!

ঝাঁপিয়ে পড়লাম লোভের আগুনে। দিশেহারা হয়ে পড়লাম রঙীন স্বপ্নময় কল্পনায়। যেন মেঘের আড়ালে আমি চাঁদ হয়ে হাসছি। দেখছি পৃথিবীটাকে কত ক্ষুদ্র। আমি বুঝি পৃথিবীর একজন হয়েও কতদূরে—সত্যের জগৎ থেকে আমি একটি বিচ্যুত আম্রমুকুল ছাড়া কিছু নই! আশ্চর্য!

রইলেন পিছনে পড়ে আমার মনিব। আমি যে এতদিন তাঁর ভৃত্য ছিলাম, ভাবতেই পারছি না। বাঁকা কটাক্ষে অন্তরকে তাচ্ছিল্যের হাসি দেখিয়ে লোভের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে আমি যথাস্থানে টাকা জমা না দিয়ে সোজা চলে এলাম কলকাতায়।

(সাত)

অধর্মের নামাবলী গায়ে চড়ালাম।

অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে একটা গলিতে ঘুপচি মত খোলার ঘর ভাড়া নিলাম দশ টাকা ভাড়াতে।

একটা বাক্সে টাকার থলিটা বন্ধ করে রাখলাম। তা থেকে নিলাম মাত্র পাঁচশো টাকা। ফিরিওয়ালা সাজবো আপাততঃ। নাম বদলালাম। আমি মুকুল সর্বাধিকারী হলাম দীনবন্ধু রায়।

ফিরিওয়ালার সাজ, কথাবার্তা, হাঁকডাক রপ্ত করে নিলাম কিছুদিনের মধ্যে। পাড়ার বাসিন্দাদের মনে কোন সন্দেহই রাখতে দিলাম না। কলকাতায় আর কে কার খবর রাখে?—বিশেষ করে আমার মত একজন ফিরিওয়ালার!

টাকায় টাকা টানে বুঝলাম। বছর খানেক কাপড়-জামা

ফিরি করে পাঁচশো টাকা খরচ খরচা বাদে এক হাজারে দাঁড়াল। মনে আশার আলো সঞ্চিত হয়ে আমার উচ্চাশাকে যেন তুলে ধরলে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে।

এসব করলেও আমি খবর রাখি, আমার কৃতকর্মের জন্য কৃষ্ণবাবু কি করছেন। চিন্তা করি কিভাবে পুলিসের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে হবে!

হঠাৎ একদিন সংবাদপত্রের এককোণে দেখলাম, শোক সংবাদ—"মহেশগঞ্জের জমিদার কৃষ্ণকান্ত পাল মশাই অনন্তধামে গমন করেছেন সত্তর বছর বয়সে।"

পুলিস কিন্তু আমাকে আমার পালিয়ে আসার দিন থেকে গোটা ভারত জুড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সংবাদপত্রেও বার বার সেকথা লোকচক্ষে তুলে ধরা হয়েছে।

বছর দেড়েক পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। ভারতের নানাস্থানে যুদ্ধের ব্যাপারে এরোড্রাম স্থাপনের বিজ্ঞাপন দেখলাম :—কন্‌ট্রাক্টর চাই!

আমি শ্রীদীনবন্ধু রায় সাহসে ভর করে আবেদন করলাম যথাস্থানে। পেলাম একটা কাজের কন্‌ট্রাক্ট। লাভ হলো প্রচুর। বাসা বদলালাম উত্তর কলকাতায়।

শুধু এরোড্রাম তৈরী নয়, সে সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহেরও একটা কন্‌ট্রাক্ট পেলাম।....তিন বছর পর দশ হাজার এক লক্ষতে পৌঁছুলো। তখন আমার একজন প্রাইভেট সেক্রেটারী ও দু'জন ম্যানেজার কাজকর্ম দেখাশোনা করছে। আমি তাদের মনিব। তারা আমার কথায় ওঠ'বস করে। তারা আমার চেয়ে শিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু আমার বুদ্ধি ও বুদ্ধির মারপ্যাঁচ ভিন্ন কোন বিশেষ কাজে হাত দিতে পারে না। আজ আর আমি একশো টাকার নোট কপালে ছোঁয়াই না। দশ হাজার টাকা গুনতে আধঘণ্টা সময়ও লাগে না। হাঁটুর তলায় নোটগুলো ফেলে বড় জোর চার-পাঁচ মিনিট সময় লাগে।

তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেমে গেল। কিন্তু আমার অর্থ লালসার উন্মত্ত আবেগ থামল না। অহরহ অর্থ উপার্জনের জন্য যুদ্ধ চলতে লাগল—ফাঁক আর ফাঁকির সঙ্গে। শুধু ধর্মে ব্যবসা হয় না, অধর্মের মিশাল চাই। টাকার নেশায় মেতে উঠেছি তখন আমি। বড়বাজারের প্রথম তোষামোদ, খোসামোদ—তারপর মিতালির পরাকাষ্ঠায় তাদের কাছে যে অমূল্য উপদেশ পেয়েছি জীবনে তা' ভুলব না। বুঝলাম ব্যবসা করে শুধু অর্থোপার্জন নয়, মানুষের পরমায়ু তিলে তিলে কমাবার জন্য এদের অবদান চিরঃস্মরণীয়।—আমি তাদের সমগোত্রীয় হয়ে গেলাম। আমাকে আঁধার থেকে আলোয় নিয়ে এলেন তাঁরা। আমি ব্যবসা শুরু করলাম। আমার ট্রেনিং প্রয়োগ শুরু করলাম বিভিন্ন নিরীহ দ্রব্যসম্ভারের ওপর। সেসব নিত্যনতুন প্রসাধনের প্রলেপে নির্ভেজাল ষ্ট্যাম্প মারা মোড়কে টিনের বাক্সে বন্দী হয়ে দেশে দেশে বেলুনের মত ছুটতে শুরু করলো। সেসবের চাহিদা বাড়তে লাগলো দ্বিগুণ-তিনগুণ পর্যন্ত। নকলের জয় হোক!

আমার ব্যবসায়ী গুরুদের তখন দু-চোখ ছানাবড়া! স্বীকার করেন প্রকাশ্যে তাঁরা, হ্যাঁ। ছোকরা ব্যবসা কাকে বলে জানে। তবে মনে রেখো ছোকরা, সর্বদা মনে রাখবে, সাহস চাই। বুক ফুলিয়ে যা' খুশী করবে, কেউ কিছু করতে সাহস পাবে না, প্রয়োজন বোধে দু-পাঁচ হাজার রোপেয়া ছুঁড়ে দেবে। যারা ধরবার জন্যে জাল পেতেছিল, তারাই 'স্যালুট' করে সরে যাবে হাজার গজ দূরে।

আমি তখন সম্পূর্ণ ভেজাল। রাতদিন ভেজাল চিন্তা করি। ভেজালের কারবারে আরও হাত পাকাবার ভ্রষ্টামিতে মশগুল।

হঠাৎ একদিন শুনলাম, আমার ভূতপূর্ব মনিব আমার নামে দশ হাজার টাকা সহ পলায়নের যে কেস করেছিলেন, তা ডিসমিস হয়ে গেছে। পুলিস গ্রামে গিয়ে গ্রাম্য জনসাধারণের কাছে আমার বিষয়-সম্পত্তি ইত্যাদির বিবরণ ও কৃষ্ণবাবুর দরবারে আমার চাকরির পদবী শুনে সদরে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল যে একজন রাঁধুনীর হাতে দশ হাজার টাকা দিয়ে লাটের টাকা দাখিল করার ঘটনা হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। যেহেতু তাঁর দুজন নায়েব, পাঁচজন গোমস্তা, সদরে দু'জন বাঁধা মোক্তার, একজন উকিল থাকতে একটা অশিক্ষিত রাঁধুনী বামুন গেল লাটের টাকা জমা দিতে! এ ঘটনা বিশ্বাস করা পুলিসের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি যে কোন কারণে টাকা দাখিল করতে অসমর্থ ছিলেন, এই তাদের ধারণা। গ্রাম্য জন-

সবাইকে হারিয়ে শোকে দুঃখে পাগল হয়ে দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিংবা গর্বিত জমিদারের কাছে কোন বিষয়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে হয়ত অন্ধকূপে বন্দী হতে বাধ্য হয়েছে—এ তাদের অনুমান।

পুলিশের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে আদালত আর 'কেস'টা বেশী দিন জিইয়ে রাখবার সার্থকতা খুঁজে পেলেন না। কেস ডিসমিস হয়ে গেল।

বুঝলাম, সৌভাগ্য দেবীর অপার করুণা নীরবে বর্ষিত হচ্ছে আমার ওপর। আমি নবীন বলে বলীয়ান হলাম। আমার অন্তরতম প্রদেশে যে একটা গুপ্ত কাঁটা ছিল, সেটা আপনাআপনি উপড়ে গেল ভাগ্যদেবীর প্রসন্ন দৃষ্টির ফলে।

আমি আমার আসল নাম ফিরিয়ে নিলাম।

আমার দেহ-মনও কলুষিত হয়েছে তখন অতি মাত্রায়। ঘর বাঁধার চেয়ে সে স্বপ্নময়, মোহময় কুহকিনীদের ডাক, তাদের প্রসাধন লাঞ্ছিত দেহ-মনগুলো অধিকার করে রয়েছে আমার দেহের প্রতিটি রোমকূপগুলো পর্যন্ত।

(আট)

তারপর সেদিন বালীগঞ্জে দশ কাঠা জায়গা কিনে রেজিস্টারি করে নিয়ে জোর স্পীডে গাড়ী চালাচ্ছি। আনন্দ উদ্বেল হৃদয় মেতে উঠেছে কত তাড়াতাড়ি গৃহনির্মাণ করতে পারি তার পরিকল্পনায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ সরকারের জয়ের চেয়েও আমার আজকের এ জায়গা কেনার যুদ্ধ-জয়ের তুলনা নেই। বহু কসরত করে জায়গাটা আমার কবলিত হয়েছে। দালালী, উপদালালীতেই গেছে দশ হাজার টাকা।

আমি ব্যবসায়ী মহলে এতদিনে কুলীন হলাম। সম্পূর্ণ নিকষ কুলীন, যেহেতু টাকা-গাড়ী-বাড়ীর অভাব রইল না আর আমার।

মনের স্ফূর্তিতে গাড়ী নিয়ে চলে এলাম লেকের ধারে। বসলাম গিয়ে একটা বেঞ্চে।

কেন জানি না, ভাবতে ভাল লাগল আমার অতীত। বসে বসে সিগারেট টানছি আর ভাবছি। আজ জায়গা কিনলাম, এবার ঘর আরম্ভ হবে। কিন্তু তারপর? কার

ব্রহ্মাণ্ডে আমি ছাড়া কে-ই বা আছে আমার? দু-চোখ ফেটে জল এলো, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম।

ভুলে গেছিলাম আমি কাঁদতে। দীর্ঘ একযুগ ধরে আমি বেপরোয়া হয়ে আছি। আমার আমি ছাড়া সুখ-দুঃখ নেই। ভেজাল ছাড়া আসল নেই। নকলের জয়গান গেয়ে আসছি এতদিন। নকলের জয়মাল্য পেয়েছি ভাগ্য-দেবীর কৃপায়। সব আছে আমার, নেই শুধু ঘরকে ঘর বলে স্বীকার করবার মত একজন; যাকে ছাড়া ঘর বাঁধা যায় না।

শ্যামলীকে মনে পড়ে গেল। এতদিন পর তার কথা স্মরণ করে মনটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যেন সেদিনের সে দারিদ্র-অভিশপ্ত দিনগুলো আমাকে আজকের দিনের সঙ্গে তুলনা করতে বাধ্য করলে।

পিছন থেকে কে যেন ডাকলে, 'মুকুলদা—মুকুলদা—'

'তুমি পারুল, না?'

'হুঁ—'

'এখানে কোথায়?'

'দাদার বাসায় এসেছি।'

'কতদিন হলো?'

'প্রায় এক বছর—'

'হুঁ, শুনেছি, তোমার দুরদৃষ্টের কথা—'

'সেকথা থাক মুকুলদা, তোমার কথা বলো! আমরা ভেবেছিলাম, তুমি হয়ত বেঁচে নেই!'

'তবু বেঁচে আছি, এবং সসম্মানে—'

'তার মানে?'

'সে অনেক কথা পারুল, পরে বলবো।'

'খুব ব্যস্ত বুঝি, এখন?'

'না, তেমন কিছু নয়, তবে—'

'থাক্, বাধা থাকলে বলতে হবে না, আর—'

'বাধার কথা নয়, কিন্তু—'

'কিন্তু কি মুকুলদা?'

আমি চোখ মুছতে ভুলে গেছিলাম। দু-চোখে অশ্রু-ধারার চিহ্ন দেখে পারুল বলে, 'একি তোমার দু-চোখ লাল —দু-গালে অশ্রুধারা!'

বলে রুমাল দিয়ে চোখ দুটো মুছলাম।

'মুকুলদা, বুঝতে পারছি, তুমি এখানে বসে কাঁদছিলে সবার অলক্ষ্যে। কিন্তু এখানে ত লোকে আনন্দ পেতে আসে, তুমি কাঁদছিলে কেন বলবে?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, 'বলবো পারুল বলবো।' আমার কথা জানাবার মত কেউ নেই ত্রিসংসারে। তোমাকেই বলবো, বলে তৃপ্তি পাব বোধহয়।'

'সেকথা বলতে পারি না, তবে বলতে হবে। এবং এক্ষুনি!'

'উঠে দাঁড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণ আগে। বসে পড়লাম দুজনে একটা বেঞ্চে।

পাঁচ মিনিট চুপচাপ বসে থাকলাম। সত্য বলবো না মিথ্যে বলবো এবং কিভাবে কথাটা আরম্ভ করি, ভাবতে লাগলাম।

পারুল অধীর হয়ে উঠেছে তখন। বললে—বেশী দেরি হলে দাদা-বৌদি ভাববেন, আমি বরং উঠি আজ!'

কাপড়ের আঁচলটা ধরে টান দিলাম। 'দরকার হলে পৌঁছে দিয়ে আসবো। তবে পারুল, তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, আমি তোমাকে যা' বলবো কোনদিন কাউকে প্রকাশ করবে না বলো?'

'দিলাম, এই তোমার গা-ছুঁয়ে বলছি মুকুলদা। ভগবান আমার সর্বনাশ করেছেন আর পরকালের মাথা খেতে চাইনে!'

'পরকাল মান তুমি?'.

'তুমি বুঝি মান না?'

'মানি, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাই না।'

'কিন্তু একদিন ঘামাবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সেদিন অতীতের কথা স্মরণ করে হয়তো বুঝবে, আসল সত্য অর্থ নয়, প্রতিপত্তি নয় এবং সে আসল সত্য সন্ধানের জন্য মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠবে। তখন মাথা খুঁড়েও অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। অনুশোচনার ধিক্কারে মনপ্রাণ জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে, গীতায় ভগবান বলেছেন—'

'বুঝেছি, তুমি গীতা পড়—'

'হ্যাঁ, গীতাই এখন আমার জীবনের সাথী!'

'কিন্তু গীতার শ্লোক নিয়ে মেতে থাকার মত বয়েস তোমার নয়। বাধ্য হয়ে মনপ্রাণ সমর্পণ করলেও অন্তর কি ঠিক সায় দিচ্ছে তাতে তোমার? আমি জানি কামনা-বাসনার বস্তু অকালে হারিয়ে তুমি এ-সবের চর্চায় কাল কাটাচ্ছো মাত্র, কিন্তু মনপ্রাণ দিতে পারনি?—পারলে কলকাতায় দাদার বাসায় এসে মুকুল সর্বাধিকারীর সঙ্গে দেখা হতেই তার বিষয় জানবার কৌতূহল থাকত না!'

'মুকুলদা, তুমি আগের ব্যাপার নিয়ে খোঁটা দিচ্ছো মাত্র। আর এক কথা, ধর্ম গ্রন্থ পড়লেই মানুষ দেবতা হয়ে যায় না। আমাকে মাপ করো মুকুলদা, আমি যাই।'

'আজীবন তোমরা দরিদ্রকে হীন নীচ ভেবে আসছো, দেখছি আজও সে দেমাক যায়নি তোমাদের।'

'তুমি কি ঝগড়া করতে চাও আমার সঙ্গে?'

'না, আমার কথা শোনাতে চাই!'

'যদি না শুনি?'

'তোমার কৌতূহলের জন্যেই শোনাতে চেয়েছিলাম, তবে শোনাবার আগ্রহ তেমন নেই। অবশ্য আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি শুনবে। আজ রাগ করে উঠে গেলেও পরে শোনবার আগ্রহে ছুটে আসবে। হয়ত সেদিন আমার সঙ্গে দেখা না-ও হতে পারে।'

সুন্দর হাসিতে মুখখানা ভরে ওঠে পারুলের। 'তোমাকে ত জানি, বাপরে বাপ, কথাতে পারবার যো নেই তোমার সঙ্গে। জাদুমাখা কথা কেবল!'

'শুধু কথাতে জাদু নয়, দেহ-মনেও জাদু আছে। তুমি সব কথা শুনলে বুঝবে আমি একজন আশ্চর্য জাদুকর!'

'বেশ বাপু বলো—' বলে মুকুলের কাছ ঘেঁষে বসে পারুল।

'সব কথা সত্য বলবো?'

'ইচ্ছে হলে, বলতে পার!'

'নির্ভয়ে?'

আবার হেসে ওঠে পারুল। 'অভয় দিলাম—'

'শোন তবে—'

কোন কথা গোপন না করে আদ্যপ্রান্ত খুলে বললাম তোমাকে। আমার সব কথা শোনার পর তুমি বিস্মিত হয়ে গেলে, 'সত্যই তুমি জাদুকর মুকুলদা—তোমার আকাশ-কুসুম স্বপ্ন সফল হয়েছে শুনে খুব খুশী হলাম।

জানো মুকুলদা, জোর জবরদস্তিতে আপনার কামনার বস্তু ছিনিয়ে নিতে হয়, বসে বসে তপস্যা করলে পাওয়া খুব দুষ্কর।—সে তোমার অন্তরের যে কোন কাম্যবস্তুই হোক'!

'তুমি সমর্থন করছো, তা' হলে? ভেবেছিলাম, গীতামৃত পান করে ঘৃণা ছাড়া কিছু পাব না তোমার কাছে।'

স্তব্ধ বিস্ময়ে মুকুলের মুখের দিকে চেয়ে রইলো পারুল। দু-চোখ তখন তার জলে ভরা।

বললাম, 'তুমিও ত লেকে এসেছিলে আনন্দ পাবার জন্যে, কাঁদছো কেন?'

'হাঁসা-কাঁদার স্থান-সময় নেই মুকুলদা' কাঁদছি কেন জান, কেন সেদিন—না-না থাক্ সে আমার অন্তরের কথা, এখন স্বীকার করছি, সারাজীবন আমার মরুভূমির তুল্য। যা আমার দুরদৃষ্ট, উঠি কেমন?' বলেই উঠে দাঁড়ায় পারুল।

আমি বললাম, 'তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে না?'

'না, একাই যেতে পারব। তবে তোমাকে একটা অনুরোধ করি, ঘর হলেই ঘর বেঁধো, কেমন? তা' না হলে শান্তি পাবে না, পরিপূর্ণ সুখ নেই তাতে!'

'বুঝেছি তোমার অন্তরের কথা। তোমার অন্তরের বেদনা আমার মনেও গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু একটা কথা, ভেজাল মুকুল সর্বাধিকারী ভেজাল বউ নিয়ে ঘর করতে দুঃখিত নয়, যদি তুমি রাজী থাক—'

'মুকুলদা—আমার কামনা-বাসনা আর্জও আমার সুপ্ত মনে অটুট রয়েছে। তোমার গাড়ী-বাড়ী-টাকার কথা শুনে আমিও যে তখন থেকে মোহজালের আবর্তে স্বপ্নময় কল্পনায় না ভাসছি, তা, নয়। আজ তোমাকে আমার প্রাণের কথা খুলে বললাম—গীতা আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না, যেহেতু যার প্রাণের গীত নিঃস্তব্ধ, সে নিস্তেজ

বীণাতে গীতার বাণী প্রবেশ করে না। করলেও তা' মর্মস্পর্শী নয়—'

'এত ঠুনকো তোমরা, প্রথমটা ত আমাকে পাত্তাই দিচ্ছিলে না। ভাবছিলাম, প্রস্তাব করলেই প্রত্যাখ্যান করবে এবং ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে প্রশান্তবাবুর বিধবা পত্নী প্রায়শ্চিত্তের জন্য বাড়ী গিয়ে পুরোহিত ডাকবে।—ভাবতেই পারিনি, এত সহজে তুমি ধরা দেবে। আজ প্রত্যক্ষ হলো, তোমরা যত কঠিন তত সহজ।'

'বিশ্বাস কর মুকুলদা, তোমাকে আমি প্রথম জীবনে মন-প্রাণ দিয়ে চেয়েছিলাম। ভালবেসে ছিলাম তোমার সুন্দর স্বাস্থ্যটাকে। কি চমৎকার চেহারা! আজ আন্দাজ চল্লিশ বছর বয়সেও তুমি যেন পূর্ণ যুবক। যাকে পেয়েছিলাম তাকে দুর্ভাগ্য বশতঃ হারিয়েছি অকালে, একি আমার কম দুঃখ? বাবা-মা মারা গেলেন, দাদা-বৌদি গ্রাহ্য করেন না—আমি তাঁদের ভার বোঝা। তুমি বুঝবে না মুকুলদা-এ অভিশপ্ত জীবনের জ্বালা বুঝবে না। শুধু স্বামীশোক ভুলবার জন্যেই গীতা পড়ি না—গীতা পড়ি, সর্বদা দাদা বৌদির খিচখিচ ভুলবার জন্যেও। মনটা কিন্তু পড়ে থাকে অন্যদিকে। কিন্তু নিরুপায় আমি, হাত-পা শিকলিতে বাঁধা।'

'কিন্তু ছিঁড়তে হবে সে বাঁধন। উড়তে হবে মনের আনন্দে। অতীত রসাতলে দিতে হবে। যাবে আমার নবীন কুণ্ডু লেনের ভাড়া বাড়ীতে?'

'তুমি কি তা' চাও?'

'লোভ আমার আজও যায়নি—'

'কিন্তু একটা শর্ত—'

'বলো—'

'আমি কোন সন্তান চাই না—'

'কিন্তু বাস করবো আমরা প্রকৃত স্বামী-স্ত্রীর মত। রাজী আছো?'

'বলো কোনদিন ঘৃণা করবে না!'

'রূপবান বলে যাকে মনে কর, সে কখনও রূপবতীকে ঘৃণা করে না। চলো আর দেরি করে লাভ নেই!'

'সেই ভাল গো আমার, চলো ঘর হারিয়ে আবার ঘর বাঁধি গে—'

'আর সেই ঘরের লক্ষ্মী হবে পারুল সর্বাধিকারী—প্রসিদ্ধ নকল কারবারী মুকুল সর্বাধিকারীর গৃহলক্ষ্মী।'

সদ্য কেনা এ্যাম্বেসডার গাড়ীতে চেপে দুজনে এসে ওঠে নবীন কুণ্ডু লেনের বাড়ীতে।

(নয়)

ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজে।

পারুলের দু-চোখ ছাপিয়ে তখন জল ঝরছে শ্রাবণ ধারার মত। মুকুলের কথায় কোন প্রতিবাদ করতে সাহস করে না সে। সব সত্য। তবু সেদিনের সে প্রতিশ্রুতির কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সেদিনের মুকুল সর্বাধিকারীর সঙ্গে আজকের মুকুল সর্বাধিকারীর বহু প্রভেদ। আগেকার সে প্রেমশীতল স্পর্শের মর্মন্তুদ পরিণতি এই প্রথম। বুঝতে পারেনি সে তাকে ঘুমুবার আবেদন জানাতে এসে, এভাবে নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা তথা অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কঠোর আঘাত দেবে। কতদিন কত গুরুত্বপূর্ণ গুকাজ করবার সময় তাকে ডাকতেই সবিনয়ে বলেছে, 'প্লীজ—এক মিনিট—' তারপর হাসতে হাসতে উঠে এসে বলেছে কৌতুক কণ্ঠে, 'আমি সব উপেক্ষা করতে পারি, ব্যবসায়ে দু-পাঁচ হাজার লোকসানও সহ্য করতে পারি- পারি না কেবল তোমার ডাক উপেক্ষা করতে।'

'কেন বলো ত?'।

'জ্বলন্ত আগুনে যে বাধ্য হয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিলো তাকে উদ্ধার করে এনে আর জ্বালাতে চাই না পারুল। সে শান্তিতে থাক, সুখে থাক এই চাই।'

'কারবার তোমার নকল নিয়ে বটে কিন্তু ভালবাসা তোমার নিখাদ। কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখলেও এক কুঁচো খাদ পাওয়া যাবে না।'

'জানো পারুল, ভগবান মানুষকে নিখাদ করেই পাঠান কিন্তু আমরা মানুষরা দেহ-মনে খাদ মেশাই ইচ্ছামত। মেশাতে মেশাতে অনেকের এমন চেহারা হয় যে আসল মানুষটাকে আর চেনাই যায় না, যেমন আমি। তুমিই একদিন বলেছিলে, গীতায় ভগবান বলেছেন—'

'থাক আর গীতার শ্লোক আওড়াতে হবে না।'

অনেকদিন পর।

বালীগঞ্জের বাড়ীটা তৈরী হয়েছে। রামগোপালের বিয়ের পর তারা নতুন বাড়ীতে উঠে এসেছে। বাড়ীখানা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল পারুলের। মহেশগঞ্জের জমিদার কৃষ্ণকান্ত পাল মশাইয়ের বাড়ীতে ছোটবেলায় একবার ভোজ খেতে গিয়েছিলো সে। বাড়ীখানা দেখে খুব ভাল লেগেছিলো তার। অনেকে বলেছিলো তেমন বাড়ী নাকি সে তল্লাটে নেই।—সে-বাড়ী আর এ-বাড়ীর কত তফাত। মহেশগঞ্জের জমিদারের অট্টালিকাকেও হার মানাতে পেরেছে তার স্বামী। এ কি কম গর্বের কথা। সে পুরানো আমলের অট্টালিকার সঙ্গে এ নতুন ছকের নানাবিধ কারুকার্যের কোন তুলনা হয় না। কত সময়, কত অর্থ যে ব্যয় হয়েছে, তার হিসেব নেই। বলেও ফেলেছিলো সেদিন উৎফুল্ল চিত্তে, 'কৃষ্ণবাবুর অট্টালিকাটাকেও হার মানিয়েছো তুমি।'

মুচকে হেসেছিলো মুকুল। 'তাই নাকি?'

বেশ মনে আছে, নবীন কুণ্ডু লেনের ভাড়া বাড়ীতে বছর খানেক একত্রে বসবাসের পর একদিন মুকুল বলেছিলো সক্ষেদে, 'কিন্তু কোথায় যেন একটা মস্তবড় ফাঁক থেকে যাচ্ছে, অবশ্য তোমা'কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি—ভেবে দেখলাম তা' লঙ্ঘন করা যায় না। তবু যেন—'

'তবু কি, থামলে কেন, বলো?'

'সংসার পাতলাম, ঘরও তৈরী হবে ধীরে ধীরে, তবু যেন কোথায়—'

'আমি বুঝতে পারছি না তোমার কথা।'

'বুঝা উচিত কোথায় যেন একটা বড় রকমের ফাঁক থেকে যাচ্ছে।'

পারুল নীরবে মুকুলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মুকুল বলে, 'আজ আমি সব পেয়েছি। যা' ভিন্ন মনে শান্তি পাচ্ছি না তা' তুমি না চাইলেও আমি চাই। আমার পরে কে এসব ভোগ করবে?'

'ভুল করেছো গো তুমি আমায় ঘরে এনে। বরং বিদেয় করে দাও সময় থাকতে—'

'না পারুল, ভুল আমি করিনি। আর যদি ভুল করেও থাকি ভুল সংশোধন করতে বেশী সময় লাগবে না।'

'তুমি কি আবার একটা বিয়ে করতে চাও?'

'না' একটা সন্তান চাই।

'কিন্তু—'

তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি আসল মুকুল সর্বাধিকারী, দীনবন্ধু রায় হয়ে বহুদিন আত্মগোপন করেছিলাম, নামটা প্রকাশ করেছি কিছুদিন আগে কিন্তু নকল মনটা বিসর্জন দিতে পারিনি। আমি নকল সন্তান চাই, তাতে আমার এতটুকু বাধবে না। তোমার কি তা'তে কোন আপত্তি আছে?'

'শুধু নিজের দিকটা দেখলে ত সংসারে বাস করা যায় না। আমার তাতে একবিন্দু আপত্তি নেই গো, তুমি যাতে সুখী হও, শান্তি পাও, তাও আমার দেখা কর্তব্য। তোমার সুখ আমার সুখ—তোমার দুঃখ আমার দুঃখ।

কিছুদিন পর একটা ফুটফুটে সুন্দর ছেলে এনে পারুলের কোলে তুলে দিয়েছিলো মুকুল, 'আমাদের সন্তান—'

উল্লসিত হয়ে ওঠে পারুল, 'খুব চমৎকার দেখতে—'

দু'জনেই খুশী হয়েছিলো তারা। এক অনির্বচনীয় আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলো সেসময়। আজও রামগোপাল জানে না, তারা তার নকল মা-বাবা। ছেলেটা ভাগ্যবান। তারা ত জানে, ছেলেটা কোথায় কিভাবে পাওয়া গেছে—মুকুলই শুনিয়েছে সে-কাহিনী।—তবু যেন ছেলেটা তাদের নিজের ছেলেরও বেশী।

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন অতি প্রত্যুষ।

একটা জরুরী কাজে বেড়িয়েছে মুকুল। গাড়ী চালাচ্ছে জোর স্পীডে। রাস্তার একটা মোড় ঘুরতেই হেড লাইটের আলোতে চোখে পড়লো একজন স্ত্রীলোক একটা শিশুকে ডাষ্টবিনে ফেলে দিতে উদ্যত।

গাড়ীটা থামিয়ে ফেলে মুকুল।

মহিলা ভয় পেয়ে কাপড়ের আঁচল দিয়ে নবজাতককে ঢেকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ে।

গাড়ী থেকে নেমে মুকুল ধমকে ওঠে, 'কে তুমি? এত ভোরে এখানে কেন?'

'আমার পরিচয় আমি ছাড়া কিছু নেই। এখানে কেন জিজ্ঞেস করবেন না বাবু, তবে এটুকুই বলি, 'আমি মা হয়েছি, কিন্তু সন্তান কাছে রাখবার ক্ষমতা নেই।'

'আমাকে ভিক্ষে দেবে, ছেলেটা?'

'নিজের সন্তান কি কেউ কাউকে ভিক্ষে দেয় বাবু? তবে আমি অভাগিনী তাই—'

ভেজাল মনটা মুহূর্তে নরম হয়ে ওঠে মুকুলের ঐ হতভাগিনীর কথা শুনে। পকেট থেকে পাঁচশো টাকার একটা বাণ্ডিল হাতে দিয়ে বলে, 'এটা নাও—'

একটা হাত বাড়িয়ে বাণ্ডিলটা হাতে নিয়ে মেয়েটি বলে, 'কি এটা, বাবু?'

'টাকা—'

বিস্ফারিত নেত্রে মেয়েটি বলে, 'টাকা? এ যে অনেক টাকা!'

'হুঁ—পাঁচশো—'

'হয়ত সেদিন এ টাকাটা পেলে আমার বিয়ে দিতে পারতেন বাবা, কিন্তু পাঁচটা টাকা বের করবার ক্ষমতা ছিল না যাঁর—' দু-পাশে মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে মেয়েটি। তারপর ছেলেটাকে রাস্তার মাঝে শুইয়ে দিয়ে টাকার বাণ্ডিলটা মুকুলের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অক্ষমতা সত্ত্বেও সে প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে যায় একটা গলির মধ্যে দিয়ে।

মুকুল নবজাতক শিশুটিকে কোলে তুলে নিলো, তারপর টাকার বাণ্ডিলটা। মেয়েটির কথা শুনে তার মনে পড়ে গেল, বাবার দারিদ্র্যের জন্য তার দিদির বিয়ে হয়েছিলো অসৎ পাত্রে আর এর বিয়েই দিতে পারেনি তার বাবা। আজ সে যে জীবন যাপন করে তার জন্য দায়ী কে?

হৃষ্ট মনে বাড়ী ফিরে এলো মুকুল জরুরী কাজ ফেলে রেখে।

(দশ)

অতীতের কথা স্মরণ করে স্বপ্ন বলেই মনে হয়। অতীত আর ফিরে আসে না সত্য, তাই অতীতের অভ্যন্তরে মনটাকে প্রবেশ করিয়ে একটা অনির্বচনীয় মধুর স্মৃতি মন্থন করে সাময়িক ভাবে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, তেমনি তাতে মনের অবক্ষয়ও হয় বেশ কিছুখানা। অকপটে মনের দর্পণে অতীতের ছবি প্রতিফলিত করে অনুশোচনার ধিক্‌কারে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত বুকের আগুন দিয়ে জালিয়ে ব্যর্থতার গ্লানি বুভুক্ষু অন্তরের চাওয়া-পাওয়ার হিসেব-নিকেশ করা ছাড়া কি বা লাভ? তবু যেন অতীতের ভাবনা-ব্যাকুল মন মুহূর্তে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সময় সময়। মনের বিভিন্ন গতি, বিভিন্ন বয়সে যে রকমারি পথে পরিচালিত করে রঙীন কল্পনায়, তার জন্য দায়ী নিজেকে করা ছাড়া কাউকে দায়ী করাও যায় না। —অদৃষ্টকে ধিক্‌কার দেয় পারুল, এই অজানা অদৃষ্ট!

কাঁদছে আকুল হয়ে পারুল। স্বামীহারা হয়ে এ-রকম কান্না কেঁদেছিলো। হৃদয়ে গাঁথা আছে সে-কান্না। আজ আবার কাঁদলে, সে মৃত স্বামীর কথা স্মরণ করে। ভুলা যায় না তাকে; তার স্মৃতিকে। প্রথম যৌবন আর প্রথম প্রেম ভোলবার নয়। হয়েছে কত আইন প্রণয়ন, মেয়েদের দ্বিতীয় বিবাহের সিদ্ধ আইন। কিন্তু আজও সে ভুলতে পারে না প্রথম স্বামীকে। পারবেও না ভুলতে এ-জীবনে। সব পেয়েছে সে—মানুষ যা' চায় তাই; কিন্তু পেয়ে ত শান্তি নেই। এতদিন তলিয়ে বোঝেনি, আজ এ প্রৌঢ় বয়সে বার বার যেন মনে হয়, সেই ভাল ছিলো। সেই ছিল সুখের। সেদিন তার বড় সাধের, বড় সুখের। প্রথম প্রেমিককে হারিয়ে নতুন প্রেমিকের মন জুগিয়ে চলা, তার সব কিছু ইচ্ছাকে মেনে নেওয়া বড় কঠিন। অন্তর যেন মনে-প্রাণে কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। সেদিন বালীগঞ্জের লেকে যে ভুল করেছে সে ভুল সংশোধনের আর উপায় নেই। অদৃষ্টে সুখ না থাকলে এমনিই হয়। অন্যায় অবিচারের সাজা আছে। মানুষের নজর এড়িয়ে গেলেও বিধাতার দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। যায় না বলেই সে পরজন্মের কোন পাপের ফল ভেবে তার বৈধব্য-দশা মেনে নিয়েছিলো। আবার যত সহজে সেদিন সে মুকুলকে স্বামী বলে মেনে নিয়েছিলো আজ তত তুচ্ছ কারণেই তার মনের আগুন আবার জ্বলে উঠেছে এ-মুহূর্তে। পূর্বস্মৃতির পুনরাবৃত্তি ভাল লাগছে না তার। কেবল মনে হচ্ছে, আবার ডাক ছেড়ে কাঁদে সেদিনের মত, 'কোথা গেলে গো তুমি—'।

অন্তরের সুদূরতম প্রদেশে যে তৃষ্ণা ছিল, আজ তা' মিটে গেছে মনে হয় পারুলের। আজ চাওয়া-পাওয়ার সীমান্তে এসে খুঁজছে কি যেন ব্যাকুলতায়। অবশ্য যে যাকে যত ভালবাসে তার তত সামান্য কথায় আঘাত পায় সবচেয়ে বেশী। তাই সে সইতে পারছে না মুকুলের কটু কথাগুলো। যেন হুল ফুটছে সর্বাঙ্গে। কথাটা অন্যভাবে ঘুরিয়ে বললে কি হতো? তা' না বলে যুগান্তরের মসীমাখা ঘৃণিত কুৎসিত জীবনের পুনরাবৃত্তি! আত্ম-অহমিকার এ-এক কুৎসিত দৃষ্টান্ত। অবশ্য একদিন সে ভালবেসেছিলো মুকুল সর্বাধিকারীকে নয়, তার চেহারা-টাকে। সুন্দর সুঠাম লালিত্যমাখা দেহটা ছিল তার কাছে লোভনীয়। দেখলে চোখ ফেরানো যেতো না। যৌবনে চঞ্চলতা বশতঃ বাসা বেঁধেছিল দেহাশ্রয়ী প্রেম, কিন্তু মনের একান্ত গোপনে সত্যকার যে প্রেম, তা' ছিল অজানা। তাই বাবা একদিন মাকে বলেছিলেন গোপনে, 'শুধু চেহারা দেখলে চলে না, তার গুণাগুণ, শিক্ষাদীক্ষার কথাও ভেবে দেখতে হবে। বুঝে দেখতে হবে তাদের মিলন শুভ হবে কিনা!'

গাড়ী-বাড়ী-টাকা!—আকাশের চাঁদ যেন হাতে পেয়েছে মুকুল। অন্ততঃ তাই সে মনে করে। কিন্তু ভেবে দেখতে রাজী নয়, চাঁদের কলঙ্ক বিশ্বজন জানে—জানে তার কলঙ্কমাখা কাহিনী!

প্রশান্তকে সে সত্যই ভালবেসেছিল। তার মহৎ হৃদয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজ তার কাছে আরো মহীয়ান হয়ে উঠেছে। প্রাণ বলি দিলে শেষে জনসাধারণের স্বার্থে। শুনলে না নিষেধ বাপের। মুখের ওপর তীক্ষ্ণ শ্লেষকণ্ঠে জবাব দিলে, 'মিথ্যাকে সত্য বলা আর অন্যায়কে ন্যায় বলে

মানতে রাজী নই আমি। আপনি সংযত হন নচেৎ আমাকে বাধ্য হয়ে আপনার বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে।'

বাপের জমিদারী আভিজাত্য অহঙ্কারের রক্তিম পরশ তখন পর্বত প্রমাণ। 'প্রজাদের কাছে আমাকে হেয় হতে হবে? তুমি পুত্র হয়ে তাতে সাহায্য করতে চাও?—যাও, কিন্তু তোমার প্রাণ যদি আমার অনুচরদের অস্ত্রাঘাতে যায়, আমি দুঃখিত হবো না—ভগবান যেন সেজন্য আমাকে তোমার প্রাণবলির জন্য দায়ী না করেন।—বৌমা—বৌমা—'

বেড়িয়ে আসে পারুল। সেও শুনছিলো জানালা দিয়ে পিতাপুত্রের বচসা। এসে প্রণাম করে শ্বশুরকে।

মনীশবাবু করুণ কণ্ঠে বলেন, 'আমি ওকে শান্ত করতে পারছি না মা। যা' কিছু করছি সবই তো তোমাদের মুখ তাকিয়ে, কিন্তু ও তা' আজও বুঝলে না। দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল-দের ত তুমি জান, ওরা আজ পর্যন্ত কোথাও হেরে আসেনি, ওরা যে কালও এ প্রজা-বিদ্রোহ রণে হারবে না—সে আমি জানি। তবে ও আমার পুত্র কিনা, তাই ভয় হয়, হয়ত ও আর ফিরে আসবে না। আর ওকে ফিরে পাব না—' সরবে কেঁদে ওঠেন এবার মনীশ মজুমদার।

পারুলকে সব বুঝিয়ে প্রশান্ত যখন প্রজাদের বর্ধিত খাজনা মকুবের জন্য লড়তে বদ্ধপরিকর জানালে এবং হাতে-নাতে প্রমাণ করে দিলে, তিন হাজার টাকা সরকারে জমা দিয়ে চার হাজার টাকা মুনাফা পাচ্ছেন বাবা, আবার কেন অকারণ দেড় হাজার টাকা খাজনা বাড়বে প্রজাদের? নিরীহ প্রজাদের কোন মঙ্গল চিন্তা না করে আশ্চর্য ভাবে নিজের সুখের জন্য খাজনা বর্ধিত হবে কেন তার সন্তোষ-জনক জবাব কে দেবে'?

পারুল বাধা দিতে পারেনি প্রশান্তকে। শুধু নীরবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল, 'ভগবান ওকে জীবিত রেখো। সেদিনের স্বপ্ন যেন তার নিস্ফল হয়।'

জীবিত ফিরে আসেনি প্রশান্ত। তার প্রাণহীন বীভৎস মূর্তিটা যখন কাছারী প্রাঙ্গণে আনা হলো, মনীশবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, 'ভুল করেছি আমি—ভুল করেছি ঊনবিংশ শতাব্দীর গর্ব বজায় রেখে। ভেবে দেখিনি, যুগ বদলেছে! উঃ—'

এরপর পারুল ফিরে এলো পিতৃগৃহে। মা-বাবা চলে গেলেন তিন বছর আড়াআড়ি। দাদার গলগ্রহ হলো সে। তারপর সে গলগ্রহ থেকে রেহাই পাবার জন্যে নতুন করে মনে প্রাণে জেগে উঠলো, প্রেম-সুখ-ভালবাসা মুকুলের আন্তরিকতায়।....দ্বিতীয় জীবন শুরু করলে, তার সঙ্গে সব কিছু ভোগের আশায়। যা সে পায়নি অথচ পাবার ব্যাকুলতা মনের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করছিলো প্রশান্তর মৃত্যুর পর থেকেই। দেনা-পাওনার হিসাব মেলাতে বসেছিলো সে, কিন্তু ভেবে দেখেনি সেখানে সব নকল, মনের মানুষটি পর্যন্ত নকলের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে, সেখানে সব ভেজাল। ভেজাল দিয়ে ব্যবসায়ী লাভবান হয় বটে, কিন্তু ভেজাল খাদ্য খেয়ে মানুষ মৃত্যুর দিকে ক্রমশঃ আগিয়ে যায়, নানা ব্যাধিতে জ্বলে পুড়ে মরে। সেও তেমনি আজ এক অগ্নিহীন চরম চিতাতে যেন জ্বলে উঠলো দাউদাউ করে, মৃত্যুর দিকে আগিয়ে চলেছে দ্রুত-বেগে।—ভেজাল প্রেম দুর্বিষহ!

এ প্রাণটার জন্য আর মায়া হয় না। অথচ যেদিন দেহে ফুটে উঠলো নতুন কুঁড়ি, যৌবন ডাক দিয়ে গেল দেহের প্রতিটি কণায় কণায়, হৃদয় উঠলো নেচে ময়ূরীর মত, সে আবেগপ্রবণ মন চঞ্চল হয়ে উঠলো তার শুভাগমনে। ধন্য হলো বুঝি জীবন। স্বর্গ পেলো বুঝি হাতে। আপনা-আপনি কার অজানা তুলির টানে মুখর হয়ে উঠলো দেহের প্রতিটি অঙ্গ—কেশপাশ থেকে পায়ের আঙুলের ডগা পর্যন্ত। মধুর স্বরে দেহ-মনের বদ্ধ প্রকোষ্ঠে বীণা বেজে উঠছে যেন অবিরাম।

রূপবতীর রূপ ফুটে উঠলো। পারুল গর্ব অনুভব করলে। সে রূপের পূজারী হবে কে? কে তার [illegible] রূপের মূল্য দেবে? কোন্ রূপবান? চলতে থাকলো তার দেহ-মনের অনুশীলন আরও নিখুঁত ভাবে। মনভ্রমরা গুনগুন করছে সদাসর্বদা মনের গোপন মন্দিরে। শিব-পূজার সময় বাড়িয়ে দিলে সে যদি শিব সন্তুষ্ট হন, তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। শিবমন্দির ধূপদীপ, পূজা স্তোত্রে মুখর হয়ে উঠলো। ভ্রমরের অলক্ষ্যে ভ্রমরীর চললো এভাবে একটানা সাধনা। মনের মানুষ চাই নিখুঁত—সুন্দর!

তারপর ভ্রমর এলো তার জীবনে। পিতামাতার যত্নে তার দীর্ঘদিনের মনোষ্কামনা পূর্ণ হলো। মনে মনে যে

মানুষটিকে ভালবাসার একটা অংশ দিয়েছিলো সবার অজান্তে তার চেয়ে কাছের মানুষটি অনেক ধনী, উচ্চ শিক্ষিত—রূপে যা' সে একটু খাটো। মন তার বহু উঁচে। সে ধনী হয়েও অর্থপিপাসু বা স্বার্থান্বেষী নয়, চায় দরিদ্রের মুখেও হাসি ফোটাতে।

মুখের হাসি আর মনের হাসির বহু তফাত। দুইয়ের যোগাযোগে যে হাসি ফুটে ওঠে মুখে, সে হাসি কত সুন্দর। সে প্রশান্ত হৃদয়ের হাসির রূপ আলাদা। মানুষের আকৃতিই মানুষ নয়, মানুষের মত মানুষ কজনই-বা হতে পারে? মানুষ হতে গেলে সাধনার প্রয়োজন। যে অনাবিল প্রেম তিলে তিলে বহু অনুশীলন, কৃচ্ছ্রসাধন করে জন্মজন্মান্তর ধরে আয়ত্ত করতে হয়। বহু ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয়।

হেসেছিলো প্রশান্ত একদিন তার কাছে। সে মধুর হাসি আজও তার নির্জীব ক্লান্ত চোখের সামনে ভেসে ওঠে মাঝে মাঝে।—অথচ তা' কত করুণ!

'পারুল আজ একটা খুব মজার স্বপ্ন দেখেছি!'

'কি স্বপ্ন?'

'শুনবে?'

'মজার স্বপ্ন শুনতে ইচ্ছে হয় না বুঝি?'

'আচ্ছা, স্বপ্ন সত্য বলে মনে হয়, তোমার?'

'বোধহয়, না—'

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সত্য না হলেও একদিন তা' সত্যে পরিণত হবে। অন্তত যদি তা' তোমার জীবনে সত্য হয়ে ওঠে আমি তাতে খুব সুখী হবো। যদিও আমার মৃত্যুর পর তোমাকে আমার আরাধ্য দেবতা বলে মেনে নিতে বলি না, তবে যদি কোনদিন মনে পড়ে আমার সমাধিতে সিরাজের বেগম লুৎফা যেমন বিধবা হলে সমাধি-মূলে অশ্রুজলে পূজা করে গেছে অহর্নিশি, তেমনটি নয়, মাঝে মাঝে দুটো ফুল ছড়িয়ে দিয়ে এসো।—তোমার চাঁপার কলির মত ঐ আঙুলের স্পর্শে ফুলগুলো আমার সমাধির বুকে দিলে আমার আত্মা সুখী হবে। ফুলের সুগন্ধে আমি পাব সুখস্পর্শের আস্বাদ। আশীর্বাদ করবো

তোমায়, তোমার বাকী জীবন সুখের হোক—পারবে না?'

পারুলের দু-চোখ তখন জলে ভরা।

হেসে উঠলো প্রশান্ত। অনাবিল সে হাসি।

হাসি দেখে পারুলের কান্না গেল বেড়ে।

'আর অমন করে ওসব কথা বলো না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। আমি সইতে পারছি না গো! তোমার স্বপ্ন মিথ্যে হোক, মিথ্যে হোক তোমার সমাধিতে আমার ফুল দেওয়া! লুৎফার দুঃখ শুনলে আজও আমার প্রাণ কেঁপে কেঁপে ওঠে, সহানুভূতিতে মন ভরে ওঠে। বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় একটা বোবাকান্না। আর হতভাগ্য সিরাজের জন্য হাহাকার করে ওঠে মনটা।—হায় সিরাজ, বুঝি-বা সে শাপভ্রষ্ট দেবদূত!'

পারুলকে কাছে টেনে নেয় প্রশান্ত। চোখ দুটো রুমাল দিয়ে মুছে দিয়ে বলে, 'কাঁদতে নেই! ছি! থাক্, আমার মনের কথা শুনে যখন কাঁদছো—স্বপ্নের কথা আর শুনতে হবে না—'।

জেদ ধরে পারুল। 'না বললে আমি কিছুতেই তোমাকে উঠতে দেবো না। বলতেই হবে।'

'শোন তবে সে মজার স্বপ্ন—'

'কাঁদছো তুমি আকুল হয়ে আমার মৃতদেহের পদতলে বসে। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছো। কিন্তু আমার রক্তাক্ত কলেবর একটা জয়ের উল্লাসে থেকে থেকে উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। হাজার হাজার নরনারী আমার মৃতদেহ দেখবার জন্যে ভিড় জমিয়েছে কাছারি প্রাঙ্গণে। তাদের মুখে কথা নেই, শোক প্রকাশের ভাষা নেই। সবার চোখে জল। কাঁদছে তারা প্রবল শত্রু মহামান্য জমিদার পুত্রের মৃতদেহ দেখে। আর মনে-প্রাণে অভিশাপ দিচ্ছে জমিদারী নিপাত যাক। সবাই মাথা হেঁট করে আছে তোমার কাছে, লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না বুঝি তারা। আমার মৃত্যুর জন্য সব দায় দায়িত্ব যেন তাদেরই। আমি দেখছি আর হাসছি। সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম, তোমাদের ওপর যে জুলুম হচ্ছিলো, তা' থেকে তোমাদের উদ্ধারের সংকল্প নিয়েছিলাম—তাতে তোমাদের দুঃখ বা লজ্জার কি আছে? প্রাণের মায়া বড় নয়, আগে অবিচারের প্রতিবাদ। আমি জমিদার পুত্র না হয়ে যদি তোমাদেরই একজন হয়ে জন্মাতাম? আমার লজ্জা আমি ধনীর ঘরে জন্মেছি, কিন্তু ধন-মান-যশের কাঙাল হতে চাইনি। তাই সেসময় পিতৃ অনুচরদের রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। নায়েব-গোমস্তা-পেয়াদারা আমার রণ হুঙ্কার দেখে সরে গেছিলো, যায়নি কেবল দুর্ধর্ষ লাঠিয়ালরা। আমি জানি পেছন থেকে তাদের সাহস দিচ্ছিলেন স্বয়ং আমার পিতা। জলছিলো তোমাদের কুটিরগুলো রাতের অন্ধকারে দাউদাউ করে আর আর্ত নরনারীরা বুকফাটা আকুল আর্তনাদ করছিলো শীতের রাতে।

সহ্য হলো না আমার। তাই ছুটে গেলাম। এ হতে দিতে পারি না। ঐশ্বর্য-লোভে নিরপরাধ মানুষগুলোর বুকে এ শক্তিশেল আমি বিদ্ধ হতে দেবো না। যদি প্রাণ বলি দিতে হয়, সেজন্য আমি দুঃখিত নই। কেন অকারণ যখন তখন তাদের খাজনা বাড়বে?—অধিকারের অন্যায় অহঙ্কার শেষ করে দিতে হবে; ইংরেজ শোষিত-শাসিত এ নির্বীর্য মানুষগুলোকে সাহসী করে তুলতে হবে, তা' না হলে দেশমাতৃকার স্বাধীনতা পিছিয়ে যাবে অনেক দূরে! লাঠির আঘাত যারা সহ্য করতে পারবে না, লাঠি ধরতে যারা ভয়ে ভীত—তারা কি কোনদিন ব্রিটিশ সরকারের সিপাহীদের গোলাগুলির সামনে বুক পেতে দিতে সাহস করবে?

তোমাকে সব বুঝিয়ে বললাম, তুমি না বলতে পারলে না। শুধু জটাজুটধারী সেই দেবাদিদেব মহাদেবের ফটোতে মাথা কুটতে লাগলে, 'ঠাকুর তুমি ওকে বাঁচিয়ে রেখো। জমিদারী চাই না আমরা, চাই সব কিছুর বিনিময়ে ওর জীবন ভিক্ষা।'

পারুল ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, 'তোমার স্বপ্ন মিথ্যে হোক। আমি তা' চাই না—চাই না—চাই না—'

সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল প্রশান্ত, 'তুমি ভেবো না—এ স্বপ্ন সত্য না-ও হতে পারে।'

অথচ সে স্বপ্ন সত্য হয়েছে পারুলের জীবনে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে।—নিজেকে নিজে ধিক্কার দিলে সে, 'এই তার ললাটের লিখন'!

(এগারো)

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ফের বলতে শুরু করলে মুকুল,—উনিশ-শো সাত চল্লিশ সাল।

ভারত স্বাধীন হলো।

হঠাৎ একদিন কোন দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিনিধি এলো আমার কাছে। আমার ফিরিওয়ালা জীবন থেকে আজ কিভাবে এতবড় লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা ফাঁদতে পেরেছি তার ইতিহাস জেনে কাগজে ছাপবে তারা।

যে ভেজালের কারবারে সিদ্ধহস্ত, তার জীবনীও যে অধিকাংশ ভেজাল, তা' কাগজের প্রতিনিধি জানবে কি করে? এ গোপন খবর রাখা কজনের পক্ষেই-বা সম্ভব? সুতরাং তারা চাইল নবীন ভারতের জনসাধারণকে আমার ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ ব্যবসায়ের কথা সগর্বে জানিয়ে আমাকে এক জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেশবাসীকে ব্যবসা ইত্যাদিতে উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়াসী হতে।

আমি আমার ব্যবসা কাহিনীর সঙ্গে ভেজাল দিলাম শতকরা নিরানব্বই ভাগ। জলো না পানসে সে পরখ কে করবে? আর যদিও-বা কেউ করে তারা নিজেরা যে কতখানি নির্ভেজাল তা' হৃদয়ঙ্গম করলে চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। এ বিশ্বাস আমি করি, যেহেতু জহুরী জহর চেনে। অর্থাৎ আমার নকল আমিত্বে একখানা নকল বাঘছাল চাপিয়ে দেওয়া হলো। জানো বোধহয়, সেই গর্দভের বাঘের চামড়া গায়ে দিয়ে কৃষকের ক্ষেতে ফসল নষ্ট করার গল্পটা।

পরদিন সংবাদপত্র দেখে আমার ব্যবসায়ী গুরুরা ফের আর একদফা পিঠ চাপড়ে দিয়ে গেল, 'সাবাস'!

কোন মাসিক পত্রের সম্পাদক ধরলে, ধারাবাহিক ভাবে আমাকে জীবনী লিখতে হবে।

আমি বলি, 'সম্ভব নয়—।'

তিনি বলেন, 'সেকথা বললে শুনছিনে স্যার, আমরা 'পেপার' পড়ে বুঝেছি, সামান্য পুঁজির ব্যবসা থেকে কি ভাবে আজ আপনি লাখ-লাখ টাকার ব্যবসা ফেঁদেছেন। সুতরাং আমার অনুরোধ, দেশের মানুষকে ব্যবসায়ের সে ইঙ্গিত দয়া করে জানাবেন। আজ আপনি দেশের একজন খাঁটি ব্যবসায়ী। আপনার নাম দেশে কেন বিদেশেও পৌচেছে। নবীন ভারত গড়তে আপনাদের সাহায্য চাই—চাই আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে নবীন ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ে উদ্বুদ্ধ করতে। শুধু চাকরি নয়, ব্যবসা করেও যে মানুষ দেশকে তথা নবীন ভারতকে বঞ্চিত করবেন কেন? শিশু-রাষ্ট্র গড়তে কি আপনার কোন অবদান আশা করতে পারি না?'

'লেখা তেমন আসে না কিনা আমার।'

'কোন প্রয়োজন নেই! আপনি কি সাহিত্যিক যে আপনার কাছে কথাশিল্প আশা করবো? তবে দয়া করে একটু অবসর করে মাসে একদিন করে আমাদের প্রতিনিধির কাছে ধারাবাহিক ভাবে কিছু কিছু বলবেন; তিনি ঠিক গুছিয়ে লিখে নেবেন—মাসে ধারাবাহিক ভাবে বেরোবে কিনা কাগজে?'

বুঝলাম, আমার স্বরূপ ওরা আসল বলে বাজারে ছাড়বে। আমার অক্ষমতার কথা বুঝলেও সাধারণের কানে তুলতে রাজী নয় এরা। ভেজাল দিয়ে আমাকে হয়তো কোনদিন সাহিত্যিক বলে চালিয়ে দেবে সাহিত্যিক-দের আসরে কিংবা কোন সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতি বা প্রধান অতিথি হবার অনুরোধ জানাবে।

ভবিষ্যতের ভাবনা আমি তেমন ভাবি না। আজও ভাবলাম না। ক'লাইন বলতেই সম্পাদক মশাই 'নোট' করে নিয়ে সুখ্যাতি করে বললেন, 'আজ এই পর্যন্ত থাক্। বড় চমৎকার বললেন স্যর, কলম ধরলে আপনাকে পাকা সাহিত্যিক বলেই মনে হবে। আবার একমাস পর আমাদের পত্রিকার প্রতিনিধি এসে কিছুক্ষণের জন্য বিরক্ত করবে আপনাকে, আজ গৌরচন্দ্রিকা হয়ে থাক্। অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।' বলে তিনি ব্যাঙ্কের একখানা চেক টেবিলে রেখে বললেন, 'আপনার দক্ষিণা'!

দেখলাম একশো টাকার চেক।

কাগজ বের হতেই একখানা বিনামূল্যে পেলাম। পড়ে দেখলাম, আমি যা' বলিনি তারই বেশীর ভাগ। আমার আসল চাপা দিয়েছিলাম, নিজেকে জাহির করবার জন্যে, সম্পাদক মশাই সেটাকে আরও চাকচিক্য করতে গিয়ে আসলের অপমৃত্যু ঘটিয়েছেন।—আমি বুঝি রূপকথা রাজ্যের মানুষ।

দৈনিক পত্রিকা সংক্ষেপে একটা স্তম্ভ ছেপেছিলো, এরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গোটা ব্যবসায়ী জীবনী ছেপে আমাকে শুকতারার মত উজ্জ্বল করে তুলতে চায় ব্যবসায়ী

শুনতে চায়, হলোই বা তা' ভেজাল !

অর্থের কাঙাল ছিলাম আমি। যশ-মান চাইনি বা পাইনি জীবনে। তা'ও ভাগ্যের প্রসন্ন দৃষ্টিতে এসে গেল। লোকচোখে আমি হলাম আদর্শ ব্যবসায়ী। সুতরাং ব্যবসায়ী মহল আমাকে তাদের সমিতির একজন হোমড়া-চোমড়া সভ্য করে নিলেন এবং দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে আমাকে তাঁরা বিধান সভার সভ্য নির্বাচনের জন্য আগে ভাগে তৈরী থাকতে বললেন। আমি না-না করতেই তাঁরা জয়ঢাক বাজিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে দিলেন। আমি কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়লাম।

পারুল বললে, 'ক্ষতি কি ? এতে ব্যবসায়ে কোন ক্ষতি হবে না আর এরও প্রয়োজন আছে, যেহেতু রাজনৈতিক মহলে ঘনিষ্ঠতা তোমার নকল জীবনে রক্ষা কবচের ন্যায় কাজ করবে। তোমার আসলটা চেপে গিয়ে তোমার নকলের জয়গান প্রচারিত হবে। কে তোমার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর নিচ্ছে ? তুমি অমর্ত করতে পারবে না।'

মুকুল ধন্যবাদ দিলে পারুলকে, 'এ রকমটি না হলে সহধর্মিণী ! তুমি বুদ্ধিমতী। আজ তোমাকে একছড়া মুক্তার মালা উপহার দিচ্ছি—চলো গাড়ী নিয়ে বেড়িয়ে পড়ি।'

সাধারণ নির্বাচনের তোড়জোড় আরম্ভ হলো।

যারা কস্মিনকালে মুকুলের নাম জানত না, চিনত না, তাকে তারা টাকার জোরে বানিয়ে তার সাত পুরুষের নাম কতদিনের চেনাজানা, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তার অবদান ইত্যাদি সরবে প্রচার শুরু করলে। এবং সে-সঙ্গে ব্যবসায়ে বিরাট সাফল্যের কথা গগনভেদী চীৎকারে মুখরিত করে তুললে। পাড়ার লোকগুলো 'থ' বনে গেল। টেলি-ফোন ও সাক্ষাৎকারে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে, 'যা-হোক মশাই, এমনি করে গা-ঢাকা দিয়ে আছেন ? আপনি এত-বড় মানুষ, দেশের জন্য এতখানা করেছেন, সেকথা কি আমাদের জানতে দিতে নেই ? বহু পুণ্যফলে আমরা আপনার মত লোককে বিধান সভায় পাঠাতে পারবো আশা করছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার জন্য

সপ্রশংস দৃষ্টিতে আত্মপ্রচার সুখের, তার পেছনে যদি থাকে জয়ঢাক, সে হলো আরও তৃপ্তিকর। নিজেকে আর বিশেষ বেগ পেতে হয় না। আর এ না হলে নাম জাহিরও বৃথা হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, মুকুলের তখন ব্যবসায়ে তেমন দৃষ্টি দেবার সময় নেই। প্রাইভেট সেক্রেটারী, ম্যানেজার-দের ওপর সম্পূর্ণ ভার দিয়ে সে তখন লাটাইয়ের মত ওয়ার্ডের বিভিন্ন পার্ক ও ময়দানে নির্বাচনী বক্তৃতা দিচ্ছে। সভাপতি, প্রধান অতিথির স্থান অলঙ্কৃত করছেন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীর দেওয়াল, লাইট পোষ্ট, পথচারীদের ব্যবহার্য নর্দমা, রিক্স-ঘোড়াগাড়ীর পেছন, বড় বড় বৃক্ষের গুঁড়ি পর্যন্ত মুকুল সর্বাধিকারীর নির্বাচনে সাফল্যের জন্য লাল মোটা মোটা হরফের জাহ্ন সগৌরবে প্রচারের সাহায্য করছে। নির্বাচনে ব্যবহার্য গাড়ীগুলো এমনকি তার গাড়ীখানা পর্যন্ত যে কোন রঙের তা'ও সাধারণের বুঝবার উপায় নেই, আসল রঙ চাপা পড়ে গেছে পোষ্টারের অভব্য ব্যবহারে !

মনের ভেতরটা যার পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ, তার কাছে দৃষ্টিকটু বলে কিছু নেই। ওপরের চাকচিক্যই মনের মাপ-কাঠি বলে অনেকের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তারপর আছে মন কেড়ে নেবার জাদুমন্ত্র—ভাষার ইন্দ্রজাল। বাক্য বিন্যাসের অপূর্ব কৌশল। চাটুকারদের যথাস্থানে স্তব-স্তুতির চমৎকার প্রয়োগ।

ভোটারদের মন জয় করে ফেললে মুকুল। প্রমান তার ব্যালট বাক্সগুলো। ভোটপত্রে প্রায় ঠাসা। অবশ্য বিনিময়ে সে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। দেশ থেকে নাকি সে ভেজাল-দুর্নীতি ঝেঁটিয়ে দূর করে দিতে চেষ্টা করবে, তার আন্তরিক ইচ্ছা দেশোন্নয়নে আত্মনিয়োগ, তাতে ব্যবসায়ে কিছু ক্ষতি হলেও।

বিজ্ঞব্যক্তিদের কাছে এসব কথা ভূতের মুখে রাম নাম মনে হলেও মৃদুহেসে সাবাস দিলেন সর্বাধিকারীকে এবং আপনাপন মনোবাঞ্ছা পূরণের দাবি পেশ করে উৎসাহিত করলেন তাকে।

নির্বাচনী সফর এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় ও নির্বাচনে জেতবার জন্য ভাড়া করা মানুষদের পেছনে বেশ কিছু অর্থ ব্যয় সার্থক হলো সর্বাধিকারীর। বেতার ও সংবাদপত্র

(বারো)

এরপর সে কতখানি দেশের জন্যে আর কতখানি নিজের জন্য কাজ করেছে, সে-সবের হিসেব-নিকেশ কেউ করলে না বরং তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে লোকসভায় পাঠাবার দৃঢ় সংকল্প করলে। প্রথমটা 'না-না' করলে মুকুল। ব্যবসায়ে নাকি এসব সময় ব্যয়ে বেশ কিছু ক্ষতি হচ্ছে তার। অতএব সে আর লোকসভার সঙ্গে যুক্ত হতে চায় না। তবে ব্যক্তিগত ভাবে যতটুকু পারবে দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবার প্রতিশ্রুতি দিলে।

কিন্তু নাছোড়বান্দা স্তাবকেরা ছাড়লে না। বরং উঠে পড়ে লাগলো এবং তার আগামী জন্মদিনে সভা ডেকে এ-বিষয় নিয়ে আলোচনার দিন স্থির হলো।

সেদিন ছিলো মুকুলের জন্মদিন। কবে কোন অন্ধকার তুল্য ঘরে দারিদ্রের নামাবলি গায়ে জড়িয়ে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। কেউ জানে না। অথচ জন্মদিনের ঘটা পালন কেন সাড়ম্বরে হচ্ছে সেকথা জানতে হলে বিশিষ্ট নাগরিক-দের লোকসভা নির্বাচনের মুখে তার এমন একটা শুভ জন্মদিনের প্রারম্ভিক প্রস্তুতি নাকি অনেককে উৎসাহিত করবে তাই এ প্রকৃষ্ট পন্থার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, অবশ্য একথা ধুরন্ধর ব্যক্তি মাত্র জানেন।

মুকুল অনেক ভেবে চিন্তে জন্মদিনটা হিসেব করে বের করেছে। ছোটবেলায় তার মা বলতেন গল্পচ্ছলে,—

শ্রাবণ মাস।

আকাশ দু'দিন ধরে মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে। ঠাণ্ডার প্রকোপে চাষীরা পর্যন্ত ঘরের বাইরে যেতে পারছে না।—পৌষের শীত যেন ভুল করে শ্রাবণে এসে উপস্থিত হয়েছে। এমনিধারা এক সাতই শ্রাবণ মুকুলের জন্মদিন। যে ঘরটায় তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন, জলে ভেসে যাচ্ছে। গতবার কিভাবে যেন খড়ের গাদাটা পুড়ে গিয়েছিলো, সেজন্য আর ঘর ছাওয়ানো হয়নি। গরীবের মেয়ে ছোট থেকেই দারিদ্রের সঙ্গে সুপরিচিতা, তাই তাঁর সেসব কষ্ট কষ্ট বলেই মনে হচ্ছিলো না। তা' ছাড়া অধিক বয়সে মুকুলই তাঁর একমাত্র পুত্র-সন্তান। কত দেবতার কাছে মানত, সাধু-সন্ন্যাসীর কবচ ধারণ করেই তাঁর এ অভীষ্ট বস্তু সিদ্ধ হয়েছে সুতরাং মায়ের প্রাণে এসব কষ্টের কোন মালিন্যের ছায়াও স্পর্শ করেনি।

খুশী হলেন মুকুলের বাবা। সেদিনই মনে মনে ঈশ্বরের কাছে সন্তানের জন্য দীর্ঘ পরমায়ু, ধন-মান-যশের প্রার্থনা জানিয়ে নামকরণ করলেন 'মুকুল—'

মা আপত্তি করেছিলেন, 'ঠাকুর দেবতার এত নাম থাকতে মুকুল নাম রাখতে গেলে কেন?'

'গাছের কচি শাখার কোলে মুকুল দেখা দেয়, তারপর ধরে গুটি, এরপর ফল—' বুঝিয়ে বললেন তিনি স্ত্রীকে।

'মুকুল—আমার প্রাণের মুকুল—' সস্নেহে জড়িয়ে ধরে-ছিলেন সন্তানকে। বেঁচে থাক্, সুখী হোক, এ আশী-র্বাদও জানিয়েছিলেন মনেপ্রাণে। গরীবের পক্ষে ধনী হ'বার আশীর্বাদ কাজে লাগবে না ভেবে হয়তো আশীর্বাদ করতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলেন। তবু ডাগর ডাগর চোখ দুটোর দিকে চেয়ে মনে বোধহয় ভেবেছিলেন, 'এ ছেলে একদিন অতুল ঐশ্বর্যের মালিক হবে। কি মিষ্টি চেহারা।'

মায়ের অন্তরের আশীর্বাদে কার্পণ্য থাকে না। আশী-র্বাদে দোষ কি? দীর্ঘদিন পর পুত্রপ্রাপ্তি প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন ভগবান, এসব ভেবে মা ছেলেকে গভীর আবেগে বুকে টেনে নিলেন, গায়ে ঢাকা দিলেন তাঁর পরনের কাপড়ের ছিন্ন মলিন অঞ্চলটুকু। বক্ষ সংলগ্ন করে দেহের উত্তাপ দিয়ে শিশুকে রক্ষা করলেন ঠাণ্ডার হাত থেকে। আজ তাঁর মন খুশীতে ভরা।

প্যাণ্ডেল সাজানো হলো নামকরা শিল্পীদের দিয়ে। ভাড়াকরা ফটোগ্রাফার বিভিন্ন ভঙ্গীর ফটো নিচ্ছেন মুকুলের। সাংবাদিকরা যথা সময়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ না করার জন্য ধৈর্যচ্যুত। তাঁরা বহু পূর্বেই মুকুলের সংক্ষিপ্ত মুদ্রিত জীবনী হস্তগত করেছেন, বাকী মাত্র আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি, প্রধান অতিথি ও যাঁদের নাম সংবাদ-পত্রে না ছাপলে সংবাদপত্রের ওপর খড়্গহস্ত হন, তাঁদের নাম ও ভাষণের মামুলী সালসার সংক্ষিপ্ত রূপায়ণ নোট করা।

এক ঘণ্টা দেরি করে বেলা ন'টায় মাইক ঘোষণা করলে অনুষ্ঠান পরিচিতি।

আজও বেশ কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা মাইকের সাড়া পেলে হল্লা করে দেখতে যায়, কি হচ্ছে,—আবার

দু-চারখানা গান হলে রাজ্যের ভিখারীগুলো মনে করে কোন ভোজকাজ হচ্ছে। অবশ্য শেষোক্তদের পেটের জ্বালা নিবারণের জন্য আজকের এ অনুষ্ঠান নয়। কালোবাজারী টিকিয়ে রাখবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টাকারী মুকুল সর্বাধিকারীর পুণ্যময় দীর্ঘজীবন লাভের জন্য সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর ৺ভগবৎ সমীপে সশ্রদ্ধ প্রার্থনা ও লোকসভার প্রার্থী হিসাবে সর্ব সম্মুখে উপস্থাপিত করা। যারা এ সবের হোতা তারা এরকম একজন মুরুব্বী পেয়ে ধন্য। তার ওপর ভুঁড়ি-ভোজন, নির্বাচনী দাঁও—সেসব তো আছেই।

যা' হোক অনুষ্ঠান পরিচিতির পর উদ্বোধন সঙ্গীতের ধাক্কায় বেশ কিছু বাজে লোক গণ্ডির বাইরে দাঁড়িয়েছে তখন। হাড় হাভাতে, অর্ধ উলঙ্গ ভিখারীগুলো এঁটো পাতা চাটবার তালে নির্লজ্জের মত এসে প্রহর গুনতে শুরু করেছে—তারা জন্মদিনের অর্থ বোঝে না,—জন্ম থেকে শুধু পেটের জ্বালা বুঝতে আর হ্যাংলার মত এঁটো পাতা চাটতে শিখেছে।

এ হেন অনুষ্ঠানে অদূরে হ্যাংলাগুলোকে দেখে কেমন যেন দৃষ্টিকটু মনে হলো মুকুলের। অবশ্য সে মুখে কিছু বলতে পারলে না জন্মদিনের প্রফুল্ল ভাব বজায় রাখবার জন্যে। পারুল অতিথি অভ্যাগতদের আদর আপ্যায়ন করছিলো প্যাণ্ডেলের ওপর সুশোভিত কার্পেটের ওপর মখমলের জুতো পায়ে দিয়ে। আজ তার বেশবাস স্বর্গের ইন্দ্রাণীকেও হার মানিয়েছে। স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরে কাছে গিয়ে কানে কানে বলে, 'শুধু একটা দিন সহ্য করতে পারবে না—থাকলোই-বা দাঁড়িয়ে?'

মুকুল সম্মতি দিলে। জানি না আর কেউ সেসময় হ্যাংলাগুলোকে দেখে লজ্জায় অধোবদন হয়েছিল কিনা। তবে ধৈর্য ধরে লজ্জার মাথা না খেলে নাকি এরকম অনুষ্ঠানে যোগদান অসম্ভব!—ধৈর্যের জয় হোক!

কোন একজন বিশিষ্ট মন্ত্রীর সভাপতিত্বের কথা ছিল আজকের এ অনুষ্ঠানে। তিনি ঘণ্টাখানেক আগে অসুস্থতার কথা জানিয়েছেন, তবে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন দ্রুতকণ্ঠে। অগত্যা কর্পোরেশনের একজন হোমড়া-চোমড়া কাউন্সিলারকে সভাপতি করা হলো।—প্রধান অতিথি অবশ্য যথাসময়ে পৌঁছেছিলেন। অপ্রধানরা দিব্য প্রফুল্ল বদনে স্ব-স্ব আসনে, কেউবা জায়গা না পেয়েও নিজগুণে গুণান্বিতের নমুনা স্বরূপ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন অধৈর্য না হয়ে।

সভার কাজ আরম্ভ হলো।

রকমারী ফুলের মালা, শ্বেত চন্দন, ধান-দূর্বা, ধূপ-দীপ, শঙ্খধ্বনির আয়োজন পূর্ব থেকেই ছিলো—সেসবের সদ্ব্যবহার হলো ধুরন্ধর মানুষদের দিয়ে।

পূর্ব-প্রস্তুতি ও নির্দেশ অনুযায়ী ক'জন মুকুল সর্বাধিকারী-ভক্ত বক্তা গুণগানে মুখর হয়ে উঠলেন। কেউ কেউ দাতাকর্ণের সঙ্গে তাঁর তুলনা করে, দেশের ক'জন মহামানবের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে দেশের কল্যাণের জন্য তাঁর দীর্ঘ পরমায়ু লাভের জন্য প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা জানালেন গদ্গদ ভাষায়। মাঝে মাঝে স্তাবকদের গগনভেদী করতালিতে পার্কের ক'টা পাখী ভয়ার্ত হয়ে উড়তে লাগলো। বুঝিবা প্রশংসা সহ্য করতে না পেরে!

কেউ জানতে পারলে না, গণ্ডির বাইরে এক কঙ্কালসার সন্তানের জননী শীর্ণ হাতের স্নেহ স্পর্শে নামকরা সর্বাধিকারীর দীর্ঘায়ু প্রার্থনারত বিভিন্ন বক্তার সুরে সুর মিলিয়ে তার সন্তানকে আজকের দিনে আশীর্বাদ জানালে অন্তর মথিত অশ্রুজলের সাথে।

বেশ মনে আছে হতভাগা জননীর, আজ থেকে ঠিক সাত বছর আগে এমনি দিনে এ ছেলেটি জন্মেছিলো। সেদিন তারা অন্য এক শহরে ছিলো। জ্যোৎস্না ধারায় পৃথিবী যখন হাসছে ঘোমটা ঢাকা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে —বসতিহীন শহরের শেষপ্রান্তে একটি গাছের নীচে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো। ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়া জড়িয়ে শিশুকে কোলে তুলে নিলে নিরাশ্রয়া জননী।—একটি পারিজাত ফুলের সৌরভ যেন তার মনপ্রাণকে আকৃষ্ট করে তুলেছে তখন। সদ্য প্রসূতির কোন কষ্ট কষ্ট বলেই বোধ হচ্ছে না তখন। চোখ-মুখে তার আনন্দের ছাপ, অন্তরে জ্যোৎস্না ধারার প্লাবন।

গরুর দুধ নেই, হরলিক্‌স নেই, প্রসূতি বা শিশুর পরিচর্যা করবারও কেউ নেই। আছে শুধু মাথার ওপর খোলা আকাশ, বিধাতার অকৃপণ আশীর্বাদ আর ক্ষীণাকার মাতৃস্তন। স্তন থেকে ক্ষরিত দুধ শিশুর মুখে যাচ্ছে, চুকচুক করে টানছে, মিটমিট চাইছে আর মাঝে মাঝে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদছে। জানতে পারছে না সে,

কোথায় এলো, জীবনটা তার পৃথিবীর কোন্ কাজে লাগবে! সবচেয়ে বড় সমস্যা ক্ষুধার অন্ন কি ভাবে জুটবে?

শিশুর পিতা ধারে পাশে ছিলো। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে বৃক্ষতলে মাতৃঅঙ্কে শায়িত শিশুর মুখ দেখলে। চোয়াল বসা গাল দুটো আনন্দে ফুলে উঠলো কিনা বুঝা গেল না, শুধু বিড়বিড় করে বললে, 'ভগবান, ভিক্ষুক-কুলকে বাঁচিয়ে রাখতে তোমার এত দয়া কেন?'

ভগবান শুনলেন কিনা জানি না, কিন্তু তার কিছুদিন পর নানা কারণে শিশুর পিতা তাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে কোথায় যেন চলে গেল।

গর্ভধারিণী মায়ের স্নেহ নাকি অকৃপণ। তাই সে শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। ভিক্ষা করে যেদিন যা' জোটে দুজনে ভাগ করে খায়। কখনো কোলে, কখনো পিঠে নিয়ে পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়ায়। ফেলে পালাবার কল্পনাও করতে পারে না।—সবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিশু ক্রমশঃ দিন-মাস-বৎসর অতিক্রম করে বড় হতে থাকে। তবে তাকে পাঠশালা যেতে হয় না, উলঙ্গ হয়ে থাকার জন্যে কেউ তিরস্কার করে না, বাসী-পচা, এঁটো পাতা চাটার জন্যেও কেউ অসুখ-বিসুখ হবার ভয় দেখায় না—অর্থাৎ গুরুগিরির তাড়না থেকে সে নিশ্চিন্ত।

সে এখন রপ্ত করতে শিখেছে, কেমন করে সানুনয় কণ্ঠে পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। ভোজ কাজের নিদর্শন মাইক কেমন সুরে বাজে, ভোক্তার চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় প্রসাদী ডাষ্টবিন নামক গহ্বর থেকে তাদের সমগোত্রীয় কুকুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি বা সন্ধি স্থাপন করে খেতে হয় বা সুযোগ পেলে আগে ভাগে জেতার আনন্দেও তাদের ঠকানোর আনন্দে বেকুবের মত হাসতে হয়।

সর্বাধিকারীর ন্যায় নামজাদা মানুষের সঙ্গে নরকের এক অপদার্থ শিশুর জন্মদিন পালন বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। তবে মানুষের মনের কথা কেউ বুঝতে পারে না, এই যা' সুবিধা!

জন্মদিন পালন ও নির্বাচনী আলোচনা সভাতে বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হলো। এক নজরে—সর্বাধিকারীর জয় যে অনিবার্য তাতে কারও নাকি বিন্দুমাত্র সন্দেহও রইলো না।

এরপর সমাধা হলো ভোজনপর্ব। তার পরেই ভুক্তাবশেষ সহ পাতাগুলো শিলাবৃষ্টির ন্যায় ডাষ্টবিনে পড়তে লাগল ঝপঝপ করে।

শিশুর লালসা কাতর চোখের দৃষ্টি দেখে একটু ফাঁক পেয়ে তার মা যায় পরিবেশনকারীদের কাছে কিছু খাবার সংগ্রহের জন্য। ভোজপুরী দারোয়ানের শ্যেনদৃষ্টি এড়ায় না। ছুটে আসে লাঠি হাতে, 'নিকালো হিঁয়াসে—'

শিশু বায়না ধরে, 'চলো মা, আজকালকার কুকুরগুলো বড় পাজী, আগে ভাগে গিয়ে খেয়োখেয়ি করে, কিছুতেই আমাদের খেতে দেবে না। তাড়াতাড়ি চলো না!'

শিশুকে বুঝিয়ে বলতে পারে না মা, আজ তার জন্মদিনে সে তাকে কিছু খাবার উপহার দেবে।—মনে কি থাকে ছাই সেসব! তাদের আবার জন্মদিন!

মুকুল স্থির থাকতে পারে না আর ভিখারীদের অসভ্যতা দেখে। প্যাণ্ডেল থেকে বজ্রকণ্ঠে নির্দেশ দেয়, 'দূর করে দে জানোয়ারের দলটাকে—ওদের জ্বালাতে এঁদের মান-সম্মান রাখা দায় হলো দেখছি। সব এসে ভিড় জমিয়েছে খাই-খাই করে। হুঁ, যত অপদার্থ আর অপগণ্ডদের জ্বালাতে দেশটা ছেয়ে গেল, দেখছি!'

প্রধান অতিথি তখন চেয়ারে বসে সিগারেট টানছেন। মুকুলের কথা শেষ হতেই তার কথায় সায় দেন, 'সাঁচ্চা বাত বলেছেন, সর্বাধিকারী—ওদের জন্যেই দেশটা উৎসন্নে যেতে বসেছে। আমার হাতে যদি 'পাওয়ার' থাকতো ওদের গুলি করে মারতে হুকুম দিতাম।

সভাপতি বলেন, 'শহর থেকে ভিখারীগুলোকে তাড়াবার কি কোন আইন নেই মুকুলবাবু? আগামী সিটিং-এ এ নিয়ে একটা আইন পাশ করানো যায় না?'

উপায়ন্তর বিহীন মা অদূরে দাঁড়িয়ে কাতর মনে ভাবে, সত্যই কি আমরা এ-পৃথিবীতে জন্মাবার মত জন্মেছি যে পৃথিবীর মানুষের অন্নে ভাগ বসাবো!

ছেলেটা মায়ের কাপড় ধরে টানাটানি করে।

আপন মনেই বিড়বিড় করে মা, 'হতভাগার জন্মদিনে যদি প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করতে হয়, আমি প্রাণ খুলেই বলবো, আজ তোর মৃত্যুদিন পালনই আমার কাম্য—কিন্তু আমি মা হয়ে তা' বলতে পারব না—পারব না।'

দারোয়ান লাঠি নিয়ে ছুটে আসে।

ওরা তখন মান-অপমান, লাঠির আঘাত তুচ্ছ করে পেটের দায়ে ডাষ্টবিনের পাশে কুকুরগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। গাড়ীগুলো হর্ণ বাজাতে বাজাতে বেড়িয়ে যায়। মাইকে বাজছে তখন—"সার্থক জনম আমার—"

সবার অজান্তে কিন্তু ঐ মাতৃ-হৃদয় কাঁদছে অন্তরের নিভৃত কক্ষে। তবে পেটের জ্বালায় শোক দুঃখ চাপা দিয়ে কুকুর আর সহধর্মীদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ছাড়া উপায় কি তাদের? জন্ম থেকে এই তো করে আসছে তারা। ভিখারী জীবন কিভাবে কখন থেকে তার পূর্বপুরুষরা শুরু করেছে ভাবতেও পারে না। ভাবে এই বুঝি তাদের পেশা। সমাজচ্যুত ছিন্নমূল মানব সমাজের কাছে কবে থেকে যে উল্কা পিণ্ডের মত এরা ছিটকে পড়েছে এবং কি-ভাবে ভিখারীর সৃষ্টি সে আদিসূত্র আবিষ্কারও সহজ সাধ্য নয়। অথচ দিনের দিন তাদের সংখ্যা বাড়ছে। লালসা-কাতর মন কিন্তু ভিখারী জীবনকে মনে প্রাণে সমর্পণ করে না। পারুল সর্বাধিকারীর মত সাজ পোশাক তাদের মনেও বার বার খোঁচা দেয়। কিন্তু তা' পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়—মানব-সমাজে মনুষ্যত্বের মহিমা জানাবার মত মনের পাঠশালা না খোলা পর্যন্ত।

(তেরো)

জানলাটা খুলে বাইরের দিকে একবার কি যেন দেখলে মুকুল। ঘণ্টা দেড়েক দেরি আছে প্রভাত হতে। অস্পষ্ট কুয়াশা নিবিড় ভাবে ভোরের আলোর টুঁটি টিপে ধরেছে। যেমন করে আজ 'এনফোর্সমেণ্ট' বিভাগ তার টুঁটি টিপে ধরবার জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার যেমন চিহ্ন থাকে না, তেমনি তার সে অনাগত বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার পথ পরিষ্কার হয়ে আছে। সব নির্ভুল—ফাঁকিকে ফাঁকি দেবার ফন্দি ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মত স্বচ্ছ? আজকের অভিজাত জীবনে এই বুঝি পরমার্থ —ফাঁক আর ফাঁকি জানাই জীবনের মূলমন্ত্র। মনে মনে হাসলো সে—বিচিত্র ক্ষুরধার সে হাসি।

ধরালে দেশলাই কাঠি জেলে একটা চুরুট। বারকয়েক পায়চারি করলে পারুলের সামনে দিয়ে। ঘুম নেই চোখে, জড়িয়ে আসছে না চোখ দুটো এত রাত জেগেও। জড়িয়ে আসছে বুঝি জিহ্বা আর পূর্বস্মৃতি। না-না, শেষ করতে হবে কথাগুলো, পারুলকে জানাতে হবে সব কথা। ভাল ভাবে বোঝে না, জানে না তাই তার বিপন্ন অবস্থাতেও ঘুমুবার আবেদন জানালে ছেলেমানুষের মত, জানতে চাইলে না তার উদ্বিগ্ন মনের অবস্থা। তার মুখ চোখেও লক্ষ্য করা গেল না এতটুকু বিষন্ন ভাব। সে যেন তার কেউ নয়, শুধু সুখভোগের সঙ্গিনী। কিন্তু কে তাকে দিয়েছে সে অধিকার? কে এ অতুল ঐশ্বর্যের ভোগলালসা বাড়িয়ে দিয়েছে? বিশেষ সুখ সংবাদে সে তাকে আনন্দ সহকারে দিয়েছে কত মূল্যবান পুরস্কার। তুচ্ছ দোষ ত্রুটি তো উপেক্ষা করে আসছে বহুদিন থেকেই।

গলগল করে একটা বোতল গলায় ঢেলে দিয়ে খালিয়ে নিলে গলাটা। মনটাকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে। এত-টুকু খাতির করে তাকে কথা বলবে না। পূর্বস্মৃতি রোমন্থনের জন্য চুপচাপ বসে পড়লো একটা চেয়ারে। তলিয়ে ভাবতে লাগলো মুকুল— বিগত দিনের কথা।

দুঃখে অধৈর্য হয়ে উঠেছে পারুল। তার নিদ্রাও ছুটে গেছে অনেকক্ষণ। যেন মুকুল তাকে চাবকে খাড়া রেখেছে। এমন ভাবে আজ তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে এতকথা শুনতে হবে ভাবতে পারেনি কোনদিন। এখানে এসে থেকে শুধু পেয়েছে আবরণ আর আভরণ, সত্যকার শান্তি সুখ তেমন কিছু পায়নি বলেই বোধ হয়। তবু রামগোপাল তাকে 'মা' বলতে অজ্ঞান, সর্বদা রয়েছে তার স্নেহধারার একটা উন্মাদনা, তাতেই সে সবকিছু ভুলে আছে। কিন্তু আজকাল তা'ও যেন উবে যাবার উপক্রম। যা' সে শুনেছে রামগোপালের সম্বন্ধে তার ভবিষ্যৎ পরিণতি ভেবে ভীষণ ভয় হয়।

পারুল কথাটা শোনবামাত্র মুকুলের কানে তুলতে দেরি করেনি। বড়লোকের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। বলতে গিয়ে অপদস্থই হতে হয়েছিলো তাকে সেদিন, একটা কড়া ধমকও উপরি পাওনা হয়েছিলো তার।

'কি যা' তা' বাজে কথা বলছো পারুল? আমি বিশ্বাস করি না—তা'ছাড়া একথা যদি সত্যই হয়, উতলা হবার কোন কারণ নেই।'

'কি বলছো তুমি?—ছেলে কলেজ লাইফেই মদ শুরু করবে, সেই সঙ্গে অন্যান্য আনুষঙ্গিক দোষে জীবনটা কলুষিত করবে আর তুমি আমি তা' জেনে শুনেও ছেলে-

টাকে সংশোধনের চেষ্টা করব না ?'

'না—সে গেঁয়ো জীবন যাপন পাড়াগাঁয়ে চলতে পারে, এখানে নয়। আমাদের মত স্ট্যাণ্ডার্ডের ঘরে ওরকম দু'একটা ছেলে বয়ে যায় তাতে কোন ক্ষতি হয় না এমন—যদি কাজের করে নিতে পারা যায়। ওকে আমি ঠিক কাজের করে নিচ্ছি দেখ্‌না ?—তখন এমন নেশায় ধরবে, যে—'

'শোন—' আরও কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায় পারুল। 'আমাদের দু-চারটে নয়, একমাত্র ছেলে—তা'ও আবার—'

'থাক সে কথা—'

'কিন্তু তাকে যদি সময় থাকতে সাবধান না করো, ও শেষে আমাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে—'

'না পারে না। এত অতুল ঐশ্বর্য বিরাট অট্টালিকা ফেলে বাছাধন কোথাও যেতে পারে না। তা' ছাড়া সে যে সব মহলে মেলামেশা করে, যা নিয়ে কারবার করে, তাতে অঢেল পয়সার দরকার। পাবে কোথায় ?'

ছেলেটা বুদ্ধিমান। এত অল্প বয়সে বি. কম. পাশের নজীর বিশ্ববিদ্যালয়ে বোধহয় খুব কমই আছে। উপযুক্ত জলসেচের ফলে ফসল বেড়েছে মনের আনন্দে; কে তার পিতামাতা, কোথায় তার জন্ম সে-সবের তোয়াক্কা বা নীতির হিসাবে ধরা না দিয়ে। ছেলেটা ভাগ্যবান বই কি! তা' না হলে সেদিন তার সামনে ওভাবে হঠাৎ পড়বে কেন—অমন কত শিশুই তো পথে পড়ে থাকে। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে সে তাকে অনেকখানি নির্ভর করতে পারবে, ওসব সামান্য দোষ ত্রুটি নিয়ে নিজেকে আর ব্যতিব্যস্ত করতে চায় না।

কিছুদিন আগের কথা। রামগোপালের কলেজ লাইফের বিশিষ্ট বান্ধবী লীলার বাবা হঠাৎ একদিন তাকে টেলিফোন করেন, তিনি তাঁর মেয়ের সঙ্গে রামগোপালের বিয়ে দিতে আগ্রহী। সম্মতি পেলে পাকা কথাবার্তা বলে সামনের ফাল্গুনে বিয়ে দেবেন।

মেয়েটির সঙ্গে রামগোপালের ঘনিষ্ঠতার কথা জানতো

মুকুল। একবার পারুল মারফত তার মতটা জেনে নিয়ে ছেলের পছন্দ মত মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে দিয়ে দিলেন ধুমধাম সহকারে।

লীনা বুদ্ধিমতী। স্বামীর দোষ ত্রুটি সংশোধন করতে চাইলে গোপনে কত সাধ্য সাধনা করে। রামগোপাল এক-গুঁয়ে। কোন কথা শুনতে চাইলে না লীনার। শেষে কথাটা তার মা-বাবার কানে গেল। ব্যারিষ্টার সাহেব বেহাইয়ের সম্মতি নিয়ে একটা মিথ্যে 'ডিভোর্স কেস' শুরু করে দিলেন অনন্যোপায় হয়ে।

প্রথমটা না-না করেছিলো মুকুল। শেষে বেহাইয়ের পরামর্শ না মেনে উপায় ছিল না। 'দেখুন, আপনি বিরাট ঐশ্বর্যের মালিক, আপনার জীবদ্দশায় সেসব তছনছ না হতে পারে কিন্তু আপনার অবর্তমানে বাবাজী যথেচ্ছাচারিতার ফলে হয়তো একদিন পথের ভিখারীও হতে পারে। তখন? বরং সময় থাকতে সাবধান....অবশ্য সবই আপনার মতামতের ওপর নির্ভর করে। কেউ জানবে না, এটা মিথ্যা 'কেস'। যদিও জানি, আপনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন তাকে সংশোধন করবার কিন্তু কতটুকু সে শুধরেছে? আমার একমাত্র মেয়ে, বেহাই মশাই তার প্রাণে কোন ব্যথা আমরা সইতে পারব না। যদিও আমি আইনজীবি তথাপি 'ডিভোর্স কেস' করে মেয়ের দ্বিতীয় বিবাহ প্রাণ থাকতে দিতে পারব না। না-না, এ আইন—কেন জানি না, আমার মনঃপূত নয়। সে আমার ধাতে সইবে না। তা' ছাড়া আপনি আর একটা দিক ভাবুন, আপনার শুধু ব্যবসা নয়, রাজনীতিতেও যথেষ্ঠ সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। এই ধরুন না সভা-সমিতি লেগেই রয়েছে মাঝে মাঝে, তারপর লোকসভার অধিবেশনে বেশ কটা দিন ব্যয় হচ্ছে—তাতে আপনার ব্যবসায়ে ক্ষতি হচ্ছে কিনা? কিন্তু বাবাজী যদি এ দিকটায় ভাল নজর দেয়, আপনি অনেকখানি নিশ্চিন্ত হতে পারেন, এ ছাড়া আপনারও ত বয়েস হচ্ছে, ছোট থেকে নাকি অমানুষিক পরিশ্রম করে আসছেন—শরীর বলেও ত একটা কথা আছে।

পারুল কাছে বসেছিলো। সব শুনে একটা উত্তর দেবার জন্যে উসখুস করছিলো অনেকক্ষণ থেকে, তবে মুকুলের মুখে কোন উত্তর না শুনে কিছু বলতে পারছিলো উচিত। তার বাবা কতটুকু ছেলের সম্বন্ধে খোঁজ রাখে? বাড়ীতে ঘুমুবার সময়টুকু ছাড়া বাকী সময়টা তো বাইরে বাইরে কাটে তার। বাড়ী ফিরতে এক একদিন রাত বারটা-একটা বেজে যায়।

খাবার দিতে গিয়ে পারুল কতদিন ছেলের মুখে মদের গন্ধ পেয়েছে। এক একদিন না খেয়েই শুয়ে পড়েছে শরীর ভাল নেই অজুহাত দেখিয়ে। কিন্তু সে বুঝতে পেরেছে, কেন সে খেলে না, কেন অত রাত করে বাড়ী ফেরে। বলেও ফেলেছিলো একদিন সহ্য করতে না পেরে, 'গোপাল তুই মদ খাস্'?

ভীষণ চালাক রামগোপাল। জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'আজ কিছুতেই বন্ধুরা ছাড়লে না, মা। আমি যত বলি, খাব না—তারা কিছুতেই ছাড়বে না। তাই এক গেলাস—'

'ওসব খেতে নেই বাবা, আর কখনো খেও না', বাবা! কেমন'?

'না—আর কিছুতেই নয়'!

গোপাল কথা শোনেনি পারুলের। আবার খেয়েছে কতদিন। বার বার সে বন্ধুদের মাথায় সব দোষ চাপিয়ে দিয়েছে অম্লান বদনে। শেষে পারুল ওরকম প্রকৃতির বন্ধুদের সাথে মিশতে নিষেধ করে দিয়েছে তাকে।

গোপাল জিভ কেটেছে সলজ্জ ভাবে, 'কি বলছো মা? বন্ধুরা কি আমার যে সে ঘরের ছেলে? সব আমাদের মত ঘরের, কেউ কেউ আরও বড় ঘরের! ব্যারিষ্টার উমেশ ভট্টচায্যির নাম শুনেছো? তাঁর মেয়ে লীনা, বড় ভাল মেয়ে। মদ খায় না বটে কিন্তু আমাদের সঙ্গে মিশতে তার সম্ভ্রমে এতটুকু বাধে না। তারপর বিশ্বাস আইরন্ ফ্যাক্টরীর মালিক ত্রিদিববাবুর মেয়ে দোলনচাঁপা, সে তো একদিন ক্লাবে না গেলেই কৈফিয়ত চাইবে—না-না ওদের সঙ্গ আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারব না।—এ সব কি বলছো, মা'।

হাতের বাইরে ছেলে চলে গেছে। তাকে আর গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখা সম্ভব নয় তাই স্বামীকে এসব কথা জানিয়েছিলো পারুল। সেসময় সংশোধনের চেষ্টা করলে হয়তো ছেলেটা এতখানা বাড়াবাড়ি করতো না। আজ-কাল তো সব দিন বাড়ীই ফেরে না। সকালে উঠেই নগদ

সকালের দিকে ঘণ্টা তিনেক ব্যবসা দেখে তারপর খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে। কোথায় যায়, কেন যায়, কখন বাড়ী ফেরে সে কথা নাকি জানে না মুকুল। তাই সুবোধ বালকই মনে করে ছেলেকে। কিছুদিন আগে বাড়াবাড়ির কথা শুনে কেবলমাত্র গোপালকে ডেকে বলেছিলো, 'গোপাল, এমন কোন কাজ করবে না তুমি, যাতে আমার মান মর্যাদায় আঘাত পায়।'

গোপাল নতমুখে বলেছিলো, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সেরকম কোন কাজ করবো না, বাবা।'

'আমি নিশ্চিন্ত তবে মাঝে মাঝে কথাটা কানে আসে কিনা।'

'বাজে কথা, আপনি বিশ্বাস করবেন না।' গোপাল বেড়িয়ে গিয়েছিলো ঘর থেকে মিথ্যে কথা বলে। একটুও দুঃখ পায় নি—এ বুঝি তাদের মত ঘরের ছেলেদের একটা সাধারণ নেশা। এ না হলে বের হবে কি করে ঘরের বাইরে? বন্ধুরাই-বা তাকে পিঠ চাপড়ে সাবাস দেবে কেন? মোসাহেবের দল ঘিরে থাকবেই-বা কোন উল্লাসে?

পারুলের দিকে চেয়ে এবার মুকুল বলে, 'তুমি কি বলো? বেহাই মশাই যা' বললেন, তা' করা কি ঠিক হচ্ছে?—গোপালকে বরং আর একবার বুঝিয়ে বললে হতো না'?

'গোপাল তোমার নাগালের বাইরে। বেহাই মশাই যা' বললেন, তা' করলে বরং ছেলেটার পরকাল ভাল হবে। তা' ছাড়া যা' করা হচ্ছে, সে তো নকল—যদি এরকম ব্যাপার দেখে সে লজ্জিত হয়, তখন না হয়—'

বুকের কাছে কেমন যেন ব্যথা অনুভব করে মুকুল। 'হ্যাঁ, ঠিক কথা বলেছো, নকল—নকল 'কেস'! মুকুল সর্বাধিকারী এ-জগতে নকলের কারবারে সিদ্ধ হস্ত, সব নকল—নকলে নিকষকুলীন হয়ে গেছে! তাই করুন বেহাই মশাই, সেই ভাল। সবদিক ভেবে চিন্তে যা' ভাল হয় করুন, আমি এ নিয়ে আর ভাবতে পারছি না। কাল সকালেই দিল্লী যেতে হবে, তারপর আমার অনেক কাজ—আমার সব নকলকে আসলে পরিণত করতে হবে। প্রমাণ আমার হিসেব-নিকেশ লেনদেন আসল সাজে সজ্জিত। অঙ্কে এতটুকু খুঁত নেই, অর্থাৎ ধুলো দিতে হবে, এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের কর্তাদের।'

'হুঁ, এও এক মস্ত বড় ঝামেলা।'

অট্টহাসি হেসে মুকুল বলেন, 'কিন্তু তারা জানে না, আমি ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তাদের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করতে করতে নিজে ধূলিসাৎ হয়ে যাবো তবু ধরা দেবো না। না—না এ অহঙ্কারের কথা নয়, আমাকে ধরা সোজা কথা নয়। ধরলে ধরা পড়তাম বহু আগেই।'

বেহাইয়ের সম্মতি নিয়ে চলে যান উমেশবাবু।

(চোদ্দ)

লোকসভা অধিবেশনে গিয়ে শান্তি পায় না মুকুল। ভারত সরকার ব্লাক-মানি উদ্ধারের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। কালোবাজারী বন্ধ করতে হবে। দেশের ব্যবসায়ী, ধনী সম্প্রদায় টলটলায় মান। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। কিভাবে যক্ষের মত সে ধন বেঁধে রাখা যায় সে উপায় খুঁজতে দৌড়াদৌড়ি করেন আইনজ্ঞদের কাছে। নিজেদের কৌশল চূড়ান্ত বলে বিশ্বাস হয় না। বেশ কজন বড় বড় ব্যবসায়ী ইতিমধ্যে ধরা পড়ে গেছেন।

অধিবেশন শেষে বিষণ্ণ মনে কলকাতায় ফেরে মুকুল। দুঃসংবাদের একটা কিনারা করা চাই। এনফোর্সমেণ্ট তো লেগেই রয়েছে পেছনে।

তিন মাস পর আজ রাতে সব কিছু হিসাব-নিকাশ তাঁর মতে নির্ভুল এবং ধরা ছোঁয়ার বাইরে বলে দৃঢ় বিশ্বাস হলো। কিন্তু যাকে সে স্ত্রী বলে সেদিন বালীগঞ্জের লেকে গ্রহণ করেছে, সে আজ এতবড় বিপদের কথা জেনেও নির্বাক। জানে না সে যদি তাকে ধরতে পারে এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ, বেশ কিছুদিন জেলে পচে মরতে হবে। তার সমগ্র বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করেও ছাড়ানো যাবে না। সরকারের কঠোর মনোভাব। জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট ঘোচাতে বদ্ধপরিকর। মুষ্টিমেয়র হাতে অতুল ঐশ্বর্যের দ্বারা কোন সুফল হয় না। তাতে দেশের উন্নতির পথে যে বিরাট অন্তরায় তা' আজ কে না জানে? প্রতিদিন

যায়। বেশ বুঝতে পারে মুকুল, সেও তো সেরকম দুর্নীতির অভিযোগে যে কোন মুহূর্তে অভিযুক্ত হতে পারে, তখন ?

দেশের মানুষ আজ ক্ষুধার অন্ন, রোগে ওষুধ, পরনের বস্ত্র, শিক্ষা চায়। তারা মানুষ হতে চায়। এসব যদি না মেলে প্রয়োজন মত, স্বাধীনতার অর্থ কি ? স্বাধীন চিন্তাধারার অবসর কোথায় ? জ্ঞান-বিজ্ঞান কি ভাবে প্রস্ফুটিত হবে এসবের জ্বালায় মানুষ অহরহ জ্বললে ? কিন্তু যারা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে তাদের অখাদ্য-কুখাদ্য, কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে মুনাফা লুটছে সমাজের নিম্ন-মধ্য স্তর থেকে তারা কি তাদের অতি লাভের লালসার স্বার্থে এদের জীবন ধারণের মান নিম্নস্তরে পৌঁছে দেবার জন্য দায়ী নয় ?

মানুষের মত বাঁচতে চায় জনগণ। ভবিতব্যের নামে অপবাদ দিতে নারাজ, মনুষ্যত্বের দাবি নিয়ে তারা আজ জাগ্রত। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ আজ প্রয়োজন, পরলোভী রাজ্যের লেলিহান শিখার মোকাবিলা এই সাধারণ মানুষই করবে, সুতরাং দেশের অভ্যন্তরে তাদের দাবি না মিটালে হীনবল হয়ে পড়বে দেশ—দেশোন্নয়নে প্রচুর বাধার সৃষ্টি হবে।

প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পেতে চায় মানুষ। বিস্বাদে ভরে গেছে তাদের মন। এতদিন অদৃষ্ট বলে মেনে এসেছে সব কিছু নির্বিবাদে। অথচ এখনও অধিকাংশ লোক, যারা মরতে বসেছে তারাই ভেবে মরে এটা পাপ ওটা পুণ্য। না খেয়ে শুকাবে কই মাছের মত, তবু নির্জীবের মত—ক্লীবের মত ঘুমাবে অদৃষ্ট আর পরকালের দোহাই মেনে। ভবিষ্যতে ভাল হবে, পরকালে সুখী হবে—এসব বদ্ধমূল ধারণায়। বর্তমান রইলো যার নির্জীব, ভবিষ্যৎ হবে প্রাণবন্ত! অদ্ভুত ধারণা! মনের নিষ্ক্রিয় বিস্ময়-কর মাপকাঠি। না খেয়ে এরা ধনীদের খয়রাত দিচ্ছে সজ্ঞানে-অজ্ঞানে!

জনগণের মনে আজ তাই স্বতঃই উদিত হয় কিসে আমাদের কল্যাণ!

"মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।"

অধিকাংশ মানুষ শান্তিপ্রিয়। শান্তিই কাম্য তাদের। অসাধু ব্যবসায়ী, গোপন কারবারের ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাই আজ দেশের মানুষের অতি সাধারণ বিদ্রোহ। তারা বাঁচতে চায় বাঁচার মত। টাকা কাল নয়—টাকার রং লাল। পয়সা থেকে টাকা—সব লাল। ধনীর সিন্দুকে জমে তাজা রক্ত আর লাল নেই, জমে বিবর্ণ হয়ে গেছে লজ্জায়!

সরবে চীৎকার করে ওঠে মুকুল। 'টাকার রং লাল—কাল নয়—লাল—লাল—লাল—'

ভয় পেয়ে যায় পারুল। ভীত দৃষ্টিতে তার দিকে চায়। কথা বলতে পারে না। বলবে কি, তাকে যেভাবে আজ অপমান করতে আরম্ভ করেছে, প্রত্যুত্তর করলেই ত রীতিমত একটা দক্ষযজ্ঞ বেধে যাবে।

'টাকা কাল নয়—লাল। আমি বলছি, লাল। তাজা রক্ত জমে কাল হয়ে গেছে মুষ্টিমেয়র অবৈধ আওতায় এসে।'

পারুল উঠে দাঁড়ায়। ফের তাকায় মুকুলের দিকে। সে ভয়ার্ত দৃষ্টি তাকে রীতিমত বিচলিত করে। তবু সাহস সঞ্চয় করে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে, 'তুমি এভাবে চীৎকার করছো কেন, গো ?'

'কেন চীৎকার করছি, সে তুমি বুঝবে না। না-না, সে বোধশক্তি তোমার নেই। আমি আজ প্রচুর টাকার মালিক হয়েছি বটে, কিন্তু এতদিনে জানতে পেরেছি টাকার রং কালো নয়, লাল—জবাফুলের মত টকটকে লাল। গরীবের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে উপার্জন—সরকার গঠনমূলক কাজে যে পয়সা খরচ করেন, তা' ধনীর অট্টালিকা, ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের জন্য নয়, দরিদ্রের দারিদ্র ঘুচানো তথা দেশের সম্পদ বাড়াবার জন্যই সে পরিকল্পনা। কিন্তু আমরাই সে টাকার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার না করে, ন্যায্য অধিকারীর অধিকার জোর করে কেড়ে নিয়ে বিলাস ব্যসনে

জন্য দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। দেশ বিদেশ থেকে অজস্র অজস্র টাকা ঋণ করে আনা হচ্ছে দেশকে সমৃদ্ধ করবার জন্যে, কিন্তু মাঝখানে এই লালসা কাতর ধনী সম্প্রদায় শুধু লাভের অংশ নয়, অতি লাভের লালসায় প্রচণ্ড অন্তরায়। খাদ্যে ভেজাল দিই, খাদ্যদ্রব্য মজুত রেখে ছিনিমিনি খেলি অথচ যারা ফসল ফলায় তারাই দুঃসময়ে খাদ্যের জন্য আমাদের দরজায় এসে মাথা কোটে।—নির্মম পাষাণ আমরা, আমাদের প্রায়শ্চিত্তের সময় এসেছে।'

(পনেরো)

একটু থেমে মুকুল বলতে শুরু করে, 'তুমি তো জানো আমার দারিদ্রের কথা, সবদিন পেট পুরে খেতেও পাইনি আমরা। বিশেষ ভাবে মনে ধাক্কা দেয়, দিদির বিয়ে নিয়ে। তোমার মনে আছে বোধহয় বাবার দারিদ্রের জন্য দিদির বিয়ে হয়েছিলো অপাত্রে। দিদি জীবনে সুখী হয়নি। কিন্তু কেন? তার রূপ-গুণ দুইই ছিল, ছিল না বাপের অর্থ তাই তাকে বাধ্য হয়ে বাপের অন্তরের অনিচ্ছা থাকলেও সাধ্যের সীমা বুঝে সে প্রৌঢ়কেই স্বামীরূপে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছিল।'

বেদনার্ত কণ্ঠে মুকুল বলে চলে, 'আমার দিদির ফরসা রং। শান্ত-সুশ্রী-নিটোল গড়ন—সৌন্দর্যের দেবতা যেন অকৃপণ হস্তে রংয়ের তুলি বুলিয়ে দিয়েছিলেন দিদির সর্ব অবয়বে। আহা কি চোখ! কি ভ্রূ! কি সুকোমল চারু কপালখানি। আর অপর্যাপ্ত কুঞ্চিত কেশ—তার বুঝি সত্যই তুলনা নেই। ভিখারী বাপের ঘরে ইন্দ্রাণীর দেহৈশ্বর্য নিয়ে জন্মেছিলো দিদি।

বরের বয়স পঁয়তাল্লিশ। দ্বিতীয় পক্ষ তাঁর। চেহারাখানা অতি কর্কশ। উঁচু উঁচু দাঁত। বসা বসা গাল।—কপালের বলিরেখাগুলো সুস্পষ্ট।

এই বর?

বর এসে পড়েছে শুনে শাঁখে ফুঁ দিতে দিতে ছুটে গেলাম। বিপুল আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং রঙীন কল্পনায় বিভোর তখন আমি। না জানি, জামাইবাবু কেমন রঙ-ঢঙের হবেন।

মুঠো খই ছিটোচ্ছে পালকির ওপর। কে কে যেন শাঁখ বাজাচ্ছে।

কিন্তু আমার বুকে তখন কে যেন সজোরে হাতুড়ি পিটোচ্ছে। হাতের শাঁখ হাতেই রইলো; বাজাতে পারলাম না। এই আমাদের জামাইবাবু? দিদির বর? একটা আধবুড়ো লোক, আমাদের পাড়ার হরি ঘটকের মত চেহারা। দিদির লক্ষ্মীপ্রতিমার মত চেহারা, ওঁর পাশে মানাবে কি? অনেক বিয়ে দেখেছি কিন্তু সাধারণতঃ এরকম বয়সের বর ত দেখিনি? দিদি ত বরকে দেখেনি, দেখলে পছন্দ হবে? আজ তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিনে বসে বসে কাঁদবে না ত? ওঃ—বাবার কি কোন আক্কেল নেই? মা কি কানেও শোনেন নি কথাটা?

একরাশ প্রশ্ন মনের মধ্যে এসে জমা হলো। কিন্তু কাকে এ প্রশ্নের জবাব চাইব?

শাঁখ হাতেই ছুটে গেলাম মায়ের কাছে। মা তখন খুব ব্যস্ত। এক সময় মাকে একাকী পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'মা—জামাইবাবু বুড়ো কেন'?

মা একটু হেসে বললেন, 'বুড়ো বলতে নেই বাবা। শুনতে পেলে তোমার দিদি দুঃখ করবে, জামাইবাবু রাগ করবেন'।

'তবে ঘটক মশাইয়ের মত চেহারা ওলোকটার সঙ্গে দিদির বিয়ে দিচ্ছো কেন' ?

মা বোধহয় সব কথা জানতেন, তাই সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বুড়ো কেন হবে ? ও তোর মনে হচ্ছে। কত বিষয় সম্পত্তি ওঁদের জানিস ?—তোর দিদি কত সুখে যে পড়ল এবার।'

বুঝলাম, মা আমার আসল কথার জবাব এড়িয়ে যাচ্ছেন। কি জানি, কেমন করে আমার সে শিশুমন অসন্তোষে ভরে উঠলো। বিয়ে দেখতে প্রবৃত্তি হল না। রাতে কিছু খেলামও না। ওপরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙলো দিদির ডাকাডাকিতে। ভোর বেলায়। দিদি তখন বধূর সাজে। মানিয়েছে চমৎকার। একি! দিদির গায়ে এক-গা গহনা উঠলো কখন! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম আমি। দিদির রূপ যেন আরও ঝলমল করে উঠেছে। পরনে বেনারসী শাড়ী, ব্লাউজ, তাতে উগ্র সেন্টের গন্ধ আর মুখখানা স্নো-পাউডারে লাঞ্ছিত হয়ে কত সুশ্রী না হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি সিঁথির সিঁদুরে দিদির মুখখানা হয়ে উঠেছে সর্ব সৌন্দর্য বিভূষিতা।

'আয়, উঠে আয়—মা বললেন কিছু খাসনি? ইশ পেটটা একবারে খালি—ওঠ্—ওঠ্—' দিদি হাত ধরে টেনে তুললে বিছানা থেকে।

চোখ কচলাতে কচলাতে নীচে নেমে এলাম। দিদি বোধহয় কৌতুহলবশতঃ বাসর ঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো। আমিও।

দিদির বান্ধবীরা এবং ঠাকুমা সম্পর্কিতা কজন প্রতিবেশী তখন জামাইবাবুকে ঘিরে ধরেছেন। কে কি বলছিলো জানি না কিন্তু অস্পষ্টভাবে একটা কথা মনে আছে।

'একটা গান গাওনা হে জামাইবাবু?'

'গান যে জানি না—'

'গাইবে কেমন করে ভাই—গানের বয়স কবে পার হয়ে গেছে, এখন হরিনামের পালা'।

'না-না কোন কথা শুনবো না, অন্ততঃ একখানা গাইতেই হবে।'

'ও-মা গান জানে না, এ কেমন জামাই গো—যেমন জান গাওনা হে—দু-চার কলি।'

কে যেন ফস করে বলে উঠলো, 'তোবড়ানো গালে গান জমলে তো'! বাকী সবাই 'হো-হো' শব্দে হেসে উঠলো।

দিদি নির্বাক হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে তখন। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, দিদি ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে আর দেখলাম হ্যাজাকের আলোতে—তার দু-চোখের কোণে অশ্রু চিকচিক করছে।

মা আমাকে টেনে নিয়ে কোলে বসিয়ে খাওয়াতে থাকলেন....খেতে তেমন স্বাদ পেলাম না। সামান্য কিছু খেয়ে ফের ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

আমার দিদির সে রূপ আর দেখিনি। বিয়ের পর কেমন যেন শুকনো শুকনো দেখাতো। তার সে বন্দিনী-ক্লিষ্ট আত্মার কান্না যেন আমি শুনতে পেতাম।

পরে শুনেছিলাম, দিদির রূপে মুগ্ধ হয়েই জামাইবাবু দিদিকে বিনা পণে বিয়ে করেছিলেন। তা' না হলে তাঁর মত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে জামাতারূপে পেতে বাবার সর্বস্ব বিক্রি করেও সম্ভব হতো না। জামাইবাবু তাঁর প্রথমা স্ত্রীর সব অলঙ্কার দিদিকে উপহার দিয়েছিলেন। —বলতে লজ্জা নেই, বিয়ের খরচ-খরচা বাবদ বাবাকেও কিছু নগদ টাকা দিয়েছিলেন গোপনে।

আজ আমার মনে হয়, দিদি জীবনে সুখী হতে পারে নি। দিদির মুখেই শুনেছিলাম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকারের নেশা আছে জামাইবাবু তা' থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। অষ্টপ্রহর মাতাল হয়েই থাকতেন। দিদিকে অবশ্য বেশীদিন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি। জামাইবাবুর মৃত্যুর তিন বছর পর দিদি কলেরায় মারা যায়।

মাঝে মাঝে চোখ ফেটে জল আসে আমার। মনে হয়, কাঞ্চন-কৌলীন্যের দোহাই দিয়ে জগতে যে কোন বস্তুর মূল্য যাচাই হতে পারে, কিন্তু একজন প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের পাশে কামনা-বাসনা মুখরা নবীনা যুবতীর জীবন-যৌবন বলি দেওয়া সমাজের এক নিষ্ঠুর শাস্তি ছাড়া কিছু নয়। আর তা' আমার মনে ভীষণ আঘাত দেয় বলেই তোমাকে সেদিন বালীগঞ্জ লেক থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম—বিয়ে করার কথা ভাবিনি।

শয্যাশ্রয়ী হতেন না। বৈঠকখানায় মাতাল হয়ে গড়াগড়ি যেতেন। মাঝে মাঝে কলকাতা-লক্ষ্ণৌ থেকে বাইজী আনিয়ে দিনের পর দিন নাচ-গান শুনে বিভোর হয়ে অজস্র অর্থ ব্যয় করতেন। তাঁর বন্ধুরা শাঁসালো বন্ধুকে নিত্য নতুন নেশায় তন্ময় করে রাখতেন—দেহ ও মনের খোরাক জোটাতেন অদ্ভুত উপায়ে!

দিদি বলতো, 'বড়লোকের ঘর কিনা, এসব দোষ ধনী আর অভিজাত্যের নামে খণ্ডিত হয়।'

'জামাইবাবু কি ভাল হবেন না, দিদি?'

ম্লান হেসে দিদি বলতো, 'আমার সতীন বিশ-বাইশ বছর ধরে ওঁর হাতে পায়ে ধরেও মতিগতি বদলাতে পারেন নি বলে, শুনি শেষে নাকি বিষ খেয়ে তিনি মনের যন্ত্রণা লাঘব করেছেন—আমি ত কোন্ ছাড়'।

আমি শিউরে উঠতাম, 'দিদি যদি তার সতীনের মত বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে? বলতাম, আমাদের গ্রামের জাগ্রত দেবী, কালী-নারায়ণ মেরাই চণ্ডীর পূজা করিয়ে পুষ্প-কবচ পাঠিয়ে দেবো, দেখবে জামাইবাবু ঠিক ভাল হয়ে যাবেন।'

দিদি শুষ্ক হাসি হাসতো, ভাবতো—এ বুঝি বিধাতারও অসাধ্য!

আমি তখন কিশোর, তাই দিদি আমাকে সব কথা বলতো না। জামাইবাবুর মৃত্যুর পর যখন গেলাম, তখন দিদি সব কথা খুলে বললে, জামাইবাবু নাকি অনেকদিন ধরে এক কঠিন ব্যাধিতে ভুগছিলেন। ক্রমশঃ অসুখ বেড়ে ওঠে, ডাক্তার-রোজা-বদ্যিরা হার মানতে বাধ্য হয়। যেহেতু সামান্য একটু সুস্থ হলেই ফের অনিয়ম অত্যাচার করতেন। শেষে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন। অবশ্য এ গোপন কথা। যেহেতু জামাইবাবুকে এ জন্য মর্গে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়নি। 'হার্টফেল' করেছেন বলে খবর রটিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

(ষোল)

তাই বলছিলাম পারুল টাকার রঙ লাল, কাল নয়। যে টাকাটা তৈরী হয় সেটা রক্তের বিনিময়েই তখন টাঁক-শালে তৈরী হচ্ছে—বিলিয়ে দেওয়া বা অন্যায় ভাবে সিন্দুকে জমাবার জন্য নয়। রীতিমত তার মূল্যায়ন স্থির করেই এ পরিকল্পনা। তা' যদি না হবে—মানুষের জীবনের সঙ্গে টাকার মাপকাঠি হবে কেন? কেন অর্থ ছাড়া বিয়ে হয় না? অর্থাভাবে আমার দিদিকে জীবনের একটা অপরিহার্য পরিচ্ছেদ থেকে বঞ্চিত হতেই-বা হলো কেন?

দিদি কোনদিন সুখী হতে পারেনি। আমরাও। পরে এ নিয়ে মা-বাবা দুজনকেই আক্ষেপ করতে শুনেছি। কিন্তু আমরা হিন্দু। বংশগৌরব, সমাজ, কৌলীন্য—এসব মানতে হবে তো!—তাই সেকথা ভেবে মাঝে মাঝে হৃদয়ের অতল-সাগরে তলিয়ে যাই, এ আমার মনগড়া দুঃখ নয়, সত্যকার মর্মভেদী বেদনা—যা' অতি সত্য। কি আর বলবো, সেদিনের কথা পারুল—আমি জানি দরিদ্রের ঘরে সব কিছুর দীনতা সুস্পষ্ট। আমি দেখেছি সেসময় কতজনকে ভাল কথা বলতে গিয়েও হাস্যাস্পদ হতে হয়েছে, কত সৎ কামনা-বাসনা দলে পিশে শেষ করে দিতে হয়েছে। কত অন্যায়-অবিচার নীরবে সহ্য করতে হয়েছে। যদিও মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে—দারিদ্র টুঁটি টিপে ধরেছে—সাবধান!

সহসা পারুল বলে, 'মনে আছে, একদিন বলেছিলাম, আসল সত্য অর্থ নয়, দেখছি আজ তুমি তা' বুঝতে পেরেছো!'

'বুঝেছি মানে? আমার দেহের কঙ্কালগুলো পর্যন্ত টের পেয়েছে যে আসল সত্য অর্থ নয়। টাকা—সে তো লাল, ঘোর রক্তবর্ণ!'

পারুল অনুনয় কণ্ঠে বলে, 'তুমি থামবে?'

মুকুল তার কথায় কান দেয় না। আপন মনে বলে চলে, 'আজ অতীতের কথা বার বার মনে আসছে। ভুলতে পারছি না অতীত, অতীত যেন আমার প্রিয় বন্ধু! অতীতের সে নয়নাশ্রু, প্রাণটাকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছে। আকাশে বাতাসে আজ বাসুকির নিঃশ্বাস, সে বিষাক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস আজ দূরীভূত করার প্রয়োজন। কাঁদছে দেশের ঘরে ঘরে কত মানুষ অন্ন-বস্ত্র-চিকিৎসার জন্য, আর আমরা তাদের নয়নজল দেখেও উপেক্ষা করে দিব্য আরামে উপর তলার মানুষ হয়ে তাদের ব্যঙ্গ করছি। শুনেছি নয়নজলে পাষাণ গলে, কিন্তু মানুষের হৃদয় কি পাষাণের চেয়েও শক্ত। এও শিখলাম, অর্থ মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। আসল শান্তি মনের নিভৃত কক্ষে নিদ্রিত—তাকে জাগ্রত করতে হলে মনটাকে কষ্টি পাথরে যাচাই করে নিয়ে প্রেমের মিশাল দিতে হবে। ফাঁকি আর ফাঁকির উন্মাদনায় ছুটেছিলাম। আজ অনুশোচনায় মন-প্রাণ ভরে উঠেছে। ভাবছি, আজ আমি কোথায়? কোন্ প্রচণ্ড ধাক্কা আজ মনের শতশত দ্বার জাগ্রত করে দিলে?' সহসা নরম হয়ে পড়ে মুকুল। 'পারুল, আমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছি!'

'অত চীৎকার করো না গো—পাগল হয়ে যাবে। শুনছো?' ফাঁক পেয়ে ব্যথাতুর কণ্ঠে পারুল বলে।

'হতে পারি! তবু আমার প্রাণের সে সজল ব্যথাভরা ঘটনাগুলো তোমাকে না বলে থামতে পারছি না—যা, সত্য, একবিন্দু ভেজাল নেই। সত্যি বলছি পারুল, তুমি বিশ্বাস করো, যা তোমাকে এতক্ষণ ধরে বললাম, তাতে ভেজাল নেই এতটুকু, তবু যেন সব বলা হলো না, বলতে পারছি না গুছিয়ে।—জীবনটা গোঁজামিলে ভর্তি যে আমার! জীবনে পেয়েছি বহু দুঃখ, সুখ ভোগও কম করিনি কিন্তু অনুশোচনা এক্ষণে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।'

'তুমি থামবে?'

'থামতে বলো না, থামতে পারছিনে, পারুল। ভেতরটা আজ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। একদিন বুক ফুলিয়ে কালো-বাজারী করেছি আজ ধরা পড়বার মুখে অন্তর ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছে।

পারুল এবার মুকুলের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে করুণ কণ্ঠে বলে, 'ওগো সত্যি বলছি, তুমি বিশ্বাস করো, আমি সব জেনে শুনেও কেন তোমার বিপদে সহানুভূতি জানাতে পারছি না। আমার বড় ভয় করে, যদি দুর্বলতাবশতঃ তোমাকে আমার কাল্পনিক ভয় প্রকাশ করে ফেলি—তুমিও দুর্বল হয়ে পড়বে। আমি কি করবো তখন? আমায় তুমি মাফ করো, হাল ভাঙা পাল ছেঁড়া নৌকার মত আমার এ প্রাণটা আর ঘূর্ণিঝড়ের মুখে ছেড়ে দিও না। ভরাডুবির ভাবনা ভাবি না, ভাবি কেবল তোমার কথা। যে ইচ্ছে করলে, আমার চেয়ে দু-পাঁচটা রূপসী স্ত্রী নিয়ে ঘর বাঁধতে পারতো, সে কেন আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধলে! হও তুমি নকল কারবারী, কিন্তু তা' সত্বেও তুমি আমার কাছে আসল সোনার মত,—একটি কারণে, তা' হলো তুমি মহান, তোমার মহত্ত্ব আমার মত হতভাগিনীকে ছায়ার মত সুশীতল করে তুলেছিলো সেদিন—যেদিন আমি ভাসছি চোখের জলে, মনের অনলে।

'তবু বলছি পারুল, টাকার রং লাল, যতই যা' করি—এ ধারণা আজ আমার মনে দৃঢ় হয়েছে। টাটকা সতেজ রক্তিম বর্ণ সে টাকার। আজ আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, জীবিকার জন্যই জীবনটাকে কলঙ্কিত করেছি। অথচ আমার বাবা শত দুঃখ কষ্টেও মিথ্যা আচরণ করেন নি। উপবাস করেছেন কতদিন তবু ভিক্ষা চাননি কারো কাছে। আর আমি এমন মোহে ডুবলাম যে, কলঙ্কিত করে তুললাম বংশধারাকে!

'তোমার হিসেব মিলেছে?'

'হ্যাঁ. তবে নিদারুণ পরিশ্রম করে যে হিসেব খাড়া করেছি, তা' থেকে আজ স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে, টাকার রং লাল—গরীবের অর্থ আত্মসাৎ করেই আমার এ অট্টালিকা, বিলাস-ব্যসন সবকিছু।'

'তুমি শান্ত হও!'

'শান্ত নয়, সমাধিস্থ হয়ে থাকবার দিন ঘনিয়ে এসেছে আমার—চির শান্তিরও বড় প্রয়োজন আমার!'

(সতেরো)

মাস ছয়েক পরের কথা।

পরের ঘটনাগুলো অতীব মর্মান্তিক। স্থির হলো না আর মুকুলের সে অশান্ত হৃদয়। যে দেহের শিরায় শিরায় একদিন অর্থলালসা উন্মুখ হয়ে উঠেছিলো, আজ সে দেহ-মনের প্রতিটি রক্তকণা অনুশোচনায় ভরে উঠেছে। অর্ধ উন্মাদ সে এখন, থেকে থেকে চীৎকার করে ওঠে, 'টাকার রং লাল—কাল নয়, হতে পারে না।'

ব্যবসায়েও শিথিলতা এসে গেছে। রামগোপাল অবশ্য এখন প্রায় সময় ব্যবসায় দেখাশুনা করে। যদিও সে তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বিবিধ আমোদ-প্রমোদ থেকে সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত নয়। তবে মুকুল সর্বাধিকারী এনফোর্সমেন্ট বিভাগ থেকে মাস খানেক আগে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে প্রমাণিত হয়েছে নকল হিসাবের কারচুবিতে। এরপর থেকে সেই যে মুকুল মাঝে মাঝে 'হো-হো' শব্দে হাসে, সে হাসি কারও আভাস-ইঙ্গিতে, অনুনয়-বিনয়ে, ভয় দেখিয়েও থামানো যায়নি আজও। রাতদিন হাসছে আর বিড়বিড় করে বকছে, 'টাকার রং লাল—কে বলে কাল? হাঃ-হাঃ-হাঃ—'

চূড়ান্ত পাগলামির পর্যায়ে উপস্থিত মুকুল। তবে তাকে রাঁচি পাঠাবার সঙ্কল্প বা পাগলের চিকিৎসা থেকে রামগোপাল ও পারুল হার মেনেছে।

ওকথা উঠলেই, চীৎকার করে ওঠে মুকুল, 'না-না-না, বৃথা সে চেষ্টা করো না। আমাকে জীবনের বাকী দিনগুলো পাগল হয়েই থাকতে দাও। যদি জোর জবরদস্তি করো, গুলি করে মারবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ! টাকার রং লাল হয়েও কাল, সে কেবলমাত্র হাতের গুণে আর বুদ্ধি কৌশলে।'

দেওয়ালে টাঙানো নিজের ফটোর কাছে গিয়ে কখনো চীৎকার করে ওঠে, 'তুমি কি বলো টাকার রঙ কাল? না-না, এ হতে পারে না, টাকার রঙ লাল—সব টাকাই কিন্তু, তাতে কালিমা লেপন করেছি আমরা। ওঃ চিন্ময় মূর্তিতে কালিমা লেপন করেছি আমরা, অথচ হিসেব-নিকেশের কারচুবিতে আইনের কবল থেকে মুক্ত।

বাইরে জানিয়ে দেওয়া হলো মুকুল সর্বাধিকারী অসুস্থ। ডাক্তারের অভিমত অনুযায়ী কারও সঙ্গে দেখা করা তাঁর পক্ষে ক্ষতিকর। গোপনে টেলিফোনের লাইন কেটে দিলে রামগোপাল। যখন তখন যাকে তাকে ফোন করে কেবল জ্বালাতন করে, 'শুনছেন, টাকার রং লাল—না-না কালো নয়! কি একমত? হাসছেন যে? না-না কাল টাকা বললে চলবে না। নাঃ, দুঃখিত আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।—তবে আমি জানি টাকার রং লাল!'

পাগলও ভাবে। মুকুলও প্রায় সময় নানা বিষয় নিয়ে ভাবনার অতল সাগরে তলিয়ে যায়। অদ্ভুত সে ভাবনা—

অন্ততঃ তার মত মানুষের।

লোভ আর হিংসা যখন মানুষের সমস্ত শুভ বুদ্ধিকে গ্রাস করে তখন তার এমনই পরিবর্তন হয় যে, তাকে আর মানুষ বলে চেনা যায় না। কিন্তু কত অমানুষও উচ্চ শিখরে বসে নিজেকে মানুষ বলে চীৎকার করে। দরিদ্র-নিরীহ-মূর্খ মানুষও তাদের মানুষ বলেই ভুল করে, বুঝতে পারে না সব সময় আসল মানুষ কবে ছাই চাপা পড়ে গেছে লোভ আর হিংসার আগুনে। তারা অর্থের দাসত্ব গিরি করে—মনুষ্যত্বের নয়!

পারুল খাবারের থালাটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকে। বলে, 'রাতদিন কেবল বিড়বিড় করে বকছো আর হো-হো করে হাসছো—এও দেখতে হচ্ছে আমাকে। হায় অদৃষ্ট—হায় বিধাতার লিখন!'

'তুমি আজ যা' নিয়ে ব্যথা পাচ্ছো অথচ যা' কোনদিন ভাবনি, আমিও তেমনি এ অনাগত দিনের কল্পনাও কি কোনদিন করতে পেরেছিলাম? নিজেকে এতদিন রাহুগ্রাসে জড়িয়ে ফেলেছিলাম পারুল, যদিও তার প্রধান কারণ আমার দারিদ্র। তবে কি দরিদ্র হঠাৎ ধনী হলে এ অবস্থা-ই হয়? তবু আজ আমার মনে হয়, সব পেয়েও আজ আমি সব ত্যাগে প্রস্তুত। সর্বস্ব বিলিয়ে দেবো দেশের মানুষের কল্যাণে। অগ্নিপরীক্ষা ত হয়ে গেছে, এবার স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফিরে যাবো। বড় কষ্টে জোটানো দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন—যা' আমার অমৃত বলে মনে হয়, সেই পর্ণকুটির—আমার সে বেদনার্ত হৃদয়ের সান্ত্বনা, অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করেই বেঁচে থাক। কি হবে এসব নিয়ে? কি করলাম জাল জুয়াচুরির ব্যবসা করে? কেবলমাত্র জটিল মানসিকতায় আক্রান্ত হয়ে জীবন নিয়ে সংশয়ে পড়লাম। একদিন জীবিকার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম, আজ জীবন নিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে খুঁজছি শান্তির পথ।'

(আঠারো)

ঢকঢক করে একটা বোতল শেষ করে ফেলে মুকুল।

পারুল ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'এখন খাবার সময় এসব কেন খাচ্ছো? কে এনে দেয় তোমাকে এসব? গোপাল আমাকে পইপই করে বারণ করে দিয়েছে—এসব খেয়ে মন মেজাজ কি আরও যন্ত্রণাকাতর হয়ে পড়ছে না?'

'বাকী আছে কিছু? তবু যন্ত্রণার শেষ নেই পারুল। তুমি বুঝবে না, সর্বদা পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে মনটা। গোপাল মাঝে মাঝে ব্যবসা সংক্রান্ত জটিল ব্যাপারের পরামর্শ নিতে আসে, ফিরিয়ে দিই তাকে। বলি তাকে—তোমার বুদ্ধি বিবেচনামত চলো, আমি আজ শুধু মুকুল সর্বাধিকারী, নকল কারবারী নই। যদি তুমি এতে তৃপ্তি পাও করো, না করো ছেড়ে দাও। আমি এসবের মধ্যে আর নেই। প্রয়োজন হলে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে পথের ভিখারী হয়ে দিন কাটাবো। বিষয় নয়, বিষ—বিষ—মরণ বিষ!'

'গোপাল বলে, 'বাবার বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে। আমি তাঁর কোন কথাতে রাগ করি না মা, তুমিও যেন কিছু বলো না বাবাকে।'

'হ্যাঁ, মাথা খারাপই হয়েছে পারুল। অর্থলালসা কাতর তোমার ছেলে রক্তের স্বাদ পেয়েছে, সে কি এসব ছাড়তে পারে?'

'বৌমা কিন্তু প্রতিদিন তোমার খোঁজ নিচ্ছে টেলি-ফোনে।—বড় ভাল মেয়ে। এ সময় কেসটা 'উইথ ড্র' করলে ভাল হতো না কি?'

'না। তবে জানি মেয়েটা খুবই ভাল। অবশ্য গোপাল একদিন কঠোরতম আঘাতের মধ্যে দিয়ে সাক্ষাৎ পাবে নিষ্ঠুরতম সত্যের। যেমন আজ আমি নকল জীবনের অহংকারে অকস্মাৎ আগত ঘূর্ণি হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছি। আজ যে অট্টালিকায় বসে কথা বলছি, তা' আমার তৈরী বলে অহংকারের কিছু নেই—এসব সর্বসাধারণের। তাদের রক্ত জল করা শ্রমের বিনিময়ে, সে আমি যে ভাবেই রোজগার করি না কেন। আমাদের সেদিনের সে-নির্মমতা, হৃদয়ের ব্যর্থতার কাছে বার বার ক্ষমা চাচ্ছে সবিনয়ে।

'মনের অনুশোচনা কি প্রায়শ্চিত্তের সাহায্যকারী নয়?'

'হতে পারে। জীবনটাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়ে কি পেয়েছি জান?—উদ্‌ভ্রান্তি আর লক্ষহীনতা। পবিত্র ভারতের শাশ্বত নীতিজ্ঞান, মূল্যবোধ যতগুলি মানুষের কাছ থেকে পারি, ছিনিয়ে নেবার জন্যই বুঝি আমি জন্মে-ছিলাম। কি হাস্যকর ব্যাপার, সেই নকল আমি আসল বলে

বহু মানুষের কাছে নমস্য হয়ে থাকলাম। তারা জানলে না আমার ভেতরটা কিসে তৈরী! এরপর হয়ত একদিন ক্যালেণ্ডারের পাতায় ছবি দেখবে আমি খাঁটি ব্যবসায়ী হিসাবে ঘরে ঘরে পূজা পাচ্ছি। মহৎ সব কিছুকে পরিত্যাগ করে অর্থ উপার্জনই জীবনের একমাত্র সার্থকথা ভেবে অবাঞ্ছিত আনন্দ স্রোতে গা-ভাসিয়ে দেওয়াই জীবন ভেবেছিলাম একদিন। আজ মনে হচ্ছে, এ জীবন জীবন নয়। পিপীলিকাও খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে নিজের জন্য—দলের জন্য। আমি আমার জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষতি করেছি—বিরাট কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যে—এতে মনুষ্যত্বের বাহাদুরী কোথায়? সবলের ক্ষুধায় জীর্ণ হচ্ছে দুর্বল মানব সমাজ!'

পারুল অধীর হয়ে ওঠে মুকুলের আপন মনে বকবকানি শুনে। কোন সময়ে ছলেবলে ঘুমোবার আবেদন জানায়, কোন সময়ে আবার অন্য কথা বলে ভুলাতে চায়, মুকুল কিন্তু সব কিছু অগ্রাহ্য করে আপন মনে বকে চলে।

'প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়ি আর তা' প্রত্যক্ষ করি। সে রোমহর্ষক, বীভৎস দৃশ্য কল্পনা করতেও যেন বেদনাক্লিষ্ট প্রাণ আঁতকে ওঠে ভয়ে। তাই বলছিলাম, এ এক কলঙ্কিত জীবন আমার। আমাদের মসীমাখা ঘৃণিত জীবনের জন্য বহু শান্তিপূর্ণ সংসার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সুদূর অতীতের স্বপ্নময় জগৎ বলে যা' আমরা মনে করি তার সঙ্গে আজকের দিনের বহু তফাত। তবু সে দারিদ্র ভাল ছিলো, অন্ততঃ এমন দুশ্চিন্তা ভীতি সঙ্কুল জীবন যাপন করতে হতো না। সেদিনের সুন্দর ছন্দময় জীবনের স্বাদ আর কোন প্রকারেই ফিরে পাওয়া যাবে না অথচ আমার পল্লীর সে সহজ জীবন যাপনের দিনগুলো আজও আমাকে প্রলুব্ধ করে। পয়সার জন্য কি না করেছি আমি? এইযে ঘটনার পর ঘটনা ঘটে গেল, পেলামও অনেক কিছু—কিন্তু যা' অন্তরের একান্ত কামনা, 'শান্তি' তা পেলাম না।

পারুল বলে, 'এ তোমার মনের অনুতাপ! এমনি করে কেউ কি ভাবে কৃতকর্মের জন্য? ওগো, তুমি যাতে শান্তি পাও—পাগলামি ভাল হয়ে যায়, তাই করো, রাত-দিন বকবকিয়ে লাভ কি?'

'লাভের কথা নয়, লোকসানের কথাই ভাবছি পারুল। উৎসর্গীকৃত হবে। তবে তুমি সময় থাকতে গোপালকে বলে দিও, আমি তার জীবন যাপনের জন্য এ বাড়ী ভাড়ার আয় ছাড়া সব কিছু দেশের জন্য দান করে দেবো। শুনেছো বোধহয়, উইলের কাগজপত্র প্রস্তুত হচ্ছে।'

আঁতকে ওঠে পারুল। বলে, 'না-না, সে তুমি করতে পারবে না। ছেলেটা যেভাবে মানুষ হয়েছে তাতে তার বাড়ী ভাড়ার আয়ে চলবে না—চলতে পারে না।'

'না চলে শুকিয়ে মরবে। দেশের কোটি কোটি মানুষ অন্ন-বস্ত্রের জ্বালায় আত্মাহুতি দেবে, আর তোমার গোপাল আলালের ঘরের দুলাল হয়ে থাকবে, সে আমি কল্পনাও করতে পারি না। না-না তুমি বাধা দিও না। বলেও কাজ নেই বরং এখন তাকে, পাগল বলেই জানে আমাকে—সব কাজ চুকে গেলে বরং নিজেই জানতে পারবে, যখন তার আর কিছু বলার থাকবে না, নীরবে থাকতে বাধ্য হবে।'

'তোমার এ মত আমি কিন্তু অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করতে পারছি না। না-না, সে খুব অন্যায় হবে। বরং লাখ খানেক টাকা দান করতে পারো কোন সৎ প্রতিষ্ঠানে।

একটা জরুরী কাজে পিতার সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে গোপাল এসেছিলো। সে ঘণ্টাখানেক ধরে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, পিতার মনের শেষ ইচ্ছার কথা

কানে আসতেই সে থেমে গেছে। এ কি বলছেন বাবা? তবে কি মিষ্টার সোম গোপনে যে কথা কাল বলেছেন তা' সর্বৈব সত্য! সে শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যা' ঘটতে পারে মনে করে আন্দাজে সব ঠিক রেখেছে, তা' ধ্রুবসত্য হতে চলেছে!

মরিয়া হয়ে ঘরে ঢোকে গোপাল। 'আমার নীরবতার আগে তোমাকেই চুকিয়ে দিই শয়তান। তোমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হতে দেবো না। ভেবেছো, সব রোজগার তোমার? আমি কি কম পরিশ্রম করছি, ব্যবসাটা খাড়া রাখবার জন্যে? পাগলামির ভান করে ঘরে বসে আছো ছ'-সাত মাস। মানলাম তুমি পাগল, কিন্তু আমাকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করার বুদ্ধি পাগলামির লক্ষণ নয়—এ তোমার বিরাট অভিসন্ধি।'

পারুল বলে, 'পৃথিবীতে পাগল বহু প্রকারের আছে গোপাল।'

মুকুল আর্দ্র কণ্ঠে বলে, 'গোপাল তুই বুঝবি না আমার বর্তমান মনের অবস্থা। অন্তর কি চায় আমার। ওরে সত্যি বলছি, টাকার রং লাল, একটা টাকাও কাল নয়—কাল হয় কেবল আমাদেরই কলুষিত মনের কদর্য ব্যবহারে। আমি জানি, টাকার রং লাল। স্বার্থ আর অর্থ ই মানুষের যত অধঃপতনের মূল।'

সহসা মুকুলের বুক লক্ষ্য করে গোপালের রিভলভারটা গর্জে ওঠে দুবার।

পারুল চিৎকার করে ওঠে, 'এ তুই কি করলি গোপাল—ওরে হতভাগা—' অচৈতন্য হয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে সে।

বিছানার ওপর বসেছিলে মুকুল। এবার ঢলে পড়ে। বুকের ওপর গড়িয়ে পড়া রক্ত ধারাটা ডান হাত দিয়ে অলস হাতে মুছতে মুছতে বলে, 'ঠিক আমার বুকের এই তাজা রক্তের মত—প্রতিটি টাকা-পয়সা লাল। আমি বুঝতে পেরেছি টাকার রং লাল, জীবন দিয়ে আজ তা' আরও গভীর ভাবে অনুভব করলাম'।—চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে মুকুল।

পারুলের মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে খাড়া করে তোলে গোপাল। বলে, মা, তুমি কিচ্ছুটি বলতে পারবে না, অনেক ভেবে দেখেছি, এ ছাড়া উপায় ছিল না। তুমি কিছু ভেবো না। টাকার জোরে আমি সব কিছু আগে থেকে ঠিক করে রেখেছি। জান তো, আমি প্রসিদ্ধ ভেজাল কারবারী মুকুল সর্বাধিকারীর ছেলে—রামগোপাল সর্বাধিকারী, আমিও সবার ধরা ছোঁয়ার বাইরে।'

'হয়তো তাই সত্য, গোপাল, কিন্তু আমি আজ বুঝতে পারলাম, টাকার রং লাল—একদিন তুইও বুঝতে পারবি। যত কাল আমাদের মন। কিন্তু আমি ক্ষমা করলেও, কাল আমাদের কোনদিন ক্ষমা করবে না। কালের মানুষও না।

মুহূর্তে পাড়ায় শোকের ছায়া নেমে আসে। শহরময় এ খবর ছড়াতে দেরি হয় না।

জাগো গো পুনর্বার

শ্রীমতী শান্তি বসু

যোগে মগ্ন যজ্ঞেশ্বর
আজ কি হায় কৈলাশে,
নৃত্য করে চারিদিকে
পিশাচেরা উল্লাসে!
অভয় বাণী দানো জননী
নিখিলের ঘরে ঘরে,
জীবন যুদ্ধে পরাজিত
সন্তানগণ তরে।

ভুলেছ কি জননী আমার
অতীত কালের কথা,
অত্যাচারে ত্রিভুবন
যবে হ'ল লাঞ্ছিতা!
জগত রক্ষিতে জাগো গিরিসুতে,
জাগো গো, পুনর্বার।
অসুর নিধন লগ্ন এল—
আজিকে হায় আবার।

কিশোর চারণ

শ্রীরমেশচন্দ্র দে

চারণ কিশোর শোভে রণভূমে,
কৃপাণ পতাকা সঙ্গী তার,
এক হাত তার ঝাণ্ডা উঁচায়,
অপর হস্ত খড়্গাকার।
চারণ কিশোর গেছে রণভূমে
লইতে বক্ষে অশ্রুলেখা,
আশু মৃত্যুর শ্রেণীতে শ্রেণীতে
সততই তার পাইবে দেখা।
জণকের তার শাণিত কৃপাণ
বিশ্বাসীতম হস্তে জাগে,
দুরন্ত তার তূর্য্য বনাল,
সারঙ্গ তার পৃষ্ঠভাগে।
"ভারত জননী সুপ্রিয় আমার"
কহে বিদ্বৎ চারণ শিশু,
"বিশ্বজগৎ হাসিলেও তোমা
ক্রূর বিশ্বাস-হন্তা ইষু,
একটি কৃপাণ অন্তত অয়ি,
প্রহরিবে তব সত্ত্বরাশি,
বিশ্বাসী এক সারঙ্গ তব
প্রশংসাতেই উঠিবে ভাষি।"

চারণ বালক ঝাণ্ডা উড়ায়,
স্বর্গ তাহার বক্ষে ঝলে,
কোনো শত্রুর শৃংখল তারে
দলিতে নারিবে চরণ, তলে,
পরমাত্মার স্ফুলিঙ্গই
আত্মা তাহার নোয়না কভু,
মৃত্যু বীরের বিনত ভৃত্য
মুক্ত বিবেক হৃদয় প্রভু;
সুপ্রিয় তূর্য সারঙ্গ তার
উঠিতেছে পুনঃ কথায় ভ'রে
অংগুলিগুলি চম্পক সম—
প্রতি তন্ত্রীতে পড়িছে ঝ'রে:
"হে তূর্য তোমা কোনো পীড়ন
পারিবেনা কভু কলংকিতে,
প্রেমবীর্যের আত্মা তুমিই
অমৃতলোক প্রস্ফুটিতে,
গীতগুলি তব হ'য়েছে রচিত,
শুধু পুণ্য ও মুক্ত তবে,
ধ্বনিবেনা কভু দাসত্বে তা'র।
আজ্ঞাবাহিত করোৎকরে।"

ফ্যান

॥ সু-মো-দে ॥

বলে সকলেই 'কেন ফ্যান নেই,
ঘরে ফ্যান কর ভাই'!
বিনয়ে তাদেরে আমি বলি এই
ফ্যান পেলে এবে খাই!
চালের অভাবে মরে আপামর
আকাশচুম্বী অতি চড়া দর,
হাততালি দিলে হয়নাতো ফ্যান
দেশে নাকি চাল নাই!
বলে সকলেই 'কেন ফ্যান নেই

ভাতের বদলে রুটি আটা খায়
দুগ্ধের স্বাদ ঘোলেতে মিটায়,
অনেকের গম দু'বেলা আহার
পেট ফুলে আইঢাই!
বলে সকলেই 'কেন ফ্যান নেই
ঘরে ফ্যান করভাই'?
যেন দশভুজা পূজার আগেই
'পটল তুলে ম যাই'।
'ফ্যানের বাতাস' বা 'ভাতের ফ্যান'

তবু প্রণিপাত

(১০৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নির্জিত ভারতে
বৈদেশিক শাসনের নাগপাশ হ'তে
যেদিন মুক্তির বাণী দিকে দিকে হইল ঘোষিত,
সে'দিন কী উচ্ছ্বসিত
আশা ও আনন্দ-স্রোতে ভেসেছিল লোক!
ভুলেছিল সর্ব দুঃখশোক—
মাত্র কয়দিন।
তারপর মরীচিকা মরুতে বিলীন।
ধনীরা হইতে থাকে ধনী;
রন্ধ্রগত শনি
দেখা দিল দরিদ্রের জন্ম-পত্রিকাতে।
ত্রিবর্ণ পতাকা হাতে
কোটি নরনারী
স্পর্শ করি' যেই তীর্থবারি
সঙ্কল্প পড়িল,
সে বারিতে বুঝি মিশে ছিল
পূতিগন্ধ নরকের অলক্ষিত কীট;
দেশ মাতৃকার পাদপীঠ
ঘেরিয়া দাঁড়াল তাই যত ধূর্ত জীব।
মুহূর্তে হইল ক্লীব
সর্বত্যাগী দেশপ্রেমী বীর।
ভুঁইফোঁড় যোগিদলে ভরি' গেল নিরঞ্জনা-তীর।

নাহি অন্ন, পেয়, পরিধান।
কাঙালের তরে শত নিষেধ-বিধান।
জালে ও ভেজালে,
গুণ্ডামি, গুণ্ডামি, শাঠ্য আর কূটচালে
ভরে গেছে দেশ।
নর ভুলিয়াছে বীর্য, নারী লজ্জালেশ।
দিবালোকে চলে রাহাজানি;
সিনেমা-টিকিট লয়ে হয় হানাহানি।
রাজপথে জমে মহাভিড়,
ট্রাম-বাস স্থির—
ভুলি' কাঞ্চী-কেদার-দ্বারকা
বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দাঁড়াইছে বারান্দা ও ছাতে—
ক্ষণ নেত্রপাতে
চিনিবারে পূজ্যা কোনো পর্দার দেবীরে,
কিংবা কোনো স্টুডিয়োর পীরে।

সর্ব স্তরে যত ঢোকে পাপ,
তত বাড়ে ব্রহ্মচারী গুরুর প্রতাপ।
মন্ত্র দিয়া কানে
নারীকুল জর্জরিত করে পঞ্চবাণে।
গৈরিকের তলে
নারকীয় লীলা তার চলে।
গুরু হয় গুরুতর ঈশ্বর-কৃপায়,
শিষ্যদের গৃহ ভেঙে যায়।
শিক্ষক লভিছে দণ্ড ছাত্রদের হাতে।
নিত্য দ্বন্দ্ব গুরুজন-সাথে—
সিগারেট, হোটেলের খরচ না দিলে,
পোষাকের বরাদ্দ কমিলে।
নিষ্কর্মা ছেলেরা বসে' পাড়ার রোয়াকে
ধূমপান-ফাঁকে
হিন্দী গানে টক্কর লাগায়;
নতুবা বাধায়
তপ্ত তর্ক ম্যাচ্-ছবি নিয়ে।
মেয়েদের চলা দায় সেই পথ দিয়ে।
সম্বোধন কদর্য ভাষায়,
ঢিল ছোঁড়ে গায়।
কেহ কেহ সিদ্ধহস্ত চুরি ও ছুরিতে,
বোমা ছুঁড়ে পারে প্রাণ নিতে!

যে অভাগা সৎপথে উদয়াস্ত খাটে,
যত কষ্ট তাহারি ললাটে।
যারা দেয় লক্ষ লক্ষ আয়কর ফাঁকি,
কোনো পাপ নাহি রাখে বাকি,
অর্থ তরে আপনার আত্মারে বিকায়,

হরিসভা, নৈশ ক্লাবে সুখে চোরা-বাজারীরা নাচে ;
ভিখারী তাদের দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা যাচে।
বণিকের ঋদ্ধি ক্রমাগত ;
শিল্পপতি-পদভারে রাজতক্ত নত।
বন্ধুহারা মোরা পৃথিবীতে।
সদা ত্রস্ত সীমান্তের সমর-সঙ্গীতে।
অর্থ কমে' আসে রাজকোষে ;
বিদেশের ঋণ লই নিজ কর্মদোষে।
ভিক্ষা-দত্ত খাই চাল-গম।
নিয়তি নির্মম—
পথে ঘাটে বস্তির কোটরে
বৎসরে বৎসরে
এক কোটি বিংশ লক্ষ নরশিশু আনে।
কেহ নাহি জানে
কি খেয়ে বাঁচিবে তারা ?
মানুষ করার ভার তুলে লবে কারা ?
চারিদিকে আর্তনাদ,
হরতাল, রূঢ় প্রতিবাদ।
স-বেদন নিবেদন, বুভুক্ষা-মিছিল।
পিঠে পড়ে লাঠি আর কিল।
ছোটে গুলি ; কেঁদে মরি কাঁদুনে গ্যাসেতে।
যমেরে স্মরিয়া দিনে রেতে
চলি পথে, চড়ি বাসে, ট্রামে কিংবা ট্রেণে।
রাম বা রাবণ প্রতি লেনে !
এত-যে ছুটিছে কাল-ঘাম,
তবু দুর্গানাম

প্রতি প্রাতে লিখে থাকি জপি শতবার।
তথাপি মা করুণা তোমা
পারি না জাগাতে।
ত্রিশ কোটি নিরন্নের পাতে
পড়ে না প্রসাদ-কণা।
তুমি নাই ; থাকিলে কি রহিতে উন্মনা ?
দুঃসহ এ করভারে, এই ক্লৈব্য, এই অনাচারে,
জনতার ক্ষুব্ধ হাহাকারে,
এই ধন-দম্ভ, দৈন্য, নির্বীর্য শাসনে,
তুমি রত্ন-সিংহাসনে
রহিতে কি বসি'
আপনাতে আপনি উলসি' ?

তুমি যদি সুখশান্তি না পারিতে দিতে,
অসুরের স্পর্ধারে ভাঙিতে,
তবু তুমি ভারতেরে ডুবাতে পারিতে
প্রলয়ের প্রমত্ত বারিতে।
মনে হয়, তুমি স্বপ্ন, সমূর্তা কল্পনা,
শোকে দুঃখে নিষ্ফলা সান্ত্বনা।
তুমি পঙ্গু, মূক, অন্ধ, শ্রবণবিহীনা,
তুমি মায়া, মহাশূন্যলীনা।
তবু নাহি জানি
বারংবার তব নাম, তব রূপ কেন মনে আনি !
তাই ব্যর্থ অশ্রুধারে ভেসে
প্রণতি পাঠাই মাগো তোমার উদ্দেশে !

(১৬৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মুক্ত হয়েছে। গঙ্গা পাকা বেদেনী। হাতের মুঠোয় চাপ দেয়। কতদিনের ঘুমান সাধ, যেন মিটতেই চায় না।

ঝিমান কণ্ঠে বিষণ্ণ সুরে বটুকলাল বলে—আসবার ক্ষমতা নেই।—তবু এলাম। জানতে—

গঙ্গা যেন শুনতেই পায় না। অফুরন্ত হাসির উৎস আজ তার প্রাণে লুটো পুটি খায় সে উল্লাসে।

—ওকি কথা লাল। আমি যে অবলা, জংলী, ক্ষমতাহীনা!

—তুই কালনাগিনী!—সর্ব শরীর জ্বলে যায় তার।

—সত্যি? তা হলে আমারও বিষ আছে?

[—বিষে আর সর্ব শরীর জর্জরিত। নির্জীব ক্ষমতাহীন এই শরীর দুর্বিষহ!

সাতপাঁচ

শ্রীনাথ

পকিস্তানী প্রচার দপ্তরের অপপ্রচারে প্রকাশ—ভারত অল্পদিনের মধ্যেই পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবে। এ প্রসঙ্গে নেপালী দৈনিক পত্রিকা 'স্বতন্ত্র সমাচার' মন্তব্য করেছেন, 'পাকিস্তানের প্রচার গোয়েবেল্‌সকেও হার মানিয়েছে।'

—ওদের অপপ্রচার যে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে!

স্বাধীনতা দিবসে কতিপয় রাজনৈতিক দল, ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের দিন ধার্য করেছিলেন—এমন শুভদিনকি হাতছাড়া করা যায়?

—পঞ্জিকা খুললেই বুঝতে পারতেন তাঁরা, 'সর্বদোষ হরে পুষ্যা'!

সংবাদে প্রকাশ, 'ইণ্ডিয়ান মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল' এবার এক ডজন লতা দিয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন।

—অবশ্য এর মধ্যে ললিত লবঙ্গ-লতা আছে কিনা জানা যায় নি!

বিদেশ সফরান্তে শ্রীকামরাজ দিল্লীতে এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'রাশিয়াতে দুধে এক ফোঁটা জল দেওয়া হয় না'।

—আমাদের ধারণা, রাশিয়ার অন্যান্য বিষয়ে অগ্রগতি হলেও, বেচারা গোয়ালারা আমাদের দেশের গোয়ালাদের চেয়ে এখনও অনেক পেছিয়ে আছে!

জনাব ভুট্টো স্বাস্থ্যের কারণে মন্ত্রিত্ব হ'তে অবসর গ্রহণ করে বিদেশে স্বাস্থ্য পুণরুদ্ধারের জন্য লণ্ডনে গিয়ে এক গভর্ণমেণ্ট ও মার্কিন সরকারের নিন্দা করেছেন।

—আমাদের মনে হয়, ভুট্টো সাহেবের মনের স্বাস্থ্য পরিবর্তনের আগে প্রয়োজন!

গত শনিবার ২০।৮।৬৬ তারিখে একটি পথের ষাঁড় কতকগুলো বালকের দ্বারা প্রহৃত হয়ে বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে রক্তাক্ত শিং নিয়ে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে ছুটাছুটি করতে থাকে।

—নির্বাক পশুটি বিচার প্রার্থী ছিল কিনা বুঝা যায়নি!

স্বাধীনতা দিবসে শ্রীকামরাজ বলেছেন, আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণ ইতিমধ্যেই অর্ধভুক্ত ও অর্ধনগ্ন—তাদের পক্ষে আর কোন কিছু ত্যাগ করা সম্ভব নয়।....কিন্তু যদি সম্পন্ন-লোকেরা ত্যাগ স্বীকার করেন, তা' হলে দেশ গঠন কার্যে বলিষ্ঠ সেবা করা হবে।

—কিন্তু "নাল্পে সুখমস্তি" এ শাস্ত্র বাক্য কি অমান্য করতেপারবেন তারা সহজে?

একটি সংবাদপত্রের শিরোনামা—'ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার সদ্ভাবে চীনের গাত্রদাহ'।

—এতে তাপমাত্রা কত ডিগ্রী উঠেছে জানা যায়নি!

সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব শ্রীম্যাকনামারা মন্তব্য করেছেন, 'সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ মূলতঃ হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ ছাড়া কিছু নয় এবং মার্কিন চাপেই তা' বন্ধ হয়েছে'।

—তাজ্জব ব্যাপার! দেখা যাচ্ছে, ভদ্রলোক খেয়ালখুশীর মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন; তবে কি "তাসখন্দ চুক্তি"-র কথা

ছোবল

(গল্প)

শ্রীউমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

—বল হরি—হরি বোল।

পায়রাডাঙ্গার অন্তর-আত্মা কেঁপে উঠল। ঘন বন জঙ্গল ঠেলে অমানিশার অন্ধকারের প্রান্তর থেকে ভেসে আসা বুকফাটা হাহাকার! নিশি মাঝে শবযাত্রীরা প্রত্যাবর্তন করছে। রুদ্ররূপ বটুকলালের সাধ্বী স্ত্রী মনোরমা তার স্বামী-অপদেবতার কঠিন আবদার মুখ বুঁজে বহুদিন সহ ক'রেও শেষ রক্ষা করতে পারলে না। সব বিষ! কোমল দেহলতা তুহিন-শীতল হয়ে গেছে। বটুকলালের বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে যায়····ধরে রাখতে পারলে না সে!

ভাজা খই-এর মত ছিটকে পড়ে গঙ্গা। রক্তবর্ণ চোখে তাকায় আকাশের দিকে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে হৃদয়ের জমাট বাষ্প।—জঙ্গল, পশু! সাজ সজ্জায়, চিকন-চাকনে বহুরূপী!

গঙ্গা শশী ঘরামীর মা-মরা একমাত্র মেয়ে····শিবরাত্রির সলতে। শশী মেহনতী শরীর দিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মেয়েকে চটকদার করে তুলতে কোন কার্পণ্য করেনি। তার বাঁকা নয়নের বিদ্যুৎ অনেকেরই বুকে শেল হানে। সে ছিল উত্তাল তরঙ্গময়ী স্রোতস্বিনী যেন! ক্ষীণ তটিনী নয়—বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় অসাবধানীদের!

সুযোগের সদ্ব্যবহারে বটুকলাল অদ্বিতীয়। ভবিষ্যতের চিন্তার দুর্বলতা তার নেই। বাস্তববাদী সে। নির্ভয়। শ্যেন দৃষ্টি তার প্রখর। ছোঁ মারা তার স্বভাব। স্বেচ্ছাচারী বটুকলাল! গঙ্গার জোয়ার স্তব্ধ, নিস্তেজ, নীরব। সহজিয়া ঘরের দুলাল বটুকলাল। হৃদয়ের ব্যবসায়ে দেউলিয়া হতে সে নারাজ। তাই গঙ্গার প্লাবনে সে ভাসে না। দৃঢ় হাতে ধরে রাখে সে অচঞ্চল হাল।

তালবোনার শান্ত বারুইএর ডাগর মেয়ে মনোরমা তার হাতের হাল চঞ্চল করে তুললো। বটুকলাল মুখ ফেরায় উজানে। সহজিয়া ঘর। কষ্ট হয় না ঘর বাঁধতে।

গঙ্গা রোষে ফোলে। কিন্তু বটুকলালের মতি তখন অপরিবর্তনীয়। বটুকলাল তখন মনোরমার গভীরে হাবুডুবু খেতে থাকে। গঙ্গা নৈরাশ্যে সরে যায়। ক্ষোভ-দ্বেষ বুকের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে জমে থাকে····যেন অন্তঃশীলা ফল্গু!

বটুকলালের আর ক'দিন। আঙ্গুলের হিসাবে ধরা যায়। কাল ভৈরবের তাণ্ডব তার শরীরে বয়ে চলেছে। যেন মহারুদ্র সে। ধীরে ধীরে আবার জেগে ওঠে বটুকলাল। পিয়াসী মন তার উদার আকাশের নীচে ডানা মেলে আবার উড়তে চায়। একঘেঁয়ে অন্ধকার নির্জন জীবনে তার দম বন্ধ হয়ে আসে!

আমতলার পাশে কেষ্ট সাহার ছোট্ট চালাঘরটির মধ্যে ভানুমতীর খেল চলতে থাকে। তার শিরা-উপশিরায় প্রত্যেক ধমনীতে লাভার প্রস্রবণ···মন যেন চঞ্চল কুরঙ্গ!

মনোরমা যেন পলাশ ফুল, তাই এত অনাদর। ভালবাসা-সোহাগ তার জীবনে স্বপ্ন বলে মনে হয়। বাস্তবে মূল্যহীন। অত্যাচারই তার একমাত্র প্রাপ্য। বিষাক্ত ক্লেদপূর্ণ জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। মোহ-আকর্ষণ সব শূন্যতার মাঝে বিলীন হয়ে গেছে।

সহজিয়া ঘরে স্ত্রীর কোন বিশেষ মর্যাদা নেই। স্ত্রী সহচরী, সেবা-দাসী। স্বামী বা প্রভুর সেবা যত্নে আত্মাহুতি দেবে সে। তাতেই পরম তৃপ্তি তার। এতে স্বামীর মনে কোন দাগ কাটে না। তারা প্রজাপতির মত মধু খেয়ে

বৃষ্টির ধোঁয়ায় রামধনু উঠেছে আকাশে। এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে তার পরশ। বল্‌গা-হীন মন....কোন বন্ধন বা পিছন টানের আশঙ্কা আর নেই। নির্জন বন-প্রান্তে নদীর ধারে সকলের চোখের আড়ালে চলে সেই পুরাতন অভিসার।

ফুলঝুরি ঝরে মুখ দিয়ে। চারধারে ছিটকে পড়ে সোনার টুকরো। জাদুকরের সম্মোহন....তন্ময় হয়ে যায় গঙ্গা। ছাড়া কলসী দোল খেতে থাকে জলের গভীরে। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো মনের কিনারায় টেনে আনে সে।

—কতদিন তোকে দেখিনি গঙ্গা। কিন্তু কি চেহারা হয়েছে রে তোর!

গঙ্গা বাঁকা চোখে তাকিয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসে। রঞ্জন রশ্মি....দেহে যেন আগুন জ্বলে ওঠে!

—হাসছিস হাস্। আমি এখন পর।

—আজ তোমার খুব দুঃখু, নয় গো?

—কেন?

—ইস্ত্রী মারা গেল।

—ধ্যেৎ! ও দুঃখু-টুখ্যু আমার ধাতে সয় না।

—সে জানি গো, জানি। নইলে কি আজ আমার এই দশা হয়!

—সত্যি, তোর কি হয়েছিল রে?

—ব্যামো—বড় ব্যামো। মাঝিই তো ভাল করে তুললো আমাকে।

কথা বলার অবসরে কখন ময়াল সাপ পেঁচিয়েছে তাকে! গিলবে শনৈঃ শনৈঃ! ক্ষমতাহীনা হয়ে যায় সে। অসাড় পাথর তার শরীর। নড়তেও ইচ্ছা করে না। কিন্তু হঠাৎ যেন গড়ুরের আবির্ভাবে নাগপাশ মুক্ত হ'তে হয় তাকে।

মঙ্গল মাঝি হঠাৎ এসে অকুস্থলে উপস্থিত হয়। জিজ্ঞাসা করে—তু হেথায়! আর হামি তামাম গেরাম ঢুঁড়ে মরছি।

—আঃ মর্ মিনসে! কলুর বলদ কোথাকার, চোখে যেন ঠুলি বাঁধা!

বোবা-দৃষ্টি মঙ্গলের। বুঝতে চেষ্টা করে সে।

মঙ্গলের জন্ম উত্তর প্রদেশে। নৌকার গুণ টানতে চরে নৌকা গেল আটকে। দড়ি ছিঁড়ে মাঝি হ'ল কুপোকাত! আশ্রয় পেল গঙ্গার বুকে। গঙ্গাও আবার অবলম্বন পেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বটুকলাল ধূমকেতুর মত উদয় হয়। শান্ত নীল আকাশটা গরমে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু মঙ্গল শুধু অভয় নয়, সাহসও জোগায়। বেহস্তের হুরি। বন্ধক বা গচ্ছিত থাকে না এক জায়গায়। পঞ্চ পাণ্ডবের দেশে জন্ম তার। দেশে ছোট ভাই রঘুয়ার হেপাজতে রয়েছে তার মনুয়া। সে নির্বিকার!

আগের কথারই জের টেনে মঙ্গল বলে—তু বল্, হাসি কেমনে সম্‌ঝাবে, এ সময়ে তু নদীর কিনারে।

—না, নদীর কিনারে হবে না তো—তোর জন্য ঘরে বসে বসে মালা গাঁথবে!

—সত্যি, সাচ্ বাত, এসি ওয়াস্তে তুকে হামারা আচ্ছা লাগ্‌তা। তু ভারি রসিক আছিস।

—যা—যা—ভাগ্। কি আমার রসিক নাগর রে! ঘরে যা। তোর মনুয়া পথ চেয়ে কাঁদছে।

—নেহি—নেহি, কভি নেহি। এই মান্ পিয়ার উসকা পছন্দাই নেহি।

—সব মিন্‌সের এক বোল্। যা—যা, গায়ে হাত দিস না আমার।

—চলো-চলো, গোঁসা মাত করো।

আর উত্তরের অপেক্ষায় না বসে থেকে মঙ্গল টেনে নেয় গঙ্গাকে। দৈত্য-কঠিন তার হাত। গঙ্গার ফোলা ফাঁপা শরীরটা এলিয়ে পড়ে। যেন স্বর্ণলতা! পরাশ্রয়ী, কিন্তু খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সে। আজ মঙ্গল তার আদর্শ—তারই সেবা যত্নে সে আজ মঙ্গলময়ী!

আজ আকাশ একবারে ফাঁকা। খাঁ-খাঁ করে গঙ্গার নিভৃত অন্তর। ময়াল সাপের বন্ধনের দাগ শরীরে না হোক মনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে। আবেশে চোখ বুঁজে আসে তার। কুহকের বংশীধ্বনি শোনে সে কানে। মন তার আনচান করে ওঠে।

জ্বলন্ত আগুন শরীরটা তার লাল গন গনে হয়ে ওঠে। উত্তপ্ত নিশ্বাসে এগিয়ে যায় গঙ্গা। সাপটা আজ খোলস

পিটুর দাদু

হিরণ্ময়ী বসু

জানলার ধারে চুপটি করে বসে আছে পিটু। সামনের আকাশটাতে কে যেন এক মুঠো আবীর ছড়িয়ে লাল করে দিয়েছে। সেই হোলির সময়ে রুমু, বুলু, মিতা, ময়না, যেমন করে মুঠো ভরে লাল রং ছড়িয়ে দিয়েছিল পিটুর মুখে, মাথায়, জামা,-কাপড়ে। তখন পিটু হাঁটতে পারত, ছুটতে পারত, আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের মত হুড়োহুড়ি করে বেড়াত। কতই বা বয়েস ছিল তখন পিটুর!

ওর মা মণিমালা বলতেন, চার বছরের ছেলে হলে হবে কি? কি দস্যি বাবা! এক দণ্ড স্থির হয়ে বসে না।

কথার যেন খই ফুটছে। এটা কি, ওটা কি, এটা কেন হল, ওটা কেন হল? এত প্রশ্নের উত্তর দিতে পিটুর বাবা মহিমবাবু ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তবু বিরক্ত হতেন না।

মণিমালা বলতেন, মারো না একটা চড়! খেটে খুটে ফিরে মানুষ এত কথা বলতে পারে?

মহিম হাসতেন। বলতেন, না-না, কোনদিন ওকে তুমি মেরো না মণি। এই তো বয়েস, সব জানবার চেনবার। এখন ওকে থামিয়ে দিলে যে, বরাবরের জন্য ও থেমে যাবে।

কথার মাঝখানেই ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলত পিটু, 'মা-মণি, বলো না চাঁদমামা কে হয় ঐ ঝাঁকড়া মাথা গাছটার? রোজ রোজ ওর ওপরেই উঠে বসে কেন? আমাদের ছাদে আসে না কেন?

পিটুকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে মণিমালা তখন চাঁদের গল্প বলতে শুরু করতেন। মারা তো দূরের কথা, বকতেও ভুলে যেতেন।

একটি মাত্র ছেলে পিটু। তার ওপর দেখতে যেমন ফুটফুটে, তেমনি সুন্দর স্বভাব। কিণ্ডারগার্টেন ফার্স্ট-এর সেরা ছেলে চার বছরের পিটুবাবু। খেলায় পড়াশুনায় সবেতে সেরা। সব ভাল ছিল পিটুর, কিন্তু স্বাস্থ্যটা যেন মাঝে মাঝে ওকে হিংসা করে জব্দ করে দিত।

পিটুর পাঁচ বছরের জন্মদিনের কথা ওর মনে পড়ে। খুব ঘটা করে জন্মদিন হয়েছিল সেবার।

স্কুলের বন্ধু, পাড়ার বন্ধু, আত্মীয় স্বজনরা অনেকেই এসেছিল সেদিন। বসবার ঘরটায় উপহারের পাহাড় জমে উঠেছিল। কত ছবির বই, দম দেওয়া ইঞ্জিন, উড়ো জাহাজ, ছবি আর কথা তৈরীর বাক্স, টেবিল ল্যাম্প, কলম আর রকমারি খেলনায় দু-তিনটে টেবিল উপচে উঠল!

পিটুর বন্ধুরা কেউ ছড়া বলল, কেউ গান গাইল। মিতা আর কেয়া ধানের ক্ষেতে রোদ ও ছায়ার গানটার সঙ্গে সুন্দর নেচে দেখাল। সবাই ধরল পিটুকে একটা আবৃত্তি করার জন্য। পিটুর শরীরটা কেমন যেন খারাপ করছিল, তবু সে একটা চমৎকার আবৃত্তি করল। সবাই পিটুকে খুব আদর করল। তারপর রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে যে যার বিদায় নিল।

সেই রাতেই হ'ল পিটুর ভীষণ জ্বর। জ্বরের তাপে আর শরীরে যন্ত্রণায় সে খুব কাতর হয়ে পড়ল। ছোট্ট নরম শরীরটা তার একেবারে কুঁকড়ে গেল যেন।

ভোর বেলায় পিটুর বাবা ডাক্তার ডেকে আনলেন। একে একে তিনজন বড় ডাক্তার এলেন। সাতদিন পর্যন্ত যমে-মানুষে টানাটানি চলল। তারপরেও পিটুর তিন মাস ধরে চিকিৎসা হল, কিন্তু কোমর থেকে পায়ের দিকটা তার সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেল। ডাক্তাররা ভরসা দিলেন, পোলিওতে এমন হয় বটে, কিন্তু রোগী আবার সেরে ওঠে, চলাফেরা করতে পারে। তবে অনেক সময় লাগবে, হয়তো দু'তিন বছরও লাগতে পারে।

সেই থেকে পিটু যেন কেমন হয়ে গেল। কথায় কথায় হাসি, ছুটোছুটি, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যে বাড়ীটাকে সে মাতিয়ে রাখত, সেই বাড়ীটা যেন একটা নিঝুম পুরী হয়ে গেল। মণিমালা সব কাজ ফেলে পিটুকে গল্প শোনান, ভাল ভাল বই পড়েন, দেশ বিদেশের জ্ঞানী লোকের কথা বলেন।

পিটু চুপটি করে শোনে। ছোট্ট ইজিচেয়ারটায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ে আর জানলার ফাঁক দিয়ে রাস্তা দেখে।

রাস্তার ওপাশে ঝাঁকড়া মাথাওলা বট গাছের ছায়ায় কত লোক বসে বিশ্রাম করে। কত ভিখারী আর সাধু সন্ন্যাসী এসে ধুনি জেলে বসে। পিটু চেয়ে চেয়ে দেখে।

পাড়ার কত লোক পথে যেতে-আসতে থমকে দাঁড়ায়। জানলার গরাদ ধরে পি র দিকে চেয়ে বলে, কেমন আছিস পিটু এইতো বেশ মোটা হয়েছিস, আর কদিন পরেই ভাল হয়ে যাবি।

পিটুর মুখে হাসির ছ া পড়ে, কিন্তু হাসি ফোটে না। ও বলে, সত্যি বলছ তোমরা, আমি ভাল হব, আবার হাঁটতে পারব?

সবাই বলে, নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবি, ঠাকুরকে ডাক, ভাল হয়ে যাবি বইকি!

তবু পিটু ভাল হয় না, তিনটে বছর পার হয়ে যায় একই অবস্থায়।

মণিমালাও বলেন, তুমি ঠাকুরকে ডাক পিটু, তিনি সবচেয়ে বড় ডাক্তার। তাঁর মতো ওষুধ কেউ দিতে পারে না। তিনি ইচ্ছা করলেই তুমি সেরে যাবে।

বার বার মায়ের মুখে এই কথা শুনে পিটুর মনেও দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল, নিশ্চয়ই ঠাকুর একদিন আসবেন, আর পিটুর হাত ধরে ওকে দাঁড় করিয়ে দেবেন। সেদিন পিটু আবার দু-পা ফেলে ছুটবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে মায়ের কোলে। মা বলেছেন, বিশ্বাসে মিলায় ভগবান। পিটু তো বিশ্বাস করে, কিন্তু কবে, কবে সেদিন আসবে? ঠাকুর তো কই এলেন না এখনও?

দু' চোখ ছাপিয়ে জল ঝরে পড়ে তার। আকাশের রং বদলান দেখে পিটু। গাছের পাতা-ঝরা দেখে আর যত ভিখারী আসে তাদের ছোট্ট মুঠো বাড়িয়ে একটা করে পয়সা দেয়। ওরা আশীর্বাদ করে, ভাল হবে খোকাবাবু, তুমি রাজা হবে।

পিটু কখনও হাসে, কখনও কাঁদে। অভিমানে ওর ছোট্ট বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়।—কেমন করে রাজা হব? আমি যে পঙ্গু, খোঁড়া, আমার পক্ষীরাজ কই? আমি কেমন করে সিংহাসনে বসব, আমি যে চলতে পারি না।

পিটুর কান্না শুনে ছুটে আসেন মণিমালা। পিটুর ঠাকুর তুমি মুখ তুলে চাও। হে ঠাকুর, তোমার অসাধ্য ত কিছুই নেই। তুমি রাজার রাজা, তুমি ডাক্তারের ডাক্তার, তোমার আশীর্বাদ দাও।

এমনি করেই এগিয়ে চলে পিটুর দিন। তারপর একদিন ভয়ঙ্কর ঝড় উঠল। বৈশাখী বুদ্ধ-পূর্ণিমা ছিল সেদিন। পিটু সেই জানলায় বসেছিল। দেখছিল, কালো কালো মেঘের ছোটাছুটি, গাছগুলোর নুয়ে নুয়ে পড়া, বিদ্যুতের তীব্র ঝিলিক। দেখছে আর ভাবছে, সবাই ছুটে চলেছে —মেঘ, বাতাস, আলো—কেবল পারে না চলতে পিটু!

বড় বড় কালো চোখে জল ভরে আসে। পিটু এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। হঠাৎ ওর নজরে পড়ল একটা থুরথুরে বুড়ো লাঠিতে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে এগিয়ে আসছে, কিন্তু ঝড়ে তাকে ঠেলে ঠেলে পেছিয়ে দিচ্ছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল বুড়োটা ঠিক পিটুর ঘরের জানলা বরাবর এসে, আর কাঁপা গলায় চীৎকার করে উঠল, 'ওরে কে আছিস, বাঁচা।' বুড়ো হাত দুটো যেন কেমন আশ্চর্য ভাবে বাড়িয়ে ধরল পিটুর দিকে।

পিটু কেঁদে উঠল, ওগো আমি যে খোঁড়া, তোমায় তুলব কি করে? তুমি এসো আমাদের বাড়ীর ভেতরে।

বুড়োটার থোকা থোকা সাদা চুল বাতাসে নড়ছে, হাতের লাঠি ঠকঠক করে কাঁপছে, আর কাঁপা গলায় সে বলছে, 'ধর ধর দাদু, আমার হাত দুটো চট্ করে চেপে ধর, নইলে এক্ষুণি পড়ে মরে যাব।'

ভীষণ জোরে একটা বাজ পড়ল আর পিটু সব ভুলে লাফিয়ে উঠে জানলার ভেতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে বুড়ো দাদুর হাত দুটো চেপে ধরল।

বুড়ো ফোকলা দাঁতে মধুর হেসে বলল, আয় দাদু, আয়, দরজা খুলে আমাকে ভেতরে নিয়ে যা। ছুটে আয়, ঘুরে আয়।'

পিটু আর একটিও কথা না বলে ছুটে গেল সদরের দিকে। পিটুকে ওভাবে ছুটে আসতে দেখে রান্নাঘর থেকে মণিমালাও অবাক হয়ে ছুটলেন ওর পেছনে। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না মণিমালা। সাত বছরের রুগ্ন পঙ্গু পিটুর গায়ে যেন কত শক্তি, কত বল! পেছন ফিরে তাকাল না পিটু। নিজের হাতে সদরের খিল খুলে ঝড়ো হাওয়ার ভেতর রাস্তায় নেমে পড়ল।

জাগো, জননি জাগো!

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

জাগো, জননি জাগো!
তোমার আর্ত-সন্তান আজ
ডাকিছে তোমারে মাগো!
চারিদিক ঢাকা নিবিড় আঁধার,
আলোকের রেখা নাই কোন ধার,
মোহ-রাত্রির মাঝে তুমি আজ
জীবন-প্রদীপ জ্বালো!
আঁধার নিখিলে জাগাইয়া তোল,
তোমার প্রাণের আলো।
জাগো, জননি জাগো!
তোমার আর্ত-সন্তান আজ
ডাকিছে তোমারে মাগো!

অভাব-দৈন্য-হতাশার মাঝে
ডুবেছে বিশ্ব সারা,
কাঁদিছে নিঃস্ব নিপীড়িত যত
সব আনন্দ-হারা!
দুঃখের মাঝে আনো সান্ত্বনা,
দূর ক'রে দাও বুকের বেদনা,
তব অম্লান জ্যোতির আভায়
দিগন্ত উদ্ভাসো!
অন্তর-মসী মুছে দিয়ে তুমি
মধুর হাসিটি হাসো।
জাগো, জননি জাগো!
তোমার আর্ত-সন্তান আজ
ডাকিছে তোমারে মাগো!

হৃদয়-কমলে রাখো মা তোমার
অভয় চরণ দুটি,
দিগন্ত ভ'রি তোমার প্রকাশ
বিশ্বে উঠুক ফুটি'!
অধরা তুমি মা দাও আজ ধরা,
এস সম্মুখে বরাভয়-করা,
অসুর-নাশিনী মূর্তি-ধরিয়া
বিনাশো অশুভ-গ্লানি,
এস কল্যাণি, বিশ্বজননি,
শুনাও অভয়-বাণী!
জাগো, জননি জাগো!
তোমার আর্ত-সন্তান আজ
ডাকিছে তোমারে মাগো!

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ডাক দিল পিটু, দাদু—দাদু, এই যে আমি এসেছি, তুমি কোথায়? এসো দাদু, এসো।

কোথায় দাদু? দাদু কি তবে পিটুর মনের ঠাকুর? পিটুর দাদু কি তবে মিশে গেল ঐ ঝড়ো হাওয়ায়? পিটুর কাতর প্রার্থনা শুনে বুঝি একটি বারের জন্য ছুটে এসে ওর হাত ধরে ওকে সচল করে দিয়ে মিশে গেল আকাশের অতল রহস্যে!

ঝড় কোথায়? ঝড় থেমে গেছে। আকাশে আবার ফুটে উঠেছে স্নিগ্ধ কোমল আলো। পিটুর জীবনেও সব অন্ধকার কেটে গেছে। আবার আলোয় ভরে উঠেছে ওর সামনের অনাগত দিনগুলো!

সম্পাদক—শ্রীতপনকুমার মিত্র

Printed by Tapankumar Mitra at Sisir Printing Works, 22-1, Bidhan Sarani, Calcutta, and Published by the same, from Sisir Office, 22-1, Bidhan Sarani, Calcutta-6.

৪৬শ বর্ষ | কার্তিক, ১৩৭৩ | ৫ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

ছাত্র সমাজে এ-উচ্ছৃঙ্খলতা কেন ?

সমগ্র ভারত জুড়ে আজ ছাত্র-বিক্ষোভের প্রচণ্ড জোয়ার দেখা দিয়েছে। তুচ্ছ-বৃহৎ যে কোন কারণ উপলক্ষ করে আরম্ভ হয়েছে এই ছাত্র-বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভের পেছনে কতখানি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং কতখানি ন্যায্য অভাব-অভিযোগ প্রতিকারের দাবি আছে, তা' এখনও পর্যন্ত সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নয়। এই ছাত্র-রোষের প্রাবল্যে হতচকিত ভারত-সরকার সমস্যার মূল উৎস সন্ধানের আশায় এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি নিয়োগ করেছেন।

বাইরের উস্কানিতেই হোক কিংবা অভাব অভিযোগের প্রতিকারের দাবিতেই হোক, ছাত্র সমাজের এক অংশ

পুলিসের পক্ষে হস্তক্ষেপ ছাড়া উপায় থাকে না। অনেকে বলেন, পুলিস যদি মাথা ঠাণ্ডা রেখে কর্তব্য পালনে সমর্থ হয়, তবে হয়ত বিক্ষোভের বহিঃ প্রকাশ এতটা তীব্র নাও হতে পারে। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, পারস্পরিক উস্কানির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানবতার তুলাদণ্ডের ওজনে কর্তব্য নির্ধারণ সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অভিযোগ জানানোর উদ্দেশ্যে ছাত্রদের রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার নিন্দা করেছেন। তিনি এ-ব্যাপারে পিতামাতা ও অভিভাবকদের সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন। ছাত্রেরা যখন ঈপ্সিত সংযমের পরোয়া না করে রাস্তায় বেরিয়ে এসে ধ্বংসে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাদের ছাত্র-সুলভ সুকুমার বৃত্তিগুলি

বিরোধী। আর উভয় পক্ষের আতিশয্যের ফলে যে অনর্থ ঘটে, তার ঘাত-প্রতিঘাত সহজে থামতে চায় না। এই অসহনীয় অবস্থার প্রতিকারের উপায় হচ্ছে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন হওয়া।

বাস্তববাদী বলে পরিচিত শ্রীকামরাজ ছাত্র-বিক্ষোভের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকেই অভিযুক্ত করে বলেছেন যে, ছাত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার এবং গণনেতাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার যোগসূত্র ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছে। একে অন্যের উপর দোষারোপ করেই স্বীয় দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করছেন। ফলে অবস্থা ক্রমশই জটিল হয়ে পড়ছে। ছাত্রেরা যখন শান্তিপূর্ণ উপায়ের আশ্রয় না নিয়ে নৈরাজ্য এবং ধ্বংসের উন্মত্ত নেশায় মেতে ওঠে, তখন নিঃসন্দেহে তারা শাস্তির যোগ্য। আবার কর্তৃপক্ষও যদি নৈরাশ্য-জর্জরিত ছাত্রদের ন্যায্য অভাব-অভিযোগের তদন্ত এবং প্রতিকারের ব্যবস্থায় গড়িমসি করেন, তবে কর্তব্যচ্যুতির অভিযোগ থেকে তাঁরা রেহাই পেতে পারেন না।

ছাত্র-বিক্ষোভের হয়ত যথেষ্ট সঙ্গত কারণ থাকতে পারে। কিন্তু তার জন্য অধৈর্য হয়ে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা মোটেই ছাত্রোচিত কাজ নয়। আবার অনেক সময় দেখা যায়, ছাত্রদের দাবির যুক্তিবত্তা কিছুটা নেহাতই দাবির পর্যায়ভুক্ত। অতীতের ঘটনা থেকে দেখা গেছে, বিক্ষোভের ফলে কিছুটা দাবি আদায় হয়। এই বিক্ষোভের নিকট নতি স্বীকার করে সরকার এক বিপজ্জনক নজির সৃষ্টি করে চলেছেন। এ বিপজ্জনক নজির গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে।

বহুবিধ সমস্যা আজ আমাদের ঘিরে ধরেছে। খাদ্য, নিরাপত্তা, আভ্যন্তরীণ আইন ও শৃঙ্খলা প্রভৃতি বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি আমরা। এই অবস্থায় ছাত্র-সমাজ যদি সমস্যার গুরুভার না বাড়িয়ে গঠনমূলক মনোবৃত্তি নিয়ে দুর্গত সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়, তবে তাই হবে জাতির অগ্রগতির অপরিহার্য পাথেয়। এর জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সংযম ও সহানুভূতির সঙ্গে পারস্পরিক অসুবিধার উপলব্ধি।

ছাত্র-সমাজের আজ এই উপলব্ধির দিন এসেছে যে, কেবলমাত্র দাবি আদায়ই নয়, দায়িত্বের বোঝাও তাদেরই গ্রহণ করতে হবে। জাতির ভবিষ্যৎ হিসাবে তাদের সুনাগরিক রূপে গড়ে উঠতে হবে। নতুবা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভিত্তিমূলে এই ছাত্র-অসন্তোষ কঠিন আঘাত হানবে বলে যথার্থই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

উত্তরায়ণ

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

উত্তরের হাওয়া যখন নেমে এল
সূর্য-তেজ বাড়ে ধীরে ধীরে……
উত্তরায়ণ।
তির্যক জীবনে ক্রান্তি বদলের পালা—
কোথা থেকে কোথা বলা যায় না।
তবু যেমন—
প্রকৃতির গতিতে নিজেকে মানিয়ে নাও
উত্তরায়ণের গতি।
বসে বসে ভাববার নিবিড় সঙ্কল্প।—
সেদিন আর নেই।
বহুদিন আগের গত সেই ফসিল
গবেষণার পাত্র তারা।

গতিই জীবন, গতিই সংগ্রাম।
যত গতি তত জয়।
একটি সীমাবদ্ধ জীবনের অনেক কাজ।
গতি না থাকলে অসমাপিকা ক্রিয়ার মত
দুর্বোধ্য জিজ্ঞাসা।
ভয়হীন প্রতি পদে নিখেলিত।
এ সবাই জানে—
বোঝে খুব কমই—
তবু কালের গতি-চক্রে এ সত্যটাকে
ভুলে রোজই জাগে উৎসাহ।

সত্যিই রাজযোটক বেশ!

সাতপাঁচ

শ্রীনাথ

রুমানিয়া সফরের সময় চৈনিক প্রধানমন্ত্রী চু-এন-লাই বলেছেন, কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য ভিয়েৎনামের যদি ধ্বংস হয় তবু ভাল।

—কবির ভাষায়,

"তোরা যে যা' বলিস ভাই—
আমার সোনার হরিণ চাই।"

কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা টিকটে সিনেমার বিজ্ঞাপন দিয়ে আয় বাড়াচ্ছেন।

—ভবিষ্যতে চিত্রতারকাদের ছবি থাকলেও আমরা আশ্চর্য হব না।

সংবাদে প্রকাশ, কচ্ছের রণ এলাকায় গুপ্তচরের কাজে পাকিস্তান কুকুর ব্যবহার করছে।

—চীনা কুকুর কিনা জানা যায় নি!

দিল্লী চিড়িয়াখানায় একজোড়া সোনালী বিড়াল এসেছে।

—স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধি সংশোধনের পর, সোনালী বিড়ালের আদর বাড়ছে কিনা, দর্শকেরাই বলতে পারেন!

লোকসভার আগামী অধিবেশনের প্রথম আলোচ্য বিষয় হবে, বিড়ি ও সিগার কর্মী কল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়টি।

—সে-সঙ্গে ধূমপায়ীদের উৎসাহ দান, বিষয়টির অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা জানা যায় নি।

সাপের বিষ রপ্তানির উদ্দেশ্যে, 'স্নেক বাইট রিলিফ সোসাইটি'র উদ্যোগে রায়পুরে শুধু সাপে ভর্তি এক বাগান স্থাপিত হচ্ছে।

—বাগানে দু-মুখো সাপের ঠাঁই হবে কিনা সংবাদে সে কথা বলা হয়নি অবশ্য।

শ্রীরাজাগোপালাচারী চতুর্থ যোজনায় খাদ্য সমস্যা সমাধানের এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করে বলেছেন, 'আমাদের ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ইঁদুর-কুকুর-কাক প্রভৃতি প্রাণীর মাংস আমাদের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে'।

—খাদ্যটা ছুঁচো-পাজিদের জন্য কিনা সঠিক জানা যায় নি!

সোভিয়েট দেশে যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতা কমানোর জন্য প্রকাশ্য ভাবে তাদের মস্তক মুণ্ডনের ফতোয়া জারীর ফলে যুব উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে।

—জানিনা, "বোল্ রাধা বোল্—" গানের গুঞ্জন পুরাহ্নেই তাদের কানে গিয়েছে কিনা!

মধুমিতাকে

চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

আমার পথের চলার দুঃখ একদা আদরে নাশি,
অনেক আরাম তুমি অন্তরে দিয়েছিলে ভালবাসি।
আজি কাছে নেই ভুলেও তোমার মনে যদি স্মৃতি জাগে,
ভাসে প্রাণপটে সে মধুযামিনী যেমনটি ছিল আগে!

যদি দোলা লাগে বসন্তকালে একেলা নিরালা রাতে,
অথবা আবার চোখে আসে জল শরতের মিঠে প্রাতে—
সেরা সঞ্চয় তাহলে মানিব এখনো এ ভাঙা মনে,
পরিচিতা তুমি কমিও আমার আলাপ তোমার সনে।

লহমার লাগি হঠাৎ কখনো বন্ধুর মেলে দেখা,

মুহূর্তের জন্যে

সংশ্লিষ্টা

আমাদের জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে এখন ৫০ কোটি ছুঁইছুঁই করছে। এই বিরাট সংখ্যক জনসমষ্টি বাস্তবিকই সমস্যার বিষয়। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে অস্বাভাবিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে থাকলে, সেটা দেশের পক্ষে মোটেই কল্যাণকর নয়। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ তথা জন্ম-শাসন আমাদের পাঁচ সালা পরিকল্পনায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে।

জন্ম-শাসনের বহু সনাতন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কিন্তু আমাদের পরিবার-পরিকল্পনায় কার্যসূচী প্রধানতঃ আই-ইউ-সি-ডি বা লুপ পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে রচিত। পদ্ধতিটি কেবল যে সবচেয়ে কার্যকর ও নিরাপদ তাই-ই নয়, যে-দেশে অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর এবং যে দেশে ধর্মীয় কুসংস্কার মানুষের জীবন যাত্রা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে অনেক-খানি প্রভাবিত করে, সে-দেশে জন্ম-শাসনের সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা হিসেবেও এটি স্বীকৃতি লাভ করেছে।

কিন্তু সাম্প্রতিক এক সংবাদে প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবার পরিকল্পনা অভিযান "গুরুতর বিপর্যয়ে"র সম্মুখীন হয়েছে। আগে যেখানে গড়ে প্রতি মাসে ১০ হাজার মহিলাকে 'লুপ' দেওয়া হতো, সেখানে এখন ঐ সংখ্যা ৩ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। তার চেয়েও মারাত্মক কথা, যাঁরা ইতিমধ্যেই লুপ নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ১০ জনেরও বেশী লুপ পরিত্যাগের জন্য পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলিতে ভীড় করছেন। এর ফলে কি 'লুপ' প্রয়োগের পদ্ধতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে?

সরকার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, লুপ থেকে ক্যান্সার হয় এই ভ্রান্ত ধারণা থেকেই লোকের মনে লুপ গ্রহণে অনাগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য-সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, এ পর্যন্ত ক্যান্সারের কোন ঘটনা তাঁরা পাননি বটে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে লুপ ততটা কার্যকর হয়নি, কেননা রক্তপাত ইত্যাদি বিভিন্ন যেখানে লুপ প্রধানতঃ এদের মধ্যেই প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানে লুপ প্রয়োগে যদি রক্তপাত ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলে জনসাধারণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। আর এইভাবে আভ্যন্তর ক্ষতি সাধিত হলে তা থেকে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই, একথাও বলা যায় না। গত এক বছরে ১ লক্ষ ৬০ হাজার লুপ প্রয়োগের মধ্যে যদি ১০ শতাংশ ব্যর্থতার সরকারী হিসারটিই সত্য বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলেও এটা কম উদ্বেগজনক নয়।

অন্যান্য দেশে—বিশেষ করে দূর প্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে—'লুপ' অভিযান যে রকম ব্যাপক ভাবে সফল হয়েছে, তাতে আমাদের পক্ষে এইভাবে ব্যর্থতা বরণ করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। 'লুপ' অভিযানের যদি কোন ত্রুটি থাকে, সেটা প্রতিকার না করেই যদি কার্য-সূচীতে ঢিলে দেওয়া হয়, তাহলে সেটা হবে আরও দুর্ভাগ্যজনক!

*　　　*　　　*

পূর্ব-ভারতে দুর্গাপূজা থেকে শুরু করে, উত্তর ভারতে দশহরা এবং দক্ষিণ ভারতে দেওয়ালি ও গণেশ পূজা আমাদের দেশের প্রধান জাতীয় উৎসব। এ সময়ে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেকেই প্রিয়জনকে পছন্দ মত বসন ভূষণে সাজানোর জন্য চেষ্টা করে। তার জন্য সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করতেও তারা কুণ্ঠা বোধ করে না। এ হেন মোক্ষম সময়ে কাপড়ের দর চড়ানো এদেশে একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত বছর পর্যন্ত দর চড়ানোর মওকা চলছিল বেসরকারী বিভিন্ন পক্ষের—কলওয়ালার, মহাজনের ও খুচরা ব্যবসায়ীর ষড়যন্ত্রে। এবার স্বয়ং কেন্দ্রীয় সরকার ১লা অক্টোবর থেকে "কণ্ট্রোল" কাপড়ের দর চড়ানোর অনুমতি দিয়ে পরোক্ষভাবে এ জালে জড়িয়ে পড়েছেন।

সত্য প্রচারে ভাষা দাও

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ

আশা দাও প্রভু, আশা দাও,
সত্য প্রচারে ভাষা দাও,
না-বলা বাণীর যাতনা হইতে
　　এবার আমায় ছুটি দাও।
মহাসুপ্তির ঘোর ভেঙ্গে দিয়ে
মহাজাগরণে টেনে নাও,
আশা দাও প্রভু ভাষা দাও,
　　অধিনীর পানে ফিরে চাও।

ধরণীর ব্যথা করো অনুভব
নিয়ে এস তব বিত্ত বৈভব,
মূঢ় চিত্তে জাগাতে চেতনা
　　পুনরাগমন হক ভবে,
নব রূপে এস নরনারায়ণ
　　বুঝুক বিশ্ব অনুভবে।

অধর্মের এই ভীষণ প্লাবনে
গভীর হতাশা বহুর পরাণে,
সকল শঙ্কা দূর করে দিয়ে
এস হে ধর্ম সংস্থাপনে।

কলির প্রভাবে কালো হল ধরা
ধর্মভীরুরা বেঁচে থেকে মরা
বজ্রনিনাদে শঙ্কা হরিয়া
　　সাহস জাগাও ভীরু মনে,
হ'ক সাক্ষাৎ ওগো দীননাথ
　　এ মর ধরায় তব সনে।
সারা জগতের হতাশার ব্যথা
　　দোলা দেয় প্রভু মনে-প্রাণে।

পুনরাগমন প্রার্থনা করি
বেদনা ব্যাকুল কেঁদে কেঁদে মরি,
মনে মনে তব শ্রীচরণ ধরি
গভীর আঁধারে আলোক নেহারি,
তুমি বিনা আর কে পারিবে বল
　　শান্তি আনিতে বিশ্বে,
অপার অতুল করুণা বিতরি'
　　ধনী করে দাও নিঃস্বে
নব রূপায়ণ হক ধরণীর
　　ধর্ম রহুক শীর্ষে।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ)

করে বলেছেন যে, 'গত ২' বছরের মধ্যে মাত্র তিন দফায় কণ্ট্রোল কাপড়ের দর ৬ থেকে ৮ শতাংশ চড়েছে। সে তুলনায় অন্য সব রকম পণ্যের দর চড়েছে অনেক বেশী।' অতএব মূল্যবৃদ্ধির এ-সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়!

রাখো। আবার অন্যদিকে ধাপে ধাপে দর চড়ানোর সুপারিশ করছেন। সর্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকারের একজন মন্ত্রী যে এরকম চালোয়া যুক্তির দ্বারা কাপড়ের কলওয়ালা-দের আরও মুনাফা শিকারের ব্যবস্থা করে দেবেন—সে

চোখের চকোর

সাধন চৌধুরী

হে তপতী, তোমার দখিনাচলে
যবে তুমি জেলে দিলে দীর্ঘ দীপাবলি
রাত্রির পড়ন্ত প্রহরে, সে-জ্যোতি করেছি বরণ আমি
আমার বিমুক্ত বিরাজে! সুদূরের শশিকলা তুমি
স্বপ্নের শিখরে এসে ললিত ললাম
এঁকেছিলে জানি আমি
প্রীতির ফাগুয়া দিয়ে। রণিত এক বিঘূর্ণ বিসারে
দেখেছি তোমারে। তোমার সমীহা দোলে—দোলে আজ
হেমন্তের মধুর হিন্দোলে। অবশেষে
ধীরে এসে নিয়েছ আশ্রয় তুমি
প্রেরণার পোতাশ্রয়ে। হে তপতী,
তব তক্ষশিলাতটে
বল বল জাগে আজ কার কুহরণ? অপ্রতিম অবকাশে
কার তরে এনেছিলে
অবলগ্ন অযুত আমন্ত্রণ?
চেতনার চতুরঙ্গে
দেখেছি তোমার নক্ষত্র নর্তন।
প্রমোদ-প্রবাহে—রূপ রসায়নে
তোমার মলিদাখানি
ধীরে ধীরে ডুবেছিল জানি! বেগার্ত বিদ্যুতে
পূর্বাশার পরিপত্র হাতে
নিধুবনে
বল বল কেন তুমি গিয়েছ গোপনে?
ঘূর্ণির ঘনিমা নিয়ে
তোমার চোখের চকোর
কার তরে ফেল বল
আজি অশ্রুলোর
ছান্দসী ছায়ায়!

সেক্সপীয়র

শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়

ইংলণ্ডের সমুদ্রে গাঁতা সে যে গান ধ্বনিত হয়েছিল
একদিন, কে জানিত সে সঙ্গীত গাথা, লবণাম্বু
জলোচ্ছ্বাসে পেয়ে ভাষা, ভেসে যাবে পঞ্চ
মহাদেশে! হে মহাকবি, সবাকার ধন্য হয়ে সাহিত্যের
শ্রেষ্ঠতম ধনে দিলে আনি' সর্বজন ক'রে স্বর্গীয় সাধনা;
হ্যামলেট আজো আছে, মাতৃ অপরাধের সে
নিদারুণ ব্যথা আজো তার প্রাণের মাঝে
তুলিতেছে তীব্র দাহন। ম্যাকবেথ আজো
নায়িকার প্রচণ্ড তাড়নে বীভৎস পাপের
প্রতি হতেছে উন্মুখ। ওথেলোর দাম্পত্য
অবিশ্বাসিতা, আয়াগোর হীন চক্রান্ত, ব্রুটাসের
বিশ্বাসহীনতা আজো মর্ত্যজন
প্রত্যক্ষ করিছে অহরহ।
আজ তব বন্দনার তরে আমরা এনেছি শঙ্খ
পূর্ব সমুদ্রের তীরে নারিকেল কুঞ্জ মাঝে,
বহিছে বসন্তানিল, পাদ্য-অর্ঘ্য
লয়ে পুরবালা তব প্রতিভার অম্লান
কিরণে হয়ে স্নাত, গণিতেছে তোমা আজ
সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার এ ধরণী মাঝে।

গল্প বলার গল্প

সুদর্শন চক্রবর্ত্তী

দত্তবাবুই সেদিন জমিয়ে রাখলেন আসরটাকে।

শুরু করলেন তিনি। দত্তবাবু তখন ওয়েজ্ লিমিটেডের ইন্সপেক্টর। কি একটা কাজে গিয়েছিলেন মহানন্দপুর শাখা অফিসে তদারক করতে। নিম্নশ্রেণীর কর্মীর কাজে বেশ কিছু গলদ দেখে যথেষ্ট সতর্ক করে দিয়ে এসে যথারীতি রিপোর্ট দাখিল করলেন তিনি ম্যানেজারের কাছে।

ম্যানেজার সেই রিপোর্ট দেখে দত্তবাবুকে ডেকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি সেখানে ঘুষ চেয়েছিলেন, আর পাননি ব'লেই কি লোকটিকে যা তা ব'লে এসেছেন?

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান ইন্সপেক্টর দত্তবাবু। তিনি বললেন, বলেন কি স্যার? আমার জীবনে কখনও আমি ও পথে হাঁটিনি। আর তা পারিনি বলেই না আমি এখনও ইন্সপেক্টর রয়ে গেলাম, আর আমার চেয়ে কম বিদ্যের লোক সেদিন ঢুকেই আজ অফিসার হয়ে গেল।

ম্যানেজারের বুঝতে দেরি হল না আঘাতটা কোন্ দিক থেকে এল। তাই বললেন তিনি, সাবধান, দত্তবাবু বি সিরিয়াস্! তারপর কলমের মাথাটা দাঁতে চিবিয়ে আবার ম্যানেজার বলতে থাকেন, আপনার নামে এলিগেশন্ আছে, আর আমার উপর ভার পড়েছে তার এন্‌কোয়ারীর। প্রোপ্রাইটার নিজে ডেকে আমাকে এ কথা কন্‌ফিডেন্সিয়ালী বলেছেন। আপনার কি কিছু বলবার আছে এ সম্বন্ধে?

—কি বলব বলুন, স্যার,—দত্তবাবু কাঁচুমাচু হ'য়ে বলেন, আমি কিছুই জানি না এ সম্বন্ধে।

—ওঃ, তা হ'লে ধ'রে নিতে পারি আপনার কিছুই বলার নেই, কেমন? থ্যাঙ্ক ইউ, আপনি এখন আসতে পারেন।

এরপর যা হওয়া সম্ভব, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। দত্তবাবুকে এ চাকরি আর বেশীদিন করতে হ'ল না। চাকরি থেকে বরখাস্তের চিঠিখানা পেয়ে দত্তবাবু দেখা করতে চাইলেন প্রোপ্রাইটারের সঙ্গে। কিন্তু ম্যানেজার দেখা করতে দিলেন না।

বাড়ী ফিরে এলেন দত্তবাবু। কিন্তু একি? সেই কর্মচারীটি এসে জড়িয়ে ধরলো দত্তবাবুকে। কাঁদকাঁদ স্বরে বলল, আমাকে ক্ষমা করুন স্যার।

এত দুঃখেও দত্তবাবুর এবার হাসি পেল। বললেন, কি হয়েছে?

বলা বাহুল্য লোকটি পরে জানতে পারে যে, দত্তবাবু তার বিরুদ্ধে কোন খারাপ রিপোর্টই দেননি, মুখে শুধু একটু ব'কেছিলেন সেখানেই। তাই সে বলে, স্যার, আমিই তার করেছিলাম ম্যানেজারবাবুর সম্বন্ধীর প্ররোচনায়; কারণ তিনিই আমাকে ভয় দেখিয়ে এই ভাবে লিখিয়ে নিলেন, আপনি খারাপ রিপোর্ট দিয়েছেন ব'লে আমাকে বাঁচাবার আশ্বাস দিয়ে। কি বলব স্যার, ম্যানেজারবাবুর শালা····তার বিরুদ্ধে গিয়ে এতগুলো পোষ্য নিয়ে না খেয়ে মরব? তাই এই বিপত্তি!

—ঠিক আছে রায়চরণ, যেতে হবে না। তোমায় তাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু কি তার করেছিলে?—বলেন দত্তবাবু অবাক হ'য়ে।

—পাঁচজনের প্ররোচনায় পড়ে লিখেছিলাম স্যার। যখন আপনি আমার বিরুদ্ধে এই সব তথ্যগুলো নিয়ে এলেন, আমি ভাবলাম নিশ্চয়ই কোন খারাপ রিপোর্ট দাখিল করবেন আমার বিরুদ্ধে, কারণ যা করেছি, তা যদি সত্যিই প্রকাশ হয়, তবে নির্ঘাত চাকরি যাবে আমার। তখন এরা আমায় দিয়ে তার করিয়েছে যে, আপনি ঘুষ চেয়েছিলেন, না দিতে পারায় আপনি চটে গিয়েছেন। আপনি যে ওখানে গিয়ে দু' কাপ চা ও দু'টো সিগারেট খেয়েছিলেন, আমি ভেবেছিলাম সে দাম আপনি দেননি। কিন্তু পরে আমি খাতায় দেখলাম যে একটি সিকি আপনি রেখে এসেছেন। তা দাম ত হ'য়েছে মাত্র তিন আনা। এত বেশী কেন দিয়েছেন আপনি, তাই বাকীটা ফেরত দিতে এলাম।

—তোমার এ নিষ্ঠা আদর্শ হ'য়ে থাক রায়চরণ। তুমি এসো, তোমার ডিউটির সময় হ'য়ে আসছে।

—হ্যাঁ স্যার, আমি ছেলেপুলে নিয়ে বাস করি স্যার,

আপনি যদি আমায় ক্ষমা না করেন স্যার, আমার সংসারের সর্বনাশ হবে। তাই ছুটে এসেছি আপনার আশীর্বাদের জন্যে।

আরও কত কি বলতে চাইল লোকটি। কিন্তু সব কিছু তার থামিয়ে দিয়ে দত্তবাবু শুধু বললেন অস্ফুট স্বরে, আমি কায়-মন-প্রাণে আশীর্বাদ করছি, তোমাদের মঙ্গল হ'ক রায়চরণ।

এরপরও একমাস কেটে গেছে।

একদিন প্রোপ্রাইটার হঠাৎ ডেকে পাঠালেন দত্তবাবুকে। বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত দত্তবাবু যে, ম্যানেজারের সম্বন্ধীকে ঢোকাবার জন্যেই আপনার বিরুদ্ধে এই সব চক্রান্ত। আসলে আপনি যে রায়চরণকে আরও কাজে'ত্ব নিতে বলেছিলেন, এইতেই হ'য়েছে মারাত্মক ভুলের সৃষ্টি। যা'ই হ'ক ম্যানেজার যে নিজের স্বার্থ সাধনে এতটা নীচ হ'তে পারে, তা ভাবতেও পারা যায় না। আমি সবই জেনেছি দত্তবাবু, তাই ম্যানেজারবাবুর এলাউন্সও ঢের বেশী বাড়িয়ে দিয়েছি এর শাস্তি স্বরূপ। কারণ, যে কৌশল সে নিজের স্বার্থে লাগিয়েছে, এবার থেকে সেই কৌশল আশাকরি সে কোম্পানীর স্বার্থে নিয়োগ করবে। আর চার্জসিট্ দিয়েছি রায়চরণকে। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে কোম্পানীর যে নানাপ্রকারে উনত্রিশ টাকা খরচ হয়েছে তার জন্যে তাকেই একমাত্র দায়ী ক'রে। অবশ্য এতেই মেটেনি ঘটনাটা। এরপরও সে সব বাচ্ছে, তাকে শেষ বারের মত সতর্ক হবার উপদেশ দিয়ে। তবে চাকরিটা তার নেহাত গেল না তার এই সত্য কথাটা প্রকাশ করার জন্য, কারণ সে না থাকলে ম্যানেজারের এমন গুণগুলো আমার কাছে অজানাই থেকে যেত।

—অজস্র ধন্যবাদ স্যার আপনাকে,—বলে দত্তবাবু এবার উঠে আসবেন, এমন সময়ে বাধা দিয়ে আবার প্রোপ্রাইটার বললেন—উঠছেন কি দত্তবাবু, বসুন, আসল কথাটাই বলা হল না এখনও, যে জন্যে ডেকেছি।

হাঁ ক'রে চেয়ে আবার দত্তবাবু চেয়ারে বসে ভাবতে লাগলেন, এবার নিশ্চয়ই তার একটা বিশেষ কিছু হিল্লে হ'য়ে যাবে।

কিন্তু প্রোপ্রাইটার সাহেব হঠাৎ খুবই গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। তারপর একটু থেমে বললেন, কি বলব দত্তবাবু, বিজনেস্ ইন্টারেষ্ট ও অফিস ডিসিপ্লিন সবই আমাকে দেখতে হয়। দেখা গেল, ম্যানেজারকে আপনার এই ব্যাপারটা ইন্‌ভেষ্টিগেট্ করতে মোট খরচ হয়েছে চারশো উনিশ টাকা মাত্র। ওটা আপনার মাইনে থেকে কাটা হয়নি; কারণ, ম্যানেজার ওটা সাবমিট করতেই বড় বেশী দেরি ক'রে ফেলেছিলেন। অবশ্য আমি জানি, এসব ব্যাপারে আপনি অত্যন্ত পারফেক্ট। তা' ঐ টাকা দিতে আর দেরি করবেন না মোটেই!

কি বলতে চাইলেন দত্তবাবু। কিন্তু সহসা ব্লাড প্রেসারটা এমনই চাঙ্গা হ'য়ে উঠল যে, দত্তবাবু সেখানেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলেন।

গান

শ্রীনারায়ণ পাত্র, সাহিত্যমণি

কতো রজনীর বিফল প্রহরে
জাগার-ক্লান্তি মাখি'—
তোমারে খুঁজিয়া নীরব ব্যথায়
কেঁদেছে ব্যর্থ আঁখি!

তুমি আসো নাই, রাখো নাই কথা,
জমেছে হিয়ায় শুধু নীরবতা;
কেটেছে সময় বাতায়ন 'পরে
করতলে মাথা রাখি'!

কতো জীবনের কতো না বেদনা
এমনি আমারি মতো,
তব আগমনী আশায় আশায়
হয়েছে বেদনাহত!

তোমার বিরহে আজো কাটে রাত্রি,
পলে পলে দহে জীবনের খাত্রি,
এ দুখ-রজনী জানিনা গো আর
শেষ হতে কতো বাকী!

সূর্য এখনও ওঠে

(গল্প)

সুকুমার রায়

রাত তখন ১টা বাজে।

খাটের ওপর শুয়ে ম্যাকবেথের কয়েকটা পাতা পড়েছে পলাশ। এমন সময়ে দরজায় টক্‌টক করে জোরে টোকা পড়ল। ঠিক টোকা নয়, একরকম ধাক্কা দেওয়ার মতই মনে হ'ল।

বইটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল পলাশ। কে আসতে পারে এত রাতে। ঠিক করে উঠতে পারল না পলাশ। খাট থেকে নেমে দরজার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল—who's there?

বাইরে থেকে কোন উত্তর এল না। বইটা টেবিলের উপর রেখে দরজা খুলল পলাশ।—একি ধারা তুমি, এত রাতে! ভয় ত্রস্ত হরিণীর মত—মনে হচ্ছে তোমাকে।

কেমন যেন হাঁপাচ্ছিল ধারা। কোন উত্তর না করে পলাশের পাশ কাটিয়ে ঘরে এসে একটা চেয়ারে বসে পড়ল ও। পলাশ ফ্যানটা খুলে দিয়ে ধারার কাছে এসে দাঁড়াল। ওর মুখে চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন। একটু পরে ধারার পাশের চেয়ারে বসে' ধারাকে ডাকে, ধারা!

—উঁ—পলাশের দিকে তাকাল ধারা।

—কি হ'ল এত হাঁপাচ্ছ কেন? ঘেমে যে একেবারে নেয়ে উঠেছ!

—পলাশ—পলাশ, সর্বনাশ হয়েছে আমার!

—সর্বনাশ!—ব্যগ্রভাবে ধারার দিকে তাকাল পলাশ।

—হ্যাঁ তুমি হয়ত বি—থেমে গেল ধারা।

—থামলে কেন বল?

—তুমি হয়ত বিশ্বাস করতে পারবে না, কি করে এই পথটুকু এসেছি।—থামল ধারা। নিজের মনটা আজ ওর কাছে বড় বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করছে। সাজান কথাগুলো বলতে গিয়ে বেধে যাচ্ছে। মনটা যেন বলছে—এত বড় মিথ্যা কথাটা না বললে কি হত না, বিশেষ করে যাকে সে একান্ত ভাবেই কাছে পেতে চায়। পলাশের দিকে তাকাল ধারা।

—কি ব্যাপার এমন হয়েছে, যার জন্যে মেস ছেড়ে

—প্রবীর আর আভাষ চড়াও হয়ে—থামল ধারা। মুখটা নিচু করে একটু নড়ে বসল।

—কি বলছ তুমি!

—কি বিশ্বাস হচ্ছে না, তা হ'লে এত রাতে তোমার এখানে আসব কেন?

—তা বটে!

ওরা নীরব হ'ল। ধারা মেঝের দিকে একই ভাবে চেয়ে নীরবে বসে রইল। পলাশ জানালা দিয়ে মিটমিটে আলো-আসা তারার দিকে চেয়ে রইল। সাময়িক নীরবতার বিষণ্ণ মুহূর্তকে ভেঙ্গে দিয়ে প্রশ্ন করে পলাশ—এখন কি করবে তুমি?

—বল?—ছোট্ট উত্তর সমেত প্রশ্ন করল ধারা।

—আমি!

—হ্যাঁ তুমি, তুমি পারবে না পলাশ?—পলাশের হাত ধরল ধারা—তা হ'লে তোমার কাছে ছুটে এসেছি কেন? তুমি ত আমার সব। তুমি এত ভীরু পলাশ, তুমি কাপুরুষ!

—দাঁড়াও একটু চিন্তা করতে দাও।

—না সময় নেই। এত রাতে তোমাকে-আমাকে একঘরে এভাবে দেখলে লোকে কি ভাববে বলত।

—তা সত্যি!—কথাটা বেশ যুক্তিযুক্ত বলে মনে হল পলাশের কাছে।—আচ্ছা—থামল পলাশ।—আচ্ছা চল তোমাকে রেখে আসি।

—তুমি যাবে পলাশ—My sweet Palash!—পলাশের গলাটা জড়িয়ে ধরে ধারা।

হাসে পলাশ—দুষ্টামি কোর না চল।

—চল।

আগে চলতে থাকে পলাশ পেছনে ধারা। সিঁড়ির মাঝ পথে এসে থমকে দাঁড়াল পলাশ। ওকে থামতে দেখে ধারাও থামল।—কি হল, চল—

—যাচ্ছি,—ওরা কি এতক্ষণ আছে! আচ্ছা, কি নীচ

—তোমা'র মত মনুষ্যত্বের মূল্য ওরা দেয় না। তাই ওদের কিছু করতে বাধে না; চল।

—তা হবে।—আবার পা বাড়াল পলাশ।

কিছু পরে ধারার বাসায় এসে পৌছুল ওরা। দরজার দিকে তাকিয়ে পলাশ বলে—দরজার শিকল টানা দেখছি, ওরা চলে গেছে নিশ্চয়ই।

—দেখছি ত তাই।

—শিকলটা তুলে দিয়ে কিছুটা ভদ্রতার পরিচয় দিয়ে গেছে।—বলতে বলতে শিকলটা খুলল পলাশ—তুমি এবার যাও ধারা, আমি এখন চলি।

—পলাশ!—সোহাগ জড়ান কণ্ঠে ধারা বলে।

মৃদু হাসল পলাশ।—ভয় পাচ্ছ? আর কিছু হবে না ধারা, তুমি এখন যেতে পার।

—কিন্তু একটু ভেতরে আসবে না তুমি, না আসলে কিন্তু খুব রাগ করব।—চোখের মণি দুটো নাচিয়ে বলল। যেন নাচছে ভ্রমর-কৃষ্ণ কালো জলে রং বাহারী দুটো পদ্মকলি!

—রাত বেশী হয়ে যাচ্ছে না?

—জানি। এত উপকার করলে দয়া করে বসে কিছুটা তার প্রতিদান দাও।

—বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না ধারা?—বলে ঘরে ঢুকল পলাশ।

—এ সবই ত তোমার জন্যে। তাই একটুও হচ্ছে না। দরজাটা ভেজিয়ে দেয় ধারা।

—কি ব্যাপার, দরজা বন্ধ করছ কেন?

—আমাদের দেখে পাছে লোকে কিছু বলে!—বিদ্যুতের ঝিলিকের মত হেসে ধারা বলল।

—ও, তা' ভাল।—চেয়ারে বসল পলাশ।

—দরজা বন্ধ করলাম দেখে তুমি হয়ত মনে করেছিলে, গুপ্ত কাজ কিছু করব, তাই না?

—ছি, Non-sense-এর মত এমন কথা বল তুমি!

—একে ত আমার Sense নেই তার ওপর 'Non' যোগ করলে!—বলতে বলতে চেয়ারে এসে বসল ধারা

বেশ কিছুক্ষণ কাটল নানা কথায়। ধারা তার পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী সুযোগ বুঝে হঠাৎ আর্ত চিৎকার করে উঠল। যেন পলাশ জোর করে কিছু অবৈধ কাজ করতে চাইছে।

—ধারা, একি চিৎকার করছ তুমি—ধারা! পলাশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ধারার কাছ থেকে এ ধরনের ব্যবহারের জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না পলাশ। ওর মনে হল, এর মূলে গভীর ষড়যন্ত্র আছে।

ঘরের দরজা ভেজান ছিল। "কে, কে"—বলতে বলতে উল্কা বেগে ঘরে ঢুকল প্রবীর আর আভাষ। প্রবীর পলাশের নিকট সরে এসে বলে—একি, পলাশ তুই! ছি ছি, তুই এত নীচে নেমেছিস—তুই না মর্‍্যালিটির দোহাই দিয়ে বেড়াস!

চিৎকার, হই-হট্টগোলে আকৃষ্ট হয়ে পাশের বাড়ী থেকেও কয়েকজন লোক ছুটে এল। তাদের দেখে আভাষ বলে—দেখেছেন মশাই, একই ক্লাসে আমরা পড়ি। ধারা দেবীকে আমরা বোনের মত দেখি, দেখুন বোনের ওপর ভাইয়ের ব্যবহার! মানুষ যে এত নীচ হতে পারে, আজ স্বচক্ষে তা' দেখলাম!

পাশ থেকে একজন ভদ্রলোক বললেন, ছি ছি মশাই, কি ব্যবহার আপনার! ভদ্রঘরের ছেলে বলে মনে হয়, কিন্তু এত নীচ—ইতর—অভদ্র কেন আপনি?

পলাশ তখন কোথায়? একি বাস্তব পৃথিবীর ঘটনা, না অলীক স্বপ্নের মায়াবী কল্পনা! সবচেয়ে আশ্চর্য হল পলাশ ধারার ব্যবহারে। ধারার বিপদে সাহায্য করতে এসে ধারার কাছ থেকে যে কলঙ্কের অভিশপ্ত ঘৃণিত বোঝা মাথায় বয়ে নিয়ে যেতে হবে, এ কল্পনাও করেনি পলাশ। —বিশেষ করে যাকে সে ভালবাসে, সেই যে এমন ব্যবহার করবে তা কি করে জানবে পলাশ!

অনেক পরের কথা। প্রায় সবাই চলে গেছে। ঘরে আছে মাত্র তিনজন, অবশ্য পলাশ বাদে। ধারা, প্রবীর আর আভাষ। ধীরে ধীরে এবার মাথা তুলল পলাশ। ওর মাথা তুলতে দেখে প্রবীর আর আভাষ বেশ একচোট হাসল। ওদের হাসিতে কান দিল না পলাশ। ও বলতে থাকে, আজ আমার এই অভিজ্ঞতা হ'ল, জগতে বন্ধু আছে প্রচুর, কিন্তু প্রকৃত বন্ধুর যথেষ্ট অভাব আছে। শোন ধারা, তোমাকে আমি ভালবাসতাম, কিন্তু আজ ভালবাসার যে প্রতিদান দিলে চিরকাল তা' মনে থাকবে। কারণ, প্রেমের ক্ষেত্রে এ-ধরনের প্রতিদান এই প্রথম

কিনা! ধারা, তোমাকে আমি—থামল পলাশ। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে আবার বলতে শুরু করে—ভদ্রঘরের মেয়ে বলে জানতাম। আজ আমার সঙ্গে যে ভদ্র ব্যবহার করলে, অন্যের সঙ্গে এ ব্যবহার করে নিজের ব্যক্তিত্বকে অপমান করো না। তাছাড়া অনেকেই এ ধরনের ভদ্রতার সঙ্গে পরিচিত নয়—বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পলাশ।

একি! ধারা যেন একরকম চমকে উঠল। এতবড় অন্যায়ের বিরুদ্ধে একি প্রতিশোধ নিল পলাশ! এর চেয়ে যদি অমানুষ-ইতর-জানোয়ার বলত, তবে সেটা সহ্য করা যেত। পলাশ, তুমি এত বড় এত মহান, অপমানিত হয়েও জিতে গেলে! আমি এতটুকু বুঝতে পারিনি, টাকা আমাকে পাগল করেছে। তুমি—আমা—

—ধারা দেবী—প্রবীরের ডাকে বাধা পড়ল ধারার চিন্তাস্রোতে।—অদ্ভুত অভিনয় করলেন....You are greatest actress in the world!

ধারা কোন উত্তর করল না।

—এত চিন্তা করছেন কেন? স্বার্থ-সিদ্ধি, প্রতিষ্ঠার জন্যে কোন কিছুতেই দুর্বল হলে চলে না ধারা দেবী। —এবার আভাষ বলল।

—চুপ!—গর্জে উঠল ধারা—আমি আর শুনতে চাই না কিছু।

—অকারণে রাগ করছেন আপনি।

—রাগ করবার কোন কারণই নেই। রাত হয়েছে, আমি এবার ঘুমাতে যাব, আপনারা যেতে পারেন।

—Bad luck! আপনি রেগে গেছেন, মানে আপনি অস্বাভাবিক হয়ে গেছেন।

—রাগ নয়—আপনাদের প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছি। আপনাদের ত আর এখানে থাকবার দরকার নেই।

—Oh yes! আচ্ছা, Good bye!—বলে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—টাকা আনবেন কিন্তু কাল—বলল ধারা।

অন্ধকার রাত্রির বুক চিরে শব্দটা এগিয়ে গেল। উত্তর কিছু ফিরে এল না।

ধারা চেয়ারে এসে বসল। ওর মনে পড়ছে, সেদিনের দিয়েছে, এমন সময় কে যেন বলল—আসতে পারি?

বাইরের দিকে তাকাল ধারা...তারপর কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে খাটের ওপর উঠে বসে বলল—আসুন।

ঘরে ঢুকলেন দু'জন আগন্তুক ভদ্রলোক। উঠে দাঁড়াল ধারা।

—চিনলাম না ত!—ধারা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

—কলেজে দেখেন নি? আমার নাম প্রবীর চৌধুরী আর ও আমার বন্ধু আভাষ দত্ত।

—নমস্কার, বসুন।

—হাঁ, এসেছি যখন বসবই ত।—আভাষ এবার কথা বলল।

—আগমনের হেতু জানতে পারি কি? অবশ্য বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই!

—You are right! আধুনিক কর্মব্যস্ত যুগে প্রয়োজন ব্যতীত আসতে পারি কই!

—আপনি কিন্তু এখনও বসেন নি আভাষবাবু।

—ব্যস্ত কি ধারা দেবী!

—আমার নাম জানেন নাকি!

—নিশ্চয়ই! তা না জানলে আপনার এখানে আসব কি করে? আপনার এখানে আরোহণ করবার সিঁড়ি-ই ত আপনার নাম!

—তাই বুঝি!—ধারা হাসে।

—বড় বিপদে পড়ে আপনার এখানে এসেছি ধারা দেবী।—কোন ভূমিকা না করে আসল কথা শুরু করে আভাষ।—কলেজে ভোট ত জানেন?

—কলেজে যখন পড়ি, ওসব জানব না এতো ভাবতে পারেন না!

—তা পারি না অবশ্য।

—বিশেষ করে এ-সব রঙ্‌বাহারী ছ্যাবলামি.... Don't mind—ছ্যাবলামি, নাচানাচি এসব জানে না এমন ছাত্র, বিপরীত ক্রমে ছাত্রী—কলেজে নেই।

—তা ঠিক। যাকগে যা বলছিলাম, আমরা ছাত্র ফেডারেশানের পক্ষে দাঁড়িয়েছি। অবশ্য আমি G. S. আর ও V.P.-তে—

—বুঝেছি। দয়া করে বিপদটা বলবেন কি—

—তাড়া নয়, তবে আমার দিবানিদ্রার দোষ আছে একটু। আপনাদের আগমনে তার কিছুটা বিঘ্ন ঘটেছে কিনা তাই।

—কিন্তু দিবানিদ্রা ত Able bodied-এর জন্যে নয়—আভায় কথা বলল।

—মাইলো খেয়ে সবাই বুড়িয়ে যাচ্ছে—প্রবীর বলল।

হেসে উঠল ধারা। বলল—তা ঠিক মিষ্টার চৌধুরী।

—বিশেষ বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি ধারা দেবী। আভায় বলল।

—বিপদটা কি—

—অভয় দেন যদি বলি।

—আপনাদের মত যুবকদের অভয় দেব আমি! আচ্ছা অভয়ই দিলাম।

—না, অভয় ঠিক নয়, যদি একটু সাহায্য করেন—

—বলুন।

—পলাশকে ত চেনেন?

—চিনি।

—ওর বিরাট Popularity; ও ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়েছে। ওর সঙ্গে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারছি না।

—সে আপনারা বুঝবেন। আমার দ্বারা আপনাদের কি সাহায্য হতে পারে সেইটা বলুন।

—ওর Popularity আপনাকে নষ্ট করে দিতে হবে। চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবেন আপনি।

—ধন্যবাদ, এবার যেতে পারেন।

—ধারা দেবী—

—আমার দ্বারা এসব অসম্ভব কাজ সম্ভব নয়। ওর Popularity আছে, ও জিতবে। যদি নির্বাচনে জিততে চান, আগে Popularity অর্জন করুন। তারপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। Popularity অর্জন করবার শক্তি কি আপনাদের নেই—

—থাকবে কি করে, এরা অধিকাংশই অসৎ! স্বজন-পালন নীতি এদের মূলমন্ত্র। ধরুন একজন পরিচিত, সে ফি বুক ছাড়াই কলেজ পত্রিকা পাচ্ছে, আর যে অপরিচিত সে পাচ্ছে না। তাছাড়া অয়েলিং ব্যতীত এদের কাছ

জিততেই হবে—জিততে গেলে প্রথম কাজ হ'ল পলাশের জনপ্রিয়তা খর্ব করা, এবং তা' একমাত্র আপনিই পারেন।

—তাই নাকি! তবে আপনারা ভুল করছেন; পলাশের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ত জানেন!

—শুধু আমরা কেন—প্রবীর বলল—কলেজের সবাই জানে।

—তবে, আর একটা কথা, আমি ছাত্র পরিষদে বিশ্বাসী।

—এর জন্যে যদি আপনাকে টাকা দি, তা হলেও পারবেন না?

—টা—কা।

—হ্যাঁ, টাকা—আভায় বলল।—দু'শ টাকা পাবেন।

—দু'—শ টাকা!

—হ্যাঁ।

বাড়ী থেকে টাকা পাচ্ছিল না ধারা। বড় টানাটানি যাচ্ছিল ওর! খুব কষ্ট করে কলেজে নিজের ষ্টাইল আর আভিজাত্য বজায় রেখে চলতে হচ্ছিল। টাকার ওর আজ এই মুহূর্তে বড় প্রয়োজন। টাকার গন্ধ পেয়ে দুর্বল হয়ে গেল ধারা। ধারার এই দুর্বলতা ওদের দৃষ্টি এড়ায় নি। তবুও ও বললে—পারি কিনা দেখলেন না, আগেই টাকা দিচ্ছেন!

—আমরা জানি আপনি পারবেন—এই নিন টাকা—দু'শ টাকা।—টেবিলের ওপর রাখল প্রবীর।

টাকার দিকে চেয়ে ধারা বলে—কি ভাবে?

—আপনার শ্লীলতা নষ্ট করেছে, এই অজুহাতে।

জ্বলে উঠল ধারা।—বেরিয়ে যান, যান, যান।—চেয়ার ছেড়ে ধারা উঠে দাঁড়াল।

৩০০ টাকা পাবেন আপনি। আর একশ' টাকা টেবিলের ওপর রাখল ওরা।

প্রবীর টাকাগুলো তুলে নিয়ে ধারার দিকে বাড়িয়ে ধরল—ধরুন

টাকার জাদুস্পর্শে দুর্বল হয়ে এই কাজ করেছে, এই অভিনয় করেছে ধারা—চিন্তা করতে পারছে না ধারা—পলাশের ওপর কি অন্যায় কাজ করেছে আজ।

ধারার ঘরে বসে। আভাষ বলছে—একটা ভোট পারবি পলাশ। কি কৌশলের ওপর ভিত্তি করে পাশ করলাম দেখলেন, এর নাম Politics, বুঝলেন? এক বছরে হাজার টাকা ইনকাম করতে পারব। এর মধ্যে আবার আপনার তিনশ' টাকা দিতে হ'ল।

কোন উত্তর দিল না ধারা। চিন্তা করছিল, এই নীচ উপায়ে অর্থ উপার্জন না করলে কি হত না!

—ধারা দেবী—

—বলুন?

—বলছি, আপনি যদি এই তিনশ' টাকা না নিতেন, তবে আপনারটা আর আমারটা মিলে এক হাজার টাকা হত।

—কি বলছেন আপনি?

—তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি ধারা—ধারার একটা হাত চেপে ধরল আভাষ।—ধারা I love you—

একটানে হাতটা ছাড়িয়ে নিল ধারা।—বেরিয়ে যান, যান, যান—

—ধারা—উঠে দাঁড়িয়ে ধারাকে ধরবার চেষ্টা করল আভাষ—No shout please, my darling!

চিৎকার করে উঠল ধারা।

কি একটা প্রয়োজনে সেদিন ধারার বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল পলাশ। ধারার চিৎকারে ও থমকে দাঁড়াল।

আবার চিৎকার করে উঠল ধারা।

এক ধাক্কায় দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল পলাশ। ধারা ছুটে এসে পলাশকে জড়িয়ে ধরল—পলাশ, আমাকে বাঁচাও। পলাশ, আমার পলাশ—পলাশের পিঠে মুখ লুকাল ধারা।

সেদিনও কম লোক জমা হয়নি ধারার চিৎকারে।

একজন বললে—দিনে-দুপুরে ডাকাতি!

আর একজন বললে—পুলিস ডাকুন মশাই, পুলিস ডাকুন।

—আপনারা যেতে পারেন; নির্দোষ লোককে দোষ দেওয়া আপনাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।—বলেই ঘরের দরজা বন্ধ করল পলাশ। আভাষ ওদের কাছ থেকে দূরে

ভাল, যদি তা নির্ভুল ভাবে করা যায়। এতে যেমন যশ আছে, তেমনি সম্মান। কিন্তু যদি অভিনয়ের প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়ে যায়, তাতে যেমন ঘৃণা পাওয়া যায়, অভিশাপ পাওয়া যায় ততোধিক। তবে সত্যকে কিছুতেই চাপা দেওয়া যায় না আভাষ।

—Please পলাশ আর না—আভাষ এবার মুখ তুলল। —দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতা আমাকে এত নীচ করেছে। আমি তোকে দেখেছিলাম কেবল প্রতিযোগী হিসাবে, তোর মহত্বকে দেখতে পাইনি স্বার্থান্ধ বলে। এই মহত্বের আলোকে ক্ষমা করিস ভাই, এখন আমাকে যেতে দে—আভাষ মুখ নীচু করে বেরিয়ে গেল।

ধারা নীরবে অন্য দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিল।

—ধারা!—পলাশ ডাকল।

নীরব প্রত্যুত্তর।

—আমি চলি।

—পলাশ!—সামনে এসে দাঁড়াল ধারা। ওর চোখে জল। বলল, চলি না, বল আসি। তাতে তোমার আবার আসবার প্রতিশ্রুতি পাই। বল—

—আচ্ছা বললাম।—পলাশ চলে যাচ্ছিল।

ধারা দরজা বন্ধ করল।

—একি!

—পাপের প্রায়শ্চিত্ত!—টেবিলের ড্রয়ার খুলে টাকাগুলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে থাকে ধারা।

বাধা দেয় পলাশ—এ কি করছ?

—চুপ, পাপের প্রায়শ্চিত্ত!—টাকাগুলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে পলাশের কাছে সরে এল ধারা—একেবারে মুখোমুখি।—পলাশ যা থেকে পাপের উৎপত্তি, তা' থেকে পাপের নিষ্পত্তি হয় না।

পলাশ নীরব।

—পলাশ বল না, বল—পলাশের গলা ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ধারা।

—হয়, কিন্তু টাকাগুলো কি পাপ ডেকে আনল?

—ও কথা শুনতে চেও না পলাশ। এবার বল তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ। Hate the crime, but not the criminal!

গরমিল

(গল্প)

শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্য

ক্যামেরার নতুন রীলটা ভরতে ভরতে অন্যমনস্ক সুনীল ভাবতে লাগল, জ্ঞানদার কোন কিছুই তার কাছে রইল না। একটা ছবিও তুলে রাখতে পারত সে, তারও সুযোগ হয়নি তার। যা কিছু রইল তার মনে। বাইরে তার কিছু পরিচয় পাবে না, পাবে না কোন চিহ্ন।

বেশ কিছুদিন আগে সুনীলের সঙ্গে জ্ঞানদার পরিচয়। স্ত্রী মারা যাবার তিন বছর পরে। দুটো ছেলের মাঝে স্ত্রীর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে তার মনে। তবু বত্রিশ বছরের সুনীলের মনে অনাঘ্রাত-কুসুম জ্ঞানদার যৌবন কি কোন সাড়া জাগায় নি ?

না। চারিত্রিক শিথিলতা সুনীলের ছিল না। জ্ঞানদার আবির্ভাবের পরে তার সঙ্গে অবাধ মেলামেশার মধ্যেও কোন স্খলন-পতনের পরিচয় পাওয়া যায় নি।

বড় ছেলেটাকে প্রথম ভাগ পড়ানোর জন্য জ্ঞানদাকে নিযুক্ত করে দিয়েছিল তারই ছোট বোন বিভা।

বিভাই নতুন এসে বাস করা প্রতিবেশিনী জ্ঞানদাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল দাদার সঙ্গে।—ইনিই আমার দাদা আর এই আমার নতুন বান্ধবী জ্ঞানদা।

নমস্কার বিনিময় হোল।

বসতে বললে সুনীল। জ্ঞানদা সসংকোচে টুলটার উপর বসতে যাচ্ছিল। সুনীল একটু হেসে বলেছিল, না, না, ওখানে নয়—এখানে—চেয়ারের দিকে ছিল তার অঙ্গুলি সংকেত।

বিভা কি কাজে হঠাৎ ঘর ছেড়ে চলে গেল। জ্ঞানদাকে সুনীল বললে, ভালই হোল আপনাকে পেয়ে। ছেলেটার দিকে আমিও ঠিকমত নজর দিতে পারি না। যদি রোজ সকালে ঘণ্টা খানেক এসে দেখিয়ে দেন। তা আপনার পারিশ্রমিক—

এবার জ্ঞানদা বললে, ওগুলো থাক্—

লক্ষ্য করলে সুনীল, জ্ঞানদা বড় বেশী লাজুক। কথা বললেও দৃষ্টি তার নিম্নমুখী।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। সুনীল জিজ্ঞেস করলে, আপনার কে কে আছে বাড়ীতে ?

—দাদার কাছে থাকি। বাবা-মা কেউ নেই।

—দুঃখের কথা। লক্ষ্য করল সুনীল, বয়স অন্ততঃ আঠার উনিশ বছরের কম নয়। বিয়ে দেওয়ার কথা হয়ত চিন্তা করেনি তার দাদা। নইলে রূপের সম্পদ কম নেই জ্ঞানদার। সহজেই পছন্দ হয়ে যাবে যে কোন পাত্রের।

তারপর থেকে জ্ঞানদা এই বাড়ীরই যেন একজন হয়ে উঠেছে। বিভা আর সুনীলের মধ্যে সে নিজের ভাইবোনের স্নেহলাভ করেছে।

মাঝে মাঝে অনুভব করেছে সুনীল, জ্ঞানদার মধ্যে কি একটা লুকানো আছে যা সে প্রকাশ করতে পারছে না, অথচ তার সমস্ত লজ্জা, নম্রতার মধ্যে বারে বারে সেই না বলা গোপন কথাটাই আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। এর মধ্যে জ্ঞানদার সঙ্গে অনেক আন্তরিক কথাবার্তা হয়েছে সুনীলের। মন উজাড় করা কথায় কেটে গেছে অনেকগুলি অলস সন্ধ্যা তবুও তার মনের গোপন কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারেনি সুনীল।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ)

—করেছি।

—আমাকে বাঁচালে। পলাশ এ-জগতে অনেক বন্ধু আছে, যারা শুধু বাইরের দিকটা দেখে, অন্তরের দিকটা কিছুতেই দেখতে পায় না। তুমিও সেই দলের, এর চেয়ে বড় আঘাত আমি কোন দিনই পাইনি।—ছুটে এসে বিছানার ওপর শুয়ে পড়ে। অশ্রুর বন্যা নামল ধারার চোখে।

পলাশ ধারার চোখের জল মুছে দিতে থাকে বিছানার ওপর বসে। এ ছাড়া আর কোন সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পায় না ও।

জ্ঞানদা এখন আর শুধু সুনীলের ছেলের গৃহ-শিক্ষিকা নয়, যেন তার ঘরেরই একজন। ঘরের কাজে এটা ওটাতে সাহায্য করা, মাঝে মাঝে একসঙ্গে হইচই করে সিনেমা দেখতে বা বেড়াতে বেরিয়ে পড়া—এসবও স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

বিভা একবার রসিকতা করে সুনীলের কাছে বলতে যাচ্ছিল, আর কেন, জ্ঞানদাকে ত এবারে ঘরে আনলেই হয়। সুনীল এমন ধমক দিয়েছিল বিভাকে যে, সে আর কথাটি বলতে সাহস করেনি।

বিভাবে ধমক দিয়েই কিন্তু সুনীলের মন থেকে কথাটা মুছে যায় নি। বিভার এই কথার পেছনে যে ইঙ্গিত ছিল তা কি একেবারেই মিথ্যা? অথচ সুনীলের ব্যবহারে এমন কিছু কি প্রকাশ পেয়েছে যা জ্ঞানদার প্রতি তার দুর্বলতাকেই প্রমাণ করে? অন্ততঃ সুনীল শপথ করে বলতে পারে জ্ঞানদাকে সে নিজের করে পাওয়ার দৃষ্টিতে কোনদিন তাকায় নি।

তবে? হয়তো জ্ঞানদার ব্যবহারেই বিভা এমন কিছু পেয়েছে তার উপর ভিত্তি করে বিভা এমন ইঙ্গিত করতে পেরেছিল।

সুনীল এক একবার সবকিছুর যোগসূত্র রচনা করতে যায় আপন মনে। তার সংসারে জ্ঞানদা! কিন্তু ভেঙ্গে যাওয়া সংসারে জ্ঞানদার মত সরলপ্রাণ আর কোমল-হৃদয় একটা তরুণীকে প্রতিষ্ঠা করার পেছনে চরম স্বার্থপরতা ছাড়া আর কি থাকতে পারে?

সেদিন রাস্তায় বেরিয়েছে সুনীল বেড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়েই। হঠাৎ দেখা হয় রবি দত্তের সঙ্গে। এই রবি দত্ত তাকে ভালও বাসে আবার সুখের দিনে ঈর্ষাও করতে ভোলে না। কোনরকম ভূমিকা না করেই বলল সে, আরে সুনীল, তুমি এত ভাল আর কাজের লোক আগে ত জানতাম না।

সুনীল জিজ্ঞাসা করল, অর্থাৎ?

রবি দত্তের মুখে চাপা হাসি, তাই ত বলছি। মুনি-ঋষির মত তোমার মন। তোমার কথাগুলি বিবেচনা-ভরা, তোমার চালচলন—

বাধা দিয়ে সুনীল বলে, আরে থাম থাম। আমার সম্বন্ধে তোমার এই নবতম আবিষ্কারের হেতু কি জানতে পারি?

রবি দত্ত বললে, আবিষ্কার আমার নয়, তোমাদের বাড়ীর সেই গৃহ-শিক্ষিকাটির। তোমার বউদির কাছে বলছিল তোমার কথা, সুনীলদাদার মত লোক আর হয় না।

সুনীল এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলে। তারপরে হাসি টেনে এনে বললে, ওর মাথায় ছিট আছে মনে হচ্ছে। এই বলে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে গিয়ে বাঁচল। মনে হোল রবি দত্তের মুখখানি তখন পুলকের হাসিতে ভরে উঠেছে।

পরের দিন জ্ঞানদাকে ডেকে সুনীল বলে, আমার সম্বন্ধে প্রচার করার ভার ত তোমাকে দিই নি। রবি দত্তের বউ-এর কাছে তুমি আমার সম্বন্ধে……

বাধা দিয়ে মৃদু হেসে জ্ঞানদা বললে—হ্যাঁ, অনেক কিছু বলেছি। বেশ করেছি। কি করতে চান করুন।

সুনীল আর কিছু বলতে পারে না। খানিক পরে বললে, কিন্তু এর ফলে তাদের মনে কি ধারণা হবে বলতে পারো?

জ্ঞানদা গায়ের কাপড়টা একবার যেন সামলিয়ে নিল। পরে বললে, যা ভাবে ভাবুক গে তারা। আমার আপনার তাতে কি? আমি যাই এখন, কাজ আছে আমার। বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেল সে।

আর কোন কথা বলার সুযোগ সুনীল পেল না।

আর একদিনের ঘটনা।

কলকাতা থেকে বিকালের ট্রেনে ফিরে এসে হাত-মুখ ধুয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে। এমন সময়ে বিভা এসে বললে, শুনেছ দাদা, জ্ঞানদার কীর্তি?

—কি হোল আবার?

—মহীতোষবাবুদের সঙ্গে কি ঝগড়াটাই না বাধিয়েছে। ওদের ঝিটা আমাদের কাছে সব খুলে বলল।

—কিন্তু ব্যাপারটা কি?

—তোমার নামে মহীতোষবাবুর মেয়ে নাকি যা-তা বলেছিল। তাতেই জ্ঞানদা বেশ করে শুনিয়ে দিয়েছে।

—কিন্তু যা তা-টা কি তাই শুনি।

—এই, তুমি নাকি জমিদারী না থাকার পরেও জমিদারী মেজাজ ঠিক রেখেছ। মানুষের সঙ্গে ভাল ভাবে মিশতে জানো না, কথা বলতে জানো না—এই সব। তার

উত্তরে জ্ঞানদা যা মুখে এসেছে তাই বলে দিয়েছে। বলেছে, ওদের মত লোক আর হয় না। তোদের গুষ্টিসুদ্ধ সাতজন্ম তপস্যা করিস, তবে যদি সুনীলবাবুদের মত হতে পারিস। বলেছে, তোরা জোনাকি, চাঁদের আলো দেখে তোদের ত হিংসা হবেই। সুদে টাকা খাটিয়ে বড়লোক হয়েছিস, তোরা জমিদারীর মহিমা বুঝবি কি? এইরকম আরো কত কথা।

—জ্ঞানদা বড় বাড়াবাড়ি করছে এখন। ভাল করে সাবধান করে দিতে হবে।

বিভা দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে, দিও তুমিই। আমার দায় পড়েছে।

শেষ পর্যন্ত বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়া মেয়ে বিভা বলতে বলতে গেল—তোমারি গরবে গরবিনী হাম, রূপসী তোমারি রূপে।

অবাক্ হয়ে গেল সুনীল জ্ঞানদার এই ব্যবহারে। এমন করে আপন করে নিতে ঘরের লোকও বুঝি সবসময় পারে না। অথচ এই মেয়েটার সঙ্গে সম্পর্কটাই বা কি?

কিন্তু সেই জ্ঞানদা এমন আকস্মিকভাবে অনেক অপমান অনেক সমালোচনার কেন্দ্রস্থল হয়ে চলে যাবে, একথা শুধু সুনীল কেন, পাড়াপড়শীদেরও কেউ কল্পনা করতে পারে নি।

সুনীলদের পাড়ার একধারে ছিল রাধাশ্যামবাবুদের বাড়ী। রাধাশ্যামবাবু সরকারী পেন্সন ভোগ করছেন। আর তাঁর বড় ছেলে দীপক চাকরি করে খড়্গপুরে। মাঝে মাঝে সে এসে হই-হুল্লোড় করে কয়েকদিন কাটিয়ে যায়। তার নামে চরিত্র-ঘটিত অনেক অপবাদও অনেকের কর্মহীন অবসরের আলোচনায় খোরাক যোগায়। আর ছোট ছেলে সুশান্ত স্কুলে লেখাপড়া করে।

দীপকের সঙ্গে জ্ঞানদার নাম জড়িয়ে দু'একটা কথাবার্তা বিভা সুনীলকে সরবরাহ করত। কিন্তু সুনীল বিশ্বাস করত না সে কথা। মেয়েরা যে দৃষ্টিতে মেয়েদের বিচার করে, তার ভাষা জোরাল হলেও কথাগুলো সবসময় যুক্তি-গ্রাহ্য হয় না। তাই অবিশ্বাসের হাসি হেসেই সুনীল প্রসঙ্গ পরিবর্তন করত।

কিন্তু একদিন মধ্যাহ্নে বিভা সুনীলকে বলে, কাল থেকে তোমার পুত্রের নতুন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করো।

সুনীল বলে, হঠাৎ? কেন? জ্ঞানদার কি হোল?

—তিনি পলাতকা, বিভা অচঞ্চল গাম্ভীর্যে জানায়।

—ব্যাপার কি?

—তেমন কিছুই নয়। দীপকের সঙ্গে তার কর্মস্থলে চলে গিয়েছে। বিয়েটা বোধহয় সেখানেই হবে।

—বিয়ে? জ্ঞানদার? দীপকের সঙ্গে? একসঙ্গে এতগুলো জিজ্ঞাসা আলোড়িত হয় সুনীলের মনে। অস্ফুটে কথাগুলো যেন স্বগতোক্তির মত শোনালো বিভার কানে।

বিভা বললে, ঠিক তাই। আর দীপক ছেলেটিও ত রত্ন। বাপ-মায়ের মতামতের কানাকড়ি মূল্য আছে বলে সে মনে করে না।

সুনীল বলে, তা না হয় না করল। কিন্তু জ্ঞানদা? তার মত মেয়ে শেষ পর্যন্ত দীপককে—ছি ছি! কথাটা ভাবতেও কেমন লাগছে।

—তা হলেও করবে কি বল। সে ত তোমার খাঁচার পাখী নয়।

সুনীল বলে, তবু যেন ঠিক হিসাবটা মিলছে না। এতদিন ধরে তাকে দেখলাম, বুঝলাম, তথাপি কোথায় যেন গোলমাল থেকেই যাচ্ছে।

বিভা বললে, রক্তের ধারা বলে একটা কথা আছে ত। ওর মা স্বামীকে পরিত্যাগ করে একটা নীচু জাতির ছেলেকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিল। জ্ঞানদা সেই মিলনের সন্তান।

সুনীল তবুও যেন বিশ্বাস করতে পারে না। বিজ্ঞানের প্রচণ্ড গতি ভীম-বিক্রমে পুরাতন বিশ্বাস আর মতবাদ-গুলোকে গুঁড়িয়ে নিয়ে চলেছে ঊর্ধ্বলোকে। তবুও যেন সেই পুরাতন সংস্কারটাই আমাদের মনের যুক্তির দরজায় পাহারা দিতে বসে আছে।

সুনীল তবু বলে ওঠে—যাক্ জ্ঞানদা। ওরা সুখী হোক। দীপকের বাঁধনহারা মন আশ্রয় খুঁজে পাক জ্ঞানদার মধ্যে।

জ্ঞানদা পেছনে ফেলে গেল না কিছুই—যা কিছু তার রইল সব ভবিষ্যতের মধ্যে।

এই মন

(গল্প)

শ্রীঅশোক দত্ত

চৈত্রের ক'টা দিন আজ। এখনো অল্প অল্প শীত আছে। মাঝে মাঝে মেঘের মত কুয়াশা জমা হয়ে আছে। কৃষ্ণার খুব খারাপ লাগে।........আজকের সকালটাও কেমন থমথমে। ভিজে ভিজে কুয়াশা চারদিকে। দূরের গাছ-গুলো দেখাই যায় না। সামনের ঘর-বাড়ি, গাছপালা তো আবছা-আবছা, ছায়া-ছায়া চিত্রের মত!

ছ'টা বেজে গেছে। এখনো কৃষ্ণাদের পাড়াটা যেন ঘুমিয়ে আছে। বাইরের বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দাঁতে ব্রাশ ঘষতে ঘষতে ঘরের ভিতর তাকাল কৃষ্ণা—সুধাংশু ঘুমচ্ছে। তার পরনে নীল রঙের লুঙ্গিটা হাঁটুর উপর উঠে গেছে। পায়ের কালো কালো পাতলা লোমগুলো সব দেখা যাচ্ছে। ঘুমন্ত সুধাংশুর মুখের দিকে তাকাল কৃষ্ণা—মুখটা যেন বিবর্ণ, চোখ দুটো কেমন করুণ!

সুধাংশুর মুখের দিক থেকে চোখ সরিয়ে ঘরের দেয়ালের দিকে তাকাল কৃষ্ণা—ওমা, ঐ আরশোলাটা কোথা থেকে এলো! এইতো সেদিন 'ডাল্ফ' দিয়ে চারদিক ভাল করে স্প্রে করল ও!

দেয়াল থেকে বাইরে চোখ নিয়ে এলো কৃষ্ণা। কুয়াশার নেশা এখনো কাটেনি। এধারে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে।.......সুধাংশু তো আটটার আগে কোনোদিন উঠবে না। বাব্বারে বাবা, কি ঘুমটাই না ঘুমোতে পারে সুধাংশু। ঘুম থেকে উঠেই গরম মেজাজে হাঁক দেয়—চা হোল?

কৃষ্ণা চায়ের পেয়ালা সুধাংশুর সামনে ধরে।

সুধাংশু চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলে—হুঁ, এটা আবার চা! এর থেকে তুষার কেবিনে অনেক ভাল চা পাওয়া যায়।

অভিমান হয় কৃষ্ণার। সুধাংশুর হাত থেকে চায়ের পেয়ালা টেনে নিতে গিয়ে বলে—তুষার কেবিনেই যাও তাহলে।

যায় বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ওঠে সুধাংশু।—এই-এই, দিলে তো বিছানাটার বারোটা বাজিয়ে! তুমি না........

—আমি কি করলাম, তোমার জন্যেই তো!

হি হি করে হাসে সুধাংশু। বলে—সকাল বেলায় তোমাকে রাগাতে বড়ো ভাল লাগে।

হটাং হটাং করে কিসের যেন শব্দ উঠল। চমকে গেল কৃষ্ণা। ব্রাশটা হাতে নিয়ে রেলিং-এর উপর বুক ভর দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল—মাল বোঝাই একটা স্কুটার এসেছে। কতগুলো বস্তা। কি আছে কে জানে! হিন্দুস্থানী মুটে বস্তাগুলো ঠেলে ঠেলে নামাতে লাগল। হাসি পেল কৃষ্ণার। পাড়াটা এবারে সজাগ হয়েছে। দোকান খোলার শব্দ—ধুনোর গন্ধ! নতুন দিনকে আমন্ত্রণ জানায় ওরা।........একটা গরুর গাড়ী হটর হটর করে চলে গেল। কৃষ্ণা দেখল। কৃষ্ণা একবুক নিশ্বাস নিল। দূরের দিকে তাকিয়ে দেখল—ভেটারিনারী সার্জন চম্পক রায়ের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। ওদের ঘরটা খুব ভাল লাগে কৃষ্ণার। ছোট্ট কোয়ার্টার। চারদিক ঘেরা। সামনে অনেকখানি সবুজ লন। ওদের বাড়ি গেলে কৃষ্ণার বেশ ভাল লাগে। অথচ সুচনা-বৌদি বলে—এখানে আবার মানুষ বাস করতে পারে! দেখনা ভাই কৃষ্ণাদি, এই সামনে ডিস্পেনসারি, ঐ পিছনটায় গরু থাকবার জায়গা। আমার তো দিনরাত গা ঘিনঘিন করে!

সত্যি-ই চম্পককে এই জন্যে খারাপ লাগে কৃষ্ণার। সেই গরুর পেটের ভিতর হাত চালান করে দেওয়া। তার-পর বড়ো বড়ো ইনজেকসানের নল দিয়ে—। ইশ! ম্যাগো! ঘেন্না করে! তা' ছাড়া চম্পকের আর সব ভাল। ভাল অভিনেতা ও। সেবার 'ক্ষুধা' বইটায় কি সুন্দর অভিনয় করল—জগা না মাধার ভূমিকায়। নামটা ঠিক তার মনে

ভাল লেগেছিল। কৃষ্ণার ইচ্ছে গেছল—ছুটে ষ্টেজে উঠে গিয়ে বলে—।

সুধাংশু ঘুমোতে ঘুমোতে খংখং করে কাসলো। কৃষ্ণা দেখল। ওকে আজকাল বড়ো মায়া লাগে কৃষ্ণার। মাঝে মাঝে আবার ভীষণ রাগও হয়। একবার তো—। না-না, সেসব বাজে কথা ছেড়ে দেয় কৃষ্ণা। সুধাংশুর চোখ মুখ বেশ ফোলা ফোলা। রাতে কখন ঘরে এসেছিল—কৃষ্ণা জানতে পারেনি। রাতে ও ভাত খায়নি। এখনো চাপা পড়ে আছে। কৃষ্ণারও খাওয়া হয়নি। ইজিচেয়ারে বসে একটা পত্রিকা পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে গেছল। এক ঘুমেই ভোর। জেগে দেখে—সুধাংশু বিছানায় শুয়ে। লাইটটা নেভান হয়নি। সারা রাত ওটা জেগে জেগে পাহারা দিয়েছে।

সুধাংশু পাশ ফিরল। কৃষ্ণার খুব খারাপ লাগছে। দেয়ালের আরশোলার দিকে তাকাল কৃষ্ণা—একটা টিকটিকি আরশোলাটাকে গ্রাস করার জন্যে সন্তর্পণে এগোচ্ছে। কৃষ্ণার মায়া হ'ল। আহা আরশোলাটা···· তবে কি টিকটিকিটাকে····না-না, সে অন্যায়। একজনের মৃত্যুই তো আর একজনের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে চলে আসছে আমাদের চলমান জীবনে।

ও দৃশ্য আর দেখতে পারল না কৃষ্ণা। ব্রাশ ঘষতে ঘষতে দূরের দিকে তাকাল। চম্পক রায়ের কথা ভাবল। সে কি এখনো ওঠেনি! না, ওর ঘরেও জীবন-মৃত্যুর রহস্য চলছে? হয়ত একটা গরু দশদিন যাবৎ প্রসব যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে আজ সব জ্বালা মিটিয়ে নিচ্ছে।········

সুধাংশু নড়ে উঠল। কৃষ্ণা দেখল, সুধাংশুর মুখ হাসি-খুশি। ঠিক এইরকম মুখ নিয়েই সুধাংশু চম্পকদের বাড়ি বেড়াতে নিয়ে যায় কৃষ্ণাকে। পাঁচটায় সুধাংশুর অফিস ছুটি। ছুটির পর ঘরে এসে চা খেয়ে স্ত্রীকে বলে—চলো, চম্পকদের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসি। মাঝে মাঝে কৃষ্ণাকে একাও যেতে বলে। কৃষ্ণা অভিমানের সুরে বলে—না বাবাঃ, আমি একা যেতে পারব না।

—তবে রোডস্ ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি যাও।

—তুমি থামবে?—কৃষ্ণা রেগে ওঠে।

—হুঁ, এক শর্তে। তোমায় বের হতে হবে ঘর থেকে। বেশ তো একটা ঘণ্টা বাইরে থেকে বেড়িয়ে এসো। তাছাড়া তোমাকে বলব কি? সবই তো জানো!

হ্যাঁ, সব জানে কৃষ্ণা। তবুও সাবধান করে সুধাংশুকে। কিন্তু সুধাংশুকে প্রতিরোধ করতে পারে না। নইলে চম্পকদের ঘরে কৃষ্ণাকে দিয়ে এসে নিজে পালিয়ে আসতে পারে! এইতো সেদিন এমন কাণ্ডটি করেছিল সুধাংশু! কৃষ্ণার অবশ্য ভালই লেগেছিল। ওদের কোয়ার্টারের সামনে সুচনাবৌদির লেডিজ সাইকেলে দুজনে বেশ অনেকক্ষণ সাইকেলে কাটাল।

তারপর চা পর্বটা বেশ আনন্দদায়ক ছিল। আয়াকে চা দিতে বলে সুচনাবৌদি আর কৃষ্ণা বসে গল্প করছে। এমন সময় চম্পক কোথা থেকে কি একটা শাড়ি পরে ট্রে করে চা নিয়ে ওদের সামনে গিয়ে বলল—মেমসাব, বাঁদী চা এনেছে!

সুচনাবৌদির রোগই হচ্ছে হাসা। এমন হাসি হাসতে পারে—তেমন অন্য কেউ নয়। হাসতে হাসতে বলল—ওমা, তুমি যে আমার কাপড়টা পরে এসেছ! মাগো! বরটার কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত নেই! দেখেছো ভাই কৃষ্ণাদি, এই পাগল বর নিয়ে সংসার চালাতে হয়! সাধে কি বলে তোমাদের ঘোড়ার ডাক্তার!

সত্যি, কি অদ্ভুত চম্পক! শুধু ষ্টেজে নয়, ঘরেতেও

সুদক্ষ অভিনয়ের পরিচয় দেয় সে। এই জন্যেই তো আরো ভাল লাগে চম্পককে!

কুয়াশা অনেকটা কেটে গেছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে। রাস্তায় লোক চলাচল বেড়েছে। কোলাহলও সেই সঙ্গে। সূর্যের কিছু আলো ঠিকরে এসে পড়েছে কৃষ্ণার মুখে, কিছু ঘরের ভিতর লুটিয়ে পড়েছে। কৃষ্ণা দাঁতে ব্রাশ ঘষতে ঘষতে আবার রাস্তার দিকে তাকাল—ও কে, চম্পক না! চম্পক কি তাহলে সত্যি আসছে?

ব্রাশটা তাড়াতাড়ি ফেলে রেখে মুখ ধুয়ে নিল কৃষ্ণা। তারপর ওপর থেকে নীচে নেমে এসে কপাটে খিল লাগিয়ে দিল। আবার ওপরে উঠে গিয়ে সুধাংশুর ঘরে ঢুকে গিয়ে দরজায় খিল এঁটে, পিঠ ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করছে।

বুকের ভেতর থেকে কিসের যেন একটা শব্দ খসখস করে উঠল।—ও কালকের সেই চিঠিটা!….না-না, অসম্ভব! চম্পককে কি তার প্রয়োজন? হোক তার স্বামী মাতাল, ঢুকলেই বা ঘরে মাঝ রাতে! ব্লাউজের ভিতর থেকে চিঠিটা বার করল কৃষ্ণা। দেশলাই জ্বালাল। চিঠিটা পুড়তে লাগল। পুড়ে পুড়ে কাল হয়ে গেল। দুমড়ে বেঁকে গেল কাগজটা।

কৃষ্ণা ভাবল—হঠাৎ যেন চারিদিকের কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেছে। পৃথিবীটা যেন খুব জোরে ঘুরতে ঘুরতে স্বাভাবিক হয়ে এলো। সুধাংশু বোধহয় এবার উঠবে। হঠাৎ কিসের একটা শব্দ পেয়ে দেয়ালের দিকে দৃষ্টি পড়ল কৃষ্ণার। দেখলো, ব্যর্থ দৃষ্টি দিয়ে টিকটিকিটা তাকিয়ে আছে, আর আরশোলাটা ডানা মেলে বোঁ বোঁ করে ঘুরছে ঘরের ভেতর!

বিলাস

(গল্প)

জ. কু. বি.

বছর তিনেক আগের ঘটনা।

তখন আমি থাকতাম দক্ষিণে। লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে। ঐ অঞ্চলে যারা বাস করত তাদের উপর আমার আধিপত্য ছিল যথেষ্ট। তাদের সবাইকে ধনীর পর্যায়ে ফেলা যেত। এমন কোন লোক ছিল না, যার অন্ততঃ পাঁচ বিঘে ধানের জমি নেই। টাকা-পয়সা যেমন ছিল, তেমন ছিল চোর-ডাকাতের উপদ্রব। অঘ্রান মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত—এই দীর্ঘ দিন কটির মধ্যে এমন কোন রাত ছিল না যে রাতে কোথাও না কোথাও ডাকাতি হ'ত না। তা সে ছোট রকম ডাকাতিই হোক বা বড় রকমেরই হোক।

ঠিক এমনি এক শীতকালের একদিন বিকেলে গিয়েছিলাম মথুরাপুরে—একটা ডাকাতির তদন্ত করতে। খবর পেয়েছিলাম সকালে। নানা কাজের ঝামেলায় সকালে যাওয়া হয়নি। তদন্ত শেষ করে ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে পোশাক পরিবর্তন ক'রে সবেমাত্র বসেছি, এমন সময় চাকরটা এসে খবর দিল, কোন এক বাবু নাকি অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে। আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বললাম, বলগে যা, আজ আর দেখা হবে না। কাল যেন থানায় দেখা করে।

চাকরটা বলল, বলেছিলাম। কিন্তু তিনি শুনবেন না। ভীষণ দরকার নাকি।

মনের বিরক্তি মনেই চেপে রাখতে হ'ল। বললাম, আসতে বল্। দেখি কার কি ভীষণ দরকার।

চাকরটা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন একজন লোক। বেশবাস দেখে মনে হ'ল বড়-ঘরের ছেলে। ডান হাতের পাঁচ আঙুলের মধ্যে তিন আঙুলে তিনটে দামী পাথরের আংটি। গায়ে দামী গরম কাপড়ের পাঞ্জাবি। তার ওপরে একটা শাল আড়াআড়ি ভাবে ফেলা। বয়স বছর তিরিশের মত।

ভদ্রলোক আমার দিকে হাত দুটি জোড় করে বললেন, নমস্কার।

প্রতি নমস্কার করে বললাম, নমস্কার। বসুন।—একটা চেয়ার এগিয়ে দিলাম। বসার পর বললাম, আপনাকে তো ঠিক........

—চিনতে পারছেন না, এইতো! তা চিনবেনই বা কি ক'রে? আমি তো এখানে থাকি না। দিনকয়েক হ'ল এসেছি। আবার কাল ভোরেই চলে যাচ্ছি। একটা দরকারে আপনার কাছে এসেছি।

—দরকার ছাড়া কেউ আমার কাছে আসে না। বলুন, আপনার কি দরকার।

—না, মানে দরকার ঠিক নয়। দরকার নয় তাই বা বলি কি করে? মানে—

—আপনার বক্তব্য আপনি নিঃসংকোচে বলতে পারেন। তাতে আমার দ্বারা যদি কোন উপকার হয়—সেটুকু উপকার আপনি পাবেন।

—সে আমি জানি। আর জানি বলেই আপনার কাছে এসেছি।—বলে কিছুক্ষণ ধরে কি যেন ভাবলেন ভদ্রলোক। তারপর হঠাৎ এমন এক প্রশ্ন করলেন, যার জন্যে আমি তৈরী ছিলাম না। বললেন, আচ্ছা, আপনি ত গল্প লেখেন, না?

আকাশ থেকে পড়লাম আমি। বললাম, কি বলছেন আপনি?

মৃদু হেসে ভদ্রলোক বললেন, ঠিকই বলছি। আমি জানি, আপনি গল্প লেখেন। আপনার অনেকগুলো গল্প আমি পড়েছি। তাছাড়া......

বাধা দিয়ে বললাম, দেখুন, গল্প আমি লিখি না। আমার চাকরি-জীবনে দু'একটা এমন ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি, যেগুলো আমার কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হ'য়েছে—কেবলমাত্র সেইগুলিই ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করি।

—ঐ একই ব্যাপার। আজ আপনাকে আমি একটা সত্যি ঘটনা বলতে এসেছি। যদি পারেন দয়া করে সেটাকে

জনসাধারণের সামনে তুলে ধরবেন।

একে ত শীতের রাত। তার ওপর কথায় কথায় ঘড়ির কাঁটা আটটার ঘর ছুঁইছুঁই করছে। এত রাতে এই জ্বালাতন সহ্য হচ্ছিল না। তবুও ভদ্রতা বজায় রেখে বললাম, কিছু যদি মনে না করেন, তবে একটা কথা বলি।

—না-না, মনে করার কি আছে? নিশ্চয়ই বলবেন।

—দেখুন, আমি এইমাত্র মথুরাপুর থেকে ফিরছি। ভীষণ ক্লান্ত আমি। আপনার কাহিনীটা কাল শুনলে হবে না?

—এত রাতে আপনাকে জ্বালাতন করার জন্যে আমিও দুঃখিত। কিন্তু উপায় নেই আমার। আপনাকে আমি আগেই বলেছি যে, আমি কাল ভোরেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। হয়ত আর কোনদিনই এখানে আসব না। তাই Please, একটু ধৈর্য ধরে শুনুন।

—বেশ, বলুন আপনার কাহিনী। তার আগে একটা ছোট্ট প্রশ্ন করি। কিছুক্ষণ আগে বললেন, আপনি কাহিনীটাকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে চান। কিন্তু কি লাভ তাতে আপনার?

—লাভ বিশেষ কিছু নয়। আমি চাই কাহিনীটা বিশেষ একজন লোকের চোখে পড়ুক। জানিনা সে উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা। ও কথা থাক। যা বলছিলাম—আমার কাহিনী যাদের নিয়ে, তাদের নাম আমি এখন বলব না।

ক্ষণিকের বিরতি।

তারপর বার দুয়েক কেশে নিয়ে ভদ্রলোক আরম্ভ করলেন, আমার কাহিনীর সময়—এখন থেকে এক বছর আগে। কিন্তু তার আগের ইতিহাস একটু জেনে নেওয়া দরকার।

এখানকার 'রায়' বংশের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। এই কাহিনী সেই 'রায়' বংশের শেষ বংশধরকে নিয়ে। ধরে নেওয়া যাক্ তার নাম দিবানাথ রায়। যদিও এটা তার আসল নাম নয়। লেখাপড়া সে বেশীদূর করেনি। ওসব তার ভাল লাগত না। অর্থের অভাব সে কোনদিন অনুভব করেনি, তাই তার পেছনে চাটুকারেরও অভাব ছিল না। সভ্য ভাষায় যাদের বলা হয় বন্ধু। কিন্তু তারা সবাই সুখের দিনের। দুঃখের দিনের কেউ নয়। ওসব ব্যাপারে মাথা ঘামান দরকার মনে করেনি দিবানাথ। ফলে যা হবার তাই হ'ল। দিনে দিনে অবনতির শেষ সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল সে। ছেলের উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষ্য করেই বোধহয় দিবানাথের বাবা তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। অমত করেনি দিবানাথ। বাবার পছন্দ করা পাত্রীকে বিয়ে করেছিল সে। কিন্তু রায় বংশের পূর্বপুরুষরা কেউই একজন মাত্র অগ্নিসাক্ষীকরা স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারত না। লোক দেখান একটি করে স্ত্রী সবারই ছিল। কিন্তু তাদের ঘরে বহু নারীর গোপন অভিসার চলত। তারা আসত রাতের অন্ধকারে আবার ভোর হবার আগেই চলে যেত। যাওয়ার সময় বহন করে নিয়ে যেত 'রায় বংশের' কলঙ্ককে—যাদের জন্ম হ'ত কোন এক অশুভ মুহূর্তে। কিন্তু পৃথিবীর আলো তারা কেউই দেখতে পেত না। সে সম্ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করা হত তখনই, যখনই তাদের অস্তিত্ব ধরা পড়ত। এসব ব্যাপার এ
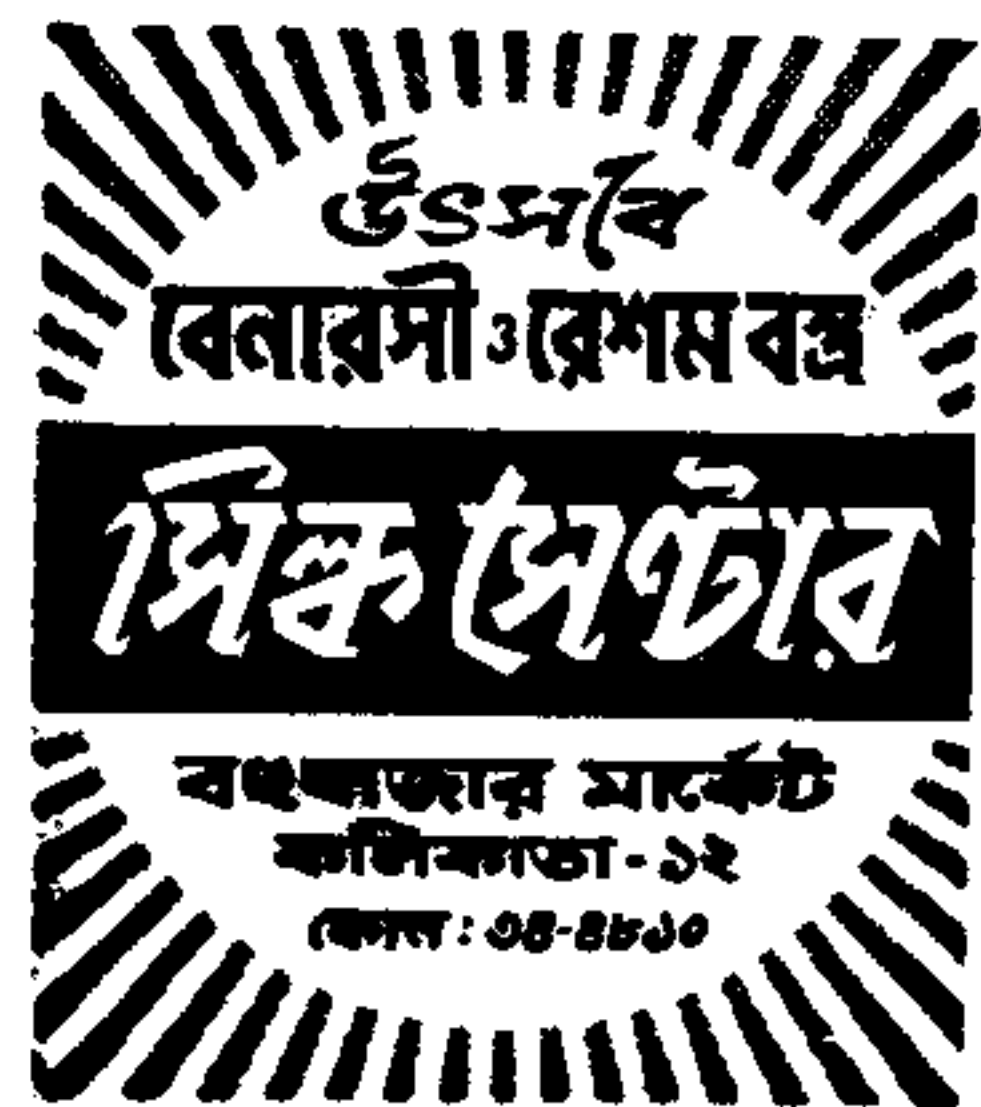
অঞ্চলের প্রতিটি লোক জানে। কিন্তু কেউ কোন আপত্তি করে না। যে করে, তারপর দিন থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না। চার-পাঁচদিন পরে হয়ত শোনা যেত, নদীর ধারে মাটির তলা থেকে শেয়ালে একটা অজানা মৃতদেহ টেনে তুলেছে।

সেই পূর্বপুরুষের রক্ত বইছে দিবানাথের প্রতি শিরা-উপশিরায়। তাই সেও পারেনি একটি মাত্র স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে। দিবানাথের স্ত্রী এসব সহ্য করতে পারত না। প্রথম থেকেই আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু দিবানাথ গায়ে মাখেনি। কারণ, ওরকম আপত্তি প্রথম প্রথম সবাই তোলে। তারপর ঠিক হ'য়ে যায়। দিবানাথ ভেবেছিল, রায় বংশের আর পাঁচটা স্ত্রীর মত সেও একজন। এই ভাবাটাই তার হয়েছিল মস্ত ভুল। বুঝতে পারেনি তাদের সঙ্গে এর একটু তফাত আছে।

প্রথম প্রথম সে দিবানাথকে ঐ পিচ্ছিল পথ থেকে সরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিল। কোন ফল হয়নি তাতে। তারপর একদিন সোজাসুজি বলে বসল, তুমি আর কাউকে এ বাড়িতে আনতে পারবে না।

হেসে বলেছিল দিবানাথ, কেন ?

—কেন আবার কি ?

—হুকুম না কি ?

—যদি বলি, হ্যাঁ।

—তাহ'লে বলব, সে হুকুম মানতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত।

সেদিনও দিবানাথ একই ভুল করেছিল। গুরুত্ব দেয়নি সে কথায়। হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

—একটু দাঁড়ান।—চেয়ার ছেড়ে আমি লাফিয়ে উঠলাম। ছুটে গিয়ে টেনে আনলাম পুরোনো চিঠির একটা বাণ্ডিল। টেনে বার করলাম একটা চিঠি তার থেকে। চিঠিটা খুলে বললাম, আমি পড়ছি আপনি শুনুন।

আমার ব্যবহারে ভদ্রলোক হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। অবাক্ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি শুনব ? কার চিঠি ?

—হ্যাঁ আপনি শুনবেন। আর চিঠিটা আমার। শুনুন তাহলে।—ভদ্রলোককে আর কোন প্রশ্ন করতে না দিয়ে আমি পড়তে আরম্ভ করলাম সম্বোধনহীন সেই চিঠি।—

—আমাকে আপনি চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। চিনি বললে ভুল হবে—খুব ভালভাবে চিনি। আমাকে না চিনলেও আমার স্বামীকে আপনি চেনেন। না চিনলেও তাঁর নামটা অন্ততঃ শুনেছেন। তাঁর নাম সত্যরঞ্জন রায়।

কেন আমি আপনাকে এই চিঠি লিখছি, এবার তাই বলি। আমার স্বামী চরিত্রহীন, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্যে এমন কোন কাজ নেই, যা তিনি করেন না। বহু নটীরও আগমন হয় তাঁর ঘরে। আমি এসব পছন্দ করি না। কিন্তু আমার স্বামী আমার কথা শোনেন না। আমি জানি আমার স্বামী এবং তাঁর বিলাস সঙ্গিনীরা সবাই পানাসক্ত। আজ সেই সুরা পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়ে রেখে এলাম বিষ। হয় আমার স্বামীকে নয় তাঁর বিলাস সঙ্গিনীকে এর ফল ভোগ করতেই হবে। কাল আপনাকে এখানে আসতে হবে। যদি আমার স্বামী ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান, তবে তাঁর ওপর যাতে কোন মিথ্যা দোষারোপ না পড়ে, তার জন্যে এই চিঠি লিখে রেখে গেলাম। আমাকে আপনি পাবেন না। আজ রাত্রেই আমি চলে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না। তবে যেতে যে আমাকে হবেই সেটুকু জানি। সেদিনই আমি ফিরব যেদিন জানতে পারব আমার স্বামী ভাল হয়ে গেছেন। অবশ্য যদি তিনি বেঁচে থাকেন।

ইতি—

প্রমীলা রায়

চিঠিটা শেষ করে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। দেখলাম, তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, আমি চললাম। আচ্ছা, নমস্কার।

— কিন্তু আপনার কাহিনীর অর্ধেক তো এখনও বাকী আছে।

—না নেই। যা বলেছি তার সঙ্গে আপনার চিঠিটা জুড়ে দেবেন। তা হলেই হবে। যাবার আগে শুধু বলে যাই, আমিই সত্যরঞ্জন রায়। প্রমীলা রায় আমারই স্ত্রী। আপনার কাহিনীর শেষে লিখে দেবেন, আমি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছি। তার ফেরার অপেক্ষায় আমি চিরদিন বসে থাকব।

৪৬শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

নন্দজীকে বিদায় নিতে হ'ল

এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দকে মন্ত্রিত্বের তখ্‌ত্‌ ই-তাউস থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হল। নন্দজী কেন্দ্রীয় কেবিনেটের একজন হোমরাচোমরা ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি দু'বার অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী ও গত ষোল বছর ধরে মন্ত্রিত্ব করার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন।

গো-হত্যা বন্ধের দাবিতে ত্রিশূল ও বর্শাধারী সাধুরা ও গো-মাতার ধ্বজাধারী অ-সাধুরা দিল্লীর পার্লামেণ্ট ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শনের নামে যে হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তার ফলে সাতটি মানুষের প্রাণহানি হয়েছে, কয়েক শত মানুষ জখম হয়েছে আর প্রচুর ধন-সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। পরে কংগ্রেস সংসদীয় দলে সকলে নন্দজীর পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং নেহাতই নিমিত্তের ভাগীদার হয়ে নন্দজীকে কেন্দ্রীয় কেবিনেট থেকে বিদায় নিতে হল।

রাজধানীতে শান্তি রক্ষায় ব্যর্থতা হোম মিনিষ্টারের চরম ব্যর্থতা, সন্দেহ নেই। তা' ছাড়া ভারতের সর্বত্রই আজ আইন ও শৃঙ্খলার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কিন্তু গো-রক্ষা আন্দোলন দমনে নন্দজীর ব্যর্থতাকে যতটা বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে, তাঁর পদত্যাগ বা মন্ত্রিসভা থেকে বিতাড়নের সঙ্গে তার কোনো বিশেষ সম্পর্ক আছে বললে পুরো সত্য বলা হয় না। কারণ রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের এই বিস্ময়কর ও অবৈজ্ঞানিক আন্দোলনের পিছনে আরও বহু শক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এসে জড়ো হয়েছে। নন্দজীর পদত্যাগের সঙ্গে নীতির প্রশ্নের চেয়ে রাজনীতির নেপথ্য ক্রিয়াই বেশি জড়িত ছিল, একথা বললে বোধহয়

ভুল বলা হবে না।

নন্দজীর পদত্যাগে শাসক মহলের একাংশে উল্লাস দেখা দিলেও, শাসক পার্টির এই আভ্যন্তর রাজনীতির খেলায় বিরোধী দল মোটেই স্বস্তি বোধ করছেন না। পদত্যাগের পর নন্দজী প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠিতে তাঁর দপ্তরের সিভিলিয়ান সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে অসংযোগিতা এবং তাঁর নিজের দলের একাংশের প্রতিকূল আচরণ সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করে গোটা ব্যাপারটাকে একটা জেহাদের রূপ দিয়েছেন।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় নন্দজীর পদত্যাগের স্বপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন, তা মোটামুটিভাবে আত্মরক্ষামূলক। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে একথা মোটেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি যে, দিল্লীতে গো-রক্ষা আন্দোলনকারীদের উচ্ছৃঙ্খলতা দমনে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ব্যর্থতার জন্য নন্দজীই দায়ী কিংবা এই কারণেই তাঁর পদত্যাগের প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি স্বীকার করেছেন যে, কোনো কোনো বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মিল ছিল না। তিনি যে নন্দজীকে চান না এবং প্রথম দিন থেকেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পদে তাঁকে চাননি, একথা সুবিদিত ছিল। নন্দজীর ভুল হয়েছে এখানেই। গো-রক্ষার কৃত্রিম উৎপাতের আগুনে হাত না পুড়িয়ে তিনি সসম্মানে আগে বিদায় নিলে দলীয় কলহ বাইরে প্রকাশ হ'ত না, নিজেরও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকত।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, নন্দজীর কেন এমন দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হ'ল! এর কারণ একাধিক। এই সব কারণের মধ্যেই নিহিত আছে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ব্যর্থতা আর কোটি কোটি মানুষের দুর্দশার ইতিহাস। নন্দজীর মন্ত্রিত্বের হাতে খড়ি হয় বোম্বাইয়ে। সেখান থেকে নেহরুজী তাঁকে নিয়ে আসেন দিল্লীতে। তাই কংগ্রেসের কোনো রাজ্য-সংগঠনেই তাঁর পা রাখার জায়গা নেই, তিনি তার জন্য কোনো চেষ্টাও করেন নি। তাই শিখর চূড়া থেকে তাঁর এই আকস্মিক পতনে কংগ্রেস সংগঠনের কোনো অংশ তাঁর পিছনে এসে দাঁড়ায় নি। নন্দজী কেন্দ্রীয় কেবিনেটে ছিলেন একটি নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্ব। দলীয় নীতির উর্ধ্বে উঠতে চেয়েছিলেন বলে তিনি পেয়েছিলেন প্রতি পদে বাধা। তাঁর সদাচারী জেহাদ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি সঙ্কল্প করেছিলেন যে, দু' বছরের মধ্যে ভারত থেকে দুর্নীতি নামক জঞ্জাল একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবেন। দুর্নীতির কয়েকটি ছায়ার সঙ্গে তিনি যুদ্ধও করেছিলেন। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, ভারতের উর্বর মাটিতে দুর্নীতির শিকড় বহুদূর অবধি পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে। এটাই তাঁর রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার চরম দৃষ্টান্ত। তাঁর এই সদাচারী মনোবৃত্তির জন্য স্বভাবতঃই তিনি সিণ্ডিকেটের বিরাগভাজন হয়েছিলেন এবং তাদেরই অনলস প্রচেষ্টায় তাঁর পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

যে দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে নন্দজীকে বিদায় নিতে হল, তা' কারুর কারুর কাছে স্বস্তিকর বলে মনে হলেও বাস্তবিক পক্ষে তা শোচনীয়। নন্দজীর বিদায়ের মধ্য দিয়ে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কেন্দ্রীয় কেবিনেটে প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের প্রাধান্য এখনও অব্যাহত আছে।

স্বপ্ন-সাধ

মদন দাশ

সকলে তোমাকে দেখে, আমি কেন দেখিনা তোমায়?
আমার অতন্দ্র চোখ কত রাতে করেছে বিহার,
নিষ্ফল প্রয়াস মোর—ব্যাকুলিত তোমার ছোঁয়ায়;
তুমি তো কোথাও নেই ব্যর্থ রাত আশা আকাঙ্ক্ষার।

তবুও তুমি আছো এ স্বীকৃতি দিয়েছে পৃথিবী;
কত রূপে কত সাজে আবির্ভূতা তুমি লো সুন্দরী!
পলকে মুছায়ে দাও যত ব্যথা যত দুঃখ-ছবি,—
হোক সে ক্ষণেক তবু জীবনের আশা ওঠে ভরি'।

তাই অন্বেষণ করি কোথা তুমি, দু'চোখে আমার,—
অন্ততঃ আজকের রাতে স্বপ্ন তুমি কর অভিসার।

তবুও সুখ, তবুও শান্তি, তবু আনন্দ জাগে!

সাতপাঁচ

শ্রীনাথ

প্রেসিডেন্ট জনসন মেলবোর্নের পথে চলার সময় এক ব্যক্তি লাল ও সবুজ রঙের থলি তাঁর গাড়ীতে ছুঁড়ে মারে। রঙে সমস্ত গাড়ী চিত্রিত হলেও প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পত্নীর গায়ে এক ফোঁটাও রং লাগে নি।......প্রেঃ জনসন এই ঘটনা নিয়ে পরে রসিকতা করেন।

—রসিক সাগরের গায়ে রঙ না লাগলেও মনে বোধহয় রঙ ধরেছে!

সংবাদে প্রকাশ, উত্তর প্রদেশের কয়েক লক্ষ লোক প্রায় অনাহারে রয়েছে, না হয় স্রেফ ঘাস-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করছে।

—ভবিষ্যতে ঘাস-পাতার কণ্ট্রোল হবে না তো?

টোকিওর এক সংবাদ প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব-এর ধারা অনুযায়ী যতদিন না শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত লালচীনের ছাত্রসমাজ লেখাপড়া করবে না।

—ও পাটটা একেবারে চুকিয়ে দিলে কেমন হয়?

ফ্রান্সের জ্যোতিষীরা, উ থান্টের ভাগ্য গণনা করে এক-দল বলেছেন, তিনি পদত্যাগ করলে সরাসরি বাড়ী ফিরে এসে নিজের স্মৃতি কথা লিখতে বসবেন। অবশ্য তিনি যদি তাই করেন, তাহলে তাঁর স্মৃতি কথার বই বেশ ভালই বিক্রি হবে।

—'করলে' 'যদি'—বাদ দিয়ে, আমরা গণনা না করেই বলতে পারি—অন্ততঃ অ-বিক্রি থাকবে না!

শ্রীব্রেজনেভ বলেছেন, ভিয়েৎনাম যুদ্ধ অব্যাহত থাকলেও সোভিয়েত-আমেরিকা সম্পর্কের উন্নতি হতে পারে—রাষ্ট্রপতি জনসন এইরকম এক অদ্ভুত অথচ এক-গুঁয়ে মরীচিকাময় স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন।

—স্বপ্নটা দিবানিদ্রা না কপটনিদ্রা শ্রীব্রেজনেভ ভেবে দেখেছেন কি?

পুলিসী সূত্রে প্রকাশ, দেশব্যাপী গো-হত্যা নিবারণ আইন প্রণয়নের দাবিতে ২৫৬ জন সাধুকে সংসদ ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

—ভিক্ষার অভাব যে দেশব্যাপী!

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে ১৯২৬ সাল থেকে উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ কোর্টে একটি দেওয়ানী মামলা চলছে। এতে ৪২ জন বিচারপতি ও দুই ডজনের বেশী আইনজীবী মামলাটি পরিচালনা করেছেন।—এঁদের মধ্যে স্বর্গত আসফ আলি এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় আইন-মন্ত্রী শ্রীপাঠকের নাম উল্লেখযোগ্য।

—আইনের প্যাঁচে পড়ে বাদী-বিবাদীদের প্রেতাত্মারা মামলার রায় শোনবার জন্যে কোর্টে ঘোরাফেরা করছে না তো?

গত ১৭।১০.৬৬ তারিখ দৈনিক বসুমতীতে জনৈক পত্রলেখক 'মায়াবিনী সমবায়িকা' শীর্ষক চিঠিপত্র স্তম্ভে সমবায়িকার কয়েকটি জিনিসের বাজার ছাড়া দরে হতাশা প্রকাশ করেছেন।

—কালবাজারের দৌলতে কে-না দু-পয়সা কামাচ্ছে মশাই?

চিনখুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমেত আরও আটজন অধ্যাপককে লালরক্ষী দলের বিচারে প্রতিক্রিয়াশীল বলে সাব্যস্ত করে অধ্যাপকের পদ থেকে অপসারিত করে বাগানের মালীর কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে।

—অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা থেকে বাগানের মালিকানা? লালরক্ষী জিন্দাবাদ!

———

চিরন্তন

সুকুমার মান্না

একটি দিনের শেষ—
জীবন-যাত্রার মাঝে মূল্য শুধু গোনা ;
আবার রাতের শুরু—
পথের প্রান্তরে কেন শোনা
কতশত বিদায়ের সুর !
রাতের শিশির পড়ে বড় সুমধুর ।

দিন যায় রাত যায়—
পাতা ঝরে ফাগুনের বন হতে বনে,
একটি হিমেলী মন
দেখা করে শয়নে-স্বপনে ।

আবার মাঘের শেষে
কখন ধানের ক্ষেতে হাত রেখে রেখে
আমাদের পাতার কুটীরে আশা নামে ;

কিংবা কোন পথে পথে
আমাজান, নীল আর মিসিসিপি তীরে
ঘর ছেড়ে ঘুরিতেছি কবে
রাত আর দিন নাহি থামে ।

পৃথিবীর এই কাজ শেষ হলে তবে
দেওয়া নেওয়া ফুরাতেই হবে,
'রাত-দিন' বাঁধা রবে বটগাছ, বাবলার ডালে—
একটি হিমেলী হাত একটু ক্ষণের মত
জীবনের অণুতে ছোঁয়ালে ।

তখন চিতার কাঠ উত্তাপে রাঙা হয়ে হয়ে
শুনাবে তো ব্যর্থ পরিণাম—
সব ভুল থেকে যাবে
কবে থেকে কোথা ছিল ক্ষণিকের ধাম॥

মুহূর্তের জন্যে

সংস্মিতা

কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের পুলিস দপ্তরের খ্যাতি ও কৃতিত্ব সারা ভারতের গৌরবের বস্তু। কলকাতা পুলিসের গোয়েন্দা দপ্তরের সঙ্গে অনেকে ইউরোপের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডেরও তুলনা করেন। কিন্তু পর পর কয়েকটি অঘটন ঘটায় স্বভাবতঃই জনসাধারণের মনে এই প্রশ্ন জেগেছে যে, তবে কি পশ্চিমবঙ্গ পুলিস দপ্তরের সে গৌরব-রবি অস্তমিত প্রায় না, এর পেছনে অন্য কোন রহস্য আত্মগোপন করে আছে।

পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্ত বেলঘরিয়া, বেলগাছিয়া ও অপর প্রান্ত নিউ আলিপুরে এক শ্রেণী সমাজ-বিরোধী গোষ্ঠীর অবাধ কার্যকলাপের ফলে ঐসব জায়গায় সন্ত্রাস-রাজত্বের সৃষ্টি হয়েছে। যথেচ্ছ ভাবে বোমা, বন্দুক ব্যবহৃত হচ্ছে; আর তার ফলে একের পর এক মানুষের জীবন-হানি ঘটছে। সেখানকার শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, দিনের পর দিন এ ধরনের সমাজ-বিরোধী অঘটন সত্ত্বেও পুলিস কোন কার্যকরী ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছে। শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ধন-মান-প্রাণ রক্ষায় যদি পুলিস ব্যর্থ হয়, সরকারী কর্ম তৎপরতা যদি সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হয়, তাহলে এ কোন্ মগের মুলুকে আমরা বাস করছি!

রাজনীতির ধূম্রজালে আত্মগোপন করে যদি এই সব সমাজ বিরোধীরা অবাধে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যায়; তাহলে সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা কোথায়? রাজ-নৈতিক আন্দোলন দমনে যতটা পুলিসী ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়, তার সামান্যতম অংশের শক্তিও যদি এই সব সমাজ-বিরোধীদের বিরুদ্ধে কার্যকরীরূপে প্রযুক্ত হ'ত, তাহলে বোধহয় আজ আর এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হ'ত না!

* * *

কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা এতদিনে তাঁদের ব্যর্থতা স্বীকার করলেন। তাঁদের হেপাজতে মোট বাসের সবচেয়ে বেশী ভিড়ের সময় রাস্তায় বের করা হয়। তাঁরা হিসাব খতিয়ে দেখেছেন যে, যত কম সংখ্যক বাস রাস্তায় চালান যায়, তাতে নাকি তাঁদের লোকসানের অঙ্ক কম হয়। অর্থাৎ শহরের বুকে বাস চালান মানেই লোকসানের অঙ্ক স্ফীত করা। অঙ্কশাস্ত্রের এ এক অদ্ভুত যুক্তি!

পরিবহন যেখানে একটা লাভজনক ব্যবসায়, অব্যবস্থা ও পরিচালন-প্রণালীতে ত্রুটির জন্য সেখানে এটা একটা বিরাট লোকসানের স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাত্রী বহনের একচেটিয়া অধিকার পেয়েও রাষ্ট্রীয় সংস্থা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলেন না। তাই শহরের উপর থেকে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় সংস্থার বাস প্রত্যাহার করে নেওয়ার নীতি স্বীকৃত হয়েছে এবং তার পরিবর্তে বে-সরকারী বাস চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে, শহরতলীর চার পাঁচ শ বাস শহরের সীমানায় যাত্রাভঙ্গ না করে কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত প্রসারিত করা হবে। তার ফলে শহরতলীর বাসে ট্রিপের সংখ্যা কমবে বটে, কিন্তু শহরে যাতায়াতের পথে যাত্রীরা সীমানায় গাড়ী বদল না করে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারবে। ফলে অন্যান্য বাসে ও ট্রামে যাত্রীর চাপ কিছুটা কমবে।

বাসে ও ট্রামে যাত্রী বোঝাইয়ের যে এক অসহনীয় অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, তা থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পাওয়া যাবে, এই আশায় জনসাধারণ যথেষ্ট খুশী হয়েছেন। এতদিন সরকারী বাসগুলি টার্মিনাস ছাড়বার পর পাঁচ মিনিট যেতে না যেতে বোঝাই হয়ে যেত এবং বাকী পথের যাত্রীরা দুরন্ত ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে গাড়ীতে ওঠা-নামা করতে বাধ্য হত। এ ছাড়াও সরকারী পরিবহনের কর্তারা নানা অছিলায় বিভিন্ন দফায় ভাড়া চড়িয়েছেন এবং গাড়ীর সংখ্যা কমিয়ে যাত্রীর ভিড় বাড়িয়েছেন। সরকারী ও বে-সরকারী বাস এবং ট্রাম—এই ত্রি পক্ষের প্রতিযোগিতা চালু থাকলে পরিবহন ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে পারে,—পরিবহন ব্যবস্থার একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হলে যাত্রী সাধারণের সমস্যা

ক্ষয়ে যাওয়া জীবন

(গল্প)

শ্রীঅঘোরচন্দ্র মুর্নিয়ান

প্রায় দেড় যুগ আগের কথা। আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। পরিচয় হয়েছিল ছোট্ট একটা মেয়ের সঙ্গে। অপর্ণা তার নাম। বড় মিষ্টি নামটা। জীবনের অনেকগুলো বছর পার করে দিয়েও অপর্ণাকে আমি ভুলতে পারিনি আজও। এখনও ওর কথা মনে পড়লে ক্ষতবিক্ষত অন্তরটা হাঁপাতে থাকে। শূন্য মনটার ওপর নেমে আসে বিষাদের কালো ঘোমটা।

অপর্ণার কাছে শুনেছি ওদের বাড়ী ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের কুমিল্লায়। আমার নিবাস এ বঙ্গে। গ্রামটার নাম তিলডাঙ্গা। অনেকের মুখে শুনেছি তিল তো দূরের কথা, সরষের চাষও আমাদের গ্রামে হয়নি কোনদিন। যাক্‌গে ওসব কথা। পাকিস্তান হয়ে যাওয়ার পর অপর্ণারা শূন্য হাতে ও সর্বহারা হয়ে এসেছিল বলে আমার ঠাকুরদা ওদের বাড়ী করার জন্য কিছুটা জমি দিয়েছিল। গ্রামে আমাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল।

আমাদের গ্রামে ছোট্ট একটি প্রাইমারী স্কুল ছিল। অপর্ণার বাবা অপর্ণাকে সেই স্কুলেই ভর্তি করেছিলেন। ও তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। আমি তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। ওদের সঙ্গে ভাব জমে গেল। কালক্রমে সেটা আত্মীয়তায় পরিণত হলো। বাইরের কেউ দেখলে বুঝতেই পারবে না যে ওরা আমাদের কেউ নয়।

দেখতে দেখতে বেশ কয়েক বৎসর কেটে গেল। আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। আর অপর্ণা তখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। অপর্ণার বাবা পরেশবাবু মনে মনে স্থির করেছিলেন আমাদের কৃত উপকারের বিনিময়ে তিনি আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হবেন। দাদুর কাছে তিনি আমার সম্বন্ধে প্রস্তাব করেছিলেন। দাদুও সে প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন।

আস্তে আস্তে কথাটা আমার কানে গেল। অপর্ণারও বুঝতে বাকী রইল না। অবশ্য সেটা অনেক পরে। আমি I. A. পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী এসে Result-এর দিন গুনছি। অর্থাৎ তখন আমার বন্দী আর অলস জীবন। ইতিমধ্যে অপর্ণার বাবা অপর্ণাকে পড়ানোর জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে দাদুর অনুরোধে রাজী হতে হ'ল। আমি অপর্ণার মাষ্টার নিযুক্ত হয়ে গেলাম।

আমার Result out হল। পাস করলাম। কিন্তু তখন আমাদের উভয়ের উভয়কে না দেখলে এক মুহূর্তও কাটানো অসম্ভব ছিল। অথচ আমাকে কলকাতায় যেতেই হবে। মন মানছে না। কেবল আমার নয় ওরও একই অবস্থা। জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবকাশে অথবা নির্জন সন্ধ্যায় আমায় ও বলত—তোমাকে চোখের আড়াল করলে আমি বাঁচব না।

—লক্ষ্মীটি, অবুঝ হয়ো না। আমাকে যে যেতেই হবে। ওর ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদামের মধ্যে আঙ্গুল চালাতে চালাতে বললাম আমি।

—তুমি যাবে যাও। আমি বাধা দেব না। তোমার ভবিষ্যৎ গড়ে তোল। আমি না হয় তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। কিন্তু তুমি আমায় ভুলে যেও না। ব্যথার দমকে ওর টানা টানা চোখের দু'কোণ বেয়ে নামলো অশ্রুবন্যা।

—তাও কি হয়! তোমাকে কি আমি ভুলতে পারি পর্ণা। তোমায় যে আমি ভালবাসি। ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম আমি।

কলকাতায় আসার আগের দিন চোখের জল মুছতে মুছতে একটা ফর্দ ও আমায় এনে দিলে। তাতে লেখা ছিল তিন-চার সাইজের ফটোগ্রাফ চাই। সপ্তাহে খান দুই চিঠি চাই, শনিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে বাড়ী আসা চাই ইত্যাদি আরো অনেক কিছু।

ওকে অনেক বুঝিয়ে আমি কলকাতায় গেলাম। কিন্তু আমার দেহটাই গেল। মনটা বাঁধা রইল অপর্ণার আঁচলে। হোষ্টেলের বন্ধুদের কাছে ওকে নিয়ে কত কথাই শুনিয়েছি। হয়ত কালু চাকর বা ভোলা নামে কোন বন্ধুকে ডাকতে গিয়ে ডেকে ফেলেছি অপর্ণা বলে। অনেকদিন নাকি আমি স্বপ্নের মাঝখানে অপর্ণা অপর্ণা বলে চেঁচিয়েও উঠেছি বার বার। পড়তে বসেও মনে পড়েছে অপর্ণাকে।

অনেকদিন যাইনি তিলডাঙ্গায়। লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। ইতিমধ্যে পর্ণা ম্যাট্রিক পাস করে ভর্তি

হয়েছে ওখানকার এক ছোট্ট কলেজে। শুনেছি কলেজে ওর একটা বন্ধুও জুটেছে। নরেন তার নাম। ওর ক্লাসমেট। কোন এক সরকারী অফিসারের ছেলে। স্মার্ট। অভিজাত চেহারা। অপর্ণার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্যে নরেন নাকি অনেকদিন চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে। বন্ধুত্ব নাকি অন্তরঙ্গতায় পরিণতও হয়েছে। খবরটা আমায় জানিয়েছিল সুদন্ত। ও আমার বিশেষ বন্ধু। সব শুনে আর আমি স্থির থাকতে পারলাম না। গেলাম একদিন তিলডাঙ্গায়। আমার বন্ধুদের মুখে শুনে অপর্ণাকে ওর গুণগ্রাহী বন্ধুর কথা জিজ্ঞেস করলাম। আমার প্রশ্নের উত্তরে ও শুধু কেঁদেছিল। ওর চোখের জল থামাতে সেদিন আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমি আমার দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নিলাম আমার ব্যবহারের জন্য। একথা দাদুর কানেও উঠেছিল। তিনি আমাদের বিয়ের ঠিকঠাক করে ফেললেন। আমি B. A. পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী ফিরলেই বিয়ে হবে।

আমার টেষ্ট হয়ে গেছে তখন। ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য প্রিপেয়ার হচ্ছি। হঠাৎ একটা চিঠি পেলাম অপর্ণাকে নিয়ে নরেন পালিয়ে গেছে। যাবার আগে ওরা নাকি রেজেস্ট্রি করে বিয়েও করে গেছে।

চিঠিটা পেয়ে আমার যে কি হয়েছিল জানি না। আমি নাকি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম—দুনিয়াটা যেন আমার কাছে অন্ধকার হয়ে গেল। কয়েক দিন হাসপাতালে ছিলাম আমি। দাদু খবর পেয়ে আমাকে নিতে এসেছিলেন, আমি কিন্তু যাইনি। পরীক্ষা না দিয়ে রাতের অন্ধকারে একদিন পালিয়ে গেলাম দেরাদুনে।

দেরাদুন। একটা ছোট্ট পাহাড়ী শহর। দূর থেকে হিমালয় দেখা যায়। ছোট ছোট পাহাড়ের গায়ে কাঠের বাড়ীগুলো এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। পাইন আর ওক্ গাছগুলো ভিড় জমিয়েছে এখানে-ওখানে। শহরটাকে দেখলে মনে হয় যেন পাহাড়ের আঁচল চাপা। ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সর্পিল গতিতে ছুটে চলেছে কাঁকরের রাস্তাগুলো। রাস্তা দিয়ে একা চলতে চলতে পথিক দাঁড়ায়। পথ হারায়। শোনে কোন বিরহী বিহঙ্গের আর্তনাদ। আমিও শুনতাম।

দেরাদুন থেকে ফিরে এলাম। মনে করেছিলাম জীবনের স্বাভাবিক গতি থেকে সরে গিয়ে পাবো শান্তি। কিন্তু পাইনি। ক্রমশঃ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলাম, তবু আমার অতীতকে আমার মনের পাতা থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারিনি।

কতদিন পরে তিলডাঙ্গায় ফিরেছি জানি না। লোকে বলে তিন বছর পরে। এসে দেখি দাদু মারা গেছেন আমার চিন্তায়। বাবা রোগ শয্যায় শায়িত। ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে। মা হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। আমায় দেখে বাবা মা'র কাছে আমার নামে বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। আমাকে কাছে ডেকে কি বলতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর সব কথা না-বলা রয়ে গেল। আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়লেন তিনি। এ জগৎ থেকে বিদায় নিলেন। সবাই বললে—আমার জন্যে তিনি অপেক্ষা করছিলেন।

কল্পনা তোমার মনে

অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য

কল্পনা তোমার মনে কামনার একশ বছর
সঙ্কুচিত পায়ে হেঁটে জাপানী দুহিতার মুখ
চুম্বকে অসাড় নজর।

কল্পনা তোমার কাছে যৌবন দুরন্ত নদী—
ঝড়ে মাথা তুলে রাখা উদ্ধত ঘাসের কুসুম
মাখন শরীরে। সময়েরা ভুখা মরে, যদি

কল্পনা তোমার বুকে জোছনাকে ভোরে টেনে নাও ;
চোখে রাত হয়ে থাক নির্বাক কাজলের মায়া।
রোদের ধারালো নখ—ছায়া হয়ে আমাকে বাঁচাও।

নীড় বাঁধা হল না

(গল্প)

এস. দত্ত

আলোর চাদর ঢাকা রাতের কলকাতাকে খুব সুন্দর বলে মনে হয়, না ? মানস নেত্রে ভেসে ওঠে প্যারী অথবা লণ্ডনের কথা! খুবই স্বাভাবিক। কল্পনাবিলাসী মানুষ কল্পনার জাল বুনতে যে খুব ভালবাসে! নিয়ন লাইটগুলো আলোর বন্যা বইয়ে দিয়ে ঝিকিমিকি তারা ঢাকা আকাশের একফালি চাঁদকে যখন ব্যঙ্গ করে ; ভাবি, কী সুখী এই কলকাতার মানুষগুলো! কিন্তু কেউ ভেবে দেখে না পথের নিরাশ্রয় ভিখারীগুলোর কথা, যারা দু'টি পয়সার জন্য হাত পেতে দাঁড়ায়। কেউ ভেবে দেখে না বস্তির সেই মানুষগুলোর কথা, যারা সারাদিন পরিশ্রম করেও একবেলা পেট পুরে খেতে পায় না ; যাদের ছেলে-মেয়ে ডাষ্টবিন থেকে ফেলে দেওয়া আহার্য উদরসাৎ করে, যাদের ছেলে-মেয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, হাসপাতালের আউট ডোরেও ওষুধ দেওয়া হয় না।

সেদিন সন্ধ্যায় অফিস ছুটির পর হন্তদন্ত হয়ে চৌরঙ্গীর পাশ দিয়ে বাড়ীর দিকে ছুটছিলাম। বাড়ী না বলে বস্তি বলাই বোধহয় ভালো। একটা লোক হাত পেতে দাঁড়ালো আমার সামনে। থমকে দাঁড়ালাম আমি। বেকুব ও অসভ্যের মত চেহারা তার। বয়স চল্লিশ না হলেও কাছাকাছি হবে। চুলে তার তেল পড়েনি অনেকদিন। মুখ ভর্তি কাঁচা পাকা দাড়ি। পরনের কাপড়টার কথা না বলাই ভাল।

মনিব্যাগটার মধ্যে ছিলো পঁচিশ পয়সা। এক পেট খিদের সংস্থান। ভেবেছিলাম, হারু দত্তর দোকান থেকে দু'টো রাধাবল্লভী কিনব রাতে খাবার জন্য। কিন্তু হ'ল না। পয়সাগুলো তুলে দিলাম তার হাতে। তার ক্লিষ্ট করুণ মুখে ফুটে উঠল এক ঝলক প্রশান্ত হাসি। তার করুণ মুখের লাবণ্য মাখা হাসি চমকে দিল আমায়। মনে পড়িয়ে দিলে স্মৃতির সাগরে হারিয়ে যাওয়া একটি মুখ। মনে পড়ে গেল সুনন্দ রায়ের কথা। সেও ঠিক এমনি ভাবে হাসত।

গাঁয়ের কলেজে একসঙ্গে পড়তাম আমরা। হ্যাঁ, আমাদের দু'জনের মধ্যে ভালবাসা ছিল। খুব গভীর স্বচ্ছ প্রেম। কামনার বারিতে তা ধোয়া নয়। শরতের শিউলি ঝরা দুপুরে অথবা কোকিল ডাকা বাসন্তী সন্ধ্যায় বা বর্ষার দিনে একটা ছাতার মধ্যে পাশাপাশি হেঁটে গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে কলেজ থেকে বাড়ী ফিরতাম আমরা দু'জনে। বেশ ভাল লাগতো। সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়লে আজও শিহরন জাগে দেহে। সেই সঙ্গে মনেও। অতীত দিনগুলোকে ফিরে পাব না জানি, কিন্তু সেই দিনগুলোর স্মৃতি যে মুছে যাবার নয়!

আমার চোখের সামনে দিয়েই তিনটে বছর কেটে গেল দেখতে দেখতে। বি. এ. পাস করলাম আমরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে পা বাড়াবার মতো আর্থিক সঙ্গতি আমাদের দু'জনের কারুরই ছিল না। তাই চাকরির চেষ্টা করতে হল আমাদের। জোড়া দুই জুতো ছিঁড়ে, অনেক জায়গায় প্রণামী দিয়ে, অনেক তেল মাখাবার পর অবশেষে জুটলো রাইটার্স বিল্ডিংসে এক'শ বার টাকার একটি কেরানীগিরি। জন্ম-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে যেন বাঁচবার ক্ষীণ আলো! কিন্তু Distinction পাওয়া Graduate সুনন্দ রায় ভারতের গোটা কয়েক শহর চষে ফেলে, বেশ কয়েক জোড়া জুতো ছিঁড়ে, অনেক প্রণামী দিয়েও একটা চাকরি যোগাড় করতে পারেনি। কিন্তু চাকরি নেই বলে তো পোড়া পেট মানবে না, ভাইবোন বুঝবে না। অভাবের জ্বালায়, ভাইবোনদের মুখ চেয়ে, মায়ের কথা ভেবে সুনন্দ যোগ দিয়েছিল সৈন্য বাহিনীতে।

চীনের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে তখন। তাই ফ্রন্টে যেতে হয়েছিল সুনন্দকে। কিছুদিন পরে নেফা থেকে একটা চিঠি দিয়েছিলো আমায়। লিখেছিল, তুমি আমার জন্যে

(শেষাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অবৈধ

(গল্প)

কৃষ্ণদাস মণ্ডল

অমল এক কাণ্ড করে বসল। সমাজের কাছে সেটা অবৈধ বলেই প্রতিপন্ন হল। অবৈধই বলা চলে। অমল থাকতো কৃষ্ণনগরে ওর এক পিসতুতো ভাইয়ের কাছে। অমলের পিসতুতো ভাই সুব্রত, সুব্রতর বউ অর্থাৎ মনোরমা। এই তিনজন নিয়ে একটা ছোট্ট সংসার বলা চলে। অমল কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে চাকরি করে।

সুব্রতর বউ অর্থাৎ মনোরমা সুখী ছিল কিনা বলা যায় না। তবে মোটামুটি সুখী যে ওরা ছিল তা বাইরে থেকে দেখলে অন্ততঃ বোঝা যেত। ভিতরে কি ছিল তা বাইরের কেউ জানত না। আর্থিক সচ্ছলতা থাকলেও মানসিক অশান্তি যে চলছিল তা কারও জানবার কথা নয়। ঝড়ের ওপরে ঝড় উঠল অমলের অনুপ্রবেশে। ভেঙ্গে গেল সুব্রতর ঘর খান খান হয়ে। কি করে জানিনা অমলের ভালবাসাগত প্রাণ সহসা মনোরমার অশ্রুতে উদ্বেল হয়ে উঠল। হয়ত অমল এটা জানত যে সে যা করছে সেটা অবৈধ! কিন্তু প্রেমের উত্তেজনায় নিজেকে পীড়িত করে তুলল। হঠাৎ আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের মত ধূম উদ্‌গিরণ হতে লাগল।

মনোরমাও নিজেকে শিথিল করে দিল। কেন ও কি বলতে পারবে? হয়ত পারবে, হয়ত পারবে না। হয়ত আছে ওর পূর্ণতার অভাব। যা না হ'লে ওর জীবনে আসবে না পূর্ণতা। সে অপূর্ণতার দরুন অন্য পুরুষের ভালবাসা, সঙ্গ কামনা করতে এতটুকুও দ্বিধা করল না ও।

সেই হিসেবে এই অবৈধ প্রণয়ের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে অমলকে একা দায়ী করা চলে না। ঝিমিয়ে যাওয়া মনোরমার মনে যেন আবার আনন্দ জাগল। শরতের প্রভাতের রৌদ্রের মত মিষ্টি আভা ফুটে উঠল মনোরমার মুখে।

সুব্রত নির্বিকার। সংসারের কারও প্রতি অতটা লক্ষ্য করবার, অতটা মাথা গলাবার প্রয়োজন বোধ করে না সে। আসলে সুব্রত ছোটবেলা থেকেই যেন খেয়ালী প্রকৃতির, উদাসী প্রকৃতির। কারও প্রতি তেমন ঔৎসুক্যও নেই, আবার অবহেলাও নেই। অফিস থেকে ফেরে ক্লান্ত হ'য়ে। যা একটু ভালবাসা, একটু পরশ পায় তাতেই সে সু[illegible] এর বেশী চায়ও না কোনদিন।

মনোরমাকে তেমন যেন উৎফুল্ল দেখে না অমল। অন্ততঃ আজ দু'বছর অমল এখানে এসেছে, এর মধ্যে দু'জনে দু'জনের অনুরক্ত এমন মনে হয় না। কেমন যেন শিথিলতা, কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ভাব। যেন [illegible] অভাবে দু'জনেই ব্যথিত।

অমল বোঝে কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করে না, সাহস হয় না। আর দরকারই বা কি? তবুও যেন মরিয়া হয়ে একদিন মনোরমাকে প্রশ্ন করে—তোমাকে এত শুকনো

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অপেক্ষা করো গীতাদি। যুদ্ধ শেষ হলে, আমরা বহুদিনের কল্পনাকে সার্থক করে তুলবো। বাঁধব 'সুখের নীড়'।

তারপর তিন বছরের মধ্যে সুনন্দর কোন খবর আমি পাইনি। মনে করেছিলাম, ওর খবর আর পাব না কোনদিন। মনে করেছিলাম, নেফা সীমান্তের একফালি বরফ-ঢাকা মাটি রাঙিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে চিরকালের জন্য—পেয়েছে মুক্তি। তবু মন মানত না। ভগবানের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি, বলেছি, 'হে প্র[illegible] সুনন্দকে একটা বারের জন্য ফিরিয়ে দাও। তাকে অনেক কথা বলা হয় নি।'

দেখাচ্ছে কেন বউদি? বিয়ের আগে তোমার চেহারা কত সুন্দর ছিল, আজ এত রোগা হচ্ছ কেন?

মনোরমা পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে একটু মুচকি হেসে বলে—কই

—না তুমি বেশ রোগা হয়ে গেছ, শীর্ণ হয়ে গেছ, চোখের কোণে কে যেন কালী মাখিয়ে দিয়েছে। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলে অমল। যেন মনের কথা সবই জেনে নিতে চায়।

মনোরমা বলে—শরীরটা তত ভালো নেই কিনা। তাতেই নিরস্ত হয় অমল। আর কিছু প্রশ্ন করে না। চায়ের পেয়ালা শেষ করে। মনোরমার কথাটা বিশ্বাস করে না অমল।

—আজ তুমি অফিসে যাবে না ঠাকুরপো?

—না আজ ছুটি নিয়েছি; আর শরীরটা কেমন ভাল লাগছে না যেন।

সিগারেটটা ধরায় অমল। চেয়ারে হেলান দিয়ে আবেশে কয়েক টান দেয়। মনোরমা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দশটা বাজে। সুব্রত অফিসে চলে যায়। যাবার সময় অমলকে প্রশ্ন করে—তুই অফিসে যাবি না অমল?

—না দাদা, আজ শরীরটা ভাল নেই। তাছাড়া ছুটি নিয়েছি।

—ও, বলে বেরিয়ে যায় সুব্রত।

বেশ মিষ্টি দুপুর। রৌদ্রের প্রখরতা নেই। মেঘে ঢাকা মলিন সূর্যরশ্মি। ঝিরঝিরে বাতাস। খবরের কাগজে মুখ ঢাকা পড়েছে। তন্দ্রা আসছিল অমলের। করুণ চাপা কান্না শুনে হঠাৎ চমকে ওঠে। চুপ করে শুনতে থাকে। হ্যাঁ মনোরমাই তো কাঁদছে। চাপা কান্না। আস্তে আস্তে উঠে পড়ে, বারান্দায় এসে পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে মনোরমা বালিশে মুখ চেপে কাঁদছে। বিস্ময়াবিষ্ট হয় অমল। কেন কাঁদছে বউদি, মনোরমা!

আবার ফিরে আসে নিজের বিছানায়। কোন কূল-কিনারা পায় না। তবে কি দাদার সাথে ঝগড়া হয়েছে! না সেরকম কিছু হয়েছে বলে তো মনে হয় না। ভেবে তল পায় না, কিছুক্ষণ পরে কান্না থেমে যায়।

[illegible] মন দিতে চেষ্টা করে অমল। কিন্তু মন তেমন বসে না। একটু পরে মনোরমা ঘরে ঢোকে। এটা সেটা গোছাতে থাকে। অমল একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সেদিকে—সদ্য বর্ষণক্লান্ত চোখ দু'টোর দিকে। উদাস সে দৃষ্টি, ব্যথাতুর সে চাওয়া। কিছু না পাওয়ার অব্যক্ত বেদনার চিহ্ন সরু চোখ দু'টির মাঝখানে। অমলের সন্ধানী দৃষ্টি খুঁজে ফেরে ব্যথার উৎস। টেবিলের বইগুলো নীরবে গুছিয়ে রাখতে থাকে মনোরমা।

বেশ স্বাভাবিক ভাবেই মনোরমা বলে—ঠাকুরপো শরীর কেমন আছে? যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব।

খবরের কাগজ দেখতে দেখতে উত্তর দেয় অমল, এখন বেশ ভাল বউদি। তারপর মুখ তুলে বলে, চল বউদি, একটু বেড়িয়ে আসি।

—না ঠাকুরপো তুমি যাও, আমার ভাল লাগছে না।

বউদির কান্নার কারণ খুঁজতে গিয়ে নিজে দিশাহারা হয়ে যায় অমল। ভাবে এখনি জিজ্ঞাসা করবে কিনা। বলতে গিয়েও থেমে যায়। ভাবে, না এখন জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে না। নিজের কৌতূহলকে আশ্বস্ত করে। জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যায়।

উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে অমল। দীঘির ধারে পিটুলী গাছটার নীচে এসে দাঁড়ায়। একটা সিগারেট ধরায়। আবার সেই প্রশ্ন, কি হয়েছে বউদির, কেন কাঁদে মনোরমা? একি ব্যাকুলতা, একি অস্বস্তি! সর্ব মন জুড়ে যেন বউদির কান্নার উৎস খুঁজতে চায়, চিন্তা সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকে সে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, বেশ অন্ধকারও হয়ে এসেছে। বাড়ীর উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়।

রাত তখন এগারোটা। অমল কেবলমাত্র শুয়েছে। পাশের ঘর থেকে দাদা-বউদির কথাবার্তা ভেসে আসছে। অমল শুনতে থাকে।

মনোরমা জিজ্ঞাসা করে—আজ এত দেরি করলে কেন?

সুব্রত উত্তর দেয়—ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম।

—ডাক্তার কি বললেন?

—যা বলে থাকেন তাই। আমি সন্তান উৎপাদনে অক্ষম। তুমি আর একটা বিয়ে কর মনোরমা।

মনোরমার কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না। হঠাৎ যেন ডুকরে কেঁদে ওঠে।

—কেঁদো না রমা। আমার অক্ষমতাই সেজন্য দায়ী। তুমি আবার বিয়ে কর রমা, আমি বাধা দেব না। তোমার মা হওয়ার বাসনা পূর্ণ কর।

অমলের কাছে আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে যায় সব কথা। মনোরমার ব্যথার উৎস খুঁজে পায়। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে থাকে, ঘুম আসে না। অসহ্য মনে হয়। অমল ভাবে, আচ্ছা, বউদি কি তাকে ভালবাসে! বোধহয় বাসে, তা নাহ'লে কেন অমলের পরে অত হুঁশিয়ারি!

মনে পড়ে একসময় অমলের টাইফয়েড হয়েছিল। সারারাত অমলের পাশে বসে হাওয়া করেছিল মনোরমা। সময় মত ওষুধ দিয়েছে। কত বিনিদ্র রজনী গেছে। বোধ-হয় মনোরমা পণ করেছিল যে, সে অমলকে সুস্থ করে তুলবেই। তারপর অসুখের পর কতদিন অমলের হাত ধরে এদিক সেদিক বেড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে।

কেন কি কারণে বউদি অতটা করেছিল? অমলের মা'ও তো সেই অসুখের সময় এসেছিল। তাঁকে তো রাত জাগতে দেয়নি। কেন মনোরমার এত কঠোর চেষ্টা—তা হয়তো অমল বুঝতে চেষ্টা করেনি।

দেওয়াল ঘড়িটায় বারোটা বাজল। অমল বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। কে যেন বারান্দার রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মনে হয়। হ্যাঁ বউদিই, মনোরমাই। অমল মনোরমার দিকে এগিয়ে যায়।

—এখানে কি করছ বউদি?

কোন উত্তর আসে না অপর পক্ষ থেকে। সেই আলো-আঁধারিতে চিকচিক করে ওঠে মনোরমার চোখের জল। আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।

—কাঁদছ কেন বউদি? কি হয়েছে আমাকে বল।

উত্তেজনায় সর্বশরীর কাঁপতে থাকে মনোরমার। কিছুই বলতে পারে না মনোরমা। বেদনা শুধু অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে।

অমল আবার বলে—কেঁদ না বউদি, তুমি আর কি করবে?

—ঠাকুরপো তুমি আমাকে, তুমি আমাকে বাঁচাও।

—না বউদি, তা হয় না। সেটা যে অবৈধ। আমরা লোকচক্ষে ছোট হয়ে যাব।

—চল ঠাকুরপো আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। আজই। এই রাত্রে।

—না বউদি, তা হয় না।

—কেন হয় না ঠাকুরপো? আমি শুধু মা হতেই চাই না, আমি তোমাকে ভালবাসি।

—তুমি দাদাকে ভালবাসো না!

—না। ও ব্যক্তিত্ব থাকলেও ভালবাসা বলে কোন বস্তু ওর হৃদয়ে নেই। আমার মা না হওয়ার সান্ত্বনা ও যদি দেয়, আমাকে ভালবেসে যদি কাছে ডাকে, তবুও আমি পেরে উঠি। তবুও আমি নিজেকে বোঝাতে পারি। অত নির্বিকার, অত Careless মানুষকে ভালবেসে কি পাওয়া যায়?

—তবে আজ পাঁচ বছর কি করে কাটালে? যেখানে হৃদয় দেওয়ার প্রশ্ন নেই, মা হওয়ার প্রশ্ন নেই, হয়ত নির্ভরতা আছে, কিন্তু শান্তি নেই, তার কাছে পাঁচ বছর কি করে কাটালে?

—এই পাঁচ বছর যে কি করে কাটিয়েছি, তা' তোমাকে বোঝাতে পারব না ঠাকুরপো। বেদনার ছুঁচ শুধু আমাকে বার বার অসহ্য যন্ত্রণার সম্মুখীন করেছে। ব্যক্ত করব এমন কেউ নেই। একদিকে ভালবাসা না পাওয়ার বেদনা, অন্য দিকে ভালবেসে না পাওয়ার বেদনা। আমি যে তোমাকে ভালবাসি কোনদিন তোমাকে সাহস করে বলতে পারিনি। কিন্তু আজ আমার মুখ থেকে হঠাৎ উপছে পড়েছে, আমি আর সামলাতে পারিনি।

—সে আমিও বুঝেছিলাম বউদি। টাইফয়েডের সময় তুমি যেভাবে আমাকে সারিয়ে তুলেছ, তা একমাত্র সহৃদয় ব্যক্তিই পারে। তুমি ঘরে যাও বউদি, অনেক রাত হয়ে গেছে। দাদা জানতে পারলে হয়ত কি ভাববে।

মাত্র কয়েক দিন পরের ঘটনা। সুব্রত বাড়ীতে ছিল না। দে... শর বাড়ীতে গিয়েছিল। রাত্রিতে বালিশে মুখ ঢেকে মনোরমা ... শুয়ে আছে। অমল ঘরে ঢুকল। মনোরমার বিছানার পাশে বসল ...। বলল—চল বউদি, আমরা আজই রাত্রে কলকাতা চলে যা... ই। আমি ওখানে একটা চাকরি পেয়েছি। তুমি আর আমি সে... খানে থাকব।

মনোরমার মুখটা যেন হঠাৎ উজ্... ল আলোয় ভরে গেল। মনে হল একদিন

পরে ও বোধহয় পেয়েছে নির্ভরতা, পরম নির্ভরতা। শান্তি, অবলম্বন। সেইদিন ভোরে কলকাতায় চলে গেল মনোরমা আর অমল।

পরের দিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরল সুব্রত। এসে দেখে দরজায় তালা দেওয়া। একটা চিঠি তালার সাথে আটকানো। চিঠিটা খোলে সুব্রত।

দাদা,

জানিনা আমার এই অপরাধের শাস্তি কি? সমাজের কাছে, তোমার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। বউদির ব্যথা আমি সহ্য করতে পারিনি। জীবনের এক চরম মুহূর্তে আমি এ-কাজ করতে বাধ্য হলাম। প্রেমের উত্তেজনায় আমি যা করছি, জানিনা এর শেষ পরিণতি কোথায়! জানি পালানটা ঠিক পৌরুষতার লক্ষণ নয়। কিন্তু তোমার সামনে দাঁড়িয়ে একথাটা আমি কোনদিন বলতে পারতাম না। তাই পালাতে বাধ্য হলাম। আমার এই অপরাধের জন্য যে শাস্তিই আমাকে দাও না কেন, আমি সহ্য করব।

ইতি—

অমল

চিঠিটা বন্ধ করে একটু মুচকি হাসে সুব্রত। নিজের মনে বলে—কিন্তু আমি কি ভালবাসা চাই না! গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে অন্তর থেকে। সে নিশ্বাসের ব্যথাই বা কে বোঝে!

মুখের দুর্গন্ধ অতি অপ্রীতিকর!

মুখে দুর্গন্ধ থাকিলে সমাজে অবাধ মেলামেশা করা যায় না। কাজেই ইহা অনেকের জীবন দুঃখময় করে। প্রতিদিন সাধনা দশন ব্যবহার করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, মুখ জীবাণুমুক্ত হয় ও দন্তরাজি সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

সাধনা দশন

SADHANA DASAN TOOTH POWDER

আদর্শ দন্তমঞ্জন

সাধনা ঔষধালয় — ঢাকা

৩৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ৬

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এম. সি. এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

চিকিৎসা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য।

প্রাচীন ভারতে যন্ত্রশিল্প

নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যন্ত্রযুগে জড়-বিজ্ঞানের উন্নতি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি এবং ভাবিতেছি যে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে জড়-বিজ্ঞানের চর্চা ছিল না। প্রাচীন ভারত আধুনিক উন্নত যান্ত্রিক শিল্পকলা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিল। বর্তমানের এই সমস্ত উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-শিল্পকলা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতারই শ্রেষ্ঠ দান। সহস্রাধিক বৎসর পরাধীনতার দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া আমরা আজ অধঃপতিত হইয়াছি এবং আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়া আমাদের মনোবৃত্তিসমূহ দাসসুলভ দীন ভাব অবলম্বন করিয়াছে। তাই আজ আমাদের পূর্ব-পিতামহগণের মহনীয় কার্যাবলীর পুণ্য-গৌরবময়ী স্মৃতিটুকু পর্যন্ত আমরা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। প্রাচীন আর্য সভ্যতার আলোচনা ও অনুশীলন এক্ষণে অনাবশ্যক বোধে আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছি এবং ইহকাল সর্বস্ব ভোগপরায়ণ নিরবচ্ছিন্ন জড়বাদী প্রতীচ্য সভ্যতার লীলাবিলাস মুগ্ধ নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত দীন ও কাতর ভাবে ভাবিতেছি,—হায়, আমরা কত ক্ষুদ্র! আমাদের কি আছে! আর কি-ই বা ছিল! পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় আজ বিজ্ঞানের কি অভাবনীয় উন্নতি-ই ঘটিয়াছে! আমাদের কি এসব কোনদিন ছিল? আমাদের এই ভারতের প্রাচীন আর্য ঋষিগন কন্দ-ফলমূল-ভোজী হইয়া বনে বসিয়া তপস্যা করিতেন এবং প্রাচীন ভারতীয় নৃপতিগণ তীর-ধনুক ও ঢাল-তলোয়ার-গদা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। বর্তমানের এই সমস্ত উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্পাদি তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত-ই ছিল। প্রাচীন কালে ভারতীয় ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধক্ষেত্রে গদা ও তরবারি লইয়া আস্ফালনেই ছিল বীরত্ব—তীর-ধনুক লইয়া লক্ষ্যভেদেই ছিল বাহাদুরি। ইহাই তাঁহাদের সম্বল মাত্র ছিল। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি তাঁহাদের ছিল না—বৈজ্ঞানিক শিল্পকলার কোন ধার তাঁহারা ধারিতেন না। আমরা এক্ষণে এইরূপ মনে করিতেছি।

পরাধীনতার লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া বর্তমানের বেশে জগতের এক কোণে দাঁড়াইয়াছে এবং দীন করুণ নেত্রে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিলাস-চটুল রূপরাশি এবং রণ-ক্ষেত্রে উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক বিচিত্র যন্ত্ররাজি ও বিবিধ মারণাস্ত্রসমূহ দেখিয়া বিস্মিত চিত্তে ভাবিতেছে,—জড়-বিজ্ঞানের কি অভাবনীয় উন্নতি! আমরা এক্ষণে মনে করিতেছি যে, প্রাচীন ভারত কেবল অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানেরই অনুশীলন করিয়াছে এবং সৃষ্টিতত্ত্ব অথবা ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় লইয়াই দিনরাত মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছে। পরকালের ভাবনা ভাবিয়াই প্রাচীন ভারত ইহকালটা নষ্ট করিয়াছে।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিলেও যে প্রাচীন ভারতে জড়-বিজ্ঞানের আলোচনা আদৌ ছিল না তাহা নহে। অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের অধিবাসীগণ প্রধানতঃ দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। এই দুই সম্প্রদায় যথাক্রমে আর্য ও অনার্য নামে অভিহিত হইতেন। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ-বিসংবাদ প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। প্রাচীন ভারতের পুরাবৃত্ত আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, আর্যগণের বিবিধ পুণ্যকীর্তিতেই প্রাচীন ভারত সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আর্যগণেরই যশোগাথায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণ সাধারণতঃ ধর্মপরায়ণ, ত্যাগ-শীল ও পরকাল-বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া প্রধানতঃ তাঁহাদের মধ্যেই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অনুশীলন হইত। পক্ষান্তরে অনার্যগণ ইহকাল সর্বস্ব ও ভোগপরায়ণ ছিলেন বলিয়া জড়-বিজ্ঞানের চর্চা প্রধানতঃ তাঁহারাই করিতেন। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে অনার্যগণের কুকীর্তি বা অখ্যাতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাই হইল সাধারণ কথা। নতুবা ব্যক্তিগত ভাবে হয়তো কোন অনার্য আর্য ভাবাপন্ন, আবার কোন আর্য যে অনার্য ভাবাপন্ন না ছিলেন এমন নহে। আর্য ও অনার্যের মধ্যে যে সংঘর্ষ নিয়তই লাগিয়া থাকিত, তাহা মূলতঃ রাজ্য অথবা ধন-সম্পত্তির অধিকার ভোগের ব্যাপার লইয়া নহে। এই বিরোধ সংঘর্ষের একমাত্র হেতুই ছিল,—উভয় সম্প্রদায়ের জীবনের পরস্পর বিরোধী মূলনীতি।

প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। এই অনার্য সম্প্রদায়ই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের বড় একটা ধার ধারিতেন না এবং তাঁহারাই সাধারণতঃ জড়-বিজ্ঞানের আলোচনা লইয়াই থাকিতেন। ফলে বিবিধ বিচিত্র বৈজ্ঞানিক শিল্পকলায় তাঁহারা প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। বহু অভিনব অত্যাশ্চর্য যন্ত্রশিল্প তাঁহাদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এতদিন পরে যে সকল যন্ত্রাদির আবিষ্কার করিয়া জগতের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে, কোন্ সুদূর অতীতে এই ভারতবর্ষে তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস একটু ধীরভাবে আলোচনা করিলে এ বিষয় বুঝিতে পারা যায়।

বিংশ শতাব্দীর উন্নত পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ জড়-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ সম্পাদন করিয়া যে বিমান যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছে এবং বর্তমান যুদ্ধক্ষেত্রে যে বৈমানিক যন্ত্রশক্তির দ্বারা অঘটন সংঘটিত হইতেছে—অসাধ্য সাধন সম্ভবপর হইতেছে ; সেই বিমানযন্ত্র যে কতকাল পূর্বে এই ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহার পরিচয় সুস্পষ্ট ভাষায় প্রাচীন গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত রহিয়াছে।

'কথাসরিৎসাগর',—একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি।

এই যন্ত্র 'বাতবিমানযন্ত্র' নামে অভিহিত হইত। কারণ ইহা উত্তপ্ত বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইত ও শূন্যদেশে পরিভ্রমণ করিত। এই যন্ত্রে যে কীলক থাকিত তাহার দ্বারা যন্ত্রের গতিবেগ নিয়মিত হইতে পারিত। এই বাত-বিমানযন্ত্রের একবারের গতিবেগ দুই শত হইতে আট শত যোজন পর্যন্ত ছিল। 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গেই এ সম্বন্ধে উল্লেখিত হইয়াছে,—

"বাতযন্ত্র বিমানং চ তন্মমাস্তীহ মঙ্ক্ষু যৎ।
যোজনাষ্টশতীং যাতি সকৃৎপ্রহত কীলকম্॥
আরুহ্য স্বকৃহেহস্মিন্ বাতযন্ত্রবিমানকে।
দ্রুতং ততো গতোঽভুবং যোজনানাং শতদ্বয়ম্॥"

এই বাতবিমানযন্ত্র যেরূপ বেগবান হইয়া উর্ধ্বে উঠিত, সেইরূপ বেগে আবার নিম্নদেশে অবতরণ করিতেও কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা কোন সময়ই ঘটিত না। এই যন্ত্রের আয়তন সম্বন্ধে জানা যায় যে, এক সঙ্গে সহস্র ব্যক্তির স্থান সংকুলান হইত। এক সহস্র আরোহী লইয়া এই বিশাল বাতবিমানযন্ত্র নিরাপদে অবতরণ করিত। এ সম্বন্ধে পূর্বকথিত গ্রন্থের এক স্থানে উল্লেখ আছে,—

"তত্রাম্বরাদশঙ্কিতমবতীর্ণং বর-বিমান-বহনং তম্।
সানুচরং নববধ্বাযুক্তং দৃষ্টা বিসিস্মিয়ে জনতা।"

এই অত্যাশ্চর্য বাতবিমানযন্ত্র প্রাচীন কালে ময়দানব কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। বর্তমানে যাহা 'এয়ার শিপ' নামে পরিচিত হইয়া শূন্যপথে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং সাধারণতঃ জন মনে বিস্ময় জন্মাইতেছে, প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক শিল্পী ময়দানব কর্তৃক নির্মিত সেই বাতবিমানযন্ত্র কি বর্তমানের এই এয়ার শিপ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ? বলা বাহুল্য যে এই যন্ত্র বহু ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং ইহা সাধারণের ব্যবহারোপযোগী ছিল না। রাজা-রাজড়াগণই এ প্রকার বিশাল বিমানযন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিতেন। তাহারও উল্লেখ রহিয়াছে।

"দৃষ্টা বিমানবাহনসূচিত ভবিতব্য খচরসাম্রাজ্যম্।
তং সোঽভ্যনন্দত সুতং রাজা চরণানতং বধূসহিতম্॥"

অসামান্য শক্তিশালী নরপতি ভিন্ন এ প্রকার বিমান-পোত ব্যবহার করা সাধারণের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। বিশিষ্ট কার্যের প্রয়োজনে বিশিষ্ট ক্ষমতাশালী নৃপতিগণই এই যন্ত্র ব্যবহার করিতেন। নৃপতি সূর্যপ্রভ এই বিশাল বিমানপোতে আরোহণ করিয়া চীনদেশ বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। তাহারও পরিচয় একটি শ্লোকে পাওয়া যায়।

"অন্যেদ্যুশ্চ বিমানেন সহসূর্যপ্রভা যযুঃ।
চন্দ্রপ্রভাদ্যাঃ সর্বে তে চীনদেশং সপৌরবা।"

অনার্য ময়দানব এই বাত-বিমানযন্ত্রের প্রথম আবিষ্কর্তা বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মারও যন্ত্র-শিল্পে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় আমরা ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যেতিহাসে পাইয়া থাকি। যাহা হউক, প্রাচীন ভারতে বিমানযন্ত্রের আদি আবিষ্কারক বলিয়া একমাত্র যাঁহার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, সেই বৈজ্ঞানিক মহা-

ময়দানব অনার্য কুলসম্ভূত হইয়াও আর্যগণের অনুগত হইয়াছিলেন। তৎকালীন ভারতে আর্য জাতির প্রাধান্য দেখিয়া এবং অধ্যাত্ম বিদ্যার মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াই তিনি আর্যগণের সহিত বিরোধ-বিসংবাদের প্রকৃতি নাশ করিয়া একান্ত ভাবে তাঁহাদিগেরই আশ্রিত ও অনুগতরূপে থাকিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি আর্যগণের উৎসাহ পাইয়া এবং পরামর্শ লইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সভা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের বিখ্যাত ইন্দ্রপ্রস্থের সভাও তৎকর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। আর্যগণের সহিত তাঁহার এইপ্রকার ঘনিষ্ঠতার ফলে তিনি কিন্তু স্বজাতি ও স্বধর্মীগণের বিষ নজরে পড়িয়াছিলেন। স্বজাতিগণের নিকট নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়া ময়দানব বিন্ধ্যগিরির সন্নিকটে ভূগর্ভে এক অভাবনীয় অত্যাশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্যময় মনোহর পুরী নির্মাণ করতঃ আর্যগণের বশংবদ হইয়া কালযাপন করিয়াছিলেন। সে কথা এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে,—

"অস্তি ত্রিজগতিখ্যাতো ময়োণাম মহাসুরঃ।
আসুরং ভাবমুৎসৃজ্য শৌরিংশ শরণং শ্রিতঃ॥
তেন দত্তাভয়শ্চক্রে স চ বজ্রভৃতঃ সভাম্।
দৈত্যাশ্চ দেবপক্ষেনুয়মিতি তং প্রতিচুক্রুধুঃ॥
তদ্ভয়াত্তেন বিন্ধ্যাদ্রৌ মায়াবিবর মন্দিরম্।
আগম্য মাসুরেন্দ্রানাং বহ্বাশ্চর্যময়ং কৃতম্॥"

এত করিয়াও কিন্তু ময়দানব সেই 'অনার্য'ই থাকিয়া গিয়াছিলেন। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানবিৎ আর্যগণ একদিনের জন্যও এই জড়-বিজ্ঞানের উপাসক ময়দানবকে আপনাদিগের সমযোগ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। জড়-বিজ্ঞানের উপাসক ময়দানব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানবিৎ আর্যগণের কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভের আশায় চিরদিন তাঁহাদিগের অনুগত ভাবেই জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

ময়দানবের এক কন্যার নাম ছিল সোমপ্রভা। তিনি কলিঙ্গরাজের সেনাপতিকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, আমরা বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। ফলকথা তাহার মর্ম এই যে,—ময়দানব-কন্যা সোমপ্রভা বলিতেছেন যে, আমার পিতা এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য কৌশলময় যন্ত্রশিল্প বহুদিন আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি গৌরব করিয়া এ কথাও বলিতেছেন যে, এই ধরিত্রী একটি [প্রাকৃতিক যন্ত্রস্বরূপ এবং ইহা যেমন পঞ্চভূতাত্মক; আমার পিতার উদ্ভাবিত যন্ত্রসমূহও তেমনি পঞ্চভূতাত্মক। সোমপ্রভা যন্ত্র সমূহের শ্রেণী বিভাগও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা জলযন্ত্র, বাতযন্ত্র, আকাশযন্ত্র ইত্যাদি। সে যুগে এই যন্ত্রসমূহের এইরূপ নামের ভেদ লক্ষিত হইলেও এগুলি যে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর উন্নত বৈজ্ঞানিক যুগের যন্ত্র সমূহেরই অনুরূপ ছিল এমনকি কোন কোনটি যে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল তাহা বুঝা যায়। অতি প্রাচীন কালে এই ভারতবর্ষ যে জড়-বিজ্ঞানেও কতদূর ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছিল, এই সকল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য জড়-বিজ্ঞানের এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার,—মনুষ্যবিহীন পরিবেষণ প্রথা। আমেরিকার হোটেলে এই ব্যাপার আজ পৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়াছে। কিন্তু এ ব্যাপারও প্রাচীন কালে ভারতবাসীর অপরিজ্ঞাত ছিল না। বৈজ্ঞানিক মহাশিল্পী ময়দানব কোন্ স্মরণাতীত যুগে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের এই কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ময়দানবের নিকট হইতে অনেকেই আবার এই সমস্ত যন্ত্রশিল্প নির্মাণের কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন।

তদীয় কন্যা সোমপ্রভা এই যন্ত্র নির্মাণ করিতে শিখিয়াছিলেন। রাজ্যধর নামক জনৈক রাজা এবং তাঁহার ভ্রাতা প্রাণধর ও নরবাহন দত্ত প্রভৃতি আরও অনেকে ময়দানবের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া এই সমস্ত যন্ত্রের নির্মাণ কৌশল অবগত হইয়াছিলেন। এস্থলে একটি বিবরণ দিতেছি।

কোন সময়ে নরবাহন দত্ত নামক এক ব্যক্তি রাজকন্যা কর্পূরিকার পরিণয়প্রার্থী হইয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া এক অতি মনোহর পুরী দর্শন করিলেন। সেই স্থানে কাষ্ঠময় নরনারীগণ যথার্থ সজীবভাবে কার্য করিতেছে। কেবল তাহাদের মুখেই কোন কথা নাই। সেই মনোহর পুরীর সন্নিকটে হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সমস্তই ছিল। এমনকি বারবনিতার পর্যন্ত সেই স্থানে সমাবেশ হইয়াছিল তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন। নরবাহন দত্ত সেই স্থানে আর একটি শান্ত-শিষ্ট পুরুষকে দেখিলেন। এই ব্যক্তি জড়-বিজ্ঞানের উপাসক হইয়াছিলেন এবং ময়দানবের নিকট বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি নির্মাণের কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন। কোন কারণে তিনি রাজার কোপানলে পতিত হইয়া তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের বাসনায় বিমানযানে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন এবং এই জনশূন্য সমুদ্রতীরে এই প্রকার অদ্ভুত পুরী নির্মাণ করিয়া ক্রমশঃ রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। সেই কারণ তাহার নাম হইয়াছিল রাজ্যধর। এই রাজ্যধরের নিকট নরবাহন দত্ত উপস্থিত হইলে কি যেন এক ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রভাবে বিবিধ ভোজদ্রব্য কোথা হইতে উপস্থিত হইতে লাগিল। ভোজনাদি ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হইল। আহারান্তে স্থান সমূহ পরিমার্জিত হইয়া গেল। মনুষ্যবিহীন এই সমস্ত কার্য বৈজ্ঞানিক কৌশলেই সম্পন্ন হইল। কিভাবে কি হইয়া গেল কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

এই সকল বিবরণী পাঠ করিয়া কি মনে হয়? বিংশ শতাব্দীর উন্নত বৈজ্ঞানিক যুগে আমেরিকার হোটেলে মনুষ্যবিহীন পরিবেশন প্রথার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের এই সম্বন্ধীয় উপরোক্ত বিবরণ মিলাইয়া দেখিলে আমাদের বিস্মিত হইবার কিছুই থাকে না। তবে আমাদের বর্তমান অবস্থার কথা ভাবিয়া দুঃখ রাখিবার স্থান পাই না।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে আমাদের অতীত গৌরবের এইপ্রকার অনেক পরিচয়ই পাওয়া যায়। প্রধানতঃ "কথাসরিৎসাগর" গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই আমরা বক্ষ্যমান্ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি এবং প্রাচীন ভারতেও যে জড়-বিজ্ঞানের আলোচনা ছিল, এই কথা বলিতে চাহিয়াই প্রসঙ্গ ক্রমে জড়-বিজ্ঞানের উপাসক ময়দানব ও তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রাদির কিঞ্চিৎ পরিচয় উল্লেখ করিয়াছি। প্রাচীন ভারতের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে আমাদের অতীত গৌরবের অনেক কথাই জানা যায়। বিশালকায় সৌধহর্ম্য এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইবার বৈজ্ঞানিক কৌশলও নূতন আবিষ্কৃত নহে। এ কৌশলও যে ময়দানব কর্তৃক কতকাল পূর্বে উদ্ভাবিত হইয়াছিল তাহারও পরিচয় নানাস্থানে পাওয়া যায়। ময়দানব কর্তৃক পরিকল্পিত যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ মহাসভা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইত। এ কথার উল্লেখ মহাভারতে আছে।

রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে "পুষ্পক" রথের বহু উল্লেখ দেখা যায়। তাহা বিমান-যান ব্যতীত আর কিছুই নহে। রাবণেরও পুষ্পক রথ ছিল। রাবণ-নন্দন ইন্দ্রজিৎ এই রথে আরোহণ করিয়া মেঘের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ করিতেন। তৃতীয় পাণ্ডব ধনঞ্জয় পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসহ কৈলাসে গিয়াছিলেন। তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিমান যন্ত্রের আদি আবিষ্কারক ময়দানব যখন কৃতজ্ঞতার পরিচয় স্বরূপ পাণ্ডবগণের সভা নির্মাণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি যে পাণ্ডবদিগের জন্য পুষ্পক রথ নির্মাণ করিয়া দিবেন তাহাতে আশ্চর্য কি? রাবণের ভার্যা মন্দোদরী ছিলেন,—ময়দানবের আদরিণী কন্যা। সুতরাং ময়দানব কি জামাতাকে পুষ্পক রথ যৌতুক দিবেন না? অথবা স্নেহের দৌহিত্রকেই তাহা না দিবেন কেন?

ফলকথা প্রাচীন ভারতে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অনুশীলনের সঙ্গে যে জড়-বিজ্ঞানের আলোচনাও ছিল তাহার বহু পরিচয় এইভাবে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ঋষিগণ সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় সমাহিত হইয়া যেমন অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তেমনি অন্য সম্প্রদায় কর্তৃক স্থূল জড়-বিজ্ঞানও আলোচিত হইত এবং তাহার ফলস্বরূপ বহু প্রকার যন্ত্রশিল্পও আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

মিলন মুখে দু'টি নদী

(গল্প)

শ্রীনিরঞ্জন সেন

দেউলেশ্বরের মেলা দেখে ফিরছে শ্যামা। বেশ হাসি-খুশি ভাব নিয়ে—প্রজাপতির মত যেন উড়ে চলেছে। কামনা জড়ানো ওর স্বপ্ন-মদির একজোড়া চোখের দৃষ্টি। সব কিছুতেই নতুন করে পাওয়ার আভাস শ্যামার। সঙ্গে ছিল শরৎ। শরৎ ওর মনের মানুষ—আপন জন। তবে এই পথটুকু তাকে একাই যেতে হবে। শরৎ আর আসেনি—কি একটা কাজে আটকে পড়েছে। শ্যামার হাতে একটা কাগজের বাক্স। ওতে অনেক কিছুই আছে—সাবান, তেল, মাথার পিন, ফিতা, আলতা, পাউডার—আরও কত কি টুকিটাকি।

শ্যামা আজ অন্য শ্যামা। ও ঘর বাঁধবে—ছোট্ট একটি ঘর, যেমন ঘর বেঁধেছে ওর সই সোনামণি দেবদাসের সঙ্গে। ঘনবনের দেবদাস আর শালবোহার সোনামণি।

তৃপ্তিতে ভরে ওঠে শ্যামার মন। পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে ভরা কুমারী মন। কামনার মাধুর্যে ভরা ও।

হাসিখুশি ভাব নিয়ে ঘরে ঢুকছে শ্যামা।

—শ্যামা!—মোহিতের ডাক শুনে হোঁচট খেল শ্যামা। থমকে দাঁড়াল ভীত চকিত শ্যামা।

—দেউলেশ্বরের মেলায় গেছলে কার সঙ্গে?—আগুন ঝরা প্রশ্ন মোহিতের কণ্ঠে।

কি উত্তর দেবে শ্যামা? বলবে কি শরৎ-এর সঙ্গে! ওর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত হলো। বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শ্যামা। এই মুহূর্তে কি ভয়ঙ্কর মানুষ হয়ে উঠেছে ওর বাপ! শ্যামা নিরুত্তর।

—শরৎ-এর সঙ্গে?—ব্যঙ্গের হাসি হেসে প্রশ্ন করে মোহিত বাগদী।

—হ্যাঁ!—ছোট্ট উত্তর বেরিয়ে আসে শ্যামার কণ্ঠ থেকে।

আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা চড় এসে পড়ে শ্যামার গালে। আচমকা চড় খেয়ে সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যায় শ্যামা। হাতের কাগজের বাক্সটাও মাটিতে পড়ে যায়—ছড়িয়ে পড়ে সব জিনিসগুলো।

দপ্ করে জলে ওঠে মোহিত। পায়ে করে মাড়িয়ে দেয় সব। তারপর সব তুলে নিয়ে গিয়ে আমাগড়ের জলে ফেলে দিয়ে আসে।

—বাবা ওগুলো........

শ্যামার কথা শেষ হবার আগেই আর একটা চড় এসে পড়ে ওর গালে। তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে ওঠে মোহিতের ঠোঁটে।

শ্যামার দু'চোখ বেয়ে কান্নার বন্যা নামে। মারুক ওর বাপ যত খুশী—তবুও যদি জিনিসগুলো আমাগড়ের জলে ফেলে না দিত! ভাঙ্গনের একটা বর্ণহীন ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বাপ বেরিয়ে গেল—মণিপুরের মদের ভাটিতে। অন্য দিন আরও আগেই যায়—আজই দেরি করেছে।

শ্যামা হাসল—অবজ্ঞায় ভরা এক টুকরো হাসি!

আঁধার নেমেছে।

ঐ দূরে পড়ে আছে রানীপুরের অভিশপ্ত চর। অনেক দিনের চর। কি ওর ইতিহাস কেউ জানে না। রানীপুরের নদী চলে গেছে শ্যামাদের ঘরের কাছ দিয়ে।

উঠনে নেমে আসে শ্যামা। ঘরের ভেতর দম আটকে আসছে ওর। ওর বাপ প্রমাণ করতে চাইছে শ্যামার জীবনে শরৎ বলে কেউ নেই—যদিও থাকে, তাও ভবিষ্যতে থাকবে না।

বাপ যেন ওর কি! রক্তে মাংসে গড়া মানুষ, তবুও মন বলে কিছু নেই যেন! বড় সংকীর্ণ ওর বাপের মন—চেতনা যেন অসাড়। কি এক চক্রান্তের জাল বুনে চলেছে ওর বাপ মোহিত বাগদী। তাই পালিয়ে যেতে চায় শ্যামা। বাপের হীন চক্রান্তের জাল ছিঁড়ে—শরৎকে নিয়ে।

বাতাস বইছে জোরে জোরে—একটানা অশান্ত বাতাস। ঝড় আসবে—তারই সঙ্কেত! ঝড় জলের রাতে ঐ চর থেকে ভেসে আসে একটানা করুণ কান্না—কোন অতৃপ্ত আত্মার আর্ত আকুতি।

রানীপুরের সবাই শুনেছে—শ্যামাও। কে কাঁদে বা কিসের জন্য কাঁদে তা কেউ জানে না। রানীপুরের সবাই আঁধার-নামা ঝড় জলের রাতে দল বেঁধে ঐ কান্নার অনুসরণ করেছে তবুও কিছুই দেখতে পায়নি—কাছাকাছি যেতেই কান্না থেমে গেছে।

শ্যামার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। বাপের রুদ্র-মূর্তি চোখের সামনে তার নাচানাচি করছে।

ঝড় সত্যি এলো—সাঁই সাঁই শব্দ চারিদিকে। গাছের ডাল ভাঙ্গার শব্দ—মড়মড় মড়াৎ!

নিকষ কালো রাত—বৃষ্টি পড়ছে। কাছের মানুষও চেনা যায় না। তবুও শ্যামা উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। যৌবন ভরা সুঠাম তনুলতা তার। রূপ আছে শ্যামার। ছাঁচে ঢালা সুডৌল মুখ তার—কামনা ভরা দু'টি চোখ।

রানীপুরের পথঘাট সব এখন ফাঁকা। যদি এই সময়ে চর থেকে সেই করুণ কান্নাটা ভেসে আসে! তবে কি করবে শ্যামা? বৃষ্টিতে আর দাঁড়াতে পারে না শ্যামা—দাওয়াতে উঠে আসে।

কান্নার শব্দটা ওদের ঘরের কাছ দিয়েই আসে। অনেক রাতে শ্যামা উঠানে দাঁড়িয়ে শুনেছে বাতাসের সঙ্গে অস্পষ্ট কয়েকটি কথাও ;—পালিয়ে যা শ্যামা—পালিয়ে যা।—এ কথার মানে কিছুই বুঝত না শ্যামা—আর কারোর কাছে কিছু বলতও না সে। উঠানের ওপরে একটা ছায়া মূর্তিকে চলাফেরা করতে দেখেছে।

মা'কে মনে পড়ে না ওর—মায়ের কি হয়েছিল তাও জানে না। ও যখন খুব ছোট, তখন থেকে ওর মা ছিল না। ওর ঠাকুমা মানুষ করেছে—কিন্তু সেও এখন নেই। ঠাকুমার কাছে মায়ের কথা জানতে চাইলে কেবল কাঁদত ও। তাই জানতে চায়নি শ্যামা কোনদিন সে কথা। তবে মায়ের সম্বন্ধে কেমন একটা রহস্য রয়ে গেছে।

আজ আবার ঐ কান্নার শব্দটা ভেসে আসছে—এগিয়েও আসছে শ্যামাদের ঘরের কাছ দিয়ে। ছায়া মূর্তিটাও যেন ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে আর কান্না ভেজা কণ্ঠে বলছে—শ্যামা, তুই পালিয়ে যা শরৎ-এর সঙ্গে। তোর বাপকে তুই বিশ্বাস করিস না। বিয়ের আগে মণিপুরের দয়ালের সঙ্গে আমার ভালবাসা হয়েছিল। কিন্তু কোন কারণে আমাদের বিয়ে হয়নি। তবে দয়ালকে আমি ভুলতে পারিনি—আর দয়ালও। তাই গোপনে ওর সঙ্গে আমার রোজ রাতে মিলন হতো রানীপুরের চরে। দয়াল রোজ রাতে আসতো—আমিও যেতাম—তোর বাপ ঘুমিয়ে পড়লে। মাস তিনেক যাতায়াত করার পর তোর বাপ সব জানতে পারে। লুকিয়ে দেখত আমি কোথায় যাই।

সেদিন অন্ধকার রাত।

দয়াল আসার আগেই সে রাতে আমি চলে এসেছিলাম। দয়াল আসেনি, তবুও আমি বসে আছি। শেষে দয়ালের পরিবর্তে তোর বাপ টাঙি উচিয়ে আমার ঘাড়ে মারল এক কোপ। তারপর আর আমি কিছুই জানি না। আমার অতৃপ্ত আত্মা এই চরে দয়ালের জন্য কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়ায়!

ছায়া মূর্তি আস্তে আস্তে সরে যায়।

শ্যামার মনে পড়ে ওর বাপ বলতো—ঐ টাঙি দেখছিস, ঐ দিয়ে একজনকে শেষ করেছি—এবার তোকে আর শরৎকে। ভালবাসা!

—মা! মা-গো!—বলে আর্তনাদ করে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শ্যামা।

পরের দিন সকালে শ্যামা আর শরৎকে দেখা গেল না—ওরা চলে গেছে। মিলন মুখে ছুটে চলেছে দু'টি নদী।

কয়েকটি লিমেরিক

সরোজ রায়

সেদিনের সব যুবকদলে
জানে আস্‌লী পলিটিক্‌স্ ;
পাড়ার কোন বইয়ের স্টলে সকাল সন্ধ্যে ব'সে
বিশ্বখানা চষে,
বিপ্লে বড় জোর
ফাইভ্ কিংবা সিক্‌স্ ।

সিনেমার নায়ক হবে
কোন এক চুলফাঁপানো কবি,
টালিগঞ্জে এ্যায়সা হোঁচট খেল
ছিট্‌কে পড়ে আজন্মের 'হবি' ।

সরকারী সে-চাকুরে
সূর্যকিরণ পাকড়াশী
মনের মধ্যে জল চাপিয়ে
খদ্দরেতে কংগ্রেসী ।

স্তাখ্ স্তাখ্ স্তাখ্
ম্যাজিক খেলা স্তাখ্
মাছের বদল কাঁচকলা খা
ভাতের বদল আটা,
দেশের জন্যে লড়তে গিয়ে
ব্রেনটা একটু খাটা ।

যুদ্ধ যখন লেগে গেল
ভারত পাকিস্তানে
ওরা যে-সব হেরে যাবে
খবরটা তো আঁচা ;
ওদের মনে স্লোগান ছিল
'আপন পরান বাঁচা' ।

বিধবাদের বিয়ে এখন না হওয়াই ভালো,
তারা অনেক উপোস করে—
তার জন্যে খাদ্য কিছু বাঁচছে কিনা বলো ?

মাধুরিমা ক্লাসের সেরা ছাত্রী ;
লেকচার দেয় প্রফেসার
সুন্দর এবং ব্যাচেলার,
বছর যেতে মাধুরিমা হ'ল তাহার পাত্রী ।

কোলকাতাতে
পথ মাঝেতে
ষণ্ডগুলো বেড়ায় মেতে ।
তাই না দেখে মানিকতলার ক্রমিকচন্দ্র শর্মা
একে একে প্ল্যান ক'রে যায়
কেমন ক'রে দুধ দেবে ষাঁড়
মিটিয়ে দেশের সমস্যাটা চালান দেবে বর্মা

বিবাহিত ডাক্তার
কী বিশাল চোখ তার ।
সুন্দরী মেয়ে এক রোজ যায় আসে ;
সে-মেয়ের রোগ যত—
উবে গেল একদিন কোন মধুমাসে ।
দ্বিতীয় পক্ষের বধূ মন্দ কি আর ?

পাড়ার সে-এক বড়দা,
প্রয়োজনে যোগান দেন
খড়দা থেকে জর্দা ।
কিন্তু যদি কোন ফাঁকে
'হ্যাঁ-স্যার' 'না-স্যার' কম পড়ে
দেবেন টেনে রন্দা ।

চারদিকে কড়া চোখ
প্রেমিকার চাপে রোখ :
পিতামাতা কেন করে বন্দী ?
চিঠি লিখে কয়টা
ধ'রে রাখি প্রেমটা—
এখানেও রেশনিং ফন্দি !

ভেজাল

(গল্প)

নন্দ সেন

ব্যালকনিটা কি রকম হবে—এ চিন্তায় যখন অস্থির, কিছুতেই খেই মেলাতে পারছি না, কি রকম হলে চারিদিক থেকে হাওয়া, রাতের জ্যোৎস্না আর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যগুলির পরিপূর্ণ উপভোগ সম্ভব হবে—হাল ছেড়ে দিলাম। নিজের বিদ্যে-বুদ্ধি সম্বন্ধে স্ত্রীর সন্দেহটা আরও প্রবল ও প্রখর হয়ে উঠল। সেই মুহূর্তে স্ত্রীকে ডাকলাম। কাছে আসতেই সদ্য কাগজে আঁকা সুন্দর ছোট বাড়ীটার প্ল্যানটা এগিয়ে দিয়ে মিষ্টি হেসে প্রশ্ন করি—আচ্ছা বলত ওর ব্যালকনিটা কি রকম করা যায়! আচ্ছা 'বোস-ম্যানসনের' ব্যালকনিটা বেশ কিন্তু, কি বল?

আমার অনুকরণ প্রিয়তায় ক্ষুব্ধ হয়েই সে উত্তর করে—কেন বোসদের ব্যালকনি বাদ দিয়ে কি নতুন সুন্দর ডিজাইনের ব্যালকনি হতে নেই, না হয় না?

তারপর মুখে একরাশ পরিতৃপ্তির স্নো মেখে একে একে অলিন্দ থেকে আরম্ভ করে সূর্যমুখীর শেষ টবটা পর্যন্ত কোথায় বসলে সুন্দর মানাবে, এক নিঃশ্বাসে বলে গেল। পরিতৃপ্ত হলাম নিজের রুচির সাথে ওর পরিকল্পনা মেলাতে গিয়ে। আশ্চর্য ভাবে মিলে গেছে আমার ইচ্ছের সাথে ওর প্রত্যাশা।

তারপর মৃদু আদরের সুরে জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা, কি গাড়ী কেনা যায় বলত? আমার কিন্তু অ্যামবাসাডর একদম ভাল লাগে না।

একরকম আশ্চর্য হয়েই ও বলে উঠে—কেন? ফিয়াট! সুন্দর সারভিস, বিভিন্ন রং, হালকা গাড়ী—বলবার ভঙ্গী দেখে যুগপৎ হাসি আর করুণার উদ্রেক করে। প্রথমটার করেন ওর বলার ভঙ্গী। দেখে মনে হয় কোম্পানির ক্যানভাসার! নিঃশ্বাস নেবার আগেই গুণাবলী শেষ। আর শেষেরটার জন্য মনে হয় এতদিনের দুঃখের সঞ্চিত স্মৃতি। সত্যি বিয়ে হয়ে পর্যন্ত ট্রামে-বাসে ছাড়া নিজেকে ট্যাক্সির মধ্যে কোনদিন কল্পনা পর্যন্ত করতে পারিনি। যদিবা কোনদিন দৈবাৎ ট্যাক্সিতে উঠেছি, আমার পালিয়ে গেছে। আহা বেচারা! তবুও শিক্ষার আলো যাবে কোথায়? গাড়ী কিনবার প্রশ্নেই নজরটা ঠিক উপরের দিকে চলে গেছে—কেন? ফিয়াট!

তারপর দুজনে জল্পনা করতে বসি। ওর নিস্তরঙ্গ মনে খুশীর ঢেউ ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয় না। আমি বলি—বুবুনকে কিন্তু আমার ইন্‌জিনিয়ারিং পড়াবার ইচ্ছা।

ও সোচ্চার প্রতিবাদ তোলে—না ডাক্তারী।

নিজেকে কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করি। বিনা চিকিৎসায় ওর বাবাকে মারা যেতে দেখে, মনে হয় ডাক্তার ছেলের স্বপ্ন জন্ম নিয়েছে মনের অন্দরে। আহা বেচারা, যাক্‌গে ওর কথাই থাক।

আমি বলি—মুমির জন্য তাহলে কিন্তু ইন্‌জিনিয়ার ছেলে চাই।

ও চোখ দুটি দিয়ে মিষ্টি হেসে সম্মতি জানায়।

আবার তর্ক বাধে। বাড়ী নিজে করব, না কণ্ট্রাক্টে দেব। ওকে মোটেই বুঝাতে পারি না, সিমেণ্টের পারমিট, চুণের দুষ্প্রাপ্যতা আর এক নম্বর ইঁট পেতে যে কত ঝামেলা। ও কিছুতেই বুঝতে রাজী নয়। ওর সেই এক গোঁ।—কণ্ট্রাক্টর বাড়ী ভাল করে না, পছন্দ মত হয় না। ওদের কোন এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ী যাচ্ছেতাই হয়ে গিয়েছিল ইত্যাদি হাজার রকমের কৈফিয়ত। হঠাৎ ভিতরে কড়াইতে কচুর ডালনা পুড়ে যাবার গন্ধে সচেতন হলাম আমরা।

মাত্রাতিরিক্ত কৌতূহলকে শাসন করবার ভঙ্গী নিয়ে হাতে ধরা খুন্তিখানাকে দরমার বেড়ায় ঠুকতে ঠুকতে প্রশ্ন করে—বাড়ী, ব্যালকনি, বুবুন-ডাক্তার, ফিয়াট—কিন্তু টাকা?

আমি সহজ ও সাবলীল ভঙ্গীতে উত্তর দেবার চেষ্টা করি—কেন? রেঞ্জার্স! লটারী!

ও বলে অস্ফুট কণ্ঠে—কত?

একরাশ বিরক্তি নিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বললাম—এক লাখ দশ হাজার।

দুর্লভ

অমিয় চট্টোপাধ্যায়

জোড়াতালি জীবনের
কালো কালো দাগগুলি
মুছে দিতে চাই,
অশ্রুতে পিচ্ছিল
সর্পিল পথে আনি
ভালবাসাটাই।
এক মুঠো জুঁই ফুল
ক্ষণিকের হাসিটায়
পারি না যে ভুলতে,
সভ্যতা ফাঁসুড়ের
আমি চাই চোখ ধাঁধা
মুখোশটা খুলতে।

ধরণীর আলো দেখা
শুরু হওয়া দিন হ'তে
কান্নার ছন্দটা চিনেছি,
নড়বড়ে ঠেলাগাড়ি
দেহটায় চড়ে বসা
গাড়োয়ান মনটায় জেনেছি।

সোজা পথে চলবার
সহজ সে তালটায়
শহরের জীবনের খোলটা,
মৃদঙ্গী পোড়া মন বাজাতে চাইলেও
নাহি ওঠে ছন্দের লহরা ;
তাল কাটে, ভুল হয় বোলটা।

শতমুখী ভিক্ষুক
বহুরূপী ক্ষুধা তার
লালসার দাঁতগুলি বসিয়ে,
মরণ কামড় দিয়ে
নিতে চায় সত্যেরে
জীবনের মাটি হ'তে খসিয়ে।
ধক্‌ধকে গোলাকার
আমি তার দুই চোখ এড়িয়ে
পৃথিবীরে শেষ ভালবেসেনি,
চারণের সুরে বাঁধা
মধু ঝরা মমতার
একফোঁটা হাসি আজ হেসেনি।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ)

চোখ তুলে উদাস ভঙ্গীতে ও বলে—পাব কিনা তার ঠিক কি ?

—কেন ? স্বয়ং লক্ষ্মী বলেছে পাব।

—লক্ষ্মী ! স্বয়ং !

—হ্যাঁ, তোমার বোন—আমার শালী। কাল তোমার বাবাকে দেখতে গেলাম না ? কথায় কথায় লটারীর টিকিট কেনার কথা বলাতেই তো লক্ষ্মী স্বয়ং বলল--হ্যাঁ, এবার আপনি নির্ঘাত Ist prize পাচ্ছেন।

উদাস ভঙ্গীতে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বলে—বিশ্বাস হয় না।

আশাহত, বিক্ষুব্ধ হয়ে আমি পুত্র-কন্যা, স্থান-কাল ভুলে চিৎকার করি স্ত্রীর নাম ধরে—তোমরা কি বলত সরস্বতী ! তোমরাও কি দিন দিন ভেজাল হতে চললে ? তুমি পর পর দু'বার বললে, সংসারে পুষ্যি বাড়ছে, P.U.-টা দিয়ে দাও যদি কিছু মাইনেটা বাড়ে, পাস করে যাবে—দিলাম। দেখলাম নাম নেই লিষ্টে। কাল লক্ষ্মী স্বয়ং বলল Ist prize নির্ঘাত পাব। তাও বলছ, হবে না—তোমরা কি বলত ? কি যেন !

সচেতন হয়ে আমি কান ফিরিয়ে শুনি সরস্বতীর খুন্তির আওয়াজ আসছে। কচুর ডালনা কড়াই থেকে নামাচ্ছে। চোখ ফিরিয়ে দেখি, সদ্য আঁকা ব্যালকনির প্লান নিয়ে ভাবী ইন্‌জিনিয়ার-ঘরনী সুমি হজমের চেষ্টায় ব্যস্ত।

৪৬শ বর্ষ | পৌষ, ১৩৭৩ | ৭ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

অনশন একটা দাবি আদায়ের ফিকির

দাবি আদায়ের অমোঘ অস্ত্র হিসেবে অনশনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। শিশুরা যখন তাদের দাবির বিষয়ে কিছুতেই অপরকে প্রভাবিত করতে পারে না, তখন শুরু করে একটানা কান্না। আমাদের দেশেও শিশু-সুলভ ঘটনার অনুষ্ঠান হয়ে চলেছে! বিচারশীল বিতর্কের দ্বারা যখন কিছুতেই প্রতিপক্ষকে স্বমতে আনা যায় না, তখন অন্ধ আবেগের দ্বারা নিজের দাবির বিষয়ে অপরকে প্রভাবিত করে কার্য সাধন করাই অনশনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজকের অনশনব্রতীদের অনেকেই গান্ধীজির উদাহরণ দেখান। কিন্তু গান্ধীজি আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে অনশন

অনশন হয়, সেগুলির স্পষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে—চাপ সৃষ্টি করে দাবি আদায় করে নেওয়া। এই অন্ধ আবেগের আবহাওয়ার মধ্যে, এই চাপ সৃষ্টির চেষ্টার মধ্যে কোন সত্যকার রাজনৈতিক বিতর্ক চলে না। অথচ, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত স্থির করার যে সব প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি আছে, সেগুলি এড়িয়ে গিয়ে কিছু সংখ্যক লোক যদি নিজেদের ইচ্ছা সরকারের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন, তাহলে এই 'ব্ল্যাকমেইল'-এর রাজনীতির শেষ কোথায় ?

ভারতের দুই প্রান্তে এক সন্ন্যাসী ও এক সন্তের অনশন সম্পর্কে তুমুল বিতর্কের ঝড় উঠেছে। সন্ত ফতে সিং এবং জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য—দু'জনেই নিজ নিজ অনুগামীদের

প্রশ্ন নিয়ে নিজেকে ব্যাপৃত করেছেন এবং জগদ্গুরুও যে-প্রশ্নে অনশন করছেন, তার গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। এই অনশনের ফলে যদি কোন অনভিপ্রেত বিপদ হয়, তাহলে তাঁদের অনুগামীরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই অনুগামীরা তখন দেশের কোথায় যে কি কাণ্ড করে বসবেন, তার স্থিরতা নেই।

এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী যে দৃঢ় নীতি গ্রহণ করেছেন, তা' সত্যই প্রশংসার্হ। তিনি বলেছেন, পুরীতে জগদ্গুরু শঙ্করাচার্যের অনশনের দ্বারা স্থির হবে না যে, সারা দেশে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা হবে কিনা, বা সন্ত ফতে সিং-এর অনশন বা আত্মবিসর্জনের দ্বারা পাঞ্জাব-হরিয়ানার সমস্যার সমাধান হবে না।

সমস্ত যুক্তি-বিতর্ক বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র অন্ধ আবেগ-শক্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়া যে মোটেই সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়, সেকথা কারো অবিদিত নাই। সন্তজীর অনশন ও সম্ভাব্য আত্মবিসর্জন সম্পর্কে এবং জগদ্গুরু শঙ্করাচার্যের অনশন সম্পর্কে দেশের মধ্যে বহু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কোন্ নীতির বলে এঁরা দাবি আদায়ের অস্ত্র হিসাবে অনশনকে বেছে নিয়েছেন? ধর্মগুরু-রূপে এঁরা সম্মানিত, এবং এঁদের বহু অনুগামীও রয়েছেন। কিন্তু তাই বলে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এঁরা যদি রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে ফেলেন, তাহলে সেটা দেশের পক্ষে মোটেই শুভ লক্ষণ নয়।

ঈশ্বর ভজনা ও রাষ্ট্র পরিচালনা—দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক কর্মধারা। একের অপরের সীমানার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করলে, তাতে বিরোধের সমূহ সম্ভাবনা। পৃথিবীতে সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে রাজা ও ধর্মগুরুর মধ্যে আনুগত্য ও ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। এবং তার ফলে বহু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের এই কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘোষিত হলেও এর পুনরভ্যুত্থান পুনরায় সেই অশুভ সঙ্ঘর্ষের সূচনা করছে।

বিশ্ব নয়া সমাজের সভাপতি যোগীরাজ সূর্যদেব সন্ত ফতে সিং-য়ের দাবির বিরুদ্ধে পাল্টা অনশন শুরু করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যাতে সন্তজীর দাবি মেনে নিতে স্বীকৃত না হন, এবং হরিয়ানা সম্পর্কে আর কোন পুনর্বিবেচনা না হয়, সেই দাবিতে তিনিও অনশন শুরু করেছেন।

এ ধরনের জুলুম করে দাবি আদায় করার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কিছুটা অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের বিপদ এই যে, সেখানে বহুজনকে খুশি রাখতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বহুজনকে খুশি করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যে সরকারী নীতি গৃহীত হয়, তাতে কিছুটা দুর্বলতার প্রশ্রয় থাকে। অনশন, হিংসাত্মক কার্যানুষ্ঠানের হুমকি প্রভৃতি 'ব্ল্যাকমেইল'-এর রাজনীতি যাঁরা করেন, তাঁরা এ যাবৎ কাল অনুসৃত সরকারী নীতির দ্বারা উৎসাহিত হয়েছেন। আজ যে দেশের এখানে সেখানে বিভিন্ন ব্যাপারে অনশনের হিড়িক দেখা যায়, তার জন্য এই সরকারী দুর্বলতাই দায়ী। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এই দুর্বলতা চিরতরে দূর করার জন্য সঙ্কল্প বদ্ধ হয়ে থেকে যদি সেটা কার্যে পরিণত করতে পারেন, তাহলে বাস্তবিকই এ একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে থাকবে।

অনশনব্রতী ধর্মগুরুদের নিকট আমাদের এই সবিনয় প্রশ্ন স্বভাবতঃই করতে ইচ্ছা করে যে, মানব জাতির সম্মুখে আজ যে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয়েছে, তার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না করে, নিছক রাজনৈতিক বিতর্ক বিষয়ের মধ্যে তাঁরা কেন নিজেদের ব্যাপৃত করে ফেলছেন! মানব-জাতির কল্যাণে ও বৃহত্তর স্বার্থে তাঁদের কর্মধারার পরিবর্তন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

রঙ্গ জগৎ

চাল না পাই দুঃখ নেই, কিন্তু এত চেষ্টা করেও টেষ্ট ম্যাচের একটা টিকিট যোগাড় করতে পারলাম না।

জীবন

শ্রীতারাপদ দাস

অনন্ত জীবন-পথে চলেছে মানব-যাত্রী—,
নাহি শ্রম, নাহি শ্রান্তি,
নাহি দৈন্য, নাহি ক্লান্তি,
শুধু চলা আর চলা
কাটিছে দিবস রাত্রি।

লক্ষ্যহীন অনিমেষ, জানে না বিরতি কোথা—
কতো রূপ, আলোছায়া,
বাধা পশ্চাতের মায়া,
কোন্ সমুখের বাণী
টানে তারে হেথা-হোথা ?

জন্ম-মৃত্যু অন্ধকারে হারায়েছে বারে-বারে—
ভাঙ্গা-গড়া মাঝে মাঝে
সাজায়েছে কতো সাজে
হারায়ে হারায়ে পুনঃ
লভিয়াছে আপনারে।

আনন্দ-অমৃতে পূর্ণ বিশ্ব জীবনের রেখা—,
অখণ্ড এ বিশ্বলোকে,
জ্বলিয়া রহিবে সুখে,
সত্যের মহিমা গীতি
অনির্বাণ দীপশিখা।

ভূষণ্ডীর ক্ষত ঝরা মাঠে

শিবেন্দ্র গোস্বামী

অদ্বিতীয় বিম্বিত বেদনা,
অক্ষম ধমনী বেয়ে প্রতিধ্বনি তোলে—
শ্রদ্ধাহীন হৃদয়ের হতাশার কোলে
সঞ্চয় করে না কিছু, আগ্নেয় অনলে
একা একা দগ্ধ হয়, নেই তা' অজানা।

ময়ূরের রঙীন পেখমে—
আমি দেখি অতলান্ত সাগরের ছবি।
বহুশত শতাব্দীর সবুজ অটবী
দেখে না শাশ্বত চোখে এ যুগের কবি
রেশমের কোমলতা দূরে যায় ক্রমে।

ভূষণ্ডীর ক্ষত ঝরা মাঠে,
ভৌতিক আলেয়া রানী এখন নাচে না,
বাস্তুহারা কলোনীর বাস্তব চেতনা
কাকলী ছাপিয়ে এক সুরের ব্যঞ্জনা
বেঁধে নিয়ে সভ্যতার সোজা পথ হাঁটে।

চৈতন্যের উষ্ণ প্রস্রবণে—
নেই আর সেই রাত, মেরুন পাখীরা
ক্লান্তির বলয়ে ভুলে গেল ডানা ঝাড়া।
দীপকের তপ্ত রাগে জৈবিক ফোয়ারা
নিস্তব্ধ করেছে ওরা সঙ্গত কারণে।

শহীদ

সুদর্শন চক্রবর্ত্তী

—আমি বিয়ে করতে চাই বন্যা—প্লাবন শোনাল কথা ক'টা অনেক ইতস্তত করেই। অনেকদিন থেকেই প্রতীক্ষা ক'রে আছে প্লাবন, কিন্তু বলি বলি ক'রে আজ পর্যন্ত গুছিয়ে বলতে পারেনি সে বন্যাকে। তাই কথাটা ব'লে ফেলেই প্লাবন কেমন যেন লজ্জিত হ'য়ে পড়ল বন্যার কাছে সেই সময়ের মত।

বন্যাকে নিরুত্তর দেখে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকিয়ে রইল প্লাবন অন্ধকার আকাশের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে। সে যেন কিছুটা মিল খুঁজে পেল বন্যার চুমকি লাগানো কালো শাড়ীখানার মধ্যে। অদূরের লাইট পোষ্টের আলোয় সোনালী চুমকিগুলো তার ঝিলমিল করছে যেন।

কিন্তু বন্যা নিরুত্তরে শুধু তাকিয়ে থাকে পা দিয়ে চাপা নরম ঘাসের দিকে। কি জবাব সে দেবে এ প্রশ্নের? বন্যা জানত, প্লাবন কি একটা যেন বলতে চায়। তাই সে কিছুটা আন্দাজও করেছিল যে, প্লাবন কি বলবে তাকে। কিন্তু সহসা এভাবে যে প্লাবন একেবারে সামনাসামনি এ-কথার অবতারণা করতে পারে, এতটা বন্যা ভাবতেও পারেনি। তাই সে একবার ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখে প্লাবনকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত। আবার চোখ ফেরায় অন্যদিকে। মনে পড়ে যায় প্লাবনের সঙ্গে তার ফেলে আসা পুরনো দিনগুলো। প্লাবনকে তার ভাল লাগে সত্যিই। প্লাবনকে কাছে পেলে মনে সে আনন্দও পায়। প্লাবনকে দেখতে না পেলে মনটা তার খারাপও লাগে। কিন্তু তাই ব'লে প্লাবনকে একেবারে বিয়ে—এতটা ভেবে দেখেনি বন্যা এর আগে পর্যন্ত। তাই সে সহসা এর কোন জবাব খুঁজে পায় না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বন্যা তার স্বভাবজাত ভঙ্গিমায় বলে—'আজ তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে প্লাবন, কেন বলত?'

—তোমাকে আজ আমি কিছুই লুকাব না বন্যা। ক'দিন থেকে বাড়ীতে আমার বড়ই অশান্তি দেখা দিয়েছে আমার বিয়ে নিয়ে। আমি বলেছি বিয়ে যদি করতেই হয়, তবে সে আর কাউকে নয়—বলেই প্লাবন বন্যার চশমার

আবার বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বলে—রাত হয়ে এল বন্যা, আমার জবাব ত এখনও পেলাম না। এবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বন্যা প্লাবনের দিকে তাকিয়ে বলে—আজ ওঠ।

নিরুত্তরে দু'টো প্রাণী পথ চলে পাশাপাশি, কিন্তু যেন নিতান্ত অপরিচিতের মতই। বড় রাস্তা পার হয়ে গলির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে প্লাবন থেমে যায়।

বন্যা সহসা হাতটা জড়িয়ে ধরে প্লাবনের। বলে—আমায় ভুল বুঝো না প্লাবন, লক্ষীটি তোমার পায়ে পড়ি। তুমি রাগ করো না।—বন্যার চোখ দুটো সহসা ছলছল করে জলে।

ধরা গলায় প্লাবন উত্তরে শুধু বলে,—আমায় ক্ষমা কর বন্যা, ভুলতে পারবে ত?

—ওঃ, তুমি এতো নিষ্ঠুরও হ'তে পার প্লাবন? কি বলব, যদি বুকের ভিতরটা কি হচ্ছে তা জানতে!—বলেই বন্যা চোখ রগড়ায়।

কিন্তু প্লাবন স্থির থাকতে পারে না। কালবোশেখীর ঝড়ে আজ তাকে মাতিয়ে দিয়েছে একেবারে। ভারাক্রান্ত জীবন, অভিশপ্ত বাঁচা, এসব কত কি আজ তার মনের মধ্যে ভিড় করে উদ্দাম ক'রে তুলেছে তাকে হতাশার অন্ধকারে। নিমেষে সমস্ত আলোগুলো তার চোখের সামনে যেন কারেন্ট ফেল করে হঠাৎ। আজ এই প্রথম তার নিঃসঙ্গ একা ব'লে মনে হ'ল। বল্‌তে কি, সে যেন অনেকটা ভয় পেয়ে গেল এই চিন্তায় যে, সমস্ত অন্ধকার তার সমস্ত অভিশাপ নিয়ে টুটি টিপতে আসছে। তাই কোন দিকে আর না তাকিয়ে "শুধু বিদায়" এই কথা কটা ব'লেই প্লাবন আজ ঝড়ের মত ছুটে চ'লে গেল বন্যার চোখের সামনে থেকে।

আর বন্যা? অস্ফুট স্বরে 'প্লাবন একটু ফেরো' ব'লে হাত বাড়িয়েই আবার ধীরে ধীরে সংযত হয়ে বাড়ী ফেরে।

তারপর কেটে গেছে কয়েকটা বছর। শহর ছেড়ে

বন্যাকে ভোলার চেষ্টা করে সে। ডাক্তার হিসেবে দিনের পর দিন তার প্রভাব প্রতিপত্তি যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে নাওয়া-খাওয়ার সময়ও ঠিক থাকে না তার। প্রথম প্রথম সে ভাবত আপন মনেই যে, কি লাভ তার আর বেঁচে থেকে। কিন্তু এখন ক্রমশঃ কাজের মধ্যে এমনই সে ডুবে থাকে যে, নিজের কথা ভাবার একদণ্ড অবসরও আজ তার মেলে না।

সেদিন একটা লোক এলো। মাসখানেক হল যে ইঞ্জিনিয়ারটি এসেছেন, তার অসুখের খবর পেয়ে প্লাবন যায় রোগী দেখতে। গিয়ে দেখে অসুখটা ইঞ্জিনিয়ারের নয়, তার স্ত্রীর। আর রোগটা ম্যানেঞ্জায়টিস্। তাড়াতাড়ি তাকে নার্সিং হোমে নিয়ে এসে নাড়ী ধ'রে সময়মত ওষুধ, ইঞ্জেকশন, পথ্য প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করে।

অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাওয়ায় একদিন রক্ত দেওয়ার দরকার হ'য়ে পড়ল। সহকর্মীকে দিয়ে নিজের রক্তটা মিলিয়ে নিয়ে প্লাবন যেন একটা নূতন আলো দেখতে পেল এতদিন পরে। প্লাবনের এই অপূর্ব সুযোগ,—বোধ-হয় এরই জন্যে তার এতদিন বেঁচে থাকার প্রয়োজন ছিল।

এবার আর কাল বিলম্ব না ক'রে সহকর্মীর সাহায্যে যতটা দরকার সমস্ত রক্ত নিজের দেহ থেকে আদায় ক'রে নিল প্লাবন। পরদিনই রক্ত দেওয়া হয়ে গেল।

তিনদিন পরে রোগী চোখ মেলে দেখল। চিনতে পারছে সে আত্মীয়-স্বজনদের, দুটো-একটা কথাও বলছে অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে।

রাত্রি আটটার পর প্লাবন নিয়মিত রোগী দেখতে এল। রোগিণী চিনতে পারল প্লাবনকে। বলল—'তুমি!'—বলেই সে আবার অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল।

টলতে টলতে প্লাবন কোনরকমে নিজের ঘরে ফিরে গেল। অন্য এক সহকর্মীকে তখনই সাত নম্বর বেডের রোগিণীকে এটেণ্ড করতে বলল। তারপর কিছুক্ষণ পরে খবর নিয়ে জানল, জ্ঞান এসেছে। এক ঘণ্টা পরে আবার শুনল, ভাল আছে। পরদিন সকাল বেলায় অবস্থা বেশ ভালর দিকে গেল।

আর নয়। এতদিন জীবনটা যে ব্যর্থ ব'লে মনে হচ্ছিল প্লাবনের, আজ তার মধ্যে সে অনেকখানি সার্থকতা খুঁজে পেল। সেদিন যে আলোগুলো সহসা নিভে গিয়েছিল তার চোখের সামনে থেকে, আজ যেন সেগুলো আবার একসঙ্গে জ্বলে উঠল তার চারদিকে।

এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে প্লাবন সেইদিনই দুর্গাপুর ছেড়ে আন্দামানের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল।

আতাবনে

শ্রীনিখিলচন্দ্র তালুকদার

(সেদিন) যখন বসেছিলেম আতাবনে,
কত আকুল মুকুল ফুটেছিল;
উদাস কোকিল ডেকেছিল
আর শুক্নো পাতা ঝরেছিল;
—আনমনে সেই আতাবনে।

ঘন ছায়ার মাঝে আতার বনে
গান গুঞ্জরিল আমার মনে;
সোনাঝরা নীল আকাশ ছায়ে
আলো ঝিলমিল উতল বায়ে;
—মধুপুরে সেই আতাবনে।

উদাসী মন স্বপ্ন বোনে,
নিরজনে সবুজ-বনের কোণে;
চমকি' উঠি ক্ষণে ক্ষণে
ব্যাকুল অলির গুঞ্জরণে;
—মধুঝরা সেই আতাবনে।

মুহূর্তের জন্যে

সংস্মিতা

কলকাতার রাস্তায় বাস্তবিকই পরিবহন একটা বিরাট সমস্যা স্বরূপ। এমনিতেই রাস্তায় পথ চলা দায়; তারপর ট্রামে-বাসে একটু স্থান পাওয়া বা হাতের কাছে সময়মত একটা ট্যাক্সি পাওয়া—সে ত ভাগ্যের কথা! ট্রামে-বাসে পা রাখার মত একটু জায়গা নিয়ে ছোট বড় কত ঘটনা বা দুর্ঘটনা যে ঘটে যাচ্ছে তার হিসাব কে রাখে!

সাধারণের যানবাহন ট্রাম-বাসের উপর অধিকাংশ লোকই একান্ত নির্ভরশীল। এর বাদুড়-ঝোলা ভিড় আমাদের চোখ-সহা হয়ে গেছে। কিন্তু এইসব যান-বাহনের যখন ধর্মঘট শুরু হয়, তখন গোদের উপর বিষ ফোড়ার অবস্থার সৃষ্টি হয়! সাম্প্রতিক কলকাতার বুকের উপর একযোগে ট্রাম ও বাস ধর্মঘট জনসাধারণকে এক অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে এনে ফেলেছে।

পরিবহন সমস্যার তীব্রতার জন্য অনেকটা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন দায়ী। যাত্রী সাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে কর্পোরেশন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হয় না। যত বেশী সংখ্যক বাস চলবে, লোকসানের অঙ্ক ততই বাড়বে—অর্থনীতির এ অদ্ভুত যুক্তি কর্পোরেশন দেখিয়ে থাকেন। তাই তাঁরা যতটা সম্ভব কম বাস চালিয়ে লোকসানের হার কমিয়ে আর সমানুপাতিক হারে যাত্রীদের দুর্দশার একশেষ করছেন। ষ্টেট বাস কর্তৃপক্ষ যদি জানিয়ে দেন কোন্ রুটে কত মিনিট অন্তর বাস চলছে, তা হলেই বোঝা যাবে যত বাস রাস্তায় চলছে বলে ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন দাবি করছেন, তা সত্যি নয়। কারণ তা হলে দেখা যাবে যে, যতক্ষণে তিনটি বাসের চলবার কথা ততক্ষণে একটি বাসও চলেনি।

ষ্টেট বাসের অনুকল্প হিসাবে কলকাতায় কিছু প্রাইভেট বাস চালাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ষ্টেট ট্রান্স-পোর্ট কর্পোরেশন আর বেশী প্রাইভেট বাস চালাতে দিতে চাইছেন না বলে জানা গেছে। কর্পোরেশন আশঙ্কা করছে যে, তা হলে তাদের লোকসানের বহর আরও বেড়ে যাবে।

কর্পোরেশন নিজেরা বেশী বাস চালাচ্ছেন না, বেশী প্রাইভেট বাস চালাতেও আপত্তি জানাবেন, আবার ওদিকে ট্রাম ধর্মঘট—এখন জনসাধারণের অবস্থা দাঁড়িয়েছে, বল মা তারা দাঁড়াই কোথা!

* * *

প্রবাদ আছে, 'বিধি যখন বাম হয়—'; আমাদের ঠিক সেই অবস্থাই হয়েছে। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে (Struggle for existence) সকলের নাভিশ্বাস উঠেছে, জনসংখ্যার হার হুহু করে বেড়ে চলেছে আর মানুষের লোভ, ভণ্ডামি ও দুর্নীতি যেন চক্ষুলজ্জার মুখোশ খুলে বিকট মূর্তিতে দেখা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি দেবীও বিরূপ হয়ে উঠেছেন।

এমনিতেই আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদনের হার অত্যন্ত স্বল্প। তার উপর এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গে কিছুটা এবং বিহার ও উত্তর প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে খরা দেখা দিয়েছে। এতে বহু শস্য হানি হয়েছে। আর পশ্চিমবঙ্গে এ বৎসরে ফলনের হারও অত্যন্ত স্বল্প।

এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে স্বভাবতঃই দেশে সরবরাহে ঘাটতি হবে এবং অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, সেই সুযোগে অনেকেই বেশ দু' পয়সা কামিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। বলা বাহুল্য এতে সাধারণের দুর্দশা আরও চরমে উঠবে।

আমাদের চাল-গমের চাহিদার বেশীর ভাগ বিদেশী সরবরাহের দ্বারা মেটান হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় চরিত্র যদি এরূপ সততাবর্জিত হয়, তা'হলে আমাদের সম্মুখবর্তী এ কঠিন সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সুদূর-পরাহত। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বিপুল চাপ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্যহানি প্রভৃতি সমস্যা আমাদের নিকট একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। সে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হলে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আন্তরিকতা অবশ্য প্রয়োজনীয়।
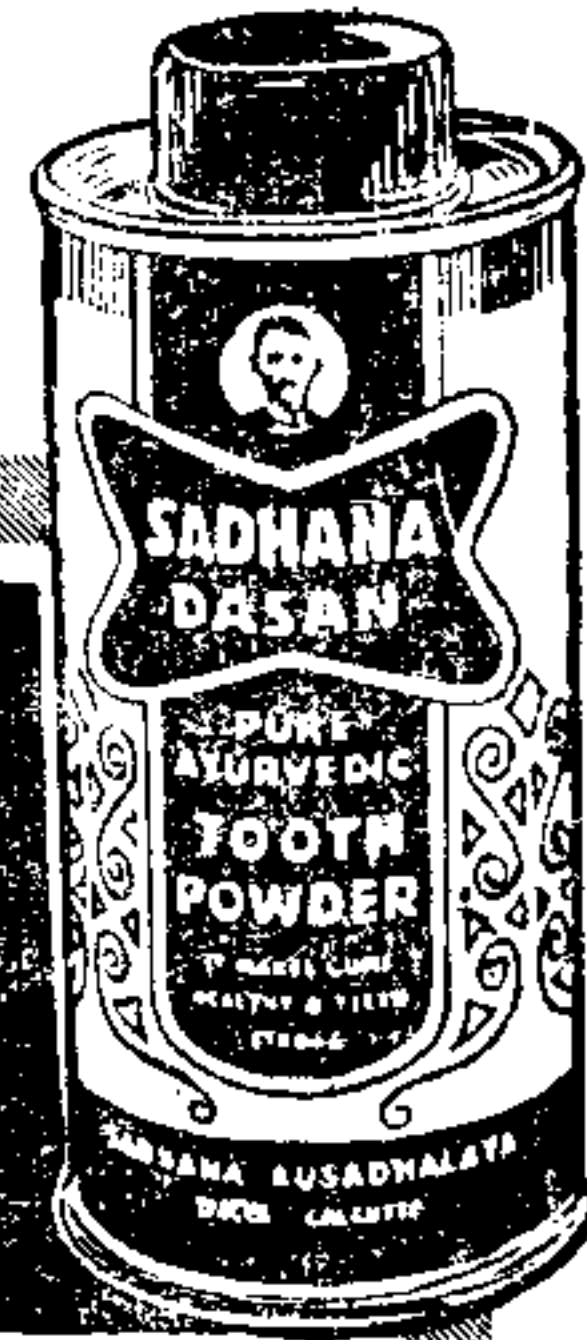
যা হারায় না

(গল্প)

শ্রীঅজিত রায়

ছোটবেলা থেকেই দুজনের আলাপ। যেত একসঙ্গে ফুটবল মাঠে। একজন ছিল ইষ্টবেঙ্গলের সমর্থক, অন্যজন মোহনবাগানের। লাইন দিয়ে টিকিট কিনে ঢুকতে হ'ত না—মেম্বারশিপ কার্ড যোগাড় করেছিল তারা। ইষ্টবেঙ্গলের তখন দুর্ধর্ষ টিম—পাঁচটি ফরওয়ার্ড যেন পাঁচটি বাঘ ছোটে যখন বল নিয়ে, আটকায় কার সাধ্যি! একজন অপরজনকে পাশ দেয়, সে কাটিয়ে কাটিয়ে নিয়ে বল পেনাল্টী সীমানার মধ্যে ফেলে, সেণ্টার ফরওয়ার্ড কিংবা লেফট্ ইন্ লাফিয়ে পড়ে—তারপরে বাঁ পায়ের তীব্র শট, আর বল যেন নেট ছিঁড়ে দেয়। এমনি করে গোল হয়, আর গ্যালারীতে সমর্থকদের জয়োল্লাস যেন দশ মাইল দূর থেকেও শোনা যায়। যখনই ইষ্টবেঙ্গলের গোল হয় তপতী লাফাতে আরম্ভ করে, আর মন্মথ যায় চুপ করে। তপতী লাফাতে লাফাতে বাড়ী আসে আর শুরু করে খেলার গল্প। মন্মথ নিজের বাড়ী গিয়ে খাটের উপর চুপ করে শুয়ে থাকে। প্রতি সপ্তাহে একবার কি দু'বার খেলা দেখতে যায় ওরা। এমনি করে লীগের খেলা শেষ হ'ল। ইষ্টবেঙ্গল লীগ বিজয়ী হ'ল—তপতীর আনন্দ দেখে কে!

কিন্তু শুধু খেলা দেখা নয়। সকাল সাতটায় উঠে মন্মথ তার ঝোলানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাতে আরম্ভ করে। কামানো শেষ হ'লে খবরের কাগজ নিয়ে বসে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে নেয়। ভিয়েতনামে যুদ্ধ চলছে। আমেরিকা হস্তক্ষেপ করেছে। এ যুদ্ধের জন্য কারা দোষী! ভাবছিল মন্মথ। এই সময় তপতী একবার আসে। Economics-এর দু'একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—Duopolyতে value কি করে স্থির হয়, Monopoly আর Imperfect competition-এ তফাত কি? এইভাবে অর্থনীতি ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়। তার সঙ্গে তাল রেখে চলা সম্ভব হয় তাদেরই যারা অধ্যাপনায় রত। তবু মন্মথ যতটুকু পারে বোঝায়।

তপতী টিপ্পনী কাটে—এরকম করে দাড়ি কামিয়েছ কেন তুমি? এখনও খসখস করছে!

মন্মথ কোন উত্তর দেয় না।

—আজ কলেজ যাবে না? তপতী প্রশ্ন করে।

—হুঁ, যাব। বলে মন্মথ খবরের কাগজের লেখাগুলো দেখে।

—ওমা, নটা যে বাজল। কখন স্নান করতে উঠবে? —আবার জিজ্ঞাসা করে তপতী।

—উঠব 'খন—গম্ভীর হয়ে জবাব দেয় মন্মথ।

তারপর তপতীর সঙ্গে দুটো চারটে কথা হয়। Vietnam war-এ কারা দোষী! 'আমেরিকা'—সবলে উত্তর দেয় তপতী।

তারপর তপতী চলে যায়! স্নান খাওয়া সেরে যখন কলেজে রওনা হয় মন্মথ, তখন বাসে প্রচণ্ড ভিড়। কোনোরকমে হ্যাণ্ডেল ধরে ঠাসাঠাসির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে মন্মথ। কত মানুষ চতুর্দিকে। এরকম ভিড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে যেতে যেতে তপতীর কথা মনে পড়ল মন্মথর। বেচারী কি কষ্টে কলেজে যায়। তপতীর জন্য মায়া হয় মন্মথর। শীর্ণ সুন্দরী মেয়েটি। বাবা ওর কোনো এক Office-এর কেরানী। দশটা-পাঁচটা খেটে যা সামান্য আয় করেন, তা থেকেই কোনোরকমে সংসার চলে। তপতীর একটা ভাল শাড়ী নেই—তার একটু আমোদের জন্য বাড়তি পয়সা খরচ করা তার বাবার পক্ষে সম্ভব হয় না। মন্মথর ইচ্ছে হয় ওর জন্য মাঝে মাঝে কিছু কিনে দেয়। কিন্তু তপতীর নেবার কোনো আগ্রহই নেই—তা সে যতই স্নেহের দান হোক না কেন। এমনকি কলেজে টিফিনেরও পয়সা থাকে না তপতীর।

বাসের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে নিজের কষ্টের মাঝেই তপতীর দুঃখ অনুভব করতে পারে মন্মথ। সাধারণ

সময়ে বেশ কড়া কড়া কথা বলে মন্মথ—'কেন মন দিয়ে পড়াশুনো কর না—একটু মন দিয়ে পড়—অত ছটফটে হওয়ার দিকে ঝোঁক কেন!' কিন্তু আজ অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল তার।

কলেজে গিয়ে কয়েকটা ক্লাস হয়ে যাওয়ার পর তপতীকে ডেকে নিয়ে কাছের দোকানে মন্মথ গেল। ওকে বসিয়ে চা-খাবারের অর্ডার দিল। প্রবল আপত্তি করলেও তপতীকে সেই খাবার খেতেই হ'ল। তপতী যখন খাচ্ছিল, মন্মথ তার শীর্ণ সুন্দর মুখের দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

বাইরে মুঠো মুঠো রোদ....উজ্জ্বল দুপুর!

ভবিষ্যৎ জীবনের এক সুখ-স্বপ্ন নিবিড় ভাবে মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে মন্মথর। একদিন যখন এই সুন্দর মেয়েটি তার হবে, কত সুখের জীবন—কেমন সুন্দর সংসার হবে! বাইরে নীল আকাশের কোলে বাতাসের চাপে উড়ে বেড়ানো সাদা-কালো মেঘগুলোর দিকে দৃষ্টি রাখলে ভবিষ্যতের সুখের কথাই মনে হয় মন্মথর।

তপতীর অভাবের সংসার। এই দৈন্যের মধ্যেও তপতীর কত ধৈর্য! এতটুকু গ্লানি নেই মনে। অত দারিদ্র্যের মাঝেও তার প্রশান্তি আর সুকোমল ভাব মন্মথকে অনিবার্য ভাবে আকৃষ্ট করে রাখে। তার থেকে এক Year নীচে পড়ে তপতী।

সেদিন আর ক্লাস করল না তপতী ও মন্মথ। সেই দোকানে বসে অনেকক্ষণ তারা গল্প করল দুজনে।—'না, ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতিকে কোনোক্রমেই নিরপেক্ষ বলা যায় না'—এবং কেন বলা যায় না এই নিয়ে মন্মথ আরও বলল, 'ভারতে বৈদেশিক নীতির বাইরের রূপটা যাই হোক না কেন—ভারতের অর্থনীতির ভিত্তি স্বাতন্ত্র্য, এবং এক ধনতান্ত্রিক দেশ, শেষ পর্যন্ত ধনতন্ত্রের রক্ষার জন্য লড়াই করবেই।'

তপতীর মনে হ'ল ওটা নিছক তত্ত্ব কথা। বাস্তবে ভারতবর্ষ সহাবস্থানের যে নীতির কথা বলে, তা যে অন্তরে গ্রহণ করেছে।

সেইদিন বিকেলের দিকে মন্মথ তপতীকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেল। তপতী বাসায় এসে দেখে বাবার হঠাৎ জ্বর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন—বাবার বিছানার একপাশে বসে বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

তপতী প্রথমে ব্যাপারটা সামান্য ভেবেছিল। তারপর বাবার কপালে হাত দিয়ে দেখল, গায়ে বেশ জ্বর আছে। মাকে বলল ডাক্তার ডাকার কথা। কিন্তু মায়ের কাছে যা সামান্য ছিল তা নিঃশেষ—এখন যে মাসের শেষ! যা' আছে তাতে ডাক্তারের ভিজিট-ই কুলোবে না।

তপতী নিজের টিফিনের জমানো পয়সা থেকেই ডাক্তার ডাকতে পাঠাল। ছোট ভাই গেল। বেশ দেরি হ'ল তার ফিরতে। যখন ডাক্তার নিয়ে ফিরল তখন প্রায় সন্ধ্যে হয় হয়। ডাক্তার রোগী পরীক্ষা করে গম্ভীর হলেন। তপতী উদ্বিগ্ন মুখে ডাক্তারের দিকে তাকাল। ডাক্তার প্রেসক্রিপসন করে দিলেন। বললেন—জীবনের আশঙ্কা আছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে আর পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এইরকম হয়েছে।

মাকে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে তপতী বাবার শিয়রে বসে রইল। মাথায় হাওয়া করল, মাঝে মাঝে জলের ঝাপটা দিল—সময়মত ওষুধও খাওয়াল।

পরের দিন বিকেলে আবার ডাক্তার এলেন। রোগী দেখে ওষুধ পালটে দিলেন। কিন্তু তার পরের দিনও জ্বর মোচনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

কয়েক দিন তপতীর কলেজ যাওয়া বন্ধ রইল। সে আর মা পালা করে রোগীর সেবা করে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, যে অসুখটা সামান্য বলে মনে হয়েছিল, ডাক্তারের ওষুধ ও এত সেবা যত্নেও তা আর ভাল হ'ল না—বাবা মারা গেলেন।

মা বাবার বিছানায় আছড়ে পড়লেন। তপতী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের সংসার মোটেই সচ্ছল নয়। সামান্য আয়ে শত অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে তাদের দিন কেটেছে। বাবার আয়ে কোনরকমে সংসার চলেছে তাদের। বাবার মৃত্যুতে সংসারের মধ্যে ভয়াবহ শোকের ছায়া নামল।

বাবার সৎকার করে তারা যখন গুটিকয় প্রাণী ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল তখন প্রথম প্রশ্ন হ'ল, কেমন করে এবার তাদের সংসার চলবে। ছোট ভাই এখনও স্কুলে

শহরের এই বাসা—এর ভাড়াও যে অনেক! আর তপতী পড়ছিল মোটে 1st year-এ। ঐ বিদ্যে নিয়ে এ বাজারে চাকরি জোটানো কত শক্ত।

তবু তপতী তার চেষ্টার ত্রুটি করেনি। যেখানে পেরেছে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছে—কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। উপায়ান্তর না দেখে তপতীর মা গ্রামের এক আত্মীয়ার কাছে আশ্রয় চেয়ে চিঠি লিখলেন। সেই আত্মীয়ার পরিবারে সংসারের সব কাজ তারাই করে দেবে—বিনিময়ে সামান্য আশ্রয় আর সংস্থান তারা পাবে।

আত্মীয়াটি সম্মতি জানিয়ে উত্তর দিলেন। তপতীরা শহরের বাস উঠিয়ে সেই বাসা ত্যাগ করে কলেজে নাম কাটিয়ে একদিন সন্ধ্যায় গ্রামের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল। সেদিন সন্ধ্যায় আকাশে গুটিকতক তারা উঠেছিল। এই নিরাশ্রয় হতাশ পরিবারটি অলক্ষ্যে বিদায় নিল, কেউ টের পেল না।

*　　*

গ্রামের ধানক্ষেতগুলোর পাশ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে সবুজ ধানের শীষগুলির উপর সূর্যের আলো প্রতিফলিত হওয়ায় চমৎকার লাগছিল। পাশ দিয়ে চলে গেছে শহরে যাবার রাস্তা—বাস-লরি যাতায়াত করে সে রাস্তা দিয়ে। কিন্তু পাশেই ধানের মাঠগুলো যেন অলস হয়ে শুয়ে আছে। দু' একটা চালাঘর আছে—যারা ক্ষেত দেখাশুনো করে তাদের থাকবার আস্তানা। দূরে গ্রামের কুঁড়েগুলো দেখা যায়—খালি গায়ে মোটা কাপড় প'রে দু' চারজন মাঠের

দিকে আসছে।

তপতী বেড়াতে থাকে। দূরে দিগন্ত রেখায় আকাশ আর বিস্তৃত মাঠ মিশে গিয়েছে। ঐ রাস্তা দিয়ে বেশ কিছু দূর গেলে যে বাঁধটা তৈরী হচ্ছে, তার তৈরীর কাজ দেখা যায়। অনেক জনমজুর খাটছে। সেই বাঁধ দিয়ে খাল কেটে মাঠে জল আসবে। চলতে চলতে তপতীর মন্মথর কথা মনে পড়ে যায়। ও এখন কি করছে? শহর থেকে চলে আসার পর কয়েক মাস কেটে গিয়েছে। মন্মথকে কিছু জানায় নি। সে জানেও না তারা চলে এসেছে। হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয় আর কোনদিন দেখাও হবে না তার সঙ্গে। জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। এখন থেকে শুধু বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম। শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি বয়ে বেড়াতে হবে। এখানে তপতী মাসিমার ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়ায়—মা রান্নায় সাহায্য করেন—ছোট ভাই বাজার করে—বাড়ীর অন্যান্য কাজে সাহায্য করে। এইভাবে তাদের দিন কাটে!

১৯৬৫ সাল। মন্মথ B. A. পাস করল। নানা প্রশ্ন তার মনে আসে। পরিকল্পনা দিয়ে দেশের উন্নতি বিধানের বিভিন্ন চেষ্টা চলছে। কোন দিক থেকে আসছে বাধা, কোনো জায়গা থেকে আসছে সমালোচনা। মন্মথ অনেক ভেবে সঠিক পরিকল্পনা কেমন হওয়া উচিত স্থির করার চেষ্টা করে। এই ছোটখাটো জলসেচ পরিকল্পনা, কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা—ছাড়া ছাড়া ভারি শিল্প তৈরী করা—এর মধ্যে কোথাও যেন ভাল ভাবে সংগঠনমূলক প্রয়াস নেই। ওতে উন্নতি হবার আশা কতটুকু? এ বিষয়ে আলোচনা চালাবার মত উপযুক্ত সঙ্গী সে খুঁজে পায় না।

বহুদিন হ'ল তপতীরা বাসা ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। হঠাৎ তাদের চলে যাবার কি কারণ ঘটল? যাবার আগে মন্মথকে কিছু জানালও না পর্যন্ত। নিশুতি রাতে ঘরের জানালাটা খুলে দিয়ে খাটে শুয়ে আকাশের মিটি-মিটি তারাগুলো দেখতে দেখতে তপতীর কথা মনে পড়ে মন্মথর। জীবনে যারা আসে তারা কত সহজে আর বিনা দ্বিধায় চলে যায়। ও কোথায় গেল, কেন গেল—খোঁজ নিয়েও জানতে পারল না মন্মথ।

মন্মথ চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছে বাইরে। এতদিন পরে এই স্থান ত্যাগ করে বাইরে গিয়ে নতুন করে ঘর পাতা অনেক অসুবিধার। তবু উৎসাহ আছে মন্মথর মনে। এমনি ছুটে চলাই তো জীবন! দূর থেকে দূরে চলা—বন্ধনহীন এ যাওয়ার যেন কোনো শেষ নেই। কাজের জায়গায় এসে একটা Quarter-ও পেল মন্মথ।

ছোট ছোট তিনখানা ঘর। সামনে একফালি একটা বারান্দা। বাড়ীতে ঢোকার মুখে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা ছোট্ট বাগান। সেখানে নানা ধরনের ফুল ফুটে থাকে। বারান্দায় চেয়ার পেতে সামনের খোলা প্রশস্ত মাঠের দিকে চেয়ে থাকে মন্মথ। মাঠের ঘাসে উজ্জ্বল রোদ পড়ে ঝিকিমিকি করছে। সব যেন কেমন ঔদাসীন্যে ভরা। কেমন প্রচ্ছন্ন বিষাদে মগ্ন। হাসি পায় মন্মথর। কেন—গেলই বা একজন। জীবনে এমনি কতজন আসে আর যায়, হাসে আর চায়—পশ্চাতে ফিরে তাকাবার অবসরই নেই। ঘর বাঁধবার আশা নাই-বা মিটল!

কে একজন এসেছে দেখা করতে। মন্মথ বাইরে এল। প্রথমেই আগন্তুকের পায়ের দিকে নজর পড়ল। জুতো নেই, খালি পা।

—একটা চাকরি যদি আমায় যোগাড় করে দেন.......

মন্মথ এবার আগন্তুকের মুখের পানে তাকায়—এ যে তপতী! প্রায় সেই রকমই আছে, তবু একটু যেন মলিন হয়ে গেছে। চুপ করে থাকে মন্মথ। মুখের রেখায় আশা-আনন্দের অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তপতীকে বসিয়ে সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে মন্মথ। সব শুনে নীরবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মন্মথ। আনন্দে নেচে ওঠে ওর মন।

তপতী বলে—তবে যাই এখন।

না, যেতে দেওয়া আর সম্ভব নয় ওকে। মন্মথ ভাবে, আবার ও হারিয়ে যাবে। তপতীর হাতটা ধরে বলে—না, এখানে বসো।

কলকাতায় গিয়ে আবার খেলা দেখে ওরা। মোহন-বাগান হারিয়ে দিল ইষ্টবেঙ্গলকে। আনন্দে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা বসে যায় মন্মথর। তপতী চুপ করে থাকে। আবার দুজনে দুজনের কাছে এসেছে—আর কিছুই তাদের মধ্যে ব্যবধান আনতে পারবে না।

ক্ষণিকের অতিথি

(গল্প)

শ্রীনিরঞ্জন সেন

একবার—দু'বার—তিনবার—আরও একবার দরজায় কড়া নড়ে ওঠে।

—কে ?—ভেতর থেকে স্ত্রী-কণ্ঠের প্রশ্ন ভেসে আসে।

—আমি—পুরুষ-কণ্ঠ উত্তর ছুঁড়ে দেয় দরজার এপাশ থেকে।

—আমি কে ? আমি বলতে কি বুঝব—পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় স্ত্রী-কণ্ঠ।

এ পক্ষ এবার নীরব।

ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে দরজা খুলতে তবুও যেন ভরসা পায় না রেবা। দরজা খুলে দিয়ে যাকে দেখল, তাতে দু'পা পিছিয়ে এসে পড়ে যাচ্ছিল, কোনরকমে টাল সামলে নিল রেবা। মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে শূন্যতার ঝংকার শুরু হয়ে গেছে। সমস্ত পৃথিবীটা কাঁপছে। ভূমিকম্প হচ্ছে—চুরমার হয়ে যাবে সৃষ্টি। এ তারই সঙ্কেত।

--তুমি ?—রেবার কণ্ঠে অর্থহীন প্রশ্ন।

উত্তর আসে না—ও পক্ষ নীরব। তাই এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে রেবা—কি মনে করে এখানে ?

— রেবা—উত্তরের পরিবর্তে শ্রীমন্তর ঠোঁট কেঁপে ওঠে।

—তোমার পাপ মুখে এ নাম আর উচ্চারণ করো না শ্রীমন্ত—তুমি যাও। তোমার ছায়া এ বাড়ীতে লাগলে অকল্যাণ হবে!

পাণ্ডুর-শীর্ণ শ্রীমন্তর মুখখানিতে মুহূর্তে ঝলসে ওঠে বাঁকা হাসি। বলে—অপূর্ব কথা শোনালে রেবা—সত্যি তুমি দরদী! তা না হলে তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে এমন কথা! অদ্ভুত তুমি! একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে শ্রীমন্ত।—আরও কিছু বল রেবা—থামলে কেন ? স্বচ্ছন্দে বলতে পার। কেননা বিবেক বলে তোমার কিছুই নেই। তবুও আমি ক্ষণিকের জন্যে আশ্রয় চাই—আমি তোমার অতিথি,—অনুনয় ফুটে ওঠে শ্রীমন্তের কণ্ঠে।

—না, না শ্রীমন্ত, তুমি যাও এখান থেকে। লজ্জা-সংকোচ কি তোমার কিছুই নেই—বলে রেবা চলে যাচ্ছিল।

—রেবা শোন।

ফিরে দাঁড়ায় রেবা।

—চলে যাব আমি—সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় শ্রীমন্ত। তারপরে একটা খাম বের করে জামার পকেট থেকে। তার ভেতর থেকে রেবার একখানা আবক্ষ ফটো বের করে ওর সামনে ধরে।

পৃথিবী রং বদলায়—আচমকাই।

—দশ বছর আগের—অন্যমনস্ক ভাবে উচ্চারণ করে রেবা।

—কত রঙীন স্বপ্নময় সন্ধ্যা—আবেগ ভরা কণ্ঠে বলে শ্রীমন্ত।

তখনকার রেবার সঙ্গে এখনকার রেবার এতটুকুও মিল নেই। দু'চোখ জলে ভরে যায় রেবার। তখনকার শ্রীমন্ত ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অতীতের অনুভূতিতে ব্যাকুল করা পরিবেশ। দশটি বছর! অতীতের উজ্জ্বল আভা এখনও ওদের মনের পাতায় পাতায় আঁকা রয়েছে! এই জন্যেই অল্পে-ই বিদায় করে দিচ্ছিল রেবা। নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য। কিন্তু নিষ্কৃতি এত সহজে পাওয়া যায় না।

—রেবা! আজকের দিনটা থাকতে দাও। মনে কর আমি তোমার হারানো অতিথি—অনুনয়ে ভরা শ্রীমন্তের প্রার্থনা।

—তুমি যাও শ্রীমন্ত, অর্থহীন তোমার প্রার্থনা। তুমি একটি অপদার্থ, তা' না হলে পালিয়ে যাও আমাকে ফেলে রেখে! যাও, আমার নিদ্রিত স্মৃতিকে আর জাগিও না।

—শুধু আজকের দিনটা—এই আমার অনুরোধ—শেষ অনুরোধ। আর কি জান রেবা!

—কি ?

—না খাইয়ে আমাকে বিদায় করে দেবে, আজ তিন

দিন কিছুই খাইনি জল ছাড়া—ধরা পড়ে যাবার ভয়ে—

সত্যি এবার রেবার নারী মনে মায়ার স্পন্দন জাগে। অতীতের অস্তিত্ব যেন পরিবেশকে সহজ করে দিল। নিঃশেষে হারিয়ে গেল রেবার মন অতীতের স্মৃতির ঘরে।

—তুমি আজ তিন দিন উপোসী?—রেবার দু'চোখে মায়ার দীপ্তি। ওর সামনে ওরই মনের মানুষ, যাকে ভালবেসে ছিল রেবা। নিঃস্ব পথিক আজ সেই শ্রীমন্ত!

—এখানে এস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন—রেবা এগিয়ে এসে শ্রীমন্তর হাত ধরে। অতীতের স্বীকৃতি! এগিয়ে যায় শ্রীমন্ত। উপস্থিত এই নিরাপদ আশ্রয়। সান্ত্বনাও বটে। অতীতের দুর্বার আকর্ষণ দু'টি মনে!

আশ্চর্য! এই হচ্ছে নারী মন। দূরে সরিয়ে দেয় প্রয়োজন হলে—আবার প্রয়োজন হলে কাছেও টানে! এতক্ষণে ভাল করে রেবাকে লক্ষ্য করে শ্রীমন্ত।

—রেবা! তোমার পরনে থান!

—আমি বিধবা শ্রীমন্ত! নির্মম নিয়তির চক্রের তলায় কে কখন পড়ে তা বোঝা যায় না।

—এই বুঝি তোমার স্বামীর ঘর?

—হ্যাঁ।

রেবা—রেবা বিশ্বাস! কি মিষ্টি চেহারা ছিল—আজ আর কিছুই নেই। যৌবন চলে গেছে। কি ছিল আর কি হয়েছে।

কথা হারা কয়েকটি মুহূর্ত কেটে যায়।

—আমার ঠিকানা........

রেবার কথা শেষ হবার আগেই উত্তর দেয় শ্রীমন্ত—তোমার পিসিমার কাছ থেকে তোমার ঠিকানা পেয়েছি।

অনুশোচনার আঘাতে জর্জরিত রেবার মন। সাদা থানের আবরণে ঢাকা একটি নারী মূর্তি। যৌবন যাবার সময় নয়, তবুও গেছে।

—বস!—আসন পেতে দেয় রেবা। প্রশান্তি ঘেরা এই ঠাঁই।

সবুজ স্বপ্ন ভরা পরিবেশ। একটু পরে রেবা নিজের কাজে চলে যায়। রেবার খুশিতে উজ্জ্বল চোখ দু'টিতে কি আশ্বাসের আভাস। অতীতের স্মৃতি ছড়ানো ঠাঁই।

ঘরের ভেতর গিয়ে পড়ে শ্রীমন্তর দৃষ্টি। একটি

ফুলের আস্তরণ। ধন কামনায়, স্বামী-পুত্রের মঙ্গল কামনায় চিরন্তনী নারীর ভক্তি অর্ঘ্য। পূত পবিত্র পরিবেশ ঘরটির। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে রেবা। মহাকালী বালিকা বিদ্যালয়ের মিস্ট্রেস সে। তাছাড়া টিউশনিও আছে।

ওঃ, এই সেই রেবা—যার একটু সান্নিধ্য পেলে ধন্য হয়ে যেত যে কোন যুবক! তাদের ঘরের আবহাওয়া ছিল আভিজাত্য ধর্মী। রেবার বাবা ছিল গণ্যমান্য ব্যক্তি—উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। রেবার জীবন ছিল সহজ-সুন্দর। উদ্গত অশ্রু গোপন করে শ্রীমন্ত। অদৃষ্ট! অদৃষ্টের রহস্য বোঝা বড্ড শক্ত—আসলে বোঝাই যায় না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বসে আছে শ্রীমন্ত। রেবাও। অতি সন্তর্পণে চাইল রেবা শ্রীমন্তর দিকে। রেবার সিঁথি সিঁদুর-রাঙা নয়—সিঁদুর মুছে গেছে। যে সিঁদুর নারী জীবনের চরম সার্থকতা।

—মা!—একটি ছেলে ছুটতে ছুটতে এলো বই খাতা নিয়ে।

—এস বাবা! সোহাগ-ভরা ডাক রেবার কণ্ঠে। একরাশ কালো চুল ছেলেটির মাথায়—সুশ্রী মুখ তার। ডাগর দু'টি বুদ্ধিদীপ্ত চোখ।

—হাউ বিউটিফুল বয়!—শ্রীমন্ত বলে ফেলে।

—ও আমার ছেলে শ্রীমন্ত। ও হবার পরেই ওর বাবা মারা যান। গৌতম ওর নাম।

—গৌতম!

—হ্যাঁ, গৌতম—রেবার কণ্ঠস্বর একটু কেঁপে গেল।

—মনে পড়ে রেবা—

রেবা চমকে ওঠে।

—পড়ে! তোমার দেওয়া নামই রেখেছি শ্রীমন্ত—অতীতের আশীর্বাদ।

—কথা ছিল, আমাদের ছেলে হলে তার নাম রাখব গৌতম, আর মেয়ে হলে গোপা।

—শ্রীমন্ত, যেচেই আমি তোমার প্রেমে পড়ি। ঘর বাঁধার স্বপ্নও দেখেছিলাম দু'জনে, কিন্তু সে স্বপ্ন সার্থক হয়নি।

—রেবা তবুও আমি পেয়েছিলাম একটি নারী, আর তার ভালবাসা। সহজ-সুন্দর প্রেরণাময়ী একটি নারী।

জাগানো, যৌবনের তৃষ্ণা জাগানো। আমার মরু-জীবনে তুমি ছিলে মরূদ্যান। কিন্তু সব ভুল রেবা। এখন তোমার বাড়ীতে এসেছি অতিথিরূপে। তুমি এখন নিরপেক্ষ। আচ্ছা রেবা, এখন আর ঘর বাঁধা যায় না? বলে ফেলে শ্রীমন্ত নিজের অগোচরে!

শিউরে ওঠে রেবা। তার পরেই কঠিন কণ্ঠে বলে—না, তবে তোমার বক্তব্য আমি সোজা ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছি।

—না-না রেবা, বক্তব্য আমার কিছু নেই। কোনদিন থাকেনি, আজও নেই। তাছাড়া আমি চলে যাব একটু পরে—একটু বসি এই আর কি। এমন বলিষ্ঠ ভালবাসার আশ্রয় কিছুক্ষণের অতিথি। ঊষর মরুর মত আমার জীবন।

রেবার চোখের পাতা দু'টো ততক্ষণে জলে ভারি হয়ে গেছে।

—রেবা আমার অসহায় ভাব তোমার ভাল লেগেছিল—এই ভাল লাগা রূপান্তরিত হয়েছিল ভালবাসায়। ভালবাসা—ছোট্ট করে হাসে শ্রীমন্ত।

—তোমার শিক্ষাদীক্ষার কাছে আমি ছিলাম সামান্য মৃন্ময় পাত্র, কাজেই আমার পক্ষে তোমাকে পাওয়ার আশা ছিল সুদূর পরাহত। তিলে তিলে শুকিয়ে মরেছি—তবুও তোমাকে দেখে হাসতাম। তুমিই বলেছিলে—আমাকে দেখে তুমি কেবল হাসবে শ্রীমন্ত—তোমার হাসি অদ্ভুত মিষ্টি। তোমাকে হারানোর সম্ভাবনা যেদিন বুঝতে পারি সেই দিন-ই বেরিয়ে পড়ি পথে—একটানা বিসর্পিল পথ। ভেবেছিলাম, তোমাকে ভুলে যাব—কিন্তু ভাবা যত সহজ ভোলা তত সহজ ছিল না।

—দিনের পর দিন এমনি চলে যাচ্ছিল। মদ খেতে শিখি—মদ আর মদ। নেশায় চুর হয়ে থাকতাম। টাকা। টাকার বড্ডো দরকার হতে লাগল। শেষে চুরি করতে শুরু করি।

—তুমি চোর শ্রীমন্ত!—রেবার কণ্ঠে বিস্ময়—চোখে জল।

—চুরি সমানে করে চলেছি—এই আমার নিয়তির নির্দেশ। আমার নিয়তি। একদিন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ি হাতেনাতে—তারই ফলে ৬ মাস শ্রীঘরে বাস করতে হল। ৬ মাস পরে ছাড়া পেলাম। আবার সেই বিগত জীবন। মদ আর চুরি।

রেবার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চোখে তার জল। শ্রীমন্ত বলে চলেছে নিজের কাহিনী। দূরত্ব বাঁচিয়ে বসেছে রেবা।

—রেবা, আজও পুলিসে আমাকে তাড়া করছে ধরবে বলে। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলাম, কোনরকমে পালিয়ে এসেছি।

রেবা ভয়ে কাঁপতে থাকে।

—ভয় নেই রেবা, তোমার কোন বিপদ হবে না। আমি চলে যাব আঁধার নামলে।

—না, তোমার আর যাওয়া হবে না এই বিপদের মধ্যে—রেবার কণ্ঠস্বর দৃঢ় শোনায়। রেবার উদাস-দীঘল চোখে শ্রাবণ-নদীর বন্যা নামে।

—না রেবা, তা হয় না—ম্লান মুখে হাসি টেনে বলে শ্রীমন্ত।

—এই দেখ, সন্ধ্যা হয়ে গেল। তোমার চা নিয়ে আসি—বলে রেবা উঠে পড়ে। উদ্‌গত দীর্ঘশ্বাস গোপন করে শ্রীমন্ত।

সন্ধ্যার আঁধার নেমেছে।

উঠে পড়ে শ্রীমন্ত। অতীতের স্মৃতির সুরের সুষমা মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুরণিত হতে থাকে।

রেবা চা নিয়ে এসে দেখে শ্রীমন্ত নেই।

—শ্রীমন্ত!

রেবার হাত থেকে ডিস সমেত কাপটা পড়ে যায়। সারা মেঝেময় ছড়িয়ে পড়ে ভাঙ্গা কাপ-ডিসের টুকরোগুলো।

পাশের ঘর থেকে গৌতম ছুটে আসে।

—মা! মামা·······

—মামা চলে গেছে বাবা।

—কেন মা? সরল-সহজ প্রশ্ন জাগে শিশুকণ্ঠে।

এই কেনর কি উত্তর দেবে তাই ভাবছে রেবা—ভাবছে—শুধু ভাবছে।

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
ADHANA
Mritusanjibani
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
(৬ বৎসরের পুরাতন)
মৃতসঞ্জীবনী

হঠাৎ আলোর ঝলকানি

(গল্প)

সুদত্ত

বৃষ্টিতে কাক-ভেজা হ'য়ে নিউ হোষ্টেলের দোতলায় উঠলাম। ছ'-নম্বর ঘরের দরজাটা বন্ধ ছিল। আস্তে একটু ধাক্কা দিতেই ভেজান দরজাটা কোনরকম আর্তনাদ না করেই সাদর আহ্বান জানাল আমায়। আমি গিয়েছিলাম শুভেন্দুবিকাশের খোঁজে। শুভেন্দু ছিল না, কোথায় গিয়েছে কে জানে! ঘরের মধ্যে কেবল রবি ছিল। ইংরাজীতে যাকে বলে ইন্টিমেট্ ফ্রেণ্ড, রবি আমার সেই-রকম বন্ধু। তবে ওর সঙ্গে পরিচয়টা আমার অল্প দিনের। বিছানায় উপুড় হ'য়ে শুয়ে বুকের তলায় বালিশ গুঁজে আকাশ ভাঙা বৃষ্টির দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল ও। বৃষ্টি দেখছিল। বুঝি না বর্ষাকালকে কবিরা কেন সুন্দর বলেছেন। আমার কাছে বর্ষাকালটা একটা অভিশাপ আর বিষাদাচ্ছন্ন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করার জন্য শ্রীরাধিকাকে বর্ষাকালে সবচেয়ে বেশি কষ্ট করতে হয়েছিল। তবুও বৈষ্ণব কবিরা বার বার বর্ষাভিসারের ছবি এঁকেছেন বিনা দ্বিধায়। তবে তাঁদের চোখে কল্পনার রঙিন চশমা ছিল। কেবলমাত্র বৈষ্ণব কবিদের কথাই বলছি কেন, বাংলাদেশের প্রায় সব কবিরাই তো বর্ষার নামে আহা-উহু করেন। তবে একথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, বর্ষার মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে। আমার পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে উঠলো রবি। বিছানার উপর উঠে বসলো আমায় দেখে।

প্রশ্ন করলাম ওকে—আর সব কোথায়?

—রূপ কথায় 'গাইড' দেখতে গেছে।

—তুমি যাওনি কেন?

—হিন্দী বই আমার ভাল লাগে না। আরে, তুমি যে একেবারে ভিজে গিয়েছ।—আমার দিকে ভাল করে তাকাল ও।

—ভিজতে কিন্তু বেশ মজা লাগছিল।

—তা আর লাগবে না, তোমরা যে লেখক। আমার ব্যঙ্গ করল ও।

—তুমিও তো বাবা বৃষ্টির প্রেমে মজে গিয়েছিলে।

—আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। তুমি প্যাণ্ট-জামাগুলো খুলে ফেলো। নাও, এই লুঙ্গিটা পড়ে নাও। আমার দিকে একটা লুঙ্গি এগিয়ে দিলো ও।

জামা-প্যাণ্ট খুলে হ্যাঙারে টাঙিয়ে দিলাম। লুঙ্গিটা পরে নিয়ে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লাম ওর বিছানায়।

রবি জিজ্ঞাসা করল, কি খাবে, চা না কফি?

নিস্পৃহ ভাবে উত্তর দিলাম, গরম কিছু একটা হলেই হ'লো।

রবি নেমে গেল একতলায়। একতলায় ওদের ডাইনিং হল। ডাইনিং হলেই একটা ক্যাণ্টিন খুলেছে ঠাকুর-চাকররা মিলে। আমি আস্তে আস্তে চৌকি থেকে নেমে পায়ে পায়ে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে এলাম। রেলিং ধরে দাঁড়ালাম ঝুল বারান্দার এক কোণে। বৃষ্টির বেগ কমে এসেছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া বইছে। বৃষ্টির ছোট ছোট ফোঁটাগুলোকে মনে হচ্ছিল শরতের শিউলি। একটি একটি করে ঝরে যাচ্ছে। আশ্রয় নিচ্ছে মাটির কোলে। হারিয়ে ফেলেছে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বটুকু। নীচের উঠানে সাজানো দেশী বিদেশী ফুলের গাছ। হোষ্টেলের সুপারিন্‌টেনডেণ্ট সুকুমার চৌধুরী বড় শখ করে বাগানটা তৈরী করেছেন। ভদ্রলোক নিঃসন্তান, স্ত্রীর সান্নিধ্যও পান না সব সময়। তাই তিনি খেয়ালী, বড় বেশী খেয়ালী। কাঁধে একটা বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শে স্থান-কাল সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠলাম। রবি কখন আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল টের পাইনি। রসিকতা করলো ও, এই না হলে লেখক! এই জন্যেই তো মেয়েরা তোমাকে পছন্দ করে।

কপট রাগে চোখ রাঙালাম আমি। রবি হাত জোড় করে মাপ চাইলো। ওর ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি দেখে হেসে

ফেললাম আমি। ও-ও হেসে উঠলো জোরে।

গলা জড়াজড়ি করে ঘরে ঢুকলাম দুজনে। দরজাটা ভেজিয়ে দিল ও। কফি খেলাম আমরা। সিগারেটে ছোট ছোট টান দিয়ে বাদলা বিকেলটাকে উপভোগ করতে লাগলাম। বিস্তীর্ণ ধান ক্ষেতের দিকে চোখের দৃষ্টিটাকে ছুঁড়ে দিয়ে রবি ধোঁয়ার রিং করতে লাগলো। আমি কোন কথা বলছিলাম না। পাছে নীরবতার মাধুর্যটুকু নষ্ট হয়ে যায়। রবিও চুপ করে বসেছিল। আমি ওর টেবিল থেকে রাজা ও রানী বইটা নিয়ে এলোমেলো ভাবে পাতা ওলটাতে লাগলাম।

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে রবি বললো, একটা গল্প শুনবে শোভন? না, গল্প নয় জীবন কাহিনী, শুনবে?

ওর কথায় অবাক হলাম আমি। ওকে আজ সম্পূর্ণ অচেনা মনে হ'লো। আমি বললাম, বলো না। বৃষ্টি-ঝরা বিকেলটার একঘেয়েমি কিছুটা কাটবে।

—তোমাকে আমি বলব। তুমি লেখক, তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে আমার মনের ব্যথাটা। তুমি হয়তো একটা গল্পই লিখে ফেলবে এটা নিয়ে। গল্প লেখ, আপত্তি নেই; কিন্তু দেখ, রোম্যান্টিক প্রেম-কাহিনী লিখে ফেল না। তোমার তো সব গল্পই রোম্যান্টিক কমেডি; আমার কাহিনীটা কিন্তু ট্র্যাজেডি। যদি শুনতে চাও তো বলতে পারি।

—বলোই না, বলছি তো শুনবো।

আবার একটা সিগারেট ধরালো রবি। শুরু ক'রলো ওর গল্প।

আমরা বড়লোক নই, আবার গরীবও নই। বাংলা দেশে মধ্যবিত্ত বলতে যা বোঝায় আমাদের স্থান ঠিক সেই পর্যায়ে। একান্নবর্তী পরিবারে নিতান্ত অবহেলায় মানুষ হয়েছি আমি। আগাছার মতো বেড়ে উঠেছি শৈশব আর কৈশোরের মধ্য দিয়ে। সংসারের কারো কাছ থেকে পাইনি স্নেহ। মা-মরা ছেলেরা কি কোনদিন স্নেহ পায়? মাকে আবছা মনে পড়ে আমার। আমায় বড় ভালবাসতেন তিনি। তিনি মারা গেলেন, আমায় একা ফেলে রেখে পালিয়ে গেলেন পৃথিবী থেকে। মা মারা যাওয়ার পর সবাই যেন কেমন হয়ে গেল। আমি সবার মধ্যে নিতান্ত দীনহীন ভাবে জীবনের অনেকগুলো দিন পার করে দিয়ে স্কুল ফাইন্যাল দিলাম আমি। পাসও করলাম। এবার সংসারের গোমরা মুখে দেখা দিল হাসির আভাস। থমথমে কালো মেঘের মাঝে যেমন ঝিলিক মারে বিদ্যুতের দ্যুতি। তবে হ্যাঁ, আমার রিক্ত জীবনে একজন এগিয়ে এসেছিল সুধার পাত্র হাতে নিয়ে। ভরিয়ে দিয়েছিল আমার সকল শূন্যতা।

আমার মরুময় জীবনের একমাত্র আকর্ষণ ছিল সীমা। আমি জীবন-মরুর বুকে পেয়েছিলাম মরূদ্যানের সন্ধান। নইলে আমি বাঁচতে পারতাম না। অর্থাৎ সবার অবহেলা আর বিদ্রূপের পসরা মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকা আমার দ্বারা সম্ভব হ'ত না। আমাকে হয়ত আত্মহত্যা করতে হ'ত। বিশ্বাস করো শোভন, মা মারা যাওয়ার পর সীমা ছাড়া আর কারো কাছ থেকে ভালবাসা পাইনি আমি। পাইনি সান্ত্বনা। তাই ওকে পেয়ে বড় সুখে ছিলাম। মনের কোণে জমা হওয়া ব্যথাগুলোকে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

কিন্তু সুখ জীবনের কতটুকু অংশই বা জুড়ে থাকে! নীল গগনের বুকে সাত রঙা ইন্দ্রধনু বড় সুন্দর, কিন্তু সেটা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। শরতের সকালে ঘাসের বুকে জমা হওয়া শিশির কণাগুলো সূর্যের আলোয় হীরের মত জ্যোতি ছড়ায়। কিন্তু কতক্ষণ? সুখ যে ঐ সাত রঙ রামধনু আর ঘাসের কোলে জমা হওয়া শিশির কণার মতোই সুন্দর, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। জীবন-তৃষ্ণা উত্তপ্ত মরু-বালিতে পথ হারিয়ে ফেলে, আশার কোমল কুঁড়িটা এক ধাক্কায় বৃন্তচ্যুত হ'য়ে লুটিয়ে পড়ে, স্বপ্নের মহিমায় প্রাসাদটা দেখতে দেখতে মাটিতে মিশে যায়—এইতো মানুষের

জীবন! আমারও সুখের দিন ফুরিয়ে গেল।

জানো শোভন, আমি সব ভুলতে পারব। কেবল পারব না সীমার কাছ থেকে বিদায় নেবার স্মৃতিটাকে।

এখানে চ'লে আসার আগের রাতে মাদুর বিছিয়ে শুয়েছিলাম দাওয়ায়। সবাই অকাতরে ঘুমচ্ছিল। কেবল ঘুমতে পারিনি আমি। কি করে ঘুমব? আমাকে যে মিত্তিরদের 'আদিরে তালনা' ঘাটে যেতে হবে সীমার সঙ্গে দেখা ক'রতে। ও আসবে ব'লেছে। বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। শ্বাপদ পদক্ষেপে হাঁটতে শুরু করলাম মিত্তির পাড়ার দিকে। তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্যে আলের পথ ধরলাম। যা অন্ধকার! চলতে গিয়ে বার বার হোঁচট খেতে লাগলাম।

আশ্বিন মাস। কাঁচা পাকা আউস ধানের শিষগুলো মৃদু হাওয়ায় লুটিয়ে পড়ছিল একে অন্যের গায়ে। আমার গায়েও মাঝে মাঝে আছাড় খাচ্ছিল ধান গাছগুলো। চোরকাঁটার আঁচড়ে পা'টা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল। তবুও আমার খেয়াল ছিল না। আমার অশান্ত হৃদয়-সমুদ্রে বার বার ভেসে উঠছিল সীমার অপূর্ব লাবণ্যমাখা মুখটি, আর দীঘির কাল জলের মত স্বচ্ছ টলটলে গভীর চোখ দু'টা। রাতজাগা পাখীগুলোকে সাক্ষী রেখে শান বাঁধান ঘাটের পাড়ে বুড়ো শিউলি গাছটার তলায় দাঁড়ালাম আমি। সীমা তখনো আসেনি। ওকি আসবে না? না না, তা কি করে হয়! ওতো বলেছে আসবে। দিনের আলোয় আমাদের দেখা হওয়া সম্ভব নয়, তাই ও আসবে রাতের গভীর অন্ধকারে। আমাদের প্রণয় ছিল গুপ্ত। চোরা-বালির তলায় জলের মত। বেশীক্ষণ অপেক্ষা ক'রতে হ'ল না। সীমা এলো কাঁপতে কাঁপতে। বুঝলাম একা আসতে ভয় পেয়েছে ও। শিউলি গাছের তলায় বসলাম দু'জনে। দু'জনে অনেক কথা বললাম। যার নাম প্রেমালাপ। একটা একটা ক'রে শিউলি ঝরছিল। আর মাঝে মাঝে পেঁচার ডাক শোনা যাচ্ছিল দূরের কোন তাল গাছের মাথা থেকে। ওকে আমি আস্তে আস্তে টেনে আনলাম আমার তৃষিত বুকের মাঝে। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম খেয়াল নেই। এক সময় সীমা ব'ললো, আর নয়। চলো। ওর কথায় সময় সম্বন্ধে সচেতন হ'লাম আমি। দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে হাঁটতে শুরু করলাম। ওকে বাড়ীর দেউড়িতে পৌঁছে দিয়ে, আমি বাড়ী ফিরে এলাম। দাওয়ায় শুয়ে পড়লাম ক্লান্ত হ'য়ে। ভরা মন নিয়ে আকাশের তারা গুনতে গুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম একসময়ে।

পরদিন সকালেই ট্রেন ধ'রলাম। সীমাদের বাড়ীর সামনে দিয়েই ষ্টেশনে যাওয়ার রাস্তা। ওদের বাড়ীর সামনে দিয়ে আসবার সময় দেখলাম ঘরের জানলার ধারে বসে আছে সীমা। তাকিয়ে আছে রাস্তার পানে। আমাকে দেখেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল ও। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আমি ওর সেই অশ্রুভেজা চোখ দু'টোকে আজও ভুলতে পারিনি। কত চেষ্টা ক'রেছি, কিন্তু মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি সীমাকে। হয়তো কোনদিনই পারব না। তাই তখন ভাবছিলাম ওকি আমার জন্য আজও অপেক্ষা করছে!

রবির শেষ কথাগুলো কান্নার মতো শোনালো। এক ঝলক বিদ্যুতের আলো ওর মুখে এসে পড়লো। দেখলাম, ও গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

জীবনায়ন

(গল্প)

তিলোত্তমা দেবী

অন্ধকারে ও হাঁটছে। রেল-লাইনের বুকের ওপর দিয়ে কাঠের স্লিপারে পা রেখে রেখে নির্ভয়ে হাঁটছে প্রণব। পৌষের এ শীতের রাতে অসংকোচ পদক্ষেপে চলতে চলতে রেল দপ্তরের বহু প্রচারিত সেই বিজ্ঞাপনটার কথা ওর এখন মনে পড়ে গেল। দৈনিক পত্রিকার প্রায় অর্ধ-পৃষ্ঠা জুড়ে যে বিজ্ঞাপনটা মাঝে মাঝে ছাপা হয়ে থাকে।

....ছোট্ট একটা শহর। দুটো রেল-লাইন সে শহরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দুরান্তে কোন এক অদৃশ্য বিন্দুতে মিলে গেছে। দু'জন মাঝ বয়েসী ছেলে সে লাইন ধরে গল্প করতে করতে আপন মনে চলেছে। একটা গাড়ী ওদের অন্যমনস্কতাকে সজাগ করতে করতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকেই। ছবিটার তলায় বড় বড় হরফে লেখা, 'মাত্র ক'টা মুহূর্ত বাঁচানোর জন্যে জীবন হারানোর ঝুঁকি নেবেন না।' আজ এ হিম-ঝরা রাতে ঐ বিজ্ঞাপনের সতর্কতার কথা ভেবে মনে মনে হাসি পেল প্রণবের। ঐ বিজ্ঞাপনটা আজ প্রণবের কাছে নিতান্তই অর্থহীন। শহরের কল-কোলাহল ছেড়ে ও যে এখন নির্জন এ লাইন ধরে হাঁটছে একা একা তাতে ওর সময় বাঁচানোর তাগিদ নেই কোন। এটা ওর গন্তব্যের সংক্ষিপ্ত কোন পথও নয়। জীবন বাঁচানোর সব দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই ও আজ ছুটে এসেছে এখানে।

হিমেল উত্তুরে বাতাসটা হিমাঙ্কের শৈত্যতা নিয়ে ছুটে চলেছে। ফাঁকা রেল-লাইনের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে থেকে থেকে একটা আওয়াজ তুলছে অস্ফুট। প্রণবের মনে হ'ল শীতের তীব্রতায় গলাটা এবার জমে কাঠ হয়ে আসছে। হয়তো আর কিছুক্ষণ পর অনেক চেষ্টা করলেও ও কথা বলতে পারবে না। মনের সব অব্যক্ত কথা কণ্ঠ-নালীর ছাড়পত্র না পেয়ে মনের মাঝেই মাথা কুটে গুমরে মরবে। প্রণব একটু দাঁড়ালো। পেছন ফিরে দেখতে চেষ্টা করলো রেল-ষ্টেশনটাকে। একটু আগে যেখান থেকে ও যাত্রা শুরু করেছিল। গাঢ় অন্ধকারের মৌন যবনিকার অন্তরালে ষ্টেশন বাড়ীটার অস্তিত্ব মিশেমিশে একাকার। শুধু প্ল্যাটফর্মে জ্বলে থাকা ক'টা বিজলী বাতি মিটিমিটি আলো ছড়াচ্ছে। যেন ওরা ষ্টেশনের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। আর ক'টা রক্তচক্ষু সারারাত জেগে জেগে ওদের কর্তব্য করে যাবে নিঃশব্দে। ট্রেনটা আসতে এখনও অনেক দেরি। ষ্টেশন ছেড়ে আসার আগে প্ল্যাটফর্মের ঘড়িটায় ও দেখে এসেছিল ঠিক ন'টা। এটুকু পথ আসতে কত সময়ই-বা লাগতে পারে। বড় জোর দশ মিনিট। ন'টা দশ। অথচ ট্রেনটা আসবে ন'টা চল্লিশে। এমনকি দেরি হতে পারে আরও। রাতের এ শেষ ট্রেনটা মাঝে মাঝে প্রায়ই নাকি দেরি করে। অন্ততঃ এখনও চল্লিশ মিনিট! কদর্যতা আর অবিশ্বাসে ভরা এ দুনিয়ার বুকে বসে এখনও তিরিশটা মিনিট পঙ্কিলতার দুষিত বাতাস শুঁকতে হবে।

প্রতীক্ষার দৈর্ঘ্যতার কথা ভেবে প্রণব মনে মনে অধৈর্য হল। কারণ অবুঝ মনটা এখনও মাঝে মাঝে সীতার কথা ভাবতে চাইছে। অথচ আজ সীতাকেই ভুলতে চায় প্রণব। সীতার বাস্তব সব স্মৃতিকে মুছে ফেলতেই প্রণব নিজেকে মুছে ফেলতে চাইছে দুনিয়ার বুক থেকে। অথচ বিয়ের পর গত চারটে বছর সীতাই ছিল প্রণবের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার একমাত্র অংশীদার। জীবনের সব জটিলতার কথা, আশা আকাঙ্ক্ষা আর দ্বিধা দ্বন্দ্বের কথা এতটুকুও গোপন করেনি প্রণব সীতার কাছে। অথচ সে সীতা আজ কোথায়!

সীতাকে প্রণব অবিশ্বাস করেনি কোনদিন। এ দুনিয়ার সব কিছুকেই প্রণব এতদিন বিশ্বাসের চোখে দেখতো। তাই পাশের বাড়ীর সুনীতের সঙ্গে সীতার স্বাচ্ছন্দ্য মেলামেশাকে ও কোনদিন দৃষ্টির অস্বচ্ছতা দিয়ে বিচার করতে বসেনি। অথচ সে বিশ্বাসের মর্যাদা ওরা রাখলো কই! ভালবাসার কিইবা মূল্য পেল প্রণব সীতার কাছ থেকে!.......হঠাৎ খেয়াল হলো প্রণবের অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে সে এক জায়গায়। ষ্টেশনের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ও এতক্ষণ সীতার কথাই ভাবছে।....আবার সীতা!

সীতার কথা মনে হতে চকিতে ও ক্ষিপ্ত হল। আবার ও এগিয়ে চললো। চলার প্রতি পদক্ষেপে হত্যা করতে চাইলো সীতার সব ভাবনাগুলো। লাইনের দু'পাশে ঝোপে ঝোপে জ্বলছে লক্ষ লক্ষ জোনাকি। সে আলোর রোশনাইতে নহবত ধরেছে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ঝিঁঝি পোকার দল, অন্ধকারে নির্দিষ্ট পথের নিশানা ধরে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল ক'টা নিশাচর। ওদের পাখার আওয়াজ অন্ধকারের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভেসে আসছে।

আসলে এ পৃথিবীতে কেউ কাউকে ভালবাসে না এক-মাত্র নিজেকে ছাড়া। অথবা নিজের প্রয়োজনের তাগিদে প্রবৃত্তির তাড়নায় অপরের কাছ থেকে শুধু সুবিধাটুকু আদায় করার চেষ্টায় একে অপরকে অপরিসীম ভালবাসার ভান করে। সীতা এতদিন অন্ধ করে রেখেছিল প্রণবকে ভাল-বাসার নিখুঁত অভিনয়ে। আজ সে অভিনয়ের পালা সাঙ্গ হল। সুনীত দিল্লীতে সরকারী দপ্তরে পদস্থ চাকরি পাওয়ায় সীতা ওর অভিনয়ের একটা অঙ্কের যবনিকা নিজের হাতে টেনে দিয়ে গেল। কে জানে হয়তো দিল্লীর মাটিতে আবার নতুন করে আরম্ভ হবে জীবন-নাটকের আর এক অঙ্ক।

আজ অফিস থেকে ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল প্রণবের। গলির মোড়ের গ্যাসের বাতিটা বাতিওয়ালা জ্বেলে দিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সামনের বাড়ীর দেউড়ির হিন্দুস্থানীটা সুর করে তুলসীদাস পড়ছে মাথা নেড়ে নেড়ে। ক'জন স্বজাতীয় ওকে ঘিরে বসে আছে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে। থেকে থেকে ওর দীর্ঘশ্বাস পড়ছিল। অথচ আশ্চর্য, প্রণব দেখলো ওদের ফ্ল্যাটটা তখনও অন্ধকার। ও ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে বাতিটা জ্বালালো। তারপর শব্দ করে জুতো জোড়া খুলে ফেললো। তবুও সাড়া পাওয়া গেল না সীতার। ক্লান্ত দেহে ক্রমে মনের উত্তাপটা সংক্রামিত হতে লাগলো। হঠাৎ নজরে পড়লো টেবিলের ওপর পড়ে আছে এক টুকরো সাদা কাগজ। কাচের রঙিন পেপার ওয়েটের তলায়। প্রণব কাগজটা তুলে আলোর সামনে মেলে ধরলো। তাতে লেখা,—'আমি সুনীতের সঙ্গে চললাম। মিথ্যে আমার খোঁজ করো না। আমায় পাবে না।' মুহূর্তে একটা শিহরন খেলে গেলো প্রণবের সমস্ত দেহে। সীতা, এটা কি সীতার হাতের লেখা! তা হ'লে....? হঠাৎ প্রণবের মনে হল, ঘরের বিজলী বাতিটা যেন ওর ঔজ্জ্বল্য হারাতে শুরু করেছে। প্রণব যেন আর এখন দেখতে পাচ্ছে না কিছু। এই ঘর, ঐ আলনা, ঐ আলমারি সব ঝাপসা অন্ধকার! চেয়ারটা ধরে কোনরকমে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলো প্রণব।

এ দুনিয়ার প্রতিটি সংসারই দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। শৈশবে শত সহস্র ভয় ভাবনাকে এড়িয়ে চলতে আমরা মাতা-পিতার কোলে মুখ লুকোই পরম বিশ্বাসে। যৌবনে সংসারের সব দায়-দায়িত্ব আর মনের সব গোপনীয়তা স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। বার্ধক্যে পুত্র-কন্যার কাছে নিজেকে একান্তে সঁপে দিয়ে শান্তি খুঁজি। এ বিশ্বাসের মাঝে কোথাও যদি প্রবঞ্চনা ঢোকে এতটুকু, তাহলে সংসারে শান্তি থাকে না।

হঠাৎ এক টুকরো হাসির শব্দ কানে আসতে প্রণব উঠে দাঁড়ালো। দেখলো লাইনের পশ্চিম দিকে অনেকগুলো বাতি জ্বলছে ইতস্ততঃ। আর ভাঙা অনুচ্চ দেওয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে এক পাল মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রণব ওদের চিনলো। দিনের সব হাট-বাজারের বিকিকিনি শেষ হয় যখন, তখন এ বাজারের দরাদরির প্রথম কিস্তি শুরু হয়। প্রণব ওদের ঘৃণা করতো মনে মনে। হয়তো বা ভয়ও পেত। ওরা সংসারের অনেক সর্বনাশের মূল। পৃথিবীর অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির প্রচারক। অথচ প্রণব আজ এতটুকুও শঙ্কিত হ'ল না। বরং কি এক কৌতূহল ওকে গ্রাস করলো তৎক্ষণাৎ।

প্রণব রেল-লাইন ছেড়ে নেমে এলো নিচে। অভিজ্ঞ ক্রেতার মত একটি মেয়ের হাতে ধরা আলোটার একান্তে এসে দাঁড়ালো। তারপর নিজের হাতেই আলোটা মেয়েটার মুখের কাছে এগিয়ে নিয়ে কি যেন দেখলো একপলক। কি ভেবে হাতটা বোধহয় একবার কেঁপে উঠেছিল। হাতের আলোটা মাটিতে পড়ে যেতে প্রণব কোনরকমে ধরে ফেললো। হারিকেনের কাচটা ভীষণ উত্তপ্ত। তবুও সে উত্তাপে হাত দুটো ওর পুড়লো না এতটুকুও। বরং মনে হল কোন এক শীতের রাতে ওর বরফ ঠাণ্ডা হাত দুটো উষ্ণ করে নিতে ও যেন সীতার কবোষ্ণ বুকের গভীরতায় হাত রেখেছে। মেয়েটি এবার প্রণবের মুখের পানে তাকালো। প্রণব মুখে কোন কথা

বললো না। শুধু চোখের ইঙ্গিতে এগিয়ে যেতে বললো। সরু দেড় হাত চওড়া একটা গলি ধরে ওরা এগিয়ে চললো। ডান দিকে ছোট ছোট অনেকগুলো ঘর। কোন কোন ঘর থেকে এক টুকরো অতি ম্লান আলো এসে লুটিয়েছিল সেই সরু পথের ওপর। কোন কোন ঘর একান্ত অন্ধকার। মেয়েটি অমনি একটা ঘরে ঢুকলো। এক দরজাওয়ালা ছোট্ট একটা ঘর। ঘরের মাঝখানে একটা চৌকি পাতা। দু' বালিশওয়ালা নির্ভাজ বিছানাটা দেখে মনে হয় ওটা এখনও অকলঙ্কিত। বিছানাটার মাথার দিকে একটা জানলা। আর দেওয়াল জুড়ে ক'জন মহাপুরুষের কাচের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি।

প্রণব নিজেকে হঠাৎ এ পরিবেশে চিন্তা করে শঙ্কিত হল। এ আজ করছে কি প্রণব! জীবনের সততা আর সকল সংযম আজ বিকোতে বসেছে ও কিসের মূল্যে? যাদের ও মনে করতো সমাজের কলঙ্ক বলে, যাদের ও সামান্যতম দয়া দেখাতেও ঘৃণা বোধ করতো—ও আজ তাদেরই ঘরে! প্রণব ভয় ভয় চোখে একবার মেয়েটির দিকে তাকালো। ও তখন দু'হাত মাথার ওপর তুলে কুন্তল পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিল। আর অপাঙ্গে প্রণবের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছিল মৃদু মৃদু। চুল বাঁধার এ বিশেষ ভঙ্গিটা দেখে প্রণবের আবার সীতাকে মনে পড়ে গেল। প্রণব দেখেছিল সীতাকে ঠিক এমনি ভাবে কতদিন চুল বাঁধতে। নিজের অজ্ঞাতে আবার সীতার কথা মনে আসায় ও উত্তেজিত হল। হঠাৎ কি করবে ভেবে না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে ও টেনে নিয়ে এলো নিজের কাছে। সীতা দেখুক, সীতা জানুক। যে সীতার অশরীরী উপস্থিতি প্রণবের চেতনাকে আচ্ছন্ন করতে চাইছে, সে দেখুক প্রণবও নষ্ট হতে পারে। জীবনে অন্ততঃ একবার ও সীতার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে পেরেছে।

—বাতিটা কি নিভিয়ে দেব?—মেয়েটি জামার বোতাম কটা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলো।

—থাক্ না। কি দরকার নেবাবার?

সে কথা শুনে মেয়েটি একটু হাসলো।

প্রণব বুঝলো কথাটা বলা বোধহয় ঠিক হয়নি। তাই ও চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। কোণে পায়া ভাঙা টেবিলের ওপর রাখা বাতিটা ও নিজের হাতে নিভিয়ে দিল। অন্ধকার। জমাট অন্ধকার। সৃষ্টির সেই আদিম অন্ধকার এসে গ্রাস করলো দু'জনকে। প্রণব মেয়েটিকে আলতো করে স্পর্শ করতে চাইলো। মেয়েটি ওর আরও একান্তে সরে এলো। প্রণব ওর বুকের কোমলতায় কান পাতলো। আর ওর বুকের স্পন্দনের দ্রুততা শুনতে শুনতে নিজেকে একান্ত অসহায় বোধ করতে লাগলো। পাশের কোন একটা ঘরে একটা বেসুরো হারমোনিয়ম বাজছিল। সে সুরে গলা মেলাতে একটা মেয়ের অক্লান্ত ব্যর্থ প্রচেষ্টা চলছিল। প্রণব গান-বাজনা ভাল বোঝে না। তবুও ওর মনে হল হয়তো চেষ্টা করলে ও ঐ মেয়েটির চেয়ে ভাল গান গাইতে পারবে। দূর থেকে একটা আওয়াজ আসছিল নূপুরের। হয়তো অতিথির মন রাখতে কোন মেয়ে নেচে চলেছে। উঃ ঘরটা কি গরম! প্রণবের মনে হল। অথবা প্রণবেরই শুধু গরম লাগছে এখন। বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমেছে কপালে। পাঞ্জাবিটা গায়ে লেপটে আছে ভেজা কাপড়ের মত। প্রণব এখন খুব পিপাসার্ত বোধ করলো। মনে হল ওর গলা যেন শুকিয়ে আসছে। এখনই একটু জল না পেলে ও হয়তো মারা যাবে তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে। আশ্চর্য! এখনও মৃত্যু ভয়? যে মৃত্যুকে ও খুঁজতে বেরিয়েছে, আজ তার মুখোমুখি দাঁড়াতে তবে ভয় পাচ্ছে কেন! দূরের লোকো সেডে একটা ইঞ্জিন হঠাৎ ক'বার চিৎকার করে উঠলো। সে আওয়াজে প্রনব সচেতন হল। মনে পড়লো আজ রাতের শেষ ট্রেনটা আসবে ঠিক ন'টা চল্লিশে।

ন'টা চল্লিশ! কটা বাজছে এখন? সময় কি পার হয়ে গেছে? গাড়ীটা কি তবে চলে গেছে? প্রণব মেয়েটির বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে উঠে দাঁড়ালো। এখন কটা বাজে একবার জানা দরকার।

—তোমার ঘরে কি ঘড়ি আছে?—প্রণব মেয়েটিকে প্রশ্ন করলো। যদিও ও জানে ঘড়ি রাখার মত ক্ষমতা এদের থাকা সম্ভব নয়।

—হ্যাঁ আছে বাবু।

—আছে! প্রণব একটু আশ্চর্য হ'ল।—দেখো তো ক'টা বাজে।

মেয়েটি উঠে আলোটা জ্বাললো। আলো জ্বলতেই

প্রণব ঘরের চারিদিকে তাকালো। এবার ও ঘড়িটাকে দেখতে পেল। চৌকোনো দেওয়াল গহ্বরে রাখা আছে একটা টেবিল ঘড়ি। প্রণব ঘরে ঢোকার সময় ঘড়িটাকে দেখতে পায়নি। ঘড়ির কাঁটা দুটো লক্ষ্য করতে পেরে প্রণব ব্যস্ত হল। ন'টা পঁয়ত্রিশ। আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে। এখানে আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা সংগত হবে না। প্রণব ভাবলো মনে মনে।

—আমি এবার যাব। প্রণব মেয়েটিকে বললো।

—সে কি বাবু! এইতো সবে এলেন। এরই মধ্যে? আপকো মর্জি!

—হ্যাঁ এখুনি আমি যাব। যাওয়া আমার দরকার।

প্রণব পকেট থেকে মনিব্যাগটা বার করলো। ব্যাগটা হাতে নিয়ে কি যেন ভাবলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর ব্যাগটা মেয়েটির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

বাইরেটা কি বিশ্রী অন্ধকার। প্রণব প্রথমে স্পষ্ট কিছুই দেখতে পেল না। একটু পরে আঁধারটা চোখে সয়ে যেতে প্রণব পায়ের তলার রাস্তাটাকে লক্ষ্য করতে পারলো। ওদের ঘরগুলোকে পেছনে ফেলে ও ততক্ষণে লাইনের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রণব দেখলো ক'টা মেয়ে এখনও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের ভাগ্যে এখনও কোন ক্রেতার দাক্ষিণ্য জোটে নি। প্রণব অন্ধকারেও ওদের মুখাবয়বের হতাশ ভাব আন্দাজ করতে পারলো।

মেয়ে কটাকে পেছনে ফেলে প্রণব আরও একটু উত্তরে এগিয়ে গেল। তারপর মাথার ওপরের শুদ্ধ আকাশের গায়ে চোখ রাখলো। শীতের দাপটে তারা-গুলো কাঁপছিল যেন। তবু ওরা কি সুন্দর! মনে হ'ল আকাশের অগণিত তারারা যেন প্রণবের দিকে তাকিয়ে আছে অপলকে। যেন ওরা ডাকছে প্রণবকে। ছোট-বেলায় মা বলতেন, মারা গেলে সবাই নাকি আকাশের গায়ে এক একটি তারা হয়ে ফোটে। ছোট বয়সে সে কথাটাকে প্রণব সত্যি বলে মেনে নিয়েছিল। তারপর স্কুলে ঢুকে প্রণব জেনেছিল কথাটা মায়ের নেহাতই মনগড়া। কিন্তু আজ এই প্রশান্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ... সেই কথা কটাকে সত্যি বলে মনে হ'ল। অন্ততঃ সে কথাটাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করতে লাগলো। মনে হতে লাগলো প্রতিটি তারা যেন এক একটি মৃত মানুষের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে। প্রতিটি মানুষের মৃত্যুতে জন্ম হয়েছে এক একটি তারার।

তাই যদি সত্যি হয়, তবে নিশ্চয়ই কোন তারার মধ্যে লুকিয়ে আছে তার মায়ের আত্মা। বাবাও হয়ত আছে এইরকম ভাবে। প্রণব এত নক্ষত্রের ভিড়ে আলাদার করে কাউকে যেন চিনতে পারছে না। এখন না পারুক, আর মাত্র ক' মিনিট পরে ও নিশ্চয়ই সবাইকে খুঁজে খুঁজে বার করতে পারবে। মা, বাবা, বড়দি, সবাইকে। ট্রেনটা ঐ ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালো। আঁধারের বুক চিরে ইঞ্জিনের হেড লাইটের আলোটা লাইনের বুকে আছড়ে পড়েছে। ইঞ্জিনের নিঃশ্বাস ছাড়ার শব্দ প্রণব এখান থেকে স্পষ্ট শুনতে পেল।

লাইনের পাশের সরু পথটা ধরে কে যেন আসছে এদিকে। টর্চের আলো ফেলে ফেলে দ্রুত পায়ে। প্রণব পথ থেকে একটু সরে দাঁড়ালো। লোকটাকে পথ করে দিতে চাইলো। কাছাকাছি এসে লোকটা দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ। তারপর অতি অসভ্যের মত আলোটা প্রণবের মুখের পরে ধরলো। আলোর জোয়ারে চমকে গিয়ে প্রণব তাড়াতাড়ি দু'চোখ বুঁজলো। লোকটা কি জানোয়ার! প্রণব মনে মনে রেগে উঠেছে ততক্ষণে।

—আপনাকে খুঁজতেই ছুটে আসছি বাবু। একটা নারীকণ্ঠ প্রণবকে লক্ষ্য করে কথা ক'টা বললো।

—আমাকে? আমাকে কি দরকার! ট্রেনটা বোধহয় আগের ষ্টেশন ছেড়েছে। 'ডিস্‌টাণ্ট সিগন্যালের' লাল আলোটা রঙ পালটে নীল হয়ে গেছে। ট্রেনটা আসছে। অন্ধকারকে দু'ভাগ করে হেড লাইটটা পথ দেখাচ্ছে।

—আমি রুকমী, বাবু।

—রুকমী! সে কে? আমি তো সারা জীবন সীতা ছাড়া অন্য কাউকে চিনতাম না। সমস্ত জীবন শুধু সীতাকেই ভালবাসতে চেয়েছিলাম।

—বারে! একটু আগে যে আপনি আমার ঘরে গিয়েছিলেন। মনে পড়ে না?

—ও হ্যাঁ। তুমি সে! কিন্তু তুমি এখানে কেন?

—আপনি আমায় ক' টাকা দিয়েছেন বাবু?

—ক' টাকা!—মনে মনে হিসেব করলো প্রণব। আজ মাইনে পেয়েছে তিনশো টাকা। তা' থেকে বড় জোর খরচ করেছিল মাত্র গোটা দশেক টাকা। তা হ'লে....?—কেন, তোমার কি টাকা কম হয়েছে? হয়ে থাকলেও আমার কাছে আর টাকা নেই। আর তো আমি দিতে পারবো না।

—না, না। কম কেন হবে বাবু। এতো আমার সমস্ত মাসের রোজগার। অত টাকা আমায় দিলেন কেন বাবু?

—তা' হোক, তুমি নাও। আমি খুশী হয়ে দিলাম। ট্রেনটা আসছে। প্ল্যাটফর্মকে পেছনে ফেলে ট্রেনটা এগিয়ে আসছে। একটু চেষ্টা করতেই প্রণব ইঞ্জিনটার আবছা অবয়বকে নজর করতে পারলো।

—না বাবু, এত টাকা আমি নিতে পারবো না। আজ সারা রাত থাকলে আমার পাওনা হত দশ টাকা। সে টাকাটাই আমি নিচ্ছি। বাকী টাকা আপনি ফিরিয়ে নিন।

ট্রেনটা এসে গেছে। বগির জানলা দিয়ে বিচ্ছুরিত আলোতে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ে কটা স্নান করছে। প্রণব ব্যস্ত হল। রুকমীর দিকে শেষ বার ফিরে তাকালো। —রুকমী তুমি টাকা কটা নাও। আমি তোমাকে ভালবেসে ওগুলো দিলাম। আর এখুনি চলে যাও এখান থেকে।

—তা হয় না বাবু। মেয়েটি এগিয়ে এসে প্রণবের হাত ধরলো। আজ আপনার মন নিশ্চয়ই ঠিক নেই বাবু। তাই এ কথা বলছেন। কাল ভোরে মন ঠিক হলে টাকার জন্যে আমায় হয়তো অভিশাপ দেবেন। বলবেন মেয়েদের ভালবাসলে কেবল ঠকতে হয়। ধরুন আপনার ব্যাগটা। —রুকমী প্রণবের দেওয়া ব্যাগটা তুলে দিল প্রণবের ডান হাতে। এবার আমি যাই বাবু। আর মেরে কস্থর মাপ কিজিয়ে। আমার নাম রুকমী। নাম করলে সবাই আমার ঘর দেখিয়ে দেবে। মর্জি হলে আবার আসবেন। নমস্তে।

ট্রেনটা চলে গেল। প্রণবকে পেছনে ফেলে আর রাতের নিস্তব্ধতাকে ধমক দিতে দিতে ট্রেণটা ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। ট্রেনের পেছনের লাল আলোটা অন্ধকারের বুকে তখনও জ্বলছে দপ্‌দপ্‌ করে। প্রণব হেরে গেছে। ঐ আলোটার চোখ রাঙানির কাছে হেরে গেছে প্রণব। ও আবার আকাশের দিকে চোখ তুললো।

নিশীথের মৌনতায় নিশ্চুপ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আকাশের তারাগুলো জেগে আছে। একটা তারাকে প্রণবের হঠাৎ বড় পরিচিত বলে মনে হল। মায়ের মুখের আদলের সঙ্গে ওটার বড় মিল। সে তারাটা যেন হাসছে মিটিমিটি প্রণবের দিকে তাকিয়ে। প্রণব হাতে ধরা ব্যাগটা আকাশের দিকে তুলে ধরলো। যেন সে ব্যাগটা মাকে দেখাতে চাইলো। তারপর প্রণব ফিরে চললো। লাইনের পাশের সেই সরু পায়ে হাঁটা পথ ধরে প্রণব এগিয়ে চললো। এখনও প্রণবকে ক'দিন বেঁচে থাকতে হবে। ক'দিন কে জানে! অন্ততঃ হাতের টাকা ক'টা খরচ করা পর্যন্ত তো বটেই। একটা নিঃশ্বাস বাইরের বাতাসে এসে মুক্তি পেল।

নিঃশ্বাস

শ্রীকিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

আকাশের অরুণিমা ডাকে না আমাকে
ঝড় জল বন্যা সব আদর জানায়—
অমৃতের কলসী আজ ভরে গেছে পাঁকে
জীবন সমুদ্র আজ পূর্ণ যে পানায়।
বাগানেতে ফোটে ফুল, উড়ে যায় চিল
সম্মুখের বাড়ী দুটো আকাশেতে বেঁধে :

জীবন আরম্ভ কবে শেষ বা কোথায়
পঞ্জিকাকে ঘেঁটে ঘেঁটে মেলে না সন্ধান,
নিয়তির আহ্বান শোনা নাহি যায়
কোথা হ'তে অতর্কিতে ছুঁড়ে দেয় বাণ।
মনোবীণা বেজে চলে সংগত-বিহীন
যে সুর উথলি ওঠে কান পেতে শুনি,
পদে পদে বাঁধা পেয়ে হয়ে আসে ক্ষীণ

৪৬শ বর্ষ | মাঘ, ১৩৭৩ | ৮ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

ভারতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন

ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। কিন্তু এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হ'ল যে ভোটদাতাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার একান্ত অভাব। পর পর তিনটি নির্বাচন হয়ে গেছে—চতুর্থ নির্বাচনও হতে চলেছে। ভোটের খুঁটিনাটি বিষয় মোটামুটি কারও কাছেই অজ্ঞাত নেই। ভোটের ফলাফল কি হওয়া উচিত, কি হতে পারে আর কি হবে, দৈবজ্ঞ না হলেও মনে মনে অনেকেই সেটা আন্দাজ করতে পারছেন। সেই অনুমান ভিত্তিক কল্পনায় সকলের মনেই একটা গভীর হতাশার ছাপ পড়েছে। তাই এবারের নির্বাচন আর নতুন কোন আশা বা উৎসাহের বাণী নিয়ে

বিগত তৃতীয় নির্বাচনের পর আমাদের দেশে বহু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়ে গেছে। রাজনীতির আব-হাওয়াও ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করেছে। দুজন প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী ও শাস্ত্রীজী পরলোকে গেছেন। চীনের ভারত আক্রমণ ও কাশ্মীরে পাকিস্থানের হানা ইত্যাদি নানা উৎপাতের ঝড় ভারতের মাটির উপর দিয়ে বয়ে গেছে। শাসক গোষ্ঠীর দল হিসাবে কংগ্রেসের মধ্যে বহু ভাঙ্গন ও কোন্দলের ফলে দলীয় ঐক্য অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে। সরকার-বিরোধী কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে দলীয় ও উপদলীয় কোন্দলের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অপাজশনের গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। ডান ও বাম এই দু'দলে পার্টি

নীতি পছন্দ করে এবং বামপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি চীনাদের সমর্থন করে। আবার বামপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে সম্প্রতি মাও-পন্থী ও লিউ শাও চি-পন্থীর মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছে।

বিরোধী দল সমূহের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আভ্যন্তর কোলাহল কংগ্রেসের নির্বাচনে জয়লাভের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হয়েছে। সরকার-বিরোধী দল হিসাবে বামপন্থীদের জোট বাঁধার পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করতে পারেনি। স্বভাবতঃই সরকার-বিরোধী একাধিক নির্বাচন প্রার্থী দাঁড়ানোর জন্য ভোটগুলি ভাগ হয়ে যাবার সমূহ আশঙ্কা।

জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের অন্ত নেই। তার ওপর আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অভাব-অভিযোগ বহুগুণ বেড়ে গেছে। বলা বাহুল্য সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। নির্বাচনী-যুদ্ধে ঐ অসন্তোষকে মূলধন করতে চেষ্টা করলেও বিরোধী-পক্ষ তাতে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধীদের কার্যকলাপ জনসাধারণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এদিক দিয়েও তাদের ব্যর্থতা বরণ করতে হয়েছে।

গুণ্ডামি ও বলপ্রয়োগের নীতি এবারের নির্বাচনী যুদ্ধে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভুবনেশ্বরে এক জনসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজও গুণ্ডামির হাত থেকে রেহাই পান নি। তবে কোন কোন বিরোধী পক্ষীয় নেতাদেরও বিভিন্ন গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা শুনা গেছে। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, সময় ও সুযোগ অনুযায়ী সকল দলই এই গায়ের জোরের নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

এবারকার সাধারণ নির্বাচনে প্রাক্তন করদ রাজ্যের নৃপতি ও জায়গীরদারদের ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া গেছে। রাজা-মহারাজাদের দিন ফুরালেও তাঁরা রাজনীতি থেকে একেবারে অবসর গ্রহণ করতে চাইছেন না। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কিছু কম দু' ডজন প্রাক্তন শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬২তে সেই সংখ্যা আরো কিছু বেড়ে গিয়েছিল। এবার সেই সংখ্যা অর্ধ শতে গিয়ে পৌঁছুবার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রাক্তন সৈনিকেরাও এবার বহু সংখ্যায় নির্বাচন-প্রার্থী হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৫জন জেনারেল এবং কিছু সংখ্যক ব্রিগেডিয়ার ও কর্ণেল শ্রেণীর অফিসারও আছেন। বিদেশে সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন অফিসারদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অনেক এবং বিশিষ্ট নজীর থাকলেও আমাদের দেশে এটা নতুন ঘটনা। অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ এইসব অফিসাররা যদি নির্বাচিত হয়ে আসেন, তাহলে আগামী সংসদে বুদ্ধির মাত্রা অনেকখানি বেড়ে যাবে, সন্দেহ নেই।

এবারের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে যে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, সেটা সুস্থ গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেই আশাপ্রদ নয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে নির্বাচনী হাঙ্গামাগুলি ঘটে চলেছে, এর শেষ কোথায়? বিহারে সংঘর্ষের ঘটনা সর্বাধিক। কলকাতা ও শহরতলির বেলঘরিয়া সহ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে বেশ কয়েকটি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব ও শুভবুদ্ধি জাগ্রত না হওয়ার ফলে বিভিন্ন দল ও তাদের সমর্থকেরা অনর্থক হানাহানি ও সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে।

এবারের নির্বাচনে বিরোধী দলের নিকট একটি সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। দলাদলি ও কলহের মধ্যে না গিয়ে বিকল্প সরকার-গঠনের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে যেতে পারলে জনসাধারণ নিশ্চয়ই তাকে স্বাগত জানাবেন।

মুহূর্তের জন্যে

সংস্মিতা

শান্তি-চুক্তি কখনও একতরফা ভাবে কার্যকরী হতে পারে না। অপর পক্ষ যদি ক্রমাগত চুক্তি-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে, তা'হলে সে চুক্তি নিতান্তই অর্থহীন একখণ্ড সাদা কাগজে পরিণত হতে বাধ্য।

পাকিস্থানের সঙ্গে ভারতের ঠিক এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে এ যাবৎ বহু চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, কিন্তু চুক্তি ভঙ্গের ঘটনা ঘটেছে তার চেয়েও বেশী সংখ্যক। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, পাকিস্থান আন্তর্জাতিক চুক্তির মর্যাদা রক্ষায় একেবারেই অনিচ্ছুক। পিণ্ডি এক হাতে গুপ্ত ছুরিকা এবং অপর হাতে কলম নিয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে থাকেন। তাই কচ্ছ চুক্তির কয়েক মাসের মধ্যেই শুরু হয়েছিল কাশ্মীরের উপর নগ্ন আক্রমণ। তাসখন্দ চুক্তিপত্রে কালির দাগ শুকোবার আগেই আরম্ভ হয়েছিল শর্ত ভঙ্গের পালা। পাকিস্থান সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই পাক রাষ্ট্র নায়কেরা বিদ্বেষসঞ্জাত বিশ্বাসঘাতকতার যে রূপটি আত্মস্থ করেছেন, সে রূপ পালটান তাঁদের পক্ষে সহজসাধ্য নয়।

অবশ্য একথাও ঠিক যে, ভারতের দিক থেকে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর না পেয়ে পাকিস্থানের আস্ফালনের স্পর্ধা ক্রমশঃ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে চলেছিল। লাহোর রণক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে মোকাবিলায় পাকিস্থান কিছুটা শক্তির পরিচয় পেয়েছে। আয়ুব খাঁ বিগত সঙ্ঘর্ষে নিদারুণ পরাজয়ের গ্লানি এখনও ভুলতে পারেন নি। ভারতকে আর একবার শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত সমরোপকরণ যোগাড়ে তিনি সারা বিশ্ব চষে বেড়াচ্ছেন। এবং দেশে-বিদেশে ভারত-বিরোধী পাক প্রচারকার্য ক্রমেই শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক পাঞ্জাবের ফিরোজপুর এলাকায় যে পাক গোয়েন্দা বিমানটি পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছিল, সেটিও আয়ুব খাঁর ভারত-বিদ্বেষের আর একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ। ভারতীয় বিমান বহরের একটি বিমান এই পাক গোয়েন্দা বিমানটিকে ভূপাতিত করেছে। ভারতের এই দৃঢ় নীতি পাকিস্থানকে কিছুটা চিন্তান্বিত করে তুলেছে। কিন্তু পিণ্ডির জঙ্গী-শাসক এ-কথা জেনে রাখুন যে, তাসখন্দ চুক্তিতে ভারতের আস্থা থাকলেও, প্রয়োজন হলে শক্তির পরিচয় দিতে ভারতবর্ষ কখনওই পশ্চাৎপদ হবে না। আর তিনি যদি বিগত সংগ্রামের পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য ভবিষ্যৎ লড়াইয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে থাকেন, তবে তাঁর মানসিক স্থৈর্য ফিরিয়ে আনার উপযুক্ত ঔষধি অবশ্য ভারতের জানা আছে!

*　　*　　*

দেড় বছর পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শর্ত সাপেক্ষে ছানায় তৈরি সন্দেশ-রসগোল্লার নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এক নতুন নির্দেশে বলা হয়েছে যে শতকরা ৪৫ ভাগ মাত্র ছানা ব্যবহার করতে হবে সন্দেশ-রসগোল্লায়। বাকীটা কি ব্যবহার করতে হবে তা কিছু বলা হয়নি, তবে এ-বিষয়ে দোকানদারদের কিছুটা বিশেষ অর্থে। 'স্বাধীনতা' দেওয়া হয়েছে বলা যেতে পারে।

ছানা প্রস্তুত কারক, মিঠাই ব্যবসায়ী ও মিষ্টান্ন শিল্পীরা এখন থেকে প্রকাশ্যে মিষ্টান্ন প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ঢালাও অনুমতি পেয়ে যারপরনাই খুশি হলেন এবং এই উদার ব্যবস্থাপনা যাঁদের অনুগ্রহে সম্ভব হ'ল তাঁদের প্রতি যথা-সময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কোন ত্রুটি তাঁরা করবেন না— এটা নিশ্চয়ই আশা করা যায়।

১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাসে যখন ছানার উপর নিষেধের ধামা চাপা দেওয়া হয়, তখন তার কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল যে, বাংলার মত দুগ্ধাভাব-পীড়িত মুলুকে রসগোল্লা-সন্দেশ খাওয়ার বিলাসিতা চলবে না। রোগী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রসূতিদের জন্যে দুধের যোগান দেওয়া আগে দরকার। এবং খাঁটি মাখন ও ঘিয়ের পর্যাপ্ত সরবরাহ করাও এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

এ-প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই সকলের মনে একটি প্রশ্ন জাগছে —ইতিমধ্যেই কলকাতা ও সংশ্লিষ্ট শহরগুলিতে দুধের প্রয়োজন কি বিলকুল মিটে গেছে, তাই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হ'ল!—এ প্রশ্নের জবাব জানা নেই সাধারণ

(শেষাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাতপাঁচ

শ্রীনাথ

ভিয়েতনামে অবস্থিত মার্কিনী সৈন্যদের সৈনাধ্যক্ষ জেনারেল উইলিয়ম ওয়েষ্ট মোর ল্যাণ্ড ২৮।১২।৬৬ তাং এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এই যুদ্ধ কয়েক বছর ধরে চলবে।

—ওয়েষ্ট মোর ল্যাণ্ড,—উলুখড়রা কি করবে তার কোন উল্লেখ করেন নি।

ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখপাত্র বলেছেন, তাসখন্দের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও পাকিস্তানের দিক থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

—চীনা গুরুর মুখ তাকিয়ে নয় ত ?

চক্র রেল স্থাপনের প্রারম্ভিক কাজ অবিলম্বে শুরু করার সিদ্ধান্তকে রাজ্য সরকার "কাজ শুরুর সবুজ সংকেত" বলে মনে করছেন।

—আমরা কিন্তু গার্ডের হাতে সবুজ নিশান দেখবার আশায় রইলাম।

কতিপয় বাম কমিউনিষ্ট কাউন্সিলরের হই-হট্টগোলের ফলে ৬।১।৬৭ তাং কলকাতা কর্পোরেশনের সাপ্তাহিক অধিবেশন বিশ মিনিটেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

—চীনা হই-হল্লার নমুনা বোধহয়!

সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব ভুট্টো শীঘ্রই মৌলানা ভাসানীর চীনপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগদান করছেন।

—ভুট্টো সাহেবকে আমরা বলি, 'শুভস্য শীঘ্রম্'।

জানা গেল, চীনের পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ফলে জাপানের উপকূলে তেজস্ক্রিয় বৃষ্টিপাত হচ্ছে।

—চীনেও কি কম তেজস্ক্রিয় রক্তপাত হচ্ছে ?

বিশ্বখ্যাত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স অবশেষে সপ্তদশী উদীয়মানা ভারতীয় অভিনেত্রী অঞ্জুর সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা করেছেন।

—পাকা খেলোয়াড়ের হাতে বল পড়লে সেটা লক্ষ্যে গিয়ে ঠিকই পৌঁছায়।

চীনপন্থী কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, চীনের সঙ্গে সীমানা বিরোধের জন্য ভারত সরকারই দায়ী ও চীন মোটেই ভারত আক্রমণ করেনি।

—এ-রকম উদ্ভট উক্তি না করলে কি নেতাগিরি টিকিয়ে রাখা যায় ?

পাকিস্তান হকি দলের ম্যানেজার ভূতপূর্ব পাক ইন্সপেক্টার মেজর হামিদিও বলেছেন, 'পাক হকি দলে সম্পূর্ণ পুনর্গঠন চাই।'

—আমাদের ধারণা পাকিস্তানের সর্বস্তরেই পুনর্গঠন প্রয়োজন।

———

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মানুষের। পরিসংখ্যানের ভেলকি বাজি দেখে জনসাধারণ ক্রমেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে আর মূল্যবৃদ্ধির সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠে চলেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় যে, মুঘল যুগে খেয়ালী রাজার উৎকট আচরণে ও খামখেয়ালীপনায় তখনকার প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সেই অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না ঘটাই বোধহয় বাঞ্ছনীয়।

———

রঙ্গ জগৎ

ভোটের বাজারে এদের চাহিদা এখন অনেক বেড়ে গেছে!

অঞ্জলি-নায়ক

(গল্প)

সুদর্শন চক্রবর্ত্তী

—দয়া ক'রে আমায় একটু স্থান করে দেবেন।

হঠাৎ এইরকম একটা প্রস্তাবে প্রিয়তম চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সরে বসতেই ভদ্রমহিলাও বাঁ পাশে ব'সে পড়ে। কিন্তু দুজনে এভাবে পাশাপাশি অথচ কথা নেই, এমন আর কতক্ষণ চলে! এত কাছেও আর কেউ নেই। তাই অঞ্জলিই আবার বলে, কতদূর যাবেন আপনি?

অঞ্জলি চট্টরাজ আর প্রিয়তম নায়ক। এইভাবেই তাদের প্রথম আলাপ। ব্যাগ থেকে একখানা বই বার ক'রে অঞ্জলির হাতে দিয়ে বলে, সাহিত্য আপনার ভাল লাগে?

—অত্যন্ত সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে আমি তা'র কতটুকু বুঝি?

—ঠিকই ত—বলেই প্রিয়তম ভাবে, এই বিনয়েই নিউটন বলেছিলেন যে, জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে উপল খণ্ড কুড়োতেই তার জীবন কেটে গেছে, জ্ঞান লাভ কিছু হল না। যাই হ'ক নতুন পরিচয়ে বেশী কিছু না শুনিয়ে তাই প্রিয়তম শুধু বলল তার উত্তরে—আপনার মুখে দেখছি সুনিপুণ শিল্পীর হাসি। অভিনয় করেন আপনি নিশ্চয়ই।

—করি না বললে মিথ্যে হবে, কয়েকবার নেমেছি বটে।

—তা'হলে একটা গান অন্তত....

—মাপ করবেন গান আমি আদৌ জানি না, তবে গীটার শিখছি কিছুদিন হ'ল।

—অপূর্ব সুন্দর আপনার ব্যবহার যেখানে, ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই—বলেই প্রিয়তম তাকিয়ে দেখল অঞ্জলির মুখখানা সহসা আবীর রঙে একেবারে রাঙা হ'য়ে উঠেছে। তার নীল আকাশের দুটো তারা বিজলীর মত চমক দিতেই সলজ্জ চাহনি দিয়ে সে শরমে নামিয়ে নিল।

গাড়ি চলেছে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে। আবেগ-মুগ্ধ প্রিয়তম অনুভূতিতে পাক খেয়ে চলেছে। জানালা দিয়ে বাহিরে নজর পড়তেই দেখল আকাশটা যেন সিঁদুর পরতে উদ্‌গ্রীব। আমেজ আর বিস্ময়ের যুগপৎ শিহরন তার সর্বাঙ্গে।

বেয়ারা একপট চা এনে দুজনের মধ্যে ধরে দিয়ে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল। আনাড়ী হাতে প্রিয়তম নাড়াচাড়া করতে অঞ্জলি তাড়াতাড়ি তাকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এসে বলল, আমি ক'রে দিচ্ছি।

দুধ আর চিনি ঢেলে চামচ নাড়তে নাড়তে ডিম সমেত পেয়ালাটা তুলে দেয় অঞ্জলি প্রিয়তমের হাতে। চুমুক দিয়ে চলেছে প্রিয়তম একটার পর একটা। আর মনটা উড়ে চলেছে মুক্ত আকাশের বুকে উড়ে চলা বিহঙ্গের মত। এদিকে অঞ্জলিও ভাবনার সমুদ্রে ডুব দিয়ে ঢেউ কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে ক্রমাগত।

জীবনের ছত্রিশটা বছর প্রিয়তম কাটিয়ে এল নানান কাজের চাপে। পড়াশোনা, চাকরী, দেশের কাজ, ডাক্তার, সাহিত্য এই সবে মশগুল হ'য়ে যে দিকটা এতদিন তার কাছে অনাবিষ্কৃত ছিল, আজ যেন হঠাৎ প্রজ্বলিত টর্চের মত অঞ্জলিই তার অন্ধকার দিকটায় আলো ধ'রে বড় ক'রে তুলল। কল্পনার সাঁতারু প্রিয়তম আজ তাই বাস্তবের সাগরে পাড়ি জমিয়েছে।

প্রিয়তমের দর্পণে অঞ্জলি নিজের ছবিকে দেখতে দেখতে যতই নিবিষ্টচিত্ত হয়, ততই রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তার প্রতিটি শিহরন। সৌন্দর্যের আবেশে নিজেকে এত সুন্দর এই সে প্রথম অনুভব করল।

কাপটা নামিয়ে রেখে অঞ্জলি বলল, কেন জানিনা, তবে আমাকে কিন্তু সবাই ভালবাসে।

—ভাল না বাসাই অসম্ভব অঞ্জলি দেবী, শুধু মনে লাগার মানুষই ন'ন আপনি, এমন হৃদয়ের স্পর্শে পরকে এত সহজেই একান্ত আপন ক'রে নিতে আপনি সত্যিই অনন্যা।

কথাগুলি বলেই প্রিয়তম ভয়ে একেবারে জড়োসড়ো হ'য়ে গেল, যেন সহসা সাপের গর্তে হাত দিয়ে ফেলেছে।

আবার এই ভয়ই তার আরও বেশী বেড়ে গেল যখন ঠিক বিদায় নেবার মুহূর্তে প্রিয়তমকে অভিনন্দন জানিয়ে

(শেষাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তুমি এসো

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায়

তুমি এসো মেঘ হ'য়ে এ-মরু আকাশে
বারি সিঞ্চনেতে করো এ-ভূমি শীতল
তুমি এসো বায়ু হ'য়ে এ-রুদ্ধ ঘরে
এ-অন্ধকার তুমি করো আলো ঝলমল।

তুমি এসো আশা হ'য়ে ওগো প্রিয়তমা
তুমি এসো উজ্জ্বল নক্ষত্র হ'য়ে
চাঁদ হ'য়ে মধুময়, আচ্ছন্ন রাখো,
এ-হৃদয় ধন্য করো তুমি পরশিয়ে।

তুমি এসো রূপে রূপে অপরূপে তুমি
তুমি এসো স্বপ্ন হ'য়ে ঘুমের আকাশে
তুমি এসো কল্পনায়, পাশে এসো তুমি—
মধু-মায়াজাল রচো কুসুম-বাতাসে।

স্নেহ দাও বুক ভ'রে নদী হ'য়ে তুমি
তোমার পরশে করো এ-হৃদয় সোনা,
ভাষা আনো তুমি আজ এ-মূক হৃদয়ে
সঞ্জীবনী সুধা নিয়ে এসো প্রিয়তমা।

শুভ-লগ্ন

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ

বাজারে বাজনা বাজা
এল যে প্রাণের রাজা
ঘরের দুয়ারে,
ছুটেরে গন্ধ ছুটে
প্রেম-পারিজাত উঠল ফুটে
হৃদয়-সায়রে
সাজারে আজকে সাজা
মন-আঙ্গিনা, বাদ্যি বাজা
উচ্চ নিনাদে,
দেখ চেয়ে দেখরে পথে
এল কে আলোর রথে
ভুলিয়ে বিষাদে।
এসেছে প্রাণের রাজা
বাজারে বাজনা বাজা
হুলুধ্বনি দে,
আগমন আভাসে তার
খুলেছে অন্তর-দ্বার
বাজা' শাঁখ মনের আনন্দে।

(পূর্ববর্ত্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অঞ্জলি বলল, আপনার ব্যবহার আমি ভুলব না কিন্তু।

সর্বনাশ! এ আবার কি তবে? সত্যিই কি ব্যবহারটা তার এমনই নির্লজ্জ হয়েছে? আজ তাই যতই সে স্মৃতির রোমন্থন করে ততই বার বার তার একটা কথাই মূর্ত হ'য়ে ওঠে, এ বেয়াদপির জন্যে অন্তত একটা ক্ষমা প্রার্থনা করার সুযোগ সে আর কি কখনও পাবে না? সে যে বিদায়-মুহূর্তে বিহ্বল-নির্বাক হ'য়ে পড়েছিল। তাইত তার চোখে আজও বিস্ময় আর প্রশ্ন—এ কি হ'ল তবে!

প্রিয়তম এর জবাব আজও পায়নি অঞ্জলির কাছ থেকে। অঞ্জলি কি ভাবছে সেই জানে। আকাশ আর সাগর—পরস্পরে একে অপরের বুকে ছায়া ফেলে দুঁহু দোঁহার প্রতীক্ষায় শুধু চেয়ে থাকাই হ'য়ে থাকবে চিরন্তন?

বালীগঞ্জে, হঠাৎ এ-পাড়ায় বাসা বদলের কারণ নাকি, তিনি এখানে কাঠা পাঁচেক জমি কিনেছেন—শীগ্রি বাড়ী আরম্ভ হবে, তাই দেখাশোনার সুবিধার জন্যে এখানে এসেছেন।

যাই হোক, ঐ কাল কুচকুচে বেঁটে মানুষটি লক্ষ্মীলাভ করে যে নিজেকে একেবারে মনুষ্যত্বের অতল গহ্বরে টেনে এনেছেন, আমরা জানতাম না। শুনলাম, স্ত্রীর মুখে, চায়ের দোকানে এবং পড়শীদের মুখে। এবং আজ রাতে দেখলাম নিজের চোখে।

কেরানীগিরি করে আমার সংসার চলে না। তাই বাধ্য হয়ে সন্ধ্যায় প্রাইভেট ট্যুইশানি করি। রবিবারের সন্ধ্যাটা কাটে সিনেমা হাউসে। তা'ছাড়া পরের বাড়ীর জানালার দিকে তাকাবার মত ইচ্ছে এবং অবসর দুয়েরই যথেষ্ঠ অভাব।

হরিহরবাবু নাকি অবিবাহিত। যাই হোক প্রতিদিন সন্ধ্যায় কল্যাণী নামে একটি সুন্দরী যুবতী তাঁর কাছে আসে। স্ত্রী একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, তার এখানে বেড়াতে আসার কারণ কি ?

কল্যাণী বলেছে, 'হরিহরবাবু একজন 'লেডি-টাইপিষ্ট' চান। বড় গরীবের মেয়ে সে, তাই তাঁর কাছে চাকরি পাবার জন্যে তোষামোদ করতে আসে।'

হরিহরবাবুর 'টাইপ-মেসিন' ছিল কিনা এবং 'লেডি টাইপিষ্ট' সত্যকার প্রয়োজন কিনা এবং চাকরির জন্য এমন করে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কেউ আসে কিনা জানিনা তবে কল্যাণী প্রায় সন্ধ্যায় হরিহরবাবুর ঘরে আড্ডা মেরে যায়। তাদের প্রচণ্ড হাসি তামাসা শুনে অবশ্য কারও মনে হয় না, কল্যাণী গরীবের মেয়ে বা সে চাকরির জন্যে উমেদারি করতে আসে।

প্রতিদিন সকালে চায়ের দোকানে হরিহরবাবু এবং কল্যাণীর নামে নানা গুজব কানে আসে। তাদের শেষ পর্যন্ত যে বিবাহ অবধারিত, সে ভবিষ্যৎ বাণীও অনেকে করতো—টাকা থাকলে নাকি বয়েস হলেও পাত্রীর অভাব নেই।

অশোক একদিন আমার বাড়ীতে চা খেতে খেতে বলে, 'শুনেছিস শ্রীনাথ, ছি ছি, প্রমথেশবাবু এমন

ডেকে আনলেন ? পাড়ার ছেলেমেয়েগুলো দিনের দিন ফচকে হয়ে যাচ্ছে—আগে ছিল সিনেমা-থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথা, এখন হয়েছে কল্যাণী-হরিহর জপমালা। নাঃ, হরিহরবাবুকে আমি মানুষ বলি না, গরীব বলে কি একটা ভদ্রঘরের মেয়েকে ওভাবে 'ব্রান্ড' দেওয়া ঠিক হচ্ছে ? বিয়ে যদি করবে, মনের মিল যদি হয়েছে—দেরি করে পাঁচজনের কাছে কেলেঙ্কারীর ভাগী হওয়া কেন ? অ্যাঁ ? এতে কি মেয়েটার আখের নষ্ট হচ্ছে না ?'

স্ত্রী অশোকের কথায় সায় দিয়ে বলে, 'তুমিই বলতো ঠাকুরপো, কতদিন ওঁকে বলেছি, ওগো এ-পাড়া থেকে বাসা তুলে দাও। মেয়েটা বড় হচ্ছে, চোখের সামনে ওদের সেসব কাণ্ড কারখানা দেখে শেষে না—' এবার আমার দিকে চেয়ে বলে, 'না—না, তুমি যদি বাসা না বদলাও, আমাকে দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও! ছি ছি, মাগো কি ঘেন্না, ঐ 'উড়ে' মানুষটার টাকা আছে বলে কি কল্যাণী তাঁর গলায় মালা দেবে ? রুচির বলিহারি যাই!'

অশোক বলে, 'আচ্ছা শ্রীনাথ, ওদের চালচলন দেখে তোর কি মনে হয় ?'

'আমি কোনদিন দেখিনি সুতরাং মনেও কিছু হয় না।'

'ন্যাকামি রাখ্—সামনাসামনি জানালা, তুই দেখিস নি ?'

'সত্য কথা কিন্তু রাত দশটার এধারে ত আমি কোনদিন বাসায় ফিরি না, সুতরাং—'

'বউদি—' স্ত্রীর দিকে তাকায় অশোক।

'মিথ্যে নয় তবে কতদিন বলেছি, একটা রাত্ত দেখো না, তা' সেসব কি লক্ষ্য আছে ? আর আমার দেখে দেখে ঘেন্নায় মাথা নুইয়ে আসে—কি বলবো ঠাকুরপো ; আমি যদি পুরুষ হতাম, কানে শোনবামাত্র বাসা বদলাতাম।'

অশোক বলে, 'একদিন দেখ না মজাটা—তোর কোন কৌতুহল নেইরে ?'

শ্যামলী বলে, 'ওদের 'ইলচেমি' দেখে পাশের বাড়ীর লোকে কানে আঙুল দিতে বাধ্য হয়!'

'ভাড়াটেরা কিছু বলে না ?'

শ্যামলী বলে, 'প্রমথেশবাবুর সব বাড়ীগুলো ভাড়া নিয়ে হরিহরবাবু বিলি করেছেন, বলবেন কে কি ? তা' ছাড়া

হরিহরবাবু নাকি বলেছেন, যদি ভাড়াটেদের কোন অসুবিধা হয় তারা উঠে যেতে পারে—তিনি গোটা বাড়ীখানার ভাড়া দেবেন!'

অশোক বলে, 'সব ছাপোষা কেরানীর দল, বলা মানেই ত "জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ"!'

'ঠিক বলেছো ঠাকুরপো—' বলে শ্যামলী নিজ কাজে চলে যায়।

মুহূর্তে আমি আমার সঙ্কল্প ঠিক করে ফেলি। 'আগামী রবিবার সিনেমা যাব না, 'কল্যাণী-হরিহর' লীলা দেখবো। সবাই কি মিথ্যে বলে? একদিন না হয় পর্দার অভিনয় না দেখে সত্যকার অভিনয় দেখি! প্রয়োজন বোধ করলে, নিশ্চয় বাসা বদল করতে হবে!'

আজ রবিবার ছিল।

শ্যামলী বিকালে বলে, 'আজ কোনটার 'শো' দেখবে?'

'শরীর ভাল নেই, আজ থাক্!' আমার সিনেমা না যাবার আসল কারণটা চেপে গেলাম, পাছে স্ত্রী-সহ দোতলায় একটা স্ত্রী-সুলভ চেঁচামেচি হয় রাতে।

সন্ধ্যা থেকে উৎকর্ণ হয়ে জানালার সামনে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে আছি। হ্যাঁ, সব সত্য—অশোক এবং শ্যামলী যা' যা' বলেছে....একতিল মিথ্যা নয়! কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে না পেরে সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। যাতে তাদের অবৈধ প্রণয়ের কোন নোংরা দৃশ্য আমার চোখে না পড়ে।

তখন রাত দশটা।

শ্যামলী আমায় দুধ-পাউরুটি দিতে এসে জিজ্ঞেস করে, 'দেখলে ত কাণ্ড?'

উদাস কণ্ঠে বললাম, 'মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যাচ্ছি—আমাকে কে দেখে ঠিক নেই, আমি ওদের—'

'ও-মা তাইতো জানালাটাই যে বন্ধ!'

শ্যামলী নীচে নেমে যায়।

দুধ-পাউরুটি খেয়ে মনে মনে ঠিক করি, কল্যাণীর সঙ্গে দেখা করে সাবধান করে দিতে হবে। স্পষ্ট কথা বলবো, তাতে ভয় কি? না—ছ' মাস ধরে ঐ এক কথা শুনছি, আর নয়!

দিন পাঁচেক পর।

অফিস থেকে ফেরবার পথে হঠাৎ সেদিন বিকালে কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কিভাবে কথাটা তুলি, চিন্তা করতে করতে কল্যাণীর পিছু পিছু আসি। কল্যাণী হাত জোড় করে কপালে ঠেকায়, 'নমস্কার শ্রীনাথবাবু?'

বিস্মিত হলাম। কল্যাণী আমাকে কেমন করে চিনলে? প্রত্যুনমস্কার করে মুখে এক ঝিলিক হাসি টেনে আনলাম, না, এ কল্যাণী ত সে উড়ে ঠিকাদারের প্রেয়সী নয়—বাইরে সম্পূর্ণ আলাদা যে! এসব মেয়েদের কি এরকম প্রবৃত্তি? বললাম, 'আমাকে চিনলেন কেমন করে?'

'সে আপনি ভালভাবেই জানেন!'

জোর করে মুখে আবার এক ঝিলিক হাসি টেনে আনি। 'হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে, যদি অবসর থাকে—চলুন না ঐ পার্কটায় গিয়ে বসিগে?'

'ওটা কি পার্ক?' খিলখিল করে হেসে ওঠে কল্যাণী।

'যাই হোক, "নাই মামার চেয়ে কানা মামা অনেক গুণে ভাল"।'

'ঠিক আছে—আসুন, তবে আধ ঘণ্টার বেশী সময় পাবেন না!'

'কেন বলুন ত?'

'সবই ত জানেন শ্রীনাথবাবু, সন্ধ্যা হয়ে আসছে, যেতে দেরি করলে হরিহরবাবু গালাগালি করবেন!'

কল্যাণীর কথা ঠিক। ওটা পার্ক নয়। একটা অসমতল ফাঁকা ডাঙা। তবে আমরা পার্ক বলে থাকি। দুজনে পার্কে এসে একটা নিরিবিলি জায়গায় বসলাম।

কল্যাণী প্রথমে বলে, 'বড় জ্বালাতন করছি আপনাদের—নয় শ্রীনাথবাবু?'

সত্য স্বীকার করতে গিয়ে কথাটা মুখে আটকে গেল, 'না—তা' ঠিক নয়, তবে—'

আমার কথা শেষ না হতেই কল্যাণী বলে, সেজন্য আপনি পাড়ার মুখপাত্র হয়ে আমার কাছে সে অভিযোগ দায়ের করতে চাচ্ছেন, ঠিক নয়?'

মনের কথা কেমন করে টের পেলে কল্যাণী? বলি, 'হ্যাঁ, আপনার অনুমান মিথ্যা নয়।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কল্যাণী, 'শ্রীনাথবাবু, সত্যই আপনাদের বিরক্ত করে

জিতেন্দ্রনাথ লেনের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমাকে দেখলেই হাসির খোরাক পায়, কেউ কেউ জানতে চায়, আমার এ অভিনয়ের কারণ কি? কিছুদিন আগে আপনার স্ত্রী-ও সেকথা জানতে চেয়েছিলেন।'

বাধা দিই কল্যাণীকে, 'আপনি কি সত্যই অভিনয় করেন?'

থতমত খেয়ে কল্যাণী বলে, 'হ্যাঁ—না, তা' ঠিক নয়—তবে—'

'তবে কি?'

রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে কল্যাণী বলে, 'আপনি ত জানেন অর্থাৎ সেদিন রাতে জানালার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন আমাদের—'

মুখটা অন্যদিকে ফেরাই আমি। 'না—সেদিন শরীর অসুস্থ থাকায় 'ট্যুইশানি' যেতে পারিনি, তাই—'

'সে যাই হোক—কিন্তু জানালাটা বন্ধ করে দিলেন কেন হঠাৎ?'

'আমি চুপ করে থাকি!'

কল্যাণী বলে, 'হয়ত ভেবেছিলেন, তারপর এমন ঘটনা ঘটবে, যা পাড়াকে পাড়া সকালের খবরের কাগজের মত চায়ের দোকান মাতিয়ে তুলবে!'

'তা' নয় কল্যাণী দেবী! তবে এতদিন ধরে পরের মুখে ঝাল খেয়ে খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, তাই—'

আমার কথা বুঝি কল্যাণীর কানে যায় না। মিনতি-পূর্ণ কণ্ঠে বলে, 'শ্রীনাথবাবু আমার একটা উপকার করবেন?'

ভীরু চোখে কল্যাণীর দিকে চেয়ে থাকি। কি বলছে কল্যাণী? হরিহর বাবুর মত লোক থাকতে আমি তার কোন উপকারে লাগতে পারি? তবু বলি, 'বলুন—'

আজ সন্ধ্যায় আপনি প্রাইভেট ট্যুইশানি যেতে পারবেন না। ঠিক সে রাতের মত আজও জানালার ধারে বসে থাকবেন। কেন তা' তখনই টের পাবেন। আর যদি কোন বিপদে পড়ি, উদ্ধার করতে হবে। প্রতিশ্রুতি দিন!'

সন্দেহ কণ্ঠে বলি, 'দেখুন, কল্যাণী দেবী, পাড়ার মাথায় বসে পাড়াসুদ্ধ মানুষকে অতিষ্ঠ করে যে সর্বনাশ ডেকে আনছেন স্বীয় স্বেচ্ছাচারিতায়, তার বিনিময়ে মানুষ অভিনয় দেখা ছাড়া কিছু ভাববে না।—যেহেতু আপনাদের মত মেয়েরা সমাজের শত্রু!'

করুণ কণ্ঠে কল্যাণী বলে, 'বিশ্বাস করুন শ্রীনাথবাবু, সত্যই আমি বিপন্ন। আমার মত হতভাগ্য মেয়ে বোধ-হয় খুব কমই আছে দুনিয়ায়।'—একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার।

'আপনার হেঁয়ালির অর্থ?'

'আছে শ্রীনাথবাবু, অর্থ আছে বই কি! তাইতো আপনাকে এত অনুনয় করছি। কোনদিন এত আগে এখানে আসি না, আজ এসেছি কেবলমাত্র আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে। আপনার প্রয়োজন না থাকলেও আপনাকে আজ আমার প্রয়োজন আছে!'

'আগে থেকে কোন কথা বলা যায় না?'

'না—' উঠে দাঁড়ায় কল্যাণী। 'দয়া করে বোনের এ অনুরোধটুকু রাখবেন আশাকরি—' বলে সে গটগট করে চলে যায়।

চিন্তিত মনে কিছুক্ষণ বসে থাকি পার্কে। তারপর সন্ধ্যা হতেই উঠে চলে আসি বাসায়।

চা খেয়ে স্ত্রীকে বলি, 'অফিসের কতকগুলো জরুরী কাগজপত্র আছে, রাতের মধ্যে ঠিক করতে হবে। হ্যাঁ, আজ আর ট্যুইশানি যাব না।' বলে দ্বিতলে উঠে যাই।

আলোটা কমিয়ে দিয়ে খাটের ওপরে বসি। সে রাতের চেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে জানালার দিকে চেয়ে থাকি।

প্রায় আট ঘন্টা পর।

হরিহর বাবু চা-কেক খেয়ে যাচ্ছেন অথচ কল্যাণী চুপ-চাপ বসে আছে কেন?

একসময় হরিহর বলেন, 'তুমি আজ কিছু খাচ্ছো না যে, কল্যাণী?'

'শরীর ভাল নেই—'

ব্যগ্রকণ্ঠে হরিহর বলেন, 'ডাক্তার ডাকব ?'

'না—তেমন কিছু নয়, মাথাটায় যন্ত্রণা হচ্ছে, এই যা।'

'তা' হলে আজ নাচ-গান বন্ধ থাক্!'

'হু—'

চা খেয়ে সযত্নে রঙের পাইপ লাইটটা জেলে দেন হরিহর। তারপর কল্যাণীকে বলে, 'শুয়ে পড় আজ বাড়ী যেতে দিচ্ছি না!'

কল্যাণী টেবিলে মাথা রেখে উপুড় হয়ে বসেছিলো। এবার মাথাটা তুলে বলে, 'আজ তোমার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী! ভাবলাম, ক্ষমা চেয়ে না নিয়ে গেলে, চিরদিন তোমার কাছে অকৃতজ্ঞ থাকতে হবে।'

'ক্ষমা? সে কি কল্যাণী?'

'বলো, ক্ষমা করবে আমায়?'

ব্যস্ত হয়ে ওঠেন হরিহর, 'নিশ্চয় তোমার অসুখ বেশী—আমি ডাক্তার ডাকি!'

'না—ডাক্তারের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন তোমার ছাড়পত্র। এতদিন ধরে যে অভিনয় করেছি তোমার কাছে—তার বদলে দয়া করে মুক্তি দাও!'

ভ্রূ-দুটো কুঞ্চিত হয়ে ওঠে হরিহরের। 'আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না কল্যাণী?'

'তোমার বালীগঞ্জের বাড়ীতে দেড় বছর আর এখানে ছ-মাস অর্থাৎ দু'টি বছর ধরে তোমার কথামত নাচ-গান করে তোমায় খুশী করেছি কেন জান?'

একটা সিগারেট ধরিয়ে হরিহর বলেন, 'জানি বই কি! তুমি যে আমায় কতখানি ভালবাস, তা' কি আমি বুঝতে পারি না? কিন্তু ভেবো না তুমি, নতুন বাড়ীটা শেষ হলেই আমাদের বিয়ে হবে, কেমন?'

নিজের অজ্ঞাতেই কল্যাণী সজোরে বলে, 'না—না, হতে পারে না!'

ভ্যাবাচাকা খেয়ে কল্যাণীর মুখের দিকে চেয়ে হরিহর বলেন, 'সে কি? দু'বছর ধরে তোমার জন্যে গানের মাষ্টার, নাচের মাষ্টার—মাস মাস দুশো টাকা করে হাত খরচ যুগিয়েছি কি আমি তোমায় ছেড়ে থাকবো বলে?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, হরিহর বলেন, 'আমি ডাক্তার ডাকি—তুমি ভুল বকছো!'

মাথা ঝাঁকড়ে কল্যাণী বলে, 'না—ভুল আমি বলিনি তবে আজ যে কথা বলবো, তোমার ভুল বলেই মনে হবে। তবে মন দিয়ে আমার সব কথা শোন—আমি বিবাহিত!'

চমকে ওঠেন হরিহর। 'বিবাহিত? তোমার শাঁখা সিন্দুর কই? এতদিন সেকথা বলোনি কেন?'

'সবই আছে, সেসব পড়িনি—পাছে স্বামী আমার বিনা চিকিৎসায় মারা যান।'

'তোমার স্বামী? কোথায়? কি হয়েছে তাঁর?'

'টি. বি. স্যানাটরিয়মে! আড়াই বছর টি. বি.তে ভুগে কাল তাঁর ডিসচার্জ নোটিশ বেড়িয়েছে। এখন তিনি সুস্থ।'—এবার হরিহরের মুখের দিকে তাকায় কল্যাণী, 'অনুমতি দাও, কাল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে যাই!'

'তাঁকে বাঁচাবার জন্যে তোমার এ অভিনয় কেন? একটা মারাত্মক অসুখ থেকে বেঁচে উঠেছেন তিনি, তাঁর সংস্রবে থাকাও উচিত নয় তোমার। কেন, আমার কাছে থাকলে কি তুমি অসুখী হবে?'

'ভুলে যেও না আমি হিন্দুনারী!'

'ডিভোর্স কেসের সুযোগ নাও!'

'না—না, সে আমি পারব না।'

ক্ষুধার্ত শার্দুলের মত গর্জন করে ওঠেন হরিহর। 'না—মুক্তি নেই তোমার, আমি তোমায় ছেড়ে দেবো না—কিছুতেই না!' বলে উন্মত্তের মত কল্যাণীর পিঠের কাছে এসে দাঁড়ায় সে।

কল্যাণী রুদ্রমূর্তিনী হয়, 'সাবধান, কোনদিন দেহ স্পর্শ করতে দিই নি—আজও দেবো না।'

চেঁচিয়ে ওঠেন হরিহর, 'আলবত দেবে, দেবে না মানে? চালাকি? যদি ফাঁসি যেতে হয়, তা'ও যাবো, তবু—'

বিকট শব্দ করে চেঁচিয়ে ওঠে কল্যাণী, 'ডাক্তার—ডাক্তার—ডাক্তার ডাকো, ওগো কি সব ভুল বকছি আমি! তুমি ছাড়া কে আছে আমার—হ্যাঁ সত্যি আমি ভুল বকছি—বিয়ে ত আমার হয় নি!'

কল্যাণীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েন হরিহর। 'সত্যি বলছো?'

পাড়ার লোকে আমায় পাগল করে তুলেছে—ওগো তোমার পায়ে পড়ি, শীঘ্রি ডাক্তার ডাক—'

'ইস—এসময় ফোন থাকলে কত সুবিধা হত! যাকগে তুমি স্থির হও, আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি।' এবার দরজা খুলে দ্রুতবেগে নেমে যান হরিহর।

কল্যাণী উঠে দাঁড়িয়ে শক্ত করে কাপড়খানা পড়ে নেয় তারপর অতি দ্রুত নেমে এসে রাস্তায় দাঁড়ায়।

আমিও তখন রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি।

মুখোমুখি হই দুজনে।

হাঁপাতে হাঁপাতে কল্যাণী বলে, 'এ ছাড়া উপায় নেই শ্রীনাথবাবু, ও কিছুতেই আমাকে ছেড়ে দেবে না। আমার আসল নাম রমা, কল্যাণী নয়! পাড়ার সকলকে বুঝিয়ে বলবেন আমার কথা—সকলের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী!' বলে সে একটা বাই লেন ধরে ছুটে চলে যায়।

আমি অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকি যতক্ষণ না সে আমার দৃষ্টি-পথের বাইরে চলে যায়।

*   *   *

প্রমথেশবাবুর কাছে আত্ম-পরিচয় দেবার এইতো সুযোগ। এমন সুন্দর একটা বাস্তব গল্পের 'প্লট' হাত ছাড়া করি কি করে?—কাল সকালেই দু-দিস্তা কাগজ কিনবো।

হারিয়ে যাওয়া রঙ বেরঙের দিনগুলো

(গল্প)

শ্রীসুশোভন দত্ত

থালার মতো সূর্যটা একরাশ গোলাপী আভা ছড়িয়ে ঢ'লে পড়েছে পশ্চিমে। রক্তিম আকাশের গা ঘেঁষে এক ঝাঁক সাদা বক উড়ে গেল। বাগানে গোলাপ, রজনীগন্ধা আর ডালিয়া ফুটেছে মুঠো মুঠো। অকাতরে গন্ধ ঢালছিল ওরা। জানালার হালকা পর্দাগুলো দুলছিল হিমেল হাওয়ার তালে তালে।

একটা ইজিচেয়ার পেতে ব'সেছিলাম জানালার সামনে। স্মৃতির অথই সাগরে অনেক কথার গুঞ্জন—হারিয়ে যাওয়া অতীতের এলোমেলো তোলপাড়। 'মালিনী'টা খুলে পড়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু মনের পটে ভেসে উঠছিল মানসীর কথা। না, 'মেবার-পতনে'র মানসী নয়, আমার 'মানসী'। আমার কল্পনার মানসী। অনেকের কথাই ভাবছিলাম। মায়া, অপরূপা, তন্দ্রা। আমার জীবনের চলার পথে অনেকেই এসেছে হাসি-কান্নার ডালি সাজিয়ে। কিন্তু মন কেড়ে নিতে পেরেছে কেউ? হ্যাঁ, একজন পেরেছিল। পপী। ওটা ওর ডাক নাম। ভালো নামটা মনে পড়ছে না। কারণ ওর পোশাকী নাম ধ'রে ডাকিনি কোনদিন। তাই মনে রাখিনি ওর পোশাকী নামটা। ইচ্ছে করেই রাখিনি।

বাড়িতে কেউ নেই। বাবা কলেজ অধ্যাপনা করেন। ফেরেন নি এখনো। মা সিনেমায়। ভাই-বোনগুলো বেড়াতে গিয়েছে। অফিস থেকে একটু আগে ফিরে এসেছি আমি। অন্যদিনের চাইতে বেশ খানিকটা আগে ফিরেছি। নিঃসঙ্গ আমি তাই বিরহী মনটাকে নিয়ে খেলায় মেতেছি। আমার জীবন-নদীর স্রোত থমকে দাঁড়িয়েছে যেন।

আমি পেছিয়ে গেছি আধযুগ আগে। আমার কলেজ জীবনে। কলেজ জীবনটাই আমার রিক্ত জীবনের সবচেয়ে সুখের অধ্যায়। আবার দুঃখেরও বটে। বিদ্যালয়ের ছকে বাঁধা জীবনের গণ্ডি মুক্ত হ'য়ে বাঙলায় অনার্স নিয়ে বি.এ.তে ভর্তি হলাম আমি। লেখাপড়ায় কোনদিনই সাধারণের বেশ খানিকটা ওপরে। আর আমার স্নেহ পাওয়ার ভাগ্যটাও ছিল ভালো। স্কুলে শিক্ষকরা স্নেহ করতেন, কলেজে অধ্যাপকরাও।

মাস খানেক কলেজ করেছি। এরই মধ্যে আমি সহপাঠী-সহপাঠিনীদের কাছে সুপরিচিত হ'য়ে গিয়েছিলাম। তবে কোন মেয়ের সঙ্গে আমি পরিচয় করার চেষ্টা করিনি। ওরাও কেউ এগিয়ে আসেনি আমার সঙ্গে পরিচয় করতে।

সেদিন ক্লাস শেষ হ'য়েছিল সাড়ে চারটায়। বাড়ির পথ ধরছিলাম আমি। পিছন থেকে একটা মেয়ে ডাকলো আমায়। দাঁড়িয়ে পড়লাম। মেয়েটা আমাদের ক্লাসেই পড়ে। বেঁটে, খাটো, আঁটসাঁট চেহারা। রঙটা ময়লা। ভরা যৌবনের ছোঁয়াচ ওর সমস্ত অঙ্গ জুড়ে। মেয়েটা মৃদু পদক্ষেপে এগিয়ে এলো আমার কাছাকাছি। জিজ্ঞাসা করল—প্রসন্নবাবু বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের ওপর একটা পরীক্ষা নেবেন বললেন, আচ্ছা, পরীক্ষায় ক'টা চ্যাপ্টার থাকবে জানেন?

—না। ছোট্ট বিরক্তি-মেশানো উত্তর দিলাম আমি।

—আপনি ওঁর কাছ থেকে জেনে নিন না। আদেশের মতো মনে হ'ল ওর কথাগুলো।

—কেন, আপনিও তো জেনে নিতে পারেন। ভ্রূ দু'টো কুঁচকে গেল আমার।

—আচ্ছা তাই নেব। অপ্রস্তুত হ'য়ে উত্তর দিলো ও।

অপমানে ওর শ্যামলা মুখ থেকে ঠিকরে পড়লো এক ঝলক বেগুনী দ্যুতি। আমার কালো ঠোঁটে ফুটে উঠলো এক টুকরো ক্রূর হাসি। আদম আর ইভকে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইয়ে শয়তান হেসেছিল যেমন ক'রে, ঠিক তেমনি করেই সেদিন আমি হেসেছিলাম।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, একটা মেয়ের সঙ্গে আমি এ-রকম অহঙ্কারীর মতো ব্যবহার করলাম কেন?—আমি কৈশোরের শেষ প্রান্তে পাড়ার

মেয়েটির। সুঠাম তনুর ভাঁজে ভাঁজে মাখানো ছিল কামনার হাতছানি। ওর একটি মিষ্টি কথায়, পাতলা অধরের একফালি শানিত হাসিতে, হরিণী-নয়নের সর্পিল কটাক্ষে ধন্য হতাম আমি। মনের পটে নানা রঙের ছবি আঁকতাম কল্পনার তুলি দিয়ে। আকণ্ঠ পান করতাম রূপের মদিরা। আমি বুঝতে পারিনি ও আমার সঙ্গে প্রেমের খেলায় মত্ত। যেদিন বুঝলাম সেদিন থেকেই আমার মনটা বিষিয়ে উঠলো ওর ওপর। আমি অহঙ্কারী হ'য়ে উঠলাম। হ'য়ে উঠলাম নারী-বিদ্বেষী।

বাড়ি ফিরে অনেক কিছু ভাবলাম। মন বলল ওর সঙ্গে এ-রকম দাম্ভিক ব্যবহার না করলেও চলতো সবাই তো আর তন্দ্রা নয়! রাতে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে ভাবলাম। ঠিক করলাম পরের দিন আলাপ ক'রবো ওর সঙ্গে। ওর ভুল ভেঙে দেব। ওকে বুঝিয়ে দেবো আমাকে ও যতটা অভদ্র মনে করেছে ততটা অভদ্র আমি নই।

পরের দিন কলেজে গিয়ে ডাকলাম ওকে। ওর নাম ধ'রেই ডাকলাম। ক্লাসের সব মেয়ের নামই আমি জানতাম। ওর তুলে রাখা নামটা ছিল মিতা—মিতা বিশ্বাস। ডাকলাম—মিতা শোন। থমকে দাঁড়ালো ও। আশ্চর্য হয়ে গেল ও। ভেবে পেল না আমার এই আকস্মিক পরিবর্তনের কি কারণ থাকতে পারে। আমি বললাম—গতকাল সুকুমারবাবু ড্রামার ওপর যে নোটটা ডিকটেট ক'রেছিলেন সেটা দিও তো।

—কেন, আপনিও তো কাল নোটটা টুকেছেন। আমার গতদিনের কথার প্রতিধ্বনি শুনলাম ওর কথায়।

—হ্যাঁ। তবে মাঝে মাঝে বাদ গিয়েছে।

—আচ্ছা কাল এনে দেব। আমার দিকে কটাক্ষ হেনে বললো ও।

পপী নোটটা দিয়েছিল আমায়। যদিও নোটটা আমার টোকা ছিল। সম্পূর্ণই টোকা ছিল। তবু চেয়েছিলাম, কারণ ওর সঙ্গে কথা বলবার আর কোন সূত্র খুঁজে পাইনি বলে।

এইভাবেই পপীর সঙ্গে আমার পরিচয়। পরিচয় থেকে ভালবাসা। হ্যাঁ, ভালবাসা—প্রেম নয়। প্রেম হয় দেহকে ঘিরে। মানুষ প্রথমে দেহকে ভালবাসে। দেহকে কেন্দ্র করেই প্রেমের জন্ম। আর ভালবাসা ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপেই মানসিক। একটা হৃদয়ের আনন্দ-বেদনা যখন অপর একটা অন্তরে সংবেদন জাগায়, আলোড়ন তোলে, তখনই জন্ম হয় ভালবাসার। প্রেমের মধ্যে অনেক সময় আবিলতা থেকে যায়। নিছক ইন্দ্রিয় লালসার মধ্যে প্রেমের পরিণতি ঘটে। কিন্তু ভালবাসা অনাবিল। তার মধ্যে একফোঁটা কামনা থাকে না। থাকে শুধু শুভ্রতা। মিতা বিশ্বাসকে আমি প্রকৃত অর্থে ভাল-বাসতাম।

পাশাপাশি হেঁটে কলেজ থেকে ফিরতাম আমরা দু'জনে। অনেক কথা হ'ত। বেশি কথা মানেই অনাবশ্যক কথা। অতি অল্প দিনের মধ্যেই শেষ হ'য়ে গিয়েছিল আমাদের মন জানাজানির পর্ব। আমি জেনেছিলাম ওর ব্যথার কথা, ওর আনন্দের কথা। ও-ও জেনেছিল আমায়। তবে পপী আমার অখণ্ড ব্যক্তিত্বের ভগ্নাংশ মাত্র জেনেছিল। জেনেছিল আমার আনন্দোচ্ছল সত্তাটাকে। আমার মধ্যে যে একটা ব্যথাহত নিঃসঙ্গ হৃদয় চুপি চুপি কাঁদছে, তা ও বুঝতে পারেনি। মানে আমিই বুঝতে দিই নি। কি লাভ হবে ওকে দুঃখ দিয়ে। ও অল্পতেই আঘাত পায়। ভীষণ সেন্টিমেন্টাল ও। আমি না বুঝে অনেক আঘাত দিয়েছি ওকে। অকারণে ওর চোখের জলের অপব্যয় করিয়েছি আমি। তবু ও আমাকে আক্রমণ করেনি কোনদিন। কোনদিন অবজ্ঞা ভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি আমার দিক থেকে। 'প্রতিটি আঘাতের একটা প্রতিঘাত আছে'—বিজ্ঞানের এই বহু পরীক্ষিত সত্যটা ভ্রান্ত প্রমাণিত হ'য়েছিল আমাদের ক্ষেত্রে। হয়তো ও আমাকে দেহের প্রতিটি রক্ত বিন্দু দিয়ে ভালবাসতো ব'লেই।

আমি কারণে-অকারণে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ছুটতাম ওর বাড়িতে। ওর পড়ার ঘরে মুখোমুখি ব'সে কতদিন গল্প করেছি। আমাদের দু'জনের গল্পের আসরে অধিকাংশ সময়েই ও ছিল বক্তা, আমি থাকতাম নীরব শ্রোতা হ'য়ে। নারী-পুরুষের স্বাভাবিক ব্যবধানটাও ঘুচে গিয়েছিল কালক্রমে। আমরা উভয়ে উভয়ের কাছে অত্যন্ত সহজ

চোখে দেখেনি। আমাদের দু'জনের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক খাড়া ক'রে তুলে সমাজের মানুষগুলো অনেক আজেবাজে কথা ছড়াতে লাগলো।

আমার বাবা-মায়ের কানেও গিয়েছিল আমাদের মেশামেশার কথা। মায়ের কাছ থেকে অনেক উপদেশ শুনতে হয়েছিল। পপীকে জানিয়েছিলাম সব কথা। তারা ঢাকা আকাশের তলে দাঁড়িয়ে ও বললে—আমার ভাগ্যটাই খারাপ।

—দোষ তোমার ভাগ্যের নয়, দোষ সমাজের।

—আমি তোমার সঙ্গে একেবারে আড়ি ক'রে দেব ভাবছি।

—পারবে? গভীর ব্যথা দিয়ে বললাম আমি।

—মিতা বিশ্বাস সবই পারে।

—তুমি পারলেও আমি পারবো না।

—আমাকে তাহ'লে কি করতে বলো?

—তুমি আগের মতোই আমার সঙ্গে মিশবে। আমার বাড়ির সামনে দিয়ে মুখ উঁচু ক'রে হাঁটবে।

—মিতা বিশ্বাস সব সময় মুখ উঁচু করেই হাঁটে।

আমি ত্যাগ করতে পারিনি পপীকে। কিন্তু পপীই ছেড়ে গেল আমায়। বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে ও চ'লে গেল রাউরকেল্লায়। ওখানে ওর মামা কাজ করতেন। যাবার বেলায় ও কেঁদেছিল। ওর দু' চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল মুঠো মুঠো অশ্রু। ওর হৃদয় নিঙড়ানো সুধা। আমি কাঁদতে পারিনি, কারণ ছেলেরা সহজে কাঁদে না। কাঁদলে ব্যথা অনেকটা লাঘব হয়। কিন্তু একবার ব্যথা পেলে সে ব্যথা চিরকালের মতো হৃদয়ের কোণে বাসা বেঁধে থাকে।

তারপর সুদীর্ঘ পাঁচ-ছ' বছরের মধ্যে আর দেখা হয়নি পপীর সঙ্গে। হয়তো আর কোনদিনই দেখা হবে না। শুনেছি ওর বিয়ে হ'য়ে গেছে। ওর স্বামী একজন বিলেত ফেরত এঞ্জিনিয়ার। পপী সুখী হ'য়েছে। ওর সুখে আমি ওর চেয়েও বেশি সুখী।

সহযাত্রী

অমিয় চট্টোপাধ্যায়

বাঁশি কাঁদে
অনিঃশেষ যন্ত্রণায়
অনিরুদ্ধ মূর্ছনায়
সোচ্চার জীবনের বাঁশি।
শুব্ধ হাসি
পৃথিবীর জীবন্ত শ্মশানে
লাঞ্ছিত সম্মানে
বিনায়ক গণ-দেবতার।

মৃত্যু হাসে
শাসনের রঙ্গমঞ্চে—নেপথ্য হাসি,
সম্মুখে পশ্চাতে
নিশীথে প্রভাতে
নির্লজ্জ উলঙ্গ মৃত্যু,
উদ্ধত উদগ্র স্পর্ধায়।
ধাবমান প্রচণ্ড ক্ষুধায়

ছদ্মবেশী লালসার
চতুরঙ্গ সেনা তার
দুঃশাসনের কুরুক্ষেত্র পথে।

ঢেউ ওঠে
চূর্ণ করি নিষেধের বাঁধ,
দুরন্ত বাঁচার সাধ
বহে আনে জনসমুদ্রের
উত্তাল দুর্বার ঢেউ।
জাগে সব্যসাচী,
প্রস্তুত সারথী অনিবার্য রণে।
সহযাত্রী হই মনে মনে,
কালো রাত্রি দিশারী আমার।

কোথা কোন্ পথে যাত্রা শেষ
নাহি জানি!
ইতিহাস দেবে সে উত্তর।

আঁধারে আলো

(গল্প)

সুচিত্রা দাশগুপ্তা

মোরাদাবাদ জেনারেল হাসপাতালের হেড ক্লার্কের কোয়ার্টারের সামনে একখানা টাঙ্গা এসে দাঁড়াল। টাঙ্গা থেকে হেড ক্লার্ক অনুপ সেন প্রথম নামল, তারপর মা অমিয়া দেবী ও স্ত্রী সুনন্দাকে নামতে সাহায্য করল। টাঙ্গা থেকে নেমে অমিয়া দেবী পুত্রবধূ সুনন্দাকে বাঁ হাতের বেষ্টনীতে বন্দী করে সদর দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন। ততক্ষণে অনুপ টাঙ্গাওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দু' একটা জিনিসপত্র নামাতে লাগল টাঙ্গা থেকে।

সদর দরজায় কড়া নাড়তেই চাকর রঘু দরজা খুলে দিল। একগাল হেসে বলে উঠলো, ওমা আপনারা এসেছেন!

অমিয়া দেবী বললেন, হ্যাঁ, শীগ্‌গীর যা জিনিসপত্র নামিয়ে আন্। আমরা আর দাঁড়াতে পারছি না। পুরো তিনটি দিন গাড়ীতে কেটে গেছে, উঃ!—বলে সুনন্দাকে দু' হাতের বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ করে দরজার মধ্যে ঢুকে গেলেন।

রঘু ছুটে গিয়ে অনুপের হাত থেকে সব জিনিস কেড়ে নিয়ে বলল, বাবু, আপনি যান, আমি-ই সব নিতে পারব।

অনুপ ধমকের সুরে বলল, এত জিনিস একা নামাতে তোর অনেক সময় লাগবে—টাঙ্গাওয়ালা কতক্ষণ দাঁড়াবে? আর কেউ নেই বাসাতে?

রঘু বলল, আজ্ঞে না—ওরা সব বায়োস্কোপ দেখতে গেছে। আজ তিন দিন ধরে আমরা সবাই অপেক্ষা ক'রে আছি আপনাদের জন্য। সিন্‌হা বাবু দু' দিন গাড়ী নিয়ে ইষ্টিশানে গিয়ে ফিরে এসেছেন। আজ বাড়ীর সবাইকে নিয়ে বেরিলীতে চলে গেছেন।

অনুপ ওর কথাগুলো শুনে বিরক্ত হয়ে বলল, বেশ হয়েছে, খুব সুখবরই দিচ্ছ, এখন তুমি যত পার বোঝা টান।—বলে চামড়ার সুটকেসটা তুলে নিয়ে চলতে আরম্ভ করে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো, হ্যাঁরে ফার্নিচারগুলো ঠিকমত এসেছে তোরে?

টাঙ্গাওয়ালার সাহায্যে সুনন্দার বড় ট্রাঙ্কটা নামাতে নামাতে রঘু উত্তর দিলো, আজ্ঞে হ্যাঁ।

সদর দরজা পার হ'য়ে অনুপ তার নিজের হাতে গড়া ফুল বাগানের মধ্যে দিয়ে সুরকি বিছানো সরু রাস্তাটা দিয়ে যেতে যেতে বাংলোর বারান্দার দিকে তাকাল। দেখলো বারান্দায় বড় সোফাটার মধ্যে মা বসে আছেন আর তাঁর কোলের মধ্যে ক্লান্ত সুনন্দা ঢলে পড়েছে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে রাস্তাটুকু পার হয়ে বারান্দায় উঠে শোবার ঘরের তালা খুলে ফেললো। তালা খোলার শব্দে অমিয়া দেবীর তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। তিনি সোফার উপর সোজা হয়ে বসলেন।

অনুপ ঘরের ভিতর গিয়ে আলো জ্বালিয়ে পাখা চালিয়ে দিয়ে মাকে বলল, মা, ওকে ঘরে নিয়ে এসে পাখার নীচে বস, ভাল লাগবে।

শাশুড়ীর ডাকে সুনন্দা যেন চমকে জেগে উঠলো। ঘুমে জড়ানো চোখ দুটোকে হাত দিয়ে ভাল করে মুছে নিয়ে সামনের দিকে তাকাতেই খুব লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। দেখল অনুপ একাই ঘরদোর পরিষ্কার করতে আরম্ভ করেছে। এতে সে খুবই বিব্রত বোধ করতে লাগল।

ততক্ষণে শাশুড়ী আবার ঘুমে ঢুলতে শুরু করেছেন।

সকল সমস্যার সমাধান করল রঘু এসে। সুনন্দা দেখলো, রঘু আরো তিন চারজন লোককে সঙ্গে নিয়ে সব মালপত্র এনে ফেলেছে। সে ঘরের ভেতর ছুটে গিয়ে অনুপের হাত থেকে ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে বলল, বাবু, আপনি এসব কি করছেন? আমরা এতগুলো লোক আছি কি করতে? চেয়ে দেখুন, ওরা সবাই এসে গেছে। আপনারা এখন হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়-জামা বদলিয়ে বিশ্রাম করুন, আর বলে দিন এখন আপনাদের খাওয়ার কি ব্যবস্থা করব।

অমিয়া দেবী রঘুর কথায় সায় দিয়ে বললেন, তাইত, তুই কেন ওসব করতে গেছিস বাবা! আয়, এইখানে একটু বোস্, বেশ ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। আমার তো ঘুমই এসে

গিয়েছিল। ওরা ঘরদোরগুলো গোছগাছ করে দিক, ততক্ষণে আমরা হাত মুখে জল দিয়ে কাপড় ছেড়ে সুস্থ হয়ে নি। তারপর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হবে। এস বউমা, তোমাকে বাথরুম দেখিয়ে দি। আহা রে, মায়ের আমার মুখখানা শুকিয়ে গেছে!

মায়ের কথা শুনে অনুপ কৃত্রিম দুঃখের সঙ্গে বলল, মা তোমার মায়ের মুখ-ই শুধু শুকনো দেখলে, বাবার কিছু হয়নি?

মা ফিরে দাঁড়িয়ে স্নেহের হাসি হেসে বললেন, ওরে আমার সোনারে, তা আবার হয়নি! খুব হ'য়েছে। তবে তোমার তো এই ধকল বইবার অভ্যাস আছে, বউমার তো এই প্রথম। তাই ওই বেশী ক্লান্ত হ'য়েছে। ব'লে তিনি এক হাতের মধ্যে বউ আর এক হাতের মধ্যে ছেলেকে নিয়ে বললেন, এসো তোমরা। এবার আর দেরি নয়, হাত মুখ ধোবে এস।

ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে সমস্ত বাংলোটা একেবারে ঝক-ঝকে তকতকে হয়ে উঠলো। তারপর খাওয়া-দাওয়া মিটে গেল রঘুর ব্যবস্থাপত্রে। খাবার টেবিলে অমিয়া দেবী অনুপকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে অনু, আমরা এলাম অথচ নটা ব্লকের একজন মানুষও এলো না নতুন বউ দেখতে? কি আশ্চর্য!

উত্তরে অনুপ বললো, কেউ কি জানে আমরা এসেছি? আমি আগেই রঘুকে বারণ করে দিয়েছি মা। তিন দিনের জার্নির পর এই এত রাতে আর লোকের ঝামেলা সহ্য হবে না। কালই সবাই তোমার বউ দেখবে। যাক্ এবার তোমার বউমাকে এই বাড়ীটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও। কোথায় কি আছে না আছে। কোথায় কি থাকে না থাকে এই সব আর কি।

মা সুনন্দার দিকে চেয়ে বললেন, পরিচয় মোটামুটি কিছু করিয়েছি, যা বাকী আছে তা কাল হবে। রাত অনেক হোল, এবার ঘুমাতে যাও। আমি গেলাম, খুব ঘুম পেয়েছে আমার, বলে অমিয়া দেবী তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

খাওয়া ওদের অনেকক্ষণ আগেই হয়ে গিয়েছিল। টেবিলে বসে বসে এতক্ষণ নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছিল। মা চলে যেতে অনুপ রঘুকে ডাকলো। রঘু বারান্দায় বসেছিল, ডাক শুনেই এসে হাজির হোল। অনুপ তাকে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে বলল আর সব ঘরগুলো ভাল করে দেখে তালা বন্ধ করে শুতে যেতে বলল। রঘু চলে গেল।

অনুপ সুনন্দার হাত ধরে ওদের ঘরে গিয়ে ঢুকলো এবং দরজা বন্ধ করল। সুনন্দা ঘরে গিয়ে একটা জিনিস আবিষ্কার করল। দেখল এই ঘরের উত্তর দিকে একটা দরজা আছে, দরজাটা আধ খোলা এবং তার উপর একটা পর্দা ঝুলছে। এর আগে তো কতবার এঘরে এসেছে, কই একবারও তো দরজাটা চোখে পড়েনি!

সে একটু অবাক্ হয়ে অনুপের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, ওদিকে একটা দরজা দেখছি ওদিকেও আবার আর একটা ঘর আছে নাকি?

অনুপও একটু অবাক্ হ'য়ে বলল, হ্যাঁ আছেই তো, তুমি দেখনি আগে?

সুনন্দা ঘাড় নেড়ে বলল আছে যে তাই জানিনা।

অনুপ ব'ললো, যাও দেখে এসো।

সুনন্দা অনুপের দিকে একটু স'রে গিয়ে ব'লল, ওরে বাবা, ওই অন্ধকার ঘরে আমি যেতে পারব না একা। অনুপ একটা সিগারেট ধরিয়ে সুনন্দাকে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে আলো জ্বাললো।

আলো জ্বালতেই সুনন্দা ঘরের প্রতিটি জিনিস দেখে একেবারে আশ্চর্য হ'য়ে গেলো। একটা ড্রেসিং টেবিল, তার উপর মেয়েদের সব প্রসাধনের জিনিসপত্র। আলনায় ব্যবহার করা কয়েকখানা শাড়ী, সায়া, ব্লাউজ। বাচ্চাদের জামা-প্যান্ট। নানারকম খেলনা, ফিডিং বোতল, ঝিনুক বাটি ইত্যাদি। একদম ছোট বাচ্চার কাঁথা, তোশক, বালিশ, চুষিকাঠি, ঝুমঝুমি এইসব আরও কত কি!

সুনন্দার চোখ দু'টো ঘরের সমস্ত জিনিসের উপর গভীর দৃষ্টি নিয়ে ঘুরলো,—তারপর একরাশ প্রশ্ন নিয়ে সে চোখ অনুপের মুখের উপর স্থির হ'ল।

অনুপ সে দৃষ্টির অর্থ বুঝলো। বুঝেও না বোঝার ভান করে বলল, কিছু বলবে আমাকে?

একটু চুপ ক'রে থেকে সুনন্দা বলল, তোমার কাছে শুনেছিলাম, এ বাড়ীতে আর কেউ থাকে না মানে, কোন মেয়েছেলে থাকে না, তবে এগুলো কারা?

বিদ্যুতের ঝিলিকের মত অনুপের মাথার মধ্যে এক

দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল। সে আশ্চর্য হওয়ার ভান ক'রে বলল, কেন তুমি কিছু শোননি, তোমার মা-বাবা তোমাকে কিছু বলেন নি ?

কৌতূহল আর আশ্চর্যে সুনন্দা যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। তার একবারও মনে পড়লো না যে, মাত্র পনের দিন হোল তার বিয়ে হ'য়েছে। এখনও লজ্জা কাটিয়ে সে ভাল ভাবে স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে পারে না। অথচ অদ্ভুত এক উত্তেজনায় সে একেবারে অস্থির হ'য়ে স্বামীর কাছে এগিয়ে গিয়ে তার একটা হাত ধ'রে ঝাঁকি দিয়ে বলে উঠলো,—কই না তো, আমাকে তো মা-বাবা কিছু বলেন নি কোন বিষয়ে। আমি তো কিছু শুনিনি, তুমি বল কি ব্যাপার, বল এসব কাদের ?

অনুপ কপট গাম্ভীর্য অবলম্বন ক'রে বলল, যখন কিছু শোননি, তখন আর শুনে কাজ নেই। এস এখন ঘুমাবে।

সুনন্দা ব্যাকুল ভাবে বিছানা গুটিয়ে রাখা খাটটা অধিকার ক'রে বসে বলল, না আমি ঘুমাবো না, ও ঘরেও যাব না, যতক্ষণ তুমি আমাকে এ ঘরের ইতিহাস না বলবে।

অনুপ যেন নিরুপায় এই ভাবেই বলল, কিন্তু শুনলে যে ভীষণ মন খারাপ হ'য়ে যাবে তোমার। আজই মাত্র এই নতুন বাড়ীতে নতুন সংসারে পা দিয়েছ, তারপর রাস্তার কষ্টে তুমি ভীষণ ক্লান্ত। আজ থাক, আর একদিন শুন। তোমাকে তো একথা বলতেই হবে এখন এসো—ব'লে অনুপ সুনন্দার একটা হাত ধরে আকর্ষণ করল।

সুনন্দার মাথার কাপড় খুলে গেছে। সেদিকে তার খেয়াল নেই। সে শক্ত হ'য়ে চেপে ব'সল। অনুপের কাছ থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে খাটের বাজুটা চেপে ধরলো, মুখে কিছু বললো না।

ওর এই ভাব দেখে অনুপ মনে মনে হাসলো। মুখে বলল, আজকের এই নতুন দিনের রাতটাকে যখন তোমার মাটি করার ইচ্ছা, তখন শোন। বলে, একটা চেয়ার নিয়ে সুনন্দার মুখের সামনে বসলো।

নিস্তব্ধ গভীর রাত। সমস্ত পৃথিবী ঘোর ঘুমে অচেতন। অন্ধকার ঘরের মধ্যে বিছানার উপর গালে হাত দিয়ে জেগে ব'সে আছে সুনন্দা। পাশে স্বামী অনুপ অঘোরে ঘুমাচ্ছে। তার শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ, টাইম পিস ঘড়িটার টিকটিক শব্দ দু'কান ভরে সে শুনছে। প্রাণ ভরে সে এতক্ষণ কেঁদেছে। কেঁদে কেঁদে সে শান্ত হ'য়েছে। চোখে আর এখন জল নেই। সে শুধু ভাবছে, আকাশ-পাতাল ভাবছে, যে ভাবনার কোন শেষ নেই। কিছুক্ষণ আগে সে স্বামীর মুখ থেকে যে কথা শুনে এলো, তাতে সে একেবারে পাষাণ হ'য়ে গেছে যেন। কী শুনলো ? নিজের কানকেই যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

এও কি সম্ভব ? স্বামী আগে একটা বিয়ে করেছিল। দু'টো ছেলেও হ'য়েছে। ও-ঘরের ওই জিনিসপত্রগুলো নাকি তাদের। যাকে বিয়ে ক'রেছিল সে নাকি নীচু জাতের মেয়ে। মাত্র নাকি দু'মাস আগে একথা জানাজানি হ'য়ে গেছে। আর তাই নাকি শাশুড়ী তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আচ্ছা একেবারেই যদি তাড়িয়ে দিয়ে থাকেন তবে জিনিস-পত্রগুলো সঙ্গে দিয়ে দেননি কেন ? ফেলেই বা দেননি কেন ? আমি এসে দেখব, এ ভয় তো থাকা উচিত ছিল ? না না, আমার ভয় থাকবে কেন ? আমার বাবা-

মাকে তো সব বলেই নিয়েছে আগে থেকে। বাবা-মার কথা মনে হতেই বুক ঠেলে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

আশ্চর্য হ'য়ে সুনন্দা ভাবে, আচ্ছা, আমি না বাবার এত আদরের সোনা? এদের এত গলদ জেনেও আমাকে এদের হাতে দিতে বাবার একটুও কষ্ট হোল না? আমি এতই বোঝা হয়েছিলাম? না না, বাবা-মা কিছুতেই এসব জানেন না। ও মিথ্যা কথা বলছে নিশ্চয়ই। জানলে কখনওই এ বিয়ে বাবা দিতেন না। বাবা কি এতই বোকা বা কাঁচা লোক যে, ওরা তাড়িয়ে দিয়েছি বললেই তা বাবা মেনে নেবেন। বাবা জানেন না? মন্ত্র পড়ে বিয়ে করলে অত সহজেই নীচু জাত বলে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না? বিশেষ করে দু'টো ছেলে আছে যখন,—এর পিছনে আইন আছে না? আবার সুনন্দার মনে প'ড়ে গেল। অনুপ একথাও তো বলল—সে আইনের সাহায্য নিয়ে ওই মেয়েটার সব ব্যবস্থা করেই তারপর নাকি সে এই বিয়ে করল। আর নাকি কিছু গোলমাল হবে না। আর এইসব জেনেই নাকি তার বাবা রাজী হয়েছেন।

বাবার কথা মনে হ'তেই আবার সুনন্দা ছটফট করে উঠল। কেন, কেন বাবা তাকে একথা জানালেন না? আমি কি বড় হইনি? আমার কি একটা মতামত থাকতে নেই! আবার সে ঝরঝর করে কেঁদে উঠলো। দূরে পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত তিনটে বাজল।

অনুপ পাশ ফিরে শুতেই তার একটা হাত এসে সুনন্দার হাঁটুর উপর পড়ল। সুনন্দা ঘৃনায় হাতখানা স'রিয়ে দিয়ে পাশ বালিশটা দিয়ে মাঝখানে একটা পার্টিশান দিয়ে দিল।

মাথার দিকের জানালাটা খোলা ছিল। শেষ রাতের একটা ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লুটিয়ে প'ড়লো মশারির উপর। ঠাণ্ডা হাওয়ার সাথে সাথে আর একজন যে এসে ঘরে ঢুকলো সে একেবারেই নবাগতা এই সুনন্দার মত। সে হ'ল শিউলি রানী।

বর্ষা বিদায় নিয়েছে। বৃষ্টির নূপুর পরা পদধ্বনি তার দূরে মিলিয়ে গেছে। নেপথ্যে শরতের কণ্ঠস্বর শুনে শিউলি রানী ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে। তার সৌরভ এসে নবাগতা সুনন্দাকে যেন স্বাগতা জানাচ্ছে। ক্ষণেকের জন্য সুনন্দার মন প্রাণ একেবারে জুড়িয়ে গেল। সে মন থেকে সবকিছু ঝেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করল; কিন্তু না, কিছুতেই ঝেড়ে ফেলা যায় না। আবার সেই চিন্তাই তাকে চেপে ধরল। একবার অনুপের দিকে তাকাল, দেখল সে বেশ ঘুমাচ্ছে একেবারে পরম নিশ্চিন্তে। তার আর চিন্তা কি? বিয়ে তো তারা একটা ছাড়া দশটা করতে পারে। জ্বালা তো শুধু এই মেয়েগুলোর!

সুনন্দা ভাবে, কি করতে পারি আমি! এখান থেকে পালিয়েও যেতে পারব না। বাবা-মাকে চিঠি লিখে চলে যাব, তাও হয়ত হবে না। এদের নিয়েই হয়ত থাকতে হবে। কি করে থাকব? মনটা অশ্রদ্ধা আর ঘৃণায় ভ'রে গেছে, এদের উপর ব্যবহারে তা প্রকাশ পাবে। তারপর অশান্তি হবে। স্বামীর তো কোন দোষ নেই। সে তো নিজে ইচ্ছা করে ওই মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেনি। তার মাই তো এই সম্বন্ধ করে বিয়ে দিয়েছেন। কেন ভাল করে খোঁজ খবর না নিয়ে তিনি বিয়ে দিলেন? যত রাগ তার প'ড়লো গিয়ে শাশুড়ীর উপর।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে দুশ্চিন্তার সাগরে সে হাবু-ডুবু খেতে লাগল। কোথাও কূল কিনারা নেই। সারাটা রাত কেটে গেল অনিদ্রায়। ঘুম তার ধারে কাছেও এল না। আজ নিয়ে চার রাত সে ঘুমায় না। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। উঃ, কি অন্ধকার কোথাও একটু আলোর চিহ্নও নেই। তার মনটাও যে এমনি গভীর অন্ধকারে ভ'রে গেছে। এ অন্ধকার কি কোনদিন দূর হবে? এতটুকু আলোও মনের মধ্যে কোথাও নেই। তার সকল আশার আলো, স্বামীর মুখে ওই কথা শোনার পর থেকে চিরকালের মত নিবে গেছে।

আরো কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে গেল সুনন্দার আবোল-তাবোল চিন্তা করতে করতে। সে লক্ষ্য করেনি যে আস্তে আস্তে রাত্রির গুমট অন্ধকার পাতলা হ'য়ে এসেছে। ভোরের ঝিরঝিরে হাওয়াতে তার মনটাও যেন হালকা হ'য়ে এসেছে। সে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজলো।

হঠাৎ দরজায় দুমদুম শব্দ হওয়াতে সুনন্দা চমকে উঠে সোজা হ'য়ে ব'সলো। জেগে উঠে তাকাতেই চোখ প'ড়লো স্বামীর দিকে, দেখলো স্বামী তার দিকে চেয়ে হাসছে। এদিকে ভোর হ'য়ে গেছে।

অনুপ বলল, যাও দরজা খুলে দাও। সব অন্ধকার দূর হ'য়ে যাবে।

সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাট থেকে নামল। আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অনুপও বিছানা থেকে নামল এবং তার পিছনে এসে দাঁড়াল।

সুনন্দা একটু স'রে দাঁড়িয়ে ব'লল, তুমি দরজা খোল।

অনুপ ওর হাত ধ'রে টেনে এনে দরজার সামনে ঠেলে দিয়ে বলল, খোল ভয় নেই, আমি আছি।

সুনন্দা স্বামীর কৌতুক হাসিতে ভরা মুখের দিকে চেয়ে একটু অবাক্ই হোল। তারপর আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে দিল।

অনুপ দরজার পাল্লা দু'টোকে দু'হাত দিয়ে একেবারে খুলে দিল। আর তখনি এক ঝলক আলো এসে প'ড়ল ঘরের মধ্যে। সেই সঙ্গে আর এক ঝলক আলোর মতই একটা সুন্দর ফুটফুটে পাঁচ ছয় বছরের ছেলে এসে সুনন্দার কোলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর তার পেছনে পেছনে আরো দুজন এসে ঘরে ঢুকলো। একজন ওই স্বর্গীয় আলোর মত সুন্দর ছেলেটির বাবা। আর একজন মা, মায়ের কোলেও আর একটি সুন্দর শিশু।

ওরা দু'জনে এগিয়ে এসে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা সুনন্দা ও অনুপকে সুপ্রভাত জানাল। এক মুহূর্তের মধ্যে ঘরখানা একেবারে কলরবে কোলাহলে মুখরিত হ'য়ে উঠল। ঘুমন্ত বাড়ীখানা যেন জেগে উঠলো গভীর নিদ্রা থেকে।

অমিয়া দেবীও ছুটে এলেন। তাঁর স্নান হ'য়ে গেছে। চাকর-ঠাকুর সব যার যার কাজে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। অনেক অনুযোগ অভিযোগের পালা শেষ হোল দু'পক্ষের থেকেই।

মিসেস সিন্‌হা কোলের শিশুটিকে এনে সুনন্দার কাছে দিয়ে ব'ললেন, মেমসাহেবার মুখে কথা নেই কেন? দু'জনে ঝগড়া হ'য়েছে নাকি?

একথা শুনে মিষ্টার সিন্‌হা বললেন, বাঃ বেশ তো তুমি, ১৫ দিন হ'ল বিয়ে হ'য়েছে, এর মধ্যেই ঝগড়া? সবাই বুঝি তোমার মত!

মিসেস ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলেন, দেখ না, কেঁদে কেঁদে মুখ ফুলিয়ে ফেলছেন শ্রীমতী। ঝগড়া শুধু আমিই করি না? তারপর অনুপের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, আচ্ছা বলুন তো, সত্যি ঝগড়া হ'য়েছে নাকি?

অনুপ সুনন্দার মুখের দিকে চেয়ে বলল, না বউদি ঝগড়া নয়, কিন্তু দারুণ একটা ইন্‌টারেষ্টিং কথা আছে, ও কান্না তারই জন্য। আপনারা ফ্রেশ হ'য়ে আসুন, চায়ের টেবিলে মজার ঢেউ বইয়ে দেব। আমি বাথরুমে গেলাম— বলে অনুপ চলে গেল। মিষ্টার এবং মিসেস সিন্‌হাও প্রাতঃকৃত্য সমাধা করতে চলে গেলেন হাসতে হাসতে। রইলো শুধু সুনন্দা।

সুনন্দার কাছে সব ব্যাপার জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে গেল। সূর্যদেবের আগমনে যেমন রাতের গুমট অন্ধকার দূর হ'য়ে যায়, তেমনি সুনন্দার মনের অন্ধকারও দূর হ'য়ে গেল প্রভাতের প্রথম অতিথি যারা এল তাদের আগমনে।

সে কোলের শিশুটিকে আদরে ভ'রিয়ে দিতে দিতে ঠাকুর ঘরের দিকে চলে গেল বিশ্বদেবতাকে প্রণাম জানাতে।

খেলা ভাঙার খেলা

(গান

সু—মো—দে

আজ খেলা ভাঙার খেলা খেলবি আয়—
ক্রিকেট খেলা ভেঙে ফেলবি আয়!
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বিদেশের টিম্ বুঝবে
নিরস্ত্র জনতার সঙ্গে পুলিস বাহিনী যুঝবে,
টিয়ার গ্যাসে জনতাকে কাঁদাবি আয়।

লাঠিপেটা কর্ নিরীহ দর্শককে
দশজনে ঠেঙা একজন লোককে,
ঠেঙিয়ে যাবি একমাথা থেকে শিশু-নারী
তোরা না পারলে ডাকব শেষে মিলিটারী
বাংলার মান পায়ে ঠেলবি আয়!
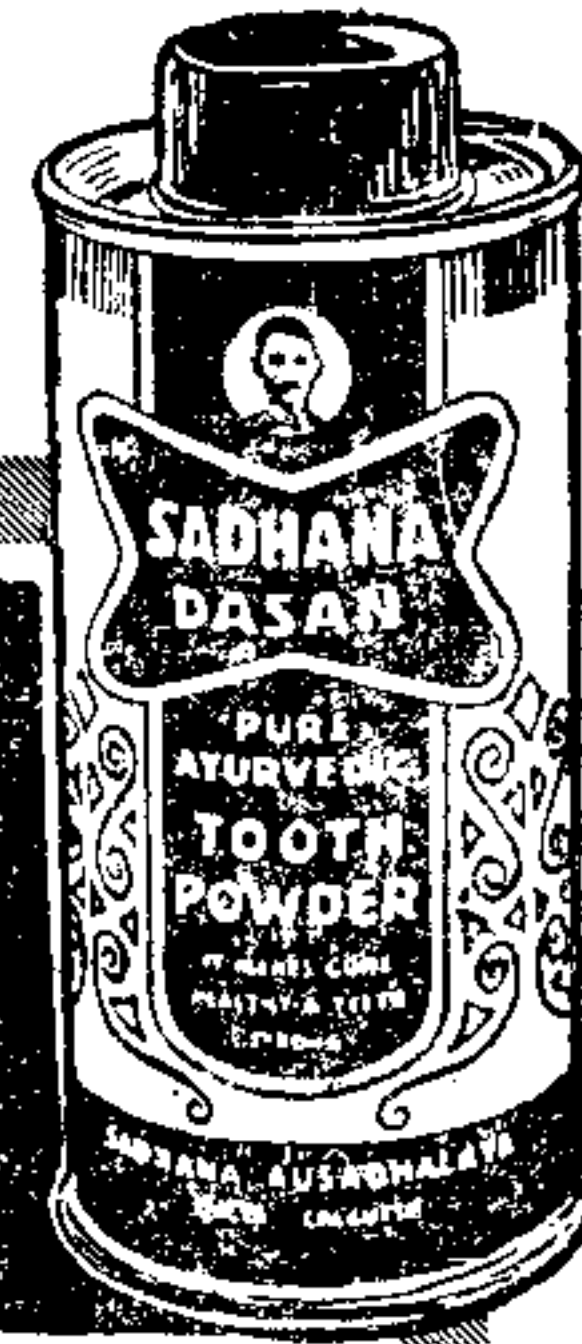
ছাড়পত্র

(গল্প)

শ্রীআদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়

এখনও অবিশ্বাস ?

আমি মনে মনে মনটাকে রুখিয়ে উঠি। চোখ দুটো স্ফীত করে ছেড়ে দিই সামনাসামনি জানালার দিকে।

'কারও কথা বিশ্বাস হয় না, এবার হল ত ?'

কে যেন অন্তর থেকে একটি মাত্র উত্তর দিলে, 'না—'

'না ? না ? চোখ দুটো কি আমার নয় ?' অধৈর্য হয়ে খাটের ওপর বসে পড়ি, দু-হাতের মুঠি দিয়ে মাথার চুলগুলো খামচে ধরে। সন্দেহ সঙ্কুল মন নানা সন্দেহে জাপটে ধরল মনটাকে। তবে ?

কতদিন স্ত্রী বলেছে, 'ওগো এ-পাড়া থেকে বাসাটা তুলে দাও, চোখের সামনে কি ওদের বেহায়াপনা দেখা যায় ? মেয়েটা বড় হচ্ছে, পাড়ার গুণে শেষে না—'

'আঃ, কি যা' তা' বাজে বকছো ?'

'তুমি ত কারও কথা বিশ্বাস কর না, কিন্তু আমি না হয় বাজে বকছি, পাড়াসুদ্ধ সব্বাই কি—'

'আমি নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত কারও কথা বিশ্বাস করি না—'

রত্না এদিকে আসে স্ত্রী চুপ মেরে যায়।

এ-পাড়ায় প্রায় পাঁচ বছর বাস করছি। অশোক আমার সহকর্মী, সে এ বাসাটা ঠিক করে দিয়েছে। বাড়ীখানা যদিও আমাদের বসবাসের উপযোগী নয়, তবু ভাড়া সস্তা—তাই স্ত্রীর শত অনুরোধেও ভাল বাসার খোঁজ করিনি। কেরানী মানুষ, ক' টাকাই-বা মাইনে পাই ?

পাড়াটার নাম জিতেন্দ্রনাথ লেন। আমারই মত কেরানী বা স্বল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এ পাড়ায় বাস করে। পাড়ার মধ্যে না আছে পার্ক, না আছে একটা স্কুল, না আছে নামকরা ডাক্তার। তবু আমি পাড়াটাকে মন্দের ভাল বলি। হিংসা নেই, ঝগড়া ঝাঁটি নেই, পাড়াগাঁয়ের মত পরস্পর পরস্পরের বিপদাপদে ছুটে আসে রাত দুপুরেও। চোর ডাকাতেরা অবশ্য এ পাড়ায় আসতে ভয় পায়, ফিরিওয়ালারা নাক সিঁটকোয়, বন্ধু-বান্ধবেরা গলির মোড় পর্যন্ত এসে, যাক্—লেনটা ত চিনে রাখলাম, পরে একদিন অবসর করে আসব বরং—' বলে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে যায়।

তবু আমরা ছিলাম ভাল বলতে হবে। কিন্তু যত কাল হল যেদিন প্রমথেশবাবু এ পাড়ায় তাঁর পুরানো দুখানা বাড়ী ভেঙে একখানা সুদৃশ্য বাড়ী তৈরী করালেন।

কেউ বলে, প্রমথেশবাবু ভবানীপুরের বাড়ী বেচে দিয়ে এবার এ পাড়ায় উঠে আসবেন, কেউ বলে তিনি ব্লাক মার্কেটিং করে লাখ লাখ টাকা মুনাফা করেছেন এখন কলকাতায় তাঁর যত পুরানো বাড়ী আছে ভেঙে নতুন করে গড়ে ভাড়া দেবেন।

অশোক একদিন বললে, 'প্রমথেশবাবুর সঙ্গে আলাপ করে এলামরে শ্রীনাথ, চমৎকার লোক মাইরি, কে বলবে লক্ষপতি ? এতটুকু অহঙ্কার বলতে নেই, তোর কথাও বলেছি।'

আমি বিরক্ত হয়ে উঠি। 'আমার এমন কি কথা তাঁকে বলবার ছিল শুনি ? মেয়েটা গলায় লেগেছে তাই বলে এলি বুঝি ?'

'নারে—তা' নয়, ভদ্রলোককে চার্মড করে দিয়ে এলাম। শোন্'—আমার কানের কাছে মুখটা এনে ফিসফিস করে বলে, 'একটা চাল মেরে দিয়ে এলাম—দেখবি,—নির্ঘাত বাজিমাত।'

'অর্থাৎ ?' অশোকের মুখের দিকে তাকাই আমি।

প্রমথেশবাবু বললেন, 'ছ মাসের মধ্যে বাড়ী 'কমপ্লিট' হচ্ছে। নীচে পাঁচখানা রুম, দোতলায় পাঁচখানা—লাইট, জল-পায়খানা সব নিয়ম মাফিক।' তাই আমিও না বলে থাকতে পারলাম না, 'শুধু পয়সাই সব নয়, একথা যদি মনে করেন, একটা অনুরোধ করে রাখি আগেভাগে।'

'বলুন—বলুন—'

'আমার এক বন্ধু আছেন। আপনার বাড়ীর সামনা-সামনি এই যে বাড়ীখানা দেখছেন এখানে থাকেন। কিন্তু বলুন ত স্যর, ও বাড়ীতে কোন ভদ্রলোক—বিশেষ করে কোন 'রাইটার'—অর্থাৎ লেখক বাস করতে পারেন ?'

মাথা নাড়েন প্রমথেশবাবু, 'নিশ্চয় না, তাঁর লেখবার ভাবসাব, প্রেরণা—মানে সাহিত্যের উপাদান পাবেন কোত্থেকে ?'

'তাই বলছিলুম স্যর, বাড়ী 'কমপ্লিট' হলেই ত ভাড়া দিচ্ছেন, হেঁ—হেঁ—'

'বলুন—'

'যদি ওঁকে মানে কেরানী মানুষ ত ভাড়াটা একটু কনসিডার করে—'

'বুঝেছি, নিশ্চয় 'হেল্প' করব ওঁকে। সাহিত্যিক মানুষ—আমাদের উচিত, ও হ্যাঁ,—লেখাজোখা কিছু বেড়িয়েছে, কোন কাগজে ?'

থতমত খেয়ে যায় অশোক। মুহূর্তে সামলে নিয়ে বলে, 'না—বেড়োয় নি, আর উনি নাকি লেখাজোখা ছাপাবারও তেমন পক্ষপাতী নন। তবে হালে যা একখানা উপন্যাস লিখেছেন না—যাকে বলে মরণজয়ী উপন্যাস! পড়লে অবাক্ হয়ে যাবেন স্যর, রুদ্রমূর্তি কাগজের নাম শুনেছেন নিশ্চয় ?'

ঘাড় কাত করেন প্রমথেশবাবু, 'হু—'

এডিটরকে ধরেছি, ওঁর সদ্য লেখা উপন্যাসখানা ছাপতেই হবে। পড়েও দেখেছেন উনি, আশ্বাস দিয়েছেন, আসছে শারদীয়া সংখ্যায় নিশ্চয় ছাপবেন।'

'ঠিক আছে, দোতলায় দুটো রুম ওঁকে খুব কম রেটেই ভাড়া দেবো। আর আপনি ত আগেই বলে রেখেছেন,—নীচের একখানা।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ—' বলে অশোক উঠে পড়ে।

আমি চীৎকার করে উঠি, 'এ তুই কি করলি অশোক ? কোনদিন একটা গল্পের দুটো লাইনও একসঙ্গে লিখিনি, কেন ভদ্রলোককে মিথ্যে ভাঁওতা দিয়ে—'

'আরে এ কলকাতা শহর,—একবার ঘরে ঢুকতে পারলে কি প্রমথেশবাবু তোর সাহিত্যের খবর রাখবেন ? ঘাবড়াস না দিব্যি আরামে থাকবি! হ্যাঁ, ভদ্রলোক যদি কোনদিন জিজ্ঞেস করেন—আমি যা' বললাম, তাই বলবি, বুঝলি ?'

অশোক যত গণ্ডগোল বাধিয়ে দিলে। রুদ্রমূর্তি কাগজের অফিসের পাশেই আমাদের অফিস। হঠাৎ একদিন বিকেলে প্রমথেশবাবু গিয়ে হাজির।

পিওন ডেকে দিন আমায়।

'এইযে শ্রীনাথবাবু, শুনুন ত ? রুদ্রমূর্তির সম্পাদক আমার বন্ধু, আসুন আপনার উপন্যাসখানার কথা একটু বলে দিই।'

'কিন্তু—'

'আরে আসুন না মশাই, কাগজের সম্পাদকরাও ত মানুষ!'

'আজ থাক্ প্রমথেশবাবু!'

'নাঃ সাহিত্যিক হলেও আপনার সময় বা সুযোগ জ্ঞান নেই!'

লজ্জায় ঘৃণায় মাথাটা নত হয়ে আসে। একবার ভাবি, সত্য কথাটাই বলি, আবার তখনই ভাবি, তা'হলে অশোকের সম্মান থাকে না। অত্যন্ত নিরুপায় হয়ে প্রমথেশবাবুকে বলি, 'সামনে 'ইয়ারেণ্ডিং'—কাজের বড় তাড়া!'

প্রমথেশবাবু মুখ ভার করে রুদ্রমূর্তির অফিসে ঢোকেন।

তারপর বাড়ী কমপ্লিট হল প্রমথেশবাবুর। কিন্তু তিনি আমাকে বা অশোককে সে ঘর ভাড়া নেবার জন্যে একটি কথাও বললেন না। এমনকি সামনাসামনি দেখা হলে পাশ কাটিয়ে যেতে লাগলেন।

বুঝলাম, আমাদের চালাকী ধরা পড়ে গেছে।

মাস খানেকের মধ্যে প্রমথেশবাবুর বাড়ীখানা ভাড়াটেতে ভরে উঠলো। এ নোংরা পল্লীতে এমন লোভনীয় বাড়ী বেশ চড়া রেটেই বিলি হয়ে গেল।

আমার বাসার দোতলার জানালার সামনে প্রমথেশ-বাবুর বাড়ীর দোতলার একটা কুঠরীর জানালা সামনা-সামনি পড়ে। সে ঘরখানায় থাকেন হরিহরবাবু। হরিহরবাবু কলকাতায় একদা এক ঠিকাদারের অধীনে কাজ করে আজ নিজেই ঠিকাদারী করেন। প্রায় একশো কুলি মিস্ত্রী তাঁর অধীনে কাজ করে। আগে তাঁর বাসা ছিল

৪৬শ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৭৩ | ৯ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

গণতান্ত্রিক ভারতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের প্রতিক্রিয়া

ভারতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন এক যুগান্তকারী রক্তক্ষয়হীন বিপ্লব এনে উপস্থিত করেছে। জগতের অবিশ্বাসীদের সামনে এই কথাটাই আজ উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করছে যে, ভোটের দ্বারাই বিরাট পরিবর্তন সাধন করা যায়। নিঃসন্দেহে এটা ভারতীয় গণতন্ত্রের বিরাট সাফল্য—আর ভারতীয় সংবিধানের সার্থক রূপায়ণেই সেটা সম্ভব হয়েছে।

এবারের সাধারণ নির্বাচনে ভারতের আটটি রাজ্যের বিধান সভায় কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটেছে; এবং বলা বাহুল্য ঐসব রাজ্যে অ-কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনসাধারণ গত কুড়ি বৎসর কংগ্রেসের শাসন ব্যবস্থায় বীতশ্রদ্ধ হয়েই বিরোধী দলগুলিকে ক্ষমতার আসনে বসিয়েছে। জনসাধারণ চায় একটি নূতন ও সুদক্ষ শাসন ব্যবস্থা।

রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অনেকে বলতেন যে, দেশবাসীর উপর কংগ্রেসের প্রভাব এতই বেশী যে একটা ল্যাম্প পোষ্টকেও প্রার্থী মনোনীত করলে ভোটদাতারা তাকে নির্বাচিত করবে। একদিন সত্যিই কংগ্রেসের প্রতিপত্তি ছিল অপ্রতিহত। কিন্তু যুগ-প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে নি। জাতির চরম পরীক্ষার দিনে নেতৃবৃন্দ কেবল সুউচ্চ বক্তৃতা মঞ্চের উচ্চতম ধাপ থেকে জনসাধারণকে কঠোর আত্মসংযমের বাণী বিতরণ করেছেন, অথচ নিজেরা আরামে বাস করেছেন, বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়েছেন—এরচেয়ে

হীনতম ও প্রতিক্রিয়াশীল কাজ আর কিছু হতে পারে না।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন পরাজিত হয়েছেন ও কংগ্রেস এবার বিধান সভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না, একথা জানার পর শুধু কলকাতায় নয়, সমগ্র পশ্চিম বাংলার সর্বত্র আনন্দোচ্ছ্বাসের এক অভূতপূর্ব বন্যা বয়ে যায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন বাংলা দেশের মানুষ প্রফুল্ল-বিজয়ী অজয়বাবুকে তাদের অবিসংবাদী নেতৃপদে বরণ করে নিয়েছিলেন। জনসাধারণের সেই মুক্তি-আনন্দের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যখন বাংলা দেশের সাধারণ মানুষ অজয়বাবুকে নিয়ে ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ড্যালহৌসী স্কোয়ার পরিক্রমা করেছিল অথবা রাইটার্স বিল্ডিংয়ের বারান্দা থেকে হাত নেড়ে সেই মিছিলকে স্বাগত জানিয়েছিল। জনতার ঐকান্তিক আগ্রহেই আজ অজয়বাবু পশ্চিম বাংলার অবিসংবাদী নেতৃপদে আসীন হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে আজ অন্নের অভাব, জীবিকার অভাব এবং সর্বোপরি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থার অভাব। ভারতের অন্যান্য রাজ্য যখন ছোটখাট শিল্পে অগ্রসর হয়ে গেছে, তখন পশ্চিমবঙ্গে শিল্প প্রসারের গতি প্রায় শুদ্ধ হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে অবাঙালী ধনপতিদের মুষ্টি দৃঢ়তর হয়েছে। দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অবহেলায় কলকাতার পৌর জীবনের সমস্যা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। আর একদিকে অবাধে ঘুষের রাজত্ব চলেছে, আমলাতান্ত্রিক হৃদয়হীনতা প্রতিকারহীন হয়ে উঠেছে। অসতের প্রতিপত্তি বেড়েছে, সততার কণ্ঠস্বর শুদ্ধ হয়ে গেছে। সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা অন্তর্হিত হয়েছে। আইনের প্রতি, প্রতিষ্ঠিত শাসনের প্রতি সম্ভ্রম শূন্যে মিলিয়ে গেছে, সর্বস্তরে অসহিষ্ণুতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খলতার দুষ্ট ব্যাধি সংক্রামিত হয়েছে। খাস রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ভিতরে পর্যন্ত অবাধ্যতার ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে দিয়েছিল।

বাংলা দেশের এই দুঃসহ অবস্থা থেকে জাতি ও মানুষকে রক্ষা করবার জন্য যে সৎ-শুদ্ধ চরিত্র, ব্রতধারী মানুষ এসেছেন, কোটি কোটি বঞ্চিত, ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ তাঁর মধ্যে নিজেদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে পেয়েছেন। জনসাধারণ অন্তত: এটুকু আশা করতে পারবেন যে, নূতন মন্ত্রিসভা তাঁদের অভাব-অভিযোগের প্রতি স্বভাবতঃই সহানুভূতি-সম্পন্ন হবেন। তাই পশ্চিম বাংলার প্রথম অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণের পর নূতন বিধান সভার উদ্বোধন উপলক্ষে যে উচ্ছ্বাস উঠেছিল তার কাছে নির্বাচনোত্তর উৎসাহের স্বতঃস্ফূর্ত জোয়ারও যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেছল। বিধান সভা ভবনের চারি পার্শ্বস্থ স্থান সমূহ গুণগ্রাহী জনতার হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। প্রতিটি লোকের মুখে চোখে ফুটে উঠেছিল স্বস্তি ও তৃপ্তির ভাব।

আমাদের বহুবিধ সমস্যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হ'ল খাদ্য। প্রাক্তন কংগ্রেসী সরকার সেই বহু পরিচিত সমস্যার মোকাবিলা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বিরাট ফাটল ছিল, যে ফাটলের রন্ধ্র পথে ভাল কিছু করার সকল প্রেরণা নষ্ট হয়ে যেত।

পশ্চিম বাংলার নূতন অ-কংগ্রেসী সরকার সর্ব শ্রেণীর জনসাধারণের নিকট হ'তে সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। দেশ ও জাতির সম্মুখে সমস্যার সমুদ্র দিগন্ত-বিস্তৃত হয়ে আছে। তাঁরা বলেছেন: সরকারের অর্থ নিতান্তই সীমাবদ্ধ, তৎসত্ত্বেও বিশেষ করে শিক্ষক, চাষী, ক্ষেতের ও কারখানার শ্রমিক এবং স্বল্পবিত্ত সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য নিম্নবিত্তের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করাই তাঁদের সঙ্কল্প।

আজ পশ্চিম বাংলার অ-কংগ্রেসী সরকারের নেতৃবৃন্দের উপর কঠিন দায়িত্বের বোঝা এসে পড়েছে। অভাবের বিরুদ্ধে লড়াই, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, অবসন্নতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁদের জনসাধারণের মধ্যে প্রেরণার সঞ্চার করতে হবে, উন্নততর জীবনের যে সব দাবি পুঞ্জীভূত হয়েছে সীমাবদ্ধ সঙ্গতির মধ্যে সে সব দাবি পূরণের জন্য উদ্যোগী হতে হবে। আমাদের নূতন সরকার যদি আন্তরিকতার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেন, তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই সকলের সহযোগিতা লাভ করবেন, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের নিকট তাঁরা অনুসরণীয় একটি আদর্শ স্থাপন করবেন; আর সর্বোপরি হতাশা-ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষের নিকট তাঁরা অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন।

রঙ্গ চিত্র
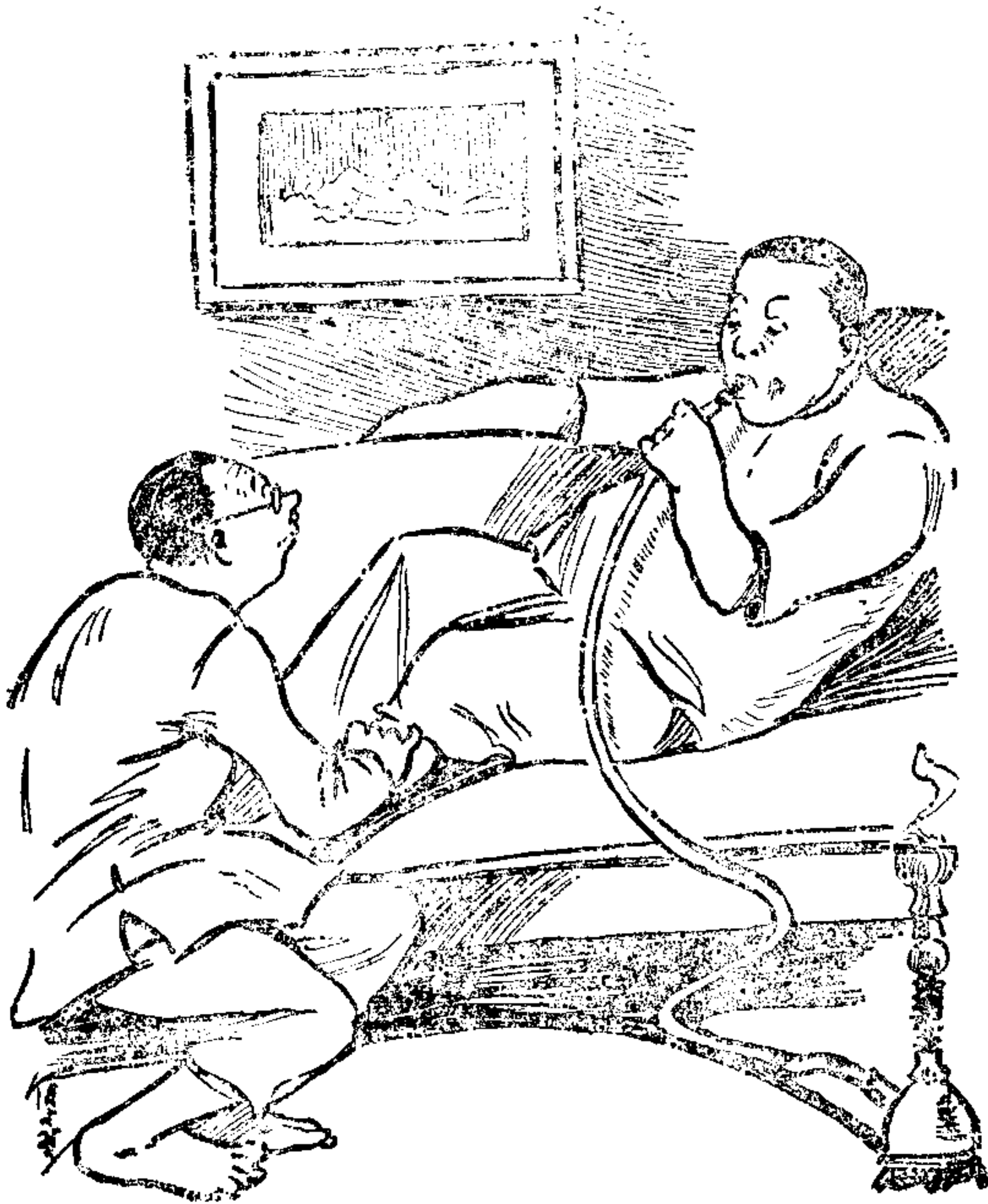
—আজ্ঞে কর্তা, দুষ্টলোকে যে যাই বলে বলুক, এ অ-কংগ্রেসী সরকার কি কখনও টিঁকতে পারে? কংগ্রেসের ২০ বছরের অভিজ্ঞতার কি কোন মূল্য নেই!

নেমনতন্ন

স্থ—মো—দে

মিন্টুর বে'তে খেয়েছি প্রচুর
সেই কথা বলি আজ,
মাইলো এবং কাঁচকলা যুগে
হাতে পাই 'রাম-রাজ'।
খেয়েছি পোলাও মাছ সন্দেশ
রসগোল্লাও সুস্বাদু বেশ,
কপি আলু ডাল চপ লুচি দই
পাঁপড় বেগুন ভাজা ;
ইঁচড়া চাটনি দরবেশ পান
স্থ-মো-দে সেজেছে রাজা।
সমাজতন্ত্রী ভারতবর্ষ
জনতা বাঁদিকে শ্মশানে হর্ষ,
ক্ষুধার জ্বালায় জনতা জঠরে
ছুঁচো দেয় ডন দাদা ;

পঙ্গু বলদ রাষ্ট্র শাসনে
ঘোড়ারূপে চালু গাধা।
খুশি আনন্দ নেমনতন্ন
হা-হাভাতের জুটলো অন্ন,
ভাগ্যে বিবাহে এসেছি যুগলে
হাসিখুশি দুইজনে ;
চিরদিন যদি এরূপ খেতাম
দুঃখ দ'ত না মনে।
মিন্টুর বে'তে খেয়েছিই ভালো
উপোসী স্থ-মো-দে মুখ দেখালো,
মাইলো খাচ্ছি বেদম ছুটছি
গাড়ু নিয়ে কাছা খুলে ;
ভাওতাবাজির সমাজতন্ত্র
ডিক্টেটারের শূলে।

মিতালি

শ্রীআশিসকুমার ব্যানার্জী

ফাগুনের খরতর তাপে
কিঞ্চিৎ আমেজ লাগা, কিঞ্চিৎ
ক্রোধের আভাসে, অথবা হঠাৎ এক
প্রকৃতির বিরোধিতা করা
বিষণ্ণ বিকেলে যেন
কলেজী ছেলের মতো
কেবল বিদ্রূপে হাসাহাসি।

এ বনবনানী হায়, শুধু এই
একমাত্র ভাষাতেই কথা বলে
ওপাশে সমুদ্র যেন
ঘন ঘন ছাড়ে চিঠি
ঝিনুককে পাঠিয়ে পিয়ন।

কখনও এগিয়ে এসে
ছুঁড়ে দিয়ে ছোটখাট সম্ভাষণ দূত
আবার মিলিয়ে যায়
দিগন্তে পড়ে থাকা আকাশের বুকে।

ওপরে আকাশ যেন
নির্নিমেষ দর্শকের মতো
চেয়ে থাকে যুগ-যুগ, তবুও
সে অক্লান্ত নয়নে,
আবার দেখতে যেন
খুশির খেলার মাতামাতি
দিন হলে অস্ত যায়
সূর্যের প্রবল প্রতাপে।

মুহূর্তের জন্যে

সংশ্মিতা

পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসী শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের বুকের উপর থেকে যেন পাষাণ-চাপ অন্তর্হিত হয়ে গেছে। সকলের মুখে-চোখে এক স্মিত উৎফুল্লের ভাব। সাধারণ মানুষ মতবাদের কচকচি বোঝে না। তারা চায় শান্তিপূর্ণ ও সহজ জীবন-যাত্রা পথে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সরবরাহের গ্যারান্টি ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা। সেদিক থেকে কংগ্রেস সরকার সাধারণ মানুষকে হতাশ করেছে।

ব্রিটিশের ঐতিহ্য অনুসরণ করে জাঁকজমকপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার ফলে কংগ্রেসী সরকার জনসাধারণের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংযোগহীন হয়ে পড়েছিল। তারা ভুলে গিয়েছিল যে, সিংহাসনের তখ্‌ত-এ-তাউস থেকে সাম্রাজ্য পরিচালনা করা যায় বটে, কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় না। নেতৃবৃন্দের সেই ভুল উপলব্ধি করার আগেই জনসাধারণ ব্যালট-যুদ্ধে কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের অভিমত (Verdict of the people) ঘোষণা করে দিয়েছে।

জনগণের শুভেচ্ছা ও সমর্থন সম্বল করে পশ্চিম বাংলায় জনপ্রিয় যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক, বর্তমান বাংলা কংগ্রেসের নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় জনসাধারণের ঐকান্তিক আগ্রহে যুক্তফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিম বাংলার নূতন সরকার জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা দুর্নীতিমুক্ত ও সুদক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার দ্বারা বহুবিধ সমস্যার মধ্য দিয়েও দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের এ সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য ও সম্পূর্ণ সময়োপযোগী।

আজকের এই যুগ সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে একটি কথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে, দেশের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল অন্য গোষ্ঠী অত্যন্ত সক্রিয় কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের এই ঘোষিত নীতি অনেকেরই স্বার্থে আঘাত হানবে। তাই ঐসব কায়েমী চক্র থেকে পাল্টা আঘাত হানার ঘটনা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সেইজন্য আজকের দিনে অত্যন্ত সাবধানতা ও সতর্কতার মধ্য দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

রাজ্যের শ্রমনীতি নিয়ে কিছুটা সমালোচনার ঝড় উঠেছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের কোন কোন সদস্য শ্রমিকগণ কর্তৃক ঘেরাও, অবরোধ ইত্যাদি সমর্থন করায় স্বভাবতঃই শিল্পপতিরা কিছুটা বিপন্ন বোধ করছেন। আবার যুক্তফ্রন্ট সরকারের অধিকাংশ সদস্য পুলিসকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার পক্ষপাতী। এই সব ব্যবস্থার ফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। আজকের এই পরিবর্তনের দিনে আকস্মিক ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন কিছুটা বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করতে পারে। আইন ও শৃঙ্খলা এর ফলে বিপন্ন হওয়াও কিছু আশ্চর্যের নয়। এবং রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও সমাজ বিরোধীরা যাতে কোন সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে সে বিষয়ে পূর্ণ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। সেদিক থেকে বিবেচনা করে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে আরও সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে।

জনসাধারণের ঐকান্তিক আগ্রহে যে জনপ্রিয় সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আতিশয্যের প্রাবল্যে সেটা যাতে না নষ্ট হয়ে যায়, তার জন্য সকলকে সচেতন থাকতে হবে।

———

শোক

নন্দ সেন

ডিমাপুর টি এষ্টেটে কাজ করি। কুলি তদারকী। মার্জিত ভাষায় 'কুলিবাবু'। সুতরাং চিরাচরিত লক্ষণগুলি যথেষ্টই বিদ্যমান। শরীর ক্ষীণ, পকেট আরও ক্ষীণ, ভগবানের উপর দোষারোপ করা ছাড়া আর কোন সান্ত্বনাই খুঁজে পাই না। তবে একদিক থেকে আমি কৃতী, সার্থক পুরুষ,—সেটি আর কিছুই নয়, খিটখিটে মেজাজ। সেই সুবাদে আনন্দ-নিরানন্দ সব সংবাদই সম পর্যায়ের। কোন কুলি মজুরী বাড়াবার কথা তুললে অথবা বাড়ীতে মেয়ের অসুখ, ছুটি চাই শুনলে যেমন দাঁত-মুখ খিঁচুতে আরম্ভ করি, তেমনি মেয়ের অতি-সুখ অর্থাৎ বিয়ে—এও আমার দাঁত-মুখ খিঁচুনির উদ্রেক করে। সুতরাং এইসব কারণে কেউ আমাকে দেখতে পারে না।

দু'একজন বুদ্ধিজীবী আবার ভাবিষ্যৎ অন্ন-সংস্থানের ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত সচেতন। সকলে সভয়ে এড়িয়ে চলে, বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকে যাতে আমার মুখ দর্শন না হয়। তা' নাহলে সেদিন উনুনে হাঁড়ি চড়বে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বুঝি না আমার মুখ-দর্শন আর উনুনে হাঁড়ি চড়ার ব্যাপারে কি কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকতে পারে, অথবা এর মধ্যে কোন লজিক আছে কিনা। যাকগে ওরা যা ভাবে ভাবুক।

সেদিন ডিমাপুর টি এষ্টেট থেকে কোহিনুর টি এষ্টেটে চলেছি, কোম্পানির জরুরী কাজে। মাঝে পাহাড়ী নদী। গরমে শুকিয়ে গেছে বালির চড়া। সুতরাং রিক্সা সহজেই পেরোতে পারছে। এক মনে ভাবছি কুলিদের নূতন উপদ্রব বন্ধ করা যায় কি করে। ভাবতে অসহ্য লাগছে যে ওরা আবার চার গণ্ডা পয়সা মজুরী বাড়াতে বলছে। চিন্তায় বিভোর হয়ে আছি।

আচমকা গাড়ী থামাতে সংবিৎ ফিরে পেলাম। লক্ষ করলাম, বার-তের বছরের একটি ছেলে সমস্ত রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে, গায়ে শতচ্ছিন্ন একটা গেঞ্জি, সমস্ত শরীর নোংরা আর ধুলোতে মাখামাখি হয়ে আছে। বিড়বিড় করে এক মনে বকে চলেছে ছেলেটি। ওর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সেই মুহূর্তে সন্দেহের উদ্রেক হ'ল। মুহূর্তে এক নূতন উপদ্রব আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলল। ছেলেটি উঠে পড়ল রিক্সায়। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে আবেগ মথিত করুণ স্বরে চিৎকার করতে লাগল—বাবা! বাবা!!

বিরক্ত বোধ করলাম আমি। যুগপৎ বিস্মিত ও বিমুগ্ধও হ'লাম। মনে পড়ে গেল বছর দু'য়েক আগের একটি দুঃখের স্মৃতি। আমার একমাত্র ছেলেকে হারিয়েছিলাম দু'বছর আগে টাইফয়েডে। আমাদের ঘরে টাইফয়েড হলে তার ফী হিসাবে ছেলে হারানো ছাড়া আর কি-বা থাকতে পারে! সেই থেকে মন্দাকিনী পাথর,—ও যেন বোবা হয়ে গেছে। সারাদিন একরাশ বিষণ্ণতার স্নো মেখে বসে থাকে। বাড়ীতে আমার একটুও ভাল লাগে না। ছেলেটির মুখটা মনে পড়লে নিজেকে ভীষণ দুর্বল আর অপরাধী মনে হয়। সমস্ত সংসার জুড়ে শ্মশানের শূন্যতা নেমে এসেছে। মন্দাকিনীর বদ্ধমূল ধারণা হ'ল, আমার সাথে ওর জীবনটা না জড়ালে তার এমন দুর্দশা হত কিনা সন্দেহ! সময়ের প্রলেপে ক্ষতটা বেশ শুকিয়ে এসেছিল, শুধু তার মুখে কাল চামড়া পড়বার মুহূর্তে সেই অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনলাম, বাবা! বাবা!!

পাগলের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি। কি উৎপাত! স্থানীয় দু-চারজন আমাকে নিরাপদ দূরত্বে টেনে এনে ওকে ফেলে দিল রাস্তায়। শুয়ে পড়েই সেই ছেলেটি শুরু করল আদিম চিৎকার—বাবা! বাবা!!

মুহূর্তে একখানা 'ফিয়াট' গাড়ী এসে চাপা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল। বার কয়েক কেঁপে উঠে চিরদিনের মত নিস্পন্দ হয়ে গেল ছেলেটির প্রাণহীন দেহখানি। ঘটনার আকস্মিকতায় বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে গেলাম। প্রথম বার পুত্র হারিয়েছিলাম টাইফয়েডে, দ্বিতীয় বার পুত্র-হারা হলাম ফিয়াটে।

সাতপাঁচ

শ্রীনাথ

সোভিয়েট সরকার এক সরকারী বিবৃতিতে বলেছে যে, পিকিং-এ আজ যা ঘটছে, সেটা ঘৃণা ও রূঢ়তার দিক দিয়ে চিয়াং-কাইশেক কর্তৃপক্ষকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

—সোভিয়েট সরকারের বোধহয় জানা নেই যে, যে দেশের ছেলে বাপের এবং স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কাজ করে, সে দেশে ঘৃণা বা লজ্জার বালাই নেই!

সংবাদে প্রকাশ, উত্তরপ্রদেশে সরকারী কর্মচারীদের দুই মাসব্যাপী ধর্মঘটের সময়ে উই আর ইঁদুর এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারকদের লাইব্রেরীর সমস্ত বইপত্র খেয়ে শেষ করেছে।

—ভেতরে ভেতরে তারাও বে-আইনের বহুল প্রচলন চাইছে কিনা কে জানে?

কমিউনিষ্ট নেতা এ. কে. গোপালন একই কেন্দ্রে তাঁর "রাজনৈতিক গুরু" কংগ্রেস প্রার্থী টি. ভি. চাথকুট নায়ারের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

—নিশ্চয় গুরুমারা বিদ্যে আয়ত্ত করেছেন তাহ'লে!

সংবাদে প্রকাশ, সিংহলের মেয়েরা জালিয়াতির নিখুঁত পদ্ধতি আর অপূর্ব কৌশলে নাকি পুরুষদের ওপর টেক্কা দিয়েছে।

—তবে ধরা পড়ে কারও সূর্পনখার মত নাক-কান খোয়া গিয়েছে কিনা জানা যায়নি।

আমেদাবাদের দু'টি সাংবাদিক সম্মেলনে "স্বতন্ত্র দল" আগামী সাধারণ নির্বাচনে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা দখল করবে বলে দাবি করেছে।

—স্বতন্ত্র দলের স্বতন্ত্র কথা!

অতি-ভালবাসার জন্য দেশের যুবক যুবতীদের মধ্যে যে কর্ম শৈথিল্য দেখা যাচ্ছে সেজন্য সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র সরকার যুবক যুবতীদের জন্য এক "ভালবাসা কমাও" আন্দোলন শুরু করেছেন।

—এতে বিবিরা গোসা ঘরে খিল দিয়েছে কিনা এখনও জানা যায়নি।

উত্তরপ্রদেশে এবারের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ২২ জন ধর্মীয় নেতা, সাধু, মোহান্ত, সন্ন্যাসী প্রভৃতি অবতীর্ণ হয়েছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

—দিল্লীকা লাড্ডুর আস্বাদ পাবার জন্যে বোধহয়!

শেষ পর্যন্ত সৈন্য বাহিনীর চাপে নতি স্বীকার করে সুকর্ণ নির্বাসিত জীবন যাপনে প্রস্তুত হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

—গুঁতোর চোটে বাবা বলেছে আর কি!

আগ্রা সিটি লোকসভা কেন্দ্রে একজন নির্দলীয় প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারের জন্য মাথা পিছু দৈনিক ৫ পয়সা পারিশ্রমিক ব্যয় করে নির্বাচনী প্রচার ব্যয়ের ইতিহাসে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন।

—ভদ্রলোক বোধহয় নির্বাচনের ফলাফল পূর্বাহ্ণেই টের পেয়েছেন!

———

আহারের পর
দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়
দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ করিতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।
সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা
কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

অশ্রুময়

(গল্প)

কৃষ্ণদাস মণ্ডল

সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে অফিস থেকে বাড়ী ফিরছি। দেহটা অবসাদে আচ্ছন্ন। আমার বাসা থেকে অফিস বেশী দূরে নয় তাই হেঁটেই সাধারণতঃ যাতায়াত করি। বাসের ঐ ভিড় আমার মোটেই ভাল লাগে না। হুড়োহুড়ি করার চাইতে হেঁটে যাওয়াই ভাল বলে মনে করি। কি যেন একটা চিন্তা করতে করতে ঠনঠনিয়া কালীবাড়ী পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি। হঠাৎ একটা ভিক্ষুক কাতরস্বরে বলল —বাবু একটা পয়সা দিন।

চিন্তার রেশ কেটে গেল। মনে মনে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলাম। উপেক্ষা করেই চলে যাচ্ছিলাম। আর কত জনকেই বা দিয়ে পারা যায়! ভিক্ষুকের সংখ্যা দিনে দিনে যা বাড়ছে, তাতে উপেক্ষা না করে আর উপায় নেই। ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত আমাদেরই হয়ত ভিক্ষা করতে বেরুতে হবে।

যা'হোক আবার ভিক্ষুকটা করুণ স্বরে বলল—বাবু একটা পয়সা দিন, আজ দু'দিন খাইনি।

গলার স্বরটা যেন একটু পরিচিত বলে মনে হ'ল। মনে হ'ল এ সুর যেন আমার অনেক দিনের চেনা।

থমকে দাঁড়ালাম। বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মুখে একরাশ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখের কোণে ময়লা জমেছে। চোখে জল চিকচিক করছে। মুখের দিকে তাকিয়ে আমার পরিচিত স্বরকে খুঁজতে চাইলাম। না, কিছু বোঝা গেল না।

মুখ দিয়ে আবার বেরিয়ে এল একগাদা আকুতি। আর একবার তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলাম। শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড়। হাতে একটি লাঠি, মাথার চুলে জট বেঁধেছে।

কিন্তু কে! আমার পরিচিত কি কেউ! মনে হ'ল, যে হয় হোক্‌গে, আমার কি দরকার? কিন্তু আমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলেও পরিচিত কণ্ঠস্বরকে চাপা দিতে পারলাম না। একবার মনে হল জিজ্ঞেস করি তার নাম, কে সে? কিন্তু ক্লান্তিতে কিছুই ভাল লাগছিল না। পকেট থেকে দশটা পয়সা বার করে দিয়ে বাড়ীর দিকেই এগোলাম।

রাত্রিতে বার বার সেই দাড়ি-গোঁফে ভরা মুখখানি মনে পড়তে লাগল। স্মৃতির পটে ঐ জলভরা চোখ আর বেদনা-ব্যথাতুর মুখখানি আমাকে ছেড়ে যেতে চাইল না। কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারলাম না, সে কে!

তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল, একবারে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। দিন পনের পর আবার ঐ রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফিরছি। কালীবাড়ীর সামনে এসে প্রণাম করে দাঁড়ালাম। আবার সেই পরিচিত কণ্ঠের ডাক এল—বাবু একটা পয়সা দিন।

আবার সেই বিস্ময়। আবার সেই জিজ্ঞাসা, তবে ও কে? মনে করলাম, আজ আমাকে জানতেই হবে, কে সে?

কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। বললাম—শোনো, তোমার নাম কি?

আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে কি যেন দেখলে। হয়ত চিন্তা করল, কি ব্যাপার আমি তার নাম জানতে চাই কেন? সে হয়ত এমন উদ্ভট প্রশ্নে কিছুটা হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর সে একটু হাসল, কেন জানিনা—আমার এই উদ্ভট প্রশ্নে, না তার ব্যথা-জনিত কোন দুঃখে! তারপর ঘাড় নিচু করে বলল—কেন বলুন তো।

আমি বললাম—তোমার কণ্ঠটা যেন আমার বহু পরিচিত মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে তুমি আমার অনেক চেনা। কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না, তুমি কে?

আমার মুখের দিকে সে আর একবার তাকাল। মনে হ'ল আমাকে চিনতে চেষ্টা করছে। তবে ওকি আমায়

চিনতে পেরেছে ? মনে হ'ল যেন পেরেছে।

—কি হবে আমার নাম জেনে ?—আমাকে ও প্রশ্ন করল।

প্রশ্নের উত্তর না নিয়েই সে চলে যাচ্ছিল। আমি আবার তাকে ডাকলাম, শোন।

যেন বিরক্তি ভরেই আবার ফিরে দাঁড়াল। অন্তত মুখ দেখে তার সেইরকম মনে হ'ল।

বললাম—বল না তোমার নাম কি ?

আমার কথার উত্তর না দিয়ে সে নিজেই বলে চলল, মনে পড়ে দীপঙ্কর, সেই স্কুলের Annual sports-এর কথা ?

একি তাহ'লে আমায় ও চেনে! বললাম, হ্যাঁ মনে পড়ে।

ও বলেই চলল, সেই স্কুলের মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হচ্ছে। বিভিন্ন খেলায় বিভিন্ন ছেলে অংশ গ্রহণ করেছে। কেউ বা হাই জাম্প, লং জাম্প, রিলে রেস, ব্রেকিং-দেজার, দৌড়, সব খেলা একে একে হয়ে গেল। সব শেষে মাইকে ঘোষণা করা হ'ল, 'গো এজ ইউ লাইক' —এতে যারা অংশগ্রহণ করতে চাও তারা দশ মিনিটের মধ্যে সভাপতি ও প্রধান অতিথির সামনে এসে দাঁড়াও।

প্রধান অতিথি অংশগ্রহণ করেছিলেন এই বাংলা দেশেরই একজন শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ্ অঞ্জন রায়। মনে পড়ে দীপঙ্কর এ সব কথা ?

বললাম, সব মনে পড়ে। কিন্তু তুমি কি............!

—বলছি, বলছি, ব্যস্ত হয়ো না। নামটা পরেই বলছি। 'গো এজ ইউ লাইক'-এতে অনেকে অনেক রকম মেক্ আপ নিয়েছিল। কেউ বা মুচি, কেউ বা ঝাড়ুদার, কেউ বা কৃষক, কেউ বা পাঞ্জাবী, কেউ বা সাহেব। কিন্তু যে ছেলেটাকে তোমরা কেউ চিনতে পারোনি, সেই খোঁড়া, লাঠি হাতে, ছেঁড়া লুঙ্গি, দাড়ি লাগানো, একটা কৌটো হাতে নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে—পেরেছিলে কি তাকে চিনতে ? তোমার কাছেও গিয়েছিলাম, কিন্তু তুমিও আমায় চিনতে পারোনি। কি আশ্চর্য, তাই না! সেই বেশ আর এই বেশ, সেই ভিক্ষুকের সাথে আর আজ এই ভিক্ষুকের সাথে আশ্চর্য রকম মিল আছে, না দীপঙ্কর ?

কৌতূহল সংবরণ করতে পারলাম না। বললাম—তুমি অশ্রু!

—এতক্ষণে চিনেছ! মনে করেছিলাম, চিনতে পারবে না। হ্যাঁ আমি সেই অশ্রুময় ঘোষ।

উঃ, কি সাংঘাতিক জীবনের পরিণতি! মানুষের জীবনে যে এইরকম পরিণতি ঘটতে পারে তা আমার কল্পনারও বাইরে ছিল। ক্লাসে ভাল ছেলেই ছিল অশ্রু। বিধবার একমাত্র সন্তান। ওর মা ঝিয়ের কাজ করতো। কত দুঃখের মধ্যে ওদের জীবন কেটেছে, তা অবর্ণনীয়। কোনদিন হয়তো খাওয়া জুটতো, কোনদিন হয়ত তাও জুটতো না।

একদিন একটা ঘটনার কথা ও আমাকে বলেছিল। ওর মা যে বাড়ীতে কাজ করতো তারা ছিল খুব বড়লোক। ভদ্রলোকের এক ছেলে ছিল, তার নাম সোমনাথ রায়। একটা অল্প ছেঁড়া জামা ওরা বাদ দিয়েছিল। অশ্রুর মা না বলে সেই জামাটা নিয়ে এসেছিল অশ্রুর জন্যে। অশ্রুর মা মনে করেছিল একটু সেলাই করে নিলেই বেশ কিছুদিন পরতে পারবে তার ছেলে। অশ্রু সেই জামাটি গায়ে দিয়ে স্কুলে গিয়েছিল একদিন। সোমনাথও সেই স্কুলে পড়ত। জামাটা দেখে ও চিনতে পারল। সোমনাথ বাড়ী গিয়ে বলল সব ঘটনা। তারপর তার মায়ের কাজ ঐ বাড়ীতে শেষ হয়ে গেল। কোন অনুনয়-বিনয় তারা মানল না।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ওর মায়ের টাইফয়েড হয়, ওষুধের অভাবে মারা গেল অশ্রুর মা। সে সময় অশ্রু ক্লাস টেন-এ পড়ে। ফাইনাল পরীক্ষা আর দেওয়া হ'ল না তার।

আমি সেই সময় চলে আসি কলকাতায় মামাবাড়ীতে। তারপর আর অশ্রুর সাথে দেখা হয়নি। জীবনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমি বি-এ, পাস করেছি। সরকারী অফিসে চাকরিও পেয়েছি। পরিবর্তন হয়েছে পৃথিবীর। পরিবর্তন হয়েছে অশ্রুর জীবনের।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার এ দশা কি করে হ'ল ?

ওর চোখ দিয়ে দরদর করে জল ঝরে পড়ল। বলল—মা মারা যাবার পর আমি আর পড়াশুনা করতে পারিনি। আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম। কি করব! এখানে সেখানে একটা কাজের জন্য ঘুরে বেড়ালাম। তাও কিছু

হ'ল না। তারপর এলাম এই শহর কলকাতায়। দু' দিন কিছু খাইনি। রাস্তা চলতে পারছি না। রাস্তা পার হতে গিয়ে একটা ট্যাক্সি এসে ধাক্কা মারল। তারপর আর আমার জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান ফিরলে দেখি, হাসপাতালে শুয়ে আছি। তারপর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এই বৃত্তি অবলম্বন করেছি।

অশ্রুর নামের সাথে তার সেই 'মেক্ আপে'র সাথে যে তার জীবনের এমন আশ্চর্য মিল হবে তা অশ্রুই কি ভাবতে পেরেছিল? আমার চোখের জল বাধা মানল না। গড়িয়ে পড়ল ফুটপাথের কঠিন মেঝেতে।

আমি বললাম—অশ্রু তুমি আমার বাড়ী চল।

—তা কি করে হয় দীপঙ্কর! বিধাতা আমার জন্য এই-ই ঠিক করেছেন। তাতে দুঃখ কি বল?

পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট তার হাতে দিয়ে চলে এলাম। আমার গতিপথের দিকে সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আর বিড়বিড় করে কি বলল শুনতে পাইনি। হয়ত ও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিল—আমার জীবনের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি।

স্মৃতি তুমি আগুন

(গল্প)

এস. দত্ত

দিন কেটে যায়, পড়ে থাকে স্মৃতি। মানুষ ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারে। কেবল পারে না স্মৃতিকে ভুলে যেতে। আমিও পারিনি ভুলে যেতে আমার অতীতকে, মনের দুয়ারের বাইরে ফেলে দিতে পারিনি স্মৃতির জঞ্জালকে। হয়তো এটাই স্বাভাবিক। নিঝুম রাতে ফাইল দেখতে দেখতে বা কোন ঘটনার রিপোর্ট লিখতে লিখতে বিরক্ত হয়ে বন্দী জীবনটাকে অবজ্ঞা করে দোতলার করিডরে দাঁড়িয়ে ধোঁয়াটে আকাশের দিকে উদাসীন চাউনি মেলে ধরলেই কেন জানিনা লণ্ডনের দিনগুলো মনের পাতায় আজও ভেসে ওঠে। মাত্র দু'বছর ছিলাম লণ্ডনে। তবু এই দু'বছরই আমার জীবনের একটি অধ্যায়—সবচেয়ে সুখের অধ্যায়। জীবনের সব কিছু ভুলে যেতে পারলেও লণ্ডনের সেই মোহময় দিনগুলোকে আমি ভুলে যেতে পারবো না। শত চেষ্টা করেও নয়। লণ্ডনের দিনগুলোকে ভুলে যেতে চাইলে জীবন থেকে মুছে ফেলতে হবে রোজমেলীকে। না-না, তা আমি পারব না—কোনদিন পারব না। লণ্ডন থেকে চলে এসেছি বছর পাঁচেক হল, তবু মনে হচ্ছে এইতো সেদিন এলাম, এখনো বোধহয় সপ্তাহ পার হয়নি।

জার্নালিজিমের কোর্স সবে শেষ করেছি। পাস-পোর্টের জন্য দরখাস্ত করেছি। পাসপোর্ট পেলেই ফিরে যাবো ইণ্ডিয়ায়। অনেক স্বপ্ন তখন চোখে, অনেক আশা মনে। আমি নাম করা সাংবাদিক হবো, সবাই আমাকে চিনবে। বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ হবে। নীল আকাশ আর চিমনির ধোঁয়া দেখে কর্মহীন দিনগুলো কাটাচ্ছিলাম। কুঁড়েমিতে যেন পেয়ে বসেছিল আমায়। চার তলার ঘরে ডানলোপিলোর গদিতে শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে আমি চলমান লণ্ডনের দিকে চেয়ে থাকি দিনের পর দিন। ওরা যেন থামতে শেখেনি। সবাই চলেছে যে যার পথে। আশ্চর্য! ওদের ক্লান্তি নেই, পথ হারিয়ে ওরা কোনদিন থমকে দাঁড়ায় না। ওদের দেখে খুব হিংসা হয়েছিল আমার। মনে হতো ওরা কত সুখী! আর আমরা ইণ্ডিয়ানরা? কেবল বেঁচে থাকার তাগিদে দু'বেলা ছুটাছুটি করছি। পৃথিবীর বিশাল পান্থশালায় আমরা অনেকেই ডিনারে যোগ দিচ্ছি, কিন্তু সাপারে যোগ দেবার সুযোগ পাচ্ছে ক'জন? আমরা অকালে বুড়িয়ে যাচ্ছি, যৌবন শুকিয়ে যাচ্ছে।

তিন চার দিন একটানা কুয়াশার পর সেদিন সূর্যদেবের দেখা মিলেছিলো। সকালটা ছিল অত্যন্ত সুন্দর। বিকেলটাও সমান সুন্দর। এক কথায় বলা যায়, একটা ঝকঝকে দিন। বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে কি একটা জার্নালের বই ওলটাচ্ছিলাম অলস ভাবে। রোজমেলী ঢুকলো ঘরে। বিছানার ওপর উঠে বসলাম। রোজ-মেলীকে বসতে বলতে হ'ল না। ও নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো। উদাস ভাবে চেয়ে রইলো বিকেল বেলার সোনা ছড়ান আকাশের দিকে।

অনেকক্ষণ পরে কথা বললো রোজী (আমি রোজ-মেলীকে রোজী বলেই ডাকতাম)—রায়, বিকেল বেলাটা কেমন রোম্যান্টিক দেখছ?

বুঝলাম স্মৃতির অরণ্যে পথ খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা করছে ও। স্লীপ পিল না খেলে আজ রাতে ওর ঘুম আসবে না। ওকে রাগিয়ে দেবার জন্য একটু তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেই বললাম, হয়তো সুন্দর! আমার উত্তর দেবার ধরন দেখে বোধহয় আঘাত পেলো রোজী।

রেগে গিয়ে বললো, তুমি দেখছি সব কিছুতেই উদাসীন! আচ্ছা, সত্যি ক'রে বলো তো আজকের স্বপ্নালু বিকেলটাকে দেখে তোমার মনে খুশী খুশী ভাব জাগছে কিনা?

অনেকটা ওকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই বললাম, নিশ্চয়ই! কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, বিকেলটা আমার মনের

ওপর তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আমি নীরস সাংবাদিক। আমি কি বুঝবো ছাই বিকেলের সৌন্দর্য!

রোজী শিল্পী। তুলির একটা নিখুঁত টানে ও ধরে রাখতে পারে অতীতকে, মুহূর্তের অনুভূতিকে, সৌন্দর্যকে—রীয়্যালি, সুন্দর ছবি আঁকে রোজী। ওর আঁকা অনেক ছবি আছে আমার কাছে। বিভিন্ন উপলক্ষে ও সেগুলি প্রেজেণ্ট করেছে আমায়। এই ষাট বছর বয়সেও প্রতিদিন রঙ আর তুলি নিয়ে বসে ও। সাদা কাগজের ওপর তুলির মাত্র কয়েকটা টানে অনেক কিছু বোঝায় রোজী। কিন্তু জানি না কেন ও ছবি আঁকে? ছবি আঁকে আর ওয়েষ্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দেয়। কোন পত্রিকায় কোন চিত্র প্রদর্শনীতে পুরস্কারের আশায় পাঠায় না। যশ বা অর্থ কোনটার ওপরই বোধহয় আকর্ষণ নেই রোজীর। কথায় কথায় প্রশ্ন করেছিলাম একদিন—ছবি আঁক কেন?

—ভালো লাগে বলে।—সহজ ছোট্ট উত্তর।

—তাহ'লে ছবিগুলো এঁকে ওয়েষ্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দাও কেন?

—কারণটা জলের মতো সহজ। এখন যা ভালো লাগে, পর মুহূর্তে তা আর ভালো লাগে না।

আর কথা বাড়াতে ইচ্ছা হয়নি আমার। রোজী সব কিছু খুলে না বললেও বুঝেছিলাম, জীবনের গভীরে ওর একটা অপ্রকাশিত বেদনা রয়ে গেছে। একটা কাঁটা সর্বদাই ওর মনে খচখচ বিঁধছে। রোজীর জীবনটাকে জানবার আগ্রহ আমার তীব্র হয়ে উঠেছিল। তবু ভরসা পাইনি। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর জীবন সম্বন্ধে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারিনি ওকে। মনে সাহস হয়নি। প্রায় দু'বছর আছি ওর কাছে। কিন্তু কোনদিন ওকে হাসতে দেখেছি ব'লে তো মনে পড়ছে না। যদি কোনদিন নিজের অজান্তে হেসেছে একটু, কিন্তু তা যেন হাসি নয় কান্না ঢাকবার প্রয়াস পেয়েছে মাত্র।

রোজীর জীবনের ট্র্যাজেডি আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। স্বাচ্ছন্দ্য থাকতেও ওর সুখ নেই—এটাই বোধহয় ওর জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। স্বামীকে হারিয়েছে অল্প বয়সে। নিঃসন্তান সে। এটাও তার জীবনে আর এক ট্র্যাজেডি। সে তার নিজের জীবন সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বলেছিল।

আমি আরো অনেক প্রশ্ন করেছিলাম তার অতীত সম্বন্ধে। কোন উত্তর সে দেয়নি আমার সেসব প্রশ্নের। শুধু বলেছিলো, "Excuse me সুমন্ট, তুমি এর বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করো না। না না, আমি আর কিছুই বলতে পারবো না।"

রোজীর বাড়ীতে আমি পেয়িংগেষ্ট ভাবেই এসেছিলাম। হঠাৎই এসেছিলাম। আর্থারলিগুসে যখন তাঁর বাড়ী বিক্রি ক'রে দিয়ে স্কটল্যাণ্ডে চ'লে গেলেন, তখন আমি খুব Stranded হয়ে পড়লাম। 'লণ্ডন টাইমসে' একটা বিজ্ঞাপন দিলাম যে, কারো বাড়ীতে আমি পেয়িংগেষ্ট হ'য়ে থাকতে চাই। আমার আশ্রয়হীন অবস্থার কথাটাও জানাতে ভুললাম না।

যেদিন বিজ্ঞাপনটা ছাপা হ'ল সেদিন বিকেলেই একটা চিঠি এলো। এক ভদ্রমহিলা তাঁর বাড়ীতে থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমায়। তিনি লিখেছেন—"রয়, তুমি ইণ্ডিয়ান। বিদেশে এসে বিপদে পড়েছ। তোমাকে সাহায্য করাই এখন আমাদের কাজ। না হ'লে লণ্ডন সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা তোমার মনে গেঁথে যাবে। তুমি কাল দশটার মধ্যে আমার এখানে চ'লে এসো। কোন অসুবিধা তোমার হবে না এখানে। চার তলায় একটা ঘর খালি আছে, তাতেই থাকবে তুমি। চার তলায় থেকে মাটিকে হয়তো কাছে পাবে না। কিন্তু হাত বাড়ালেই আকাশ। আশা করি তুমি কাল দশটার মধ্যেই আসছ। তোমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

—রোজমেরী বাটলার"

পরদিন দশটার কিছু আগেই হাজির হয়েছিলাম উত্তর লণ্ডনে রোজীর বাড়ীতে। রোজী আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো। চার তলায় একটা ঘরে পৌঁছে দিয়ে বললো, এই ঘরটা তোমার। ঘরটায় ঢুকলাম। আশ্চর্য হ'তে হ'ল আমায়। কী সুন্দর ভাবে সাজানো ঘরটা! মেঝের ওপর পাতা পাতলা কার্পেট। নীলাভ দেওয়ালে টাঙানো কতকগুলো সুন্দর ল্যাণ্ডস্কেপের ছবি, ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। টেবিলের দু'পাশে দুটো

সোফা আর একখানা চেয়ার, ফ্লাওয়ার ভাসে রাখা এক-গুচ্ছ মেরিগোল্ড আর ক্রিসেনথিয়াম, দেওয়ালে একটা ফ্লোরেসেণ্ট লাইট। ঘরের এক কোণে ডানলোপিলোর গদি বিছানো একটা খাট। আসবাবের বাহুল্য নেই, তবু ঘরটি পরিপাটি করে সাজানো। আমার মনে হ'ল, ঘরের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে রোজীর শিল্পী মনের পরশ রয়েছে।

রোজী বললো—কোন কিছু অসুবিধা হ'লে আমায় জানাতে তুমি ভুলে যেও না কিন্তু।

—নিশ্চয় জানাব। হেসে বললাম আমি।

—তুমি ততক্ষণ জিনিসগুলো গুছিয়ে নাও। আমি কিচেন্ থেকে এখুনি আসছি। তুমি কি খাবে—মাংসের কারী না রোষ্ট ?

—কারীই ভালো।

—জানতাম আমি। ইণ্ডিয়ানরা এতো কারী পছন্দ করে বলেই তো এতো দুর্বল।—হাসতে হাসতে চলে গেল রোজী।

ওকে অদ্ভুত লাগলো আমার। বৃদ্ধা রোজী এত সহজ ভাবে কথা বললো যে আমার মনে হ'ল আমি বুঝি বাংলা দেশের কোন মায়ের কথা শুনছি। একটু বাদেই ফিরে এলো রোজী। আমি বইগুলো গুছিয়ে রাখছিলাম টেবিলের ওপর। ও চট্‌পট করে সাজিয়ে দিল বইগুলো। গুছিয়ে রাখলো অন্যান্য জিনিসপত্তর। আমি আপত্তি করলাম। ও শুনলো না।

কাজ শেষ করে একটা সোফায় ব'সে পড়লো। ঝি দু'কাপ কফি দিয়ে গেল। কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বললো ও—জানো, আমি ইণ্ডিয়ানদের খুব ভালবাসি। জীবনে একবার ইণ্ডিয়ায় গিয়েছিলাম। বিবেকানন্দের দেশটা ঘুরে এসেছি। সেটা আজ থেকে বছর ত্রিশেক আগে। জ্যাক তখন বেঁচেছিলো। মিস্ মেয়োর "মাদার ইণ্ডিয়া" বইটি পড়ে ইণ্ডিয়াকে ঘৃণা করতে শিখেছিলাম। কিন্তু ইণ্ডিয়াকে নিজের চক্ষে দেখে ঘৃণা পরিণত হ'ল শ্রদ্ধায়, রূপান্তরিত হ'ল ভালোবাসায়, তখন থেকেই আমি ইণ্ডিয়াকে ভালবাসি। হয়তো তোমাদের মত পারি না—কারণ ইণ্ডিয়া তো আমার মাদারল্যাণ্ড নয়। তবু ভালবাসি।

একটানা অনেক কথা বললো রোজী। একজন বিদেশিনীর মুখে নিজের দেশের প্রশংসা শুনতে বেশ ভাল লাগলো। আমার ইণ্ডিয়াকে ও ভালবাসে এ কথা বুঝতে একটুও অসুবিধা হয়নি আমার ওর ঘরে ঢুকে। সুইং-ডোর ঠেলে শিল্পী রোজীর সাজানো ঘরে ঢুকতেই প্রথমে নজর পড়েছিলো একটা আলমারিতে ঠাসা ভারত সম্বন্ধে বিভিন্ন বই। বইগুলোর অধিকাংশই ভারতীয় লেখকদের লেখা। মিস্ মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া'খানাকে দেখতে পেলাম না কোথাও। বুঝি না রোজী কেন আমাদের এই বুভুক্ষু দেশটাকে আজও এতো ভালবাসে ? জানতেও চাইনি কোনদিন।

এই ভাবেই রোজীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে দিন দিন। ও আমাকে ক্ষণেকের জন্যেও বুঝতে দেয়নি যে বাড়ী ছেড়ে আমি অনেক দূরে বাস করছি। এখানে আসার পর থেকে মুহূর্তের জন্যও নিঃসঙ্গ বোধ করিনি আমি। মানে সব সময়ই সঙ্গ দিয়ে রোজী আমার নিঃসঙ্গতা ভুলিয়ে দিয়েছিল। এক কথায় বলতে গেলে আমাকে আপন করে নিয়েছিল বিধবা, নিঃসন্তান রোজী—অত্যন্ত আপনার করে নিয়েছিল।

অনেকক্ষণ কি যেন ভাবলো রোজী। তারপর নিম্ন-স্বরে বললো,—মাই বয়, যাও একটু বেড়িয়ে এসো। মন রাঙানো বিকেলটাকে উপভোগ করে এসো। আর ক'দিনই বা থাকছো এখানে, পাসপোর্ট পেলেই তো চলে যাবে। যে ক'দিন আছ লণ্ডনটাকে ভাল করে চিনে নাও, দেখেও নাও, আর হয়তো সুযোগ পাবে না কোনদিন, যাও যাও, একটু ঘুরে এসো।

কথাগুলো খুব করুণ শোনালো আমার কানে। ওর গলার স্বর ভীষণ ভাবে কাঁপছিলো। মনে হ'ল বেহাগ রাগিণী কেঁপে কেঁপে বাজছে, অসহায় ভাবে সমস্ত প্রাণ ঢেলে গাইছে চিরবিদায়ের গান। বুঝলাম আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনা ভারাক্রান্ত করে তুলছে রিক্তা রোজীর হৃদয়-পেয়ালা। ওর কথার মধ্য দিয়ে চল্‌কে পড়লো এক ঝলক ব্যথা। হঠাৎ মনে হ'ল আমি-ই বা ওকে ছেড়ে থাকবো কি করে ? খুব ছোট বেলায় মাকে হারিয়েছি। ও আমার মনে মায়ের স্থান করে নিয়েছিলো।

আমি বললাম—তুমি তো টেগোর পড়েছ রোজী,

তিনি কি বলেছেন জানো ?

—কি বলেছেন ?

—যেতে নাহি দিব, হায়, তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়। চলিতেছে এমনি অনাদি কাল হতে।—আবৃত্তি করলাম আমি।

—টেগোর মানুষের মনের কথা এমন সুন্দর করে বলতে পারতেন বলেই তো তাঁকে বিশ্বকবি বলা হয়। তুমি কবিতা লিখতে পারো ?

—না, কেন বলো তো ? তার প্রশ্নটাতে একটু আশ্চর্য হলাম আমি।

—না, এমনি।

—তবে আমার এক বন্ধু ভাল কবিতা লেখে।

—তাই নাকি ? তাকে বলবে তোমায় আমায় নিয়ে একটা কবিতা লিখতে ?

—বলবো।—ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলাম আমি।

—জানো সুমন্ট, আমার বয়স যখন কম ছিল, যখন স্কুলে বা কলেজে পড়তাম, অনেকেই তখন আমায় নিয়ে কবিতা লিখেছে। তারা লিখে আমার হাতে দিতো। আমি লেখাটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তাদের সামনে উড়িয়ে দিতাম হাওয়ায়। কাগজের টুকরোগুলো বার কয়েক দোলা খেয়ে লুটিয়ে পড়তো মাটির বুকে। বেশ লাগতো। কিন্তু আজ আর আমায় নিয়ে কেউ কবিতা লেখে না। পুরুষ জাতিটা কি স্বার্থপর দেখেছ ? যতদিন আমার যৌবন ছিল, ততদিন আমায় পূজা করেছে। আমার যৌবন ফুরিয়েছে বলে গোটা পৃথিবীটাই যেন আমায় ভুলে গিয়েছে। তুমি এখনো বসে, সুমন্ট! যাও, একটু বেড়িয়ে এসো।

—তুমিও আমার সঙ্গে চলো রোজী।—আবদারের সুরে বললাম আমি।

—না। এদিকে এসো, তোমার টাইটা ভাল করে বাঁধা হয়নি। কি বিশ্রী নড্ হয়েছে।

এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। নিপুণ হাতে টাইটা বেঁধে দিল ও। ও প্রায়ই আমার টাই বেঁধে দিত। না হলে ও তৃপ্তি পেত না। বললাম—অন্যদিন তো আমার সঙ্গেই যাও রোজী আজ আবার না বলছো কেন ?

—আমার শরীরটা আজ ভাল নেই সুমন্ট। তুমি একাই যাও।

রোজীকে অনেক অনুরোধ করলাম। তবু রোজী গেল না আমার সঙ্গে। বড় জিদ ওর। কি করবো বাড়ীতে বসে ? একাই বেড়িয়ে পড়লাম আমি। টেম্সের পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে হাঁটছিলাম। জুন মাসের লণ্ডন। দীর্ঘ একঘেয়ে ও কষ্টকর। শীতের পর এসেছে গ্রীষ্ম। দিকে দিকে সবুজের সমারোহ। কচি ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে খুদে খুদে সাদা ডেইজি আর হলুদ বাটারকাপ ফুল ফুটেছে। অজস্র আগুন যদি লেগে থাকে কোথাও, তা'হলে খোঁজ নিতে হবে লাল টিউলিপ ফুলের বাগানে। গোটা বাগানটা যেন লালে লাল হয়ে গেছে।

রাত্রির ঘোমটা তখনো ঢেকে দেয়নি লণ্ডনকে। আমি আস্তানায় ফিরে এলাম। রোজী ছবি আঁকছিলো। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলে চাইলো একবার। তারপর আবার মুখ নীচু করে আঁকতে শুরু করলো। বুঝলাম ওর মনের গভীরে এখনো স্মৃতির এলোমেলো তরঙ্গ

তোলপাড় করে চলেছে। বাস্তবিকই সেদিনগুলির কথা আমি আজও ভুলিনি।

আমি কলকাতায় ফিরবার জন্য জাহাজে উঠেছিলাম। আমার সঙ্গে ডক পর্যন্ত এসেছিলো রোজী। জাহাজ ছাড়ার আগে দেখেছিলাম ওর চোখের কোল বেয়ে টস-টস করে গড়িয়ে পড়েছিল কয়েক ফোঁটা অশ্রু। জাহাজটা যতক্ষণ না ওর দৃষ্টি সীমার আড়াল হয়েছে, ততক্ষণ ও একভাবে দাঁড়িয়েছিলো ডকে। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখেছি ওর স্থাণুর মতো মূর্তিটিকে। তারপর একসময় মিলিয়ে গেলো রোজীর মূর্তি। আমি ভিজে চোখে ফিরে এলাম কেবিনে।

তারপর পাঁচ বছর কেটে গেছে। এই সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের মধ্যে রোজীর চিঠি পেয়েছি তিনখানা।—আমি লিখেছিলাম দশখানা। ইংরেজরা যত সহজে আপন করতে পারে, পর করতে পারে আরও সহজে। আমি কিন্তু আজও ভুলতে পারিনি রোজীকে। ভুলতে পারিনি লণ্ডনকে, ভুলতে পারিনি লণ্ডনের দিনগুলোকে। কেন জানিনা, সেই বর্ণ মোহময় দিনগুলোর কথা চিন্তা করে অনুভব করি সুখের আমেজ, কখনো বা বিষাদের জ্বালা।

দার্জিলিং মেল এসে থামলো সাঁইথিয়ায়। নামবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন সাংবাদিক সুমন্ত রায়। যাবার আগে বললেন,—চলি ভাই। আবার হয়তো দেখা হবে কোনদিন।—বলে নেমে গেলেন তিনি। ট্রেন ছেড়ে দিল। চুপচাপ বসে রইলাম আমি। এখনো অনেক দেরি শিয়ালদ' পৌছাতে। স্মৃতিপটে ভেসে বেড়াচ্ছিল রোজীর চিন্তা-ক্লিষ্ট মুখের প্রতিচ্ছবি।

রাতের পাখীর জন্য

নচিকেতা ভরদ্বাজ

তোমার বুকের মধ্যে আমি তবে ঘুমোব! আমাকে
দেবে সে নিভৃত দুর্গে—অপরূপ সুচারু খিলান—
কী গভীর কারুকার্য—একটুকু স্থান দেবে? সমৃদ্ধ মসৃণ
তৃষ্ণার নিরিবিলি আমাকে যে ডাকে—ঐ উজ্জ্বল আকাশ—
যেখানে সম্ভ্রান্ত গান—সুনিভৃত শান্তির সোপান—
আমার করুণ দীর্ঘ রুগ্ন এই মাথাটাকে ঢেকে রেখে, দিন—
দিনের সমস্ত দাহ—ব্যর্থতা ষড়যন্ত্র ক্ষুধা ভয়—মুছে দিয়ে সব
দিতে কি পার না তুমি শৈশবের সুন্দর বিশ্বাস?
নাস্তির তীক্ষ্ণ ঝড়ে আমি আজ মৃতপ্রায়—কীট-দষ্ট শব—;
আমাকে বাঁচাতে পার যদি তুমি ঐ সব আশ্চর্য নির্মাণ,
গভীর মেঘের ছন্দ—ছুঁতে দাও—বিবর্ণ দু'হাতে।

আমি তো পাখীর মত যাযাবর নীল শূন্যে অনেক ঘুরেছি,
তোমার নরম জলে—অন্তহীন আলোর দর্পণে
আমি যে দেখেছি মুখ; আমার করুণ ঠোঁটে বিশ্রামের গান
নির্ভয়ে উঠেছে ফুটে; বৃষ্টি দাও, নীল বৃষ্টি—স্পর্শের প্লাবনে
পরিচ্ছন্ন অন্তরাত্মা—তাই ফের অঙ্গনে এসেছি।
তোমার শুভ্রতা, স্বাদ—শ্বেতপদ্ম ফোটা তনুতীর
আমাকে ডেকেছে। জন্মলগ্নে রুদ্র গ্রীষ্ম—জ্যৈষ্ঠের অস্থির,
আমার হৃদয়ে মনে তোমার শুভ্রতা স্পর্শ বর্ষা হয়ে ঝরুক
তাহলে—;

বৃষ্টি বৃষ্টি শুভ্রতার নগ্ন বৃষ্টি—তুমি হও তরুণ আষাঢ়,
আমাকে প্লাবিত কর; ডানা থেকে মুছে দাও দুঃখের ক্লান্তির
সব ধুলো। সন্ধ্যাদীপ জ্বালো তবে নির্জন আঁচলে।
এখন বিশ্রাম নেই। কাল ভোরে সূর্যের দুয়ার
খুলে গেলে চলে যাব। এখন সর্বাঙ্গে তোলো স্পর্শের ঝংকার।
তোমার বুকের মধ্যে শান্তি আছে রাতের পাখীর॥

শেষ ক'টি পাতা

(গল্প)

সুদত্ত

"প্রখ্যাত আইনজীবী স্বর্গতঃ প্রাণতোষ মজুমদারের একমাত্র কন্যা রাখী মজুমদার অধিক পরিমাণে ট্রাঙ্কুলাইজার সেবনে লেক রোডের বাড়িতে আত্মহত্যা ক'রেছেন।"

যুগান্তরের প্রথম পাতার শেষের দিকে বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছিল খবরটা। সংবাদটা সারা শহরে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। উঠতি রোমীয়রা চায়ের কাপে তুফান তুলছিলো রোমান্সের ঝাঁজ মেশানো সংবাদটাকে কেন্দ্র ক'রে। অনাবশ্যক সিগারেটের চিতা জ্বালিয়ে আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধানে মেতে উঠেছিলো গোটা কলকাতার বেকার গোষ্ঠী।

দলবল নিয়ে প্রাণতোষ মজুমদারের লেক রোডের চার তলা বাড়ির দরজায় যখন হাজির হলাম, বেলা তখন প্রায় দশটা। বাড়ির সামনে ছোটখাটো ভিড়। সবার চোখে বিস্মিত চাউনি। চারিদিকে কেমন যেন থমথমে ভাব। পুলিস দেখে আশেপাশের জমায়েত হওয়া মানুষ-গুলো যেন একটু আড়ষ্ট হ'ল। ছলছল চোখে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো রঘুয়া। রঘুয়া এ বাড়ির পুরানো চাকর।

—অন্দর মে লে চল—ওকে বললাম।

—মেরা সাথ আইয়ে সাব—বিহ্বল স্বরে বললো ও।

সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় উঠলুম রঘুয়ার সঙ্গে। একটা ঘরের সামনে থমকে দাঁড়ালো রঘুয়া। হাউহাউ করে কেঁদে ফেললো ও।

কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম—রোডি কিঁউ ?

—সাব, ইয়ে হ্যায় দিদিমণিকা ঘর, আপ অন্দর মে আইয়ে।

দরজায় একটা নাইলনের পর্দা ঝুলছিল, এমব্রয়ডারীর ডিজাইন তোলা একটা সুন্দর পর্দা। পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলুম আমি আর কলকাতা পুলিসের স্পেশাল অফিসার বিমল সোম, আর সব দাঁড়িয়ে রইলো দরজার বাইরে।

ঘরটা বেশ বড়। ছিমছাম। একটা টেবিল, টেবিলের দু'পাশে দু'টো সোফা, একটা রেডিও সেট, দেয়ালে খান কয়েক বিদেশী শিল্পীদের আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপ, খান দুই ছবি—রবীন্দ্রনাথ আর অরবিন্দর। একটা কাচের আলমারিতে ঠাসা বেশ কিছু দেশী-বিদেশী উপন্যাস। আলমারির মাথার ওপর টাঙ্গানো সুদৃশ্য ফ্রেম বাঁধানো ক্যামেরায় ধরা রাখীর জীবনের একটি মিষ্টি-মধুর মুহূর্ত, মিষ্টি মিষ্টি হাসছে ও। কী সুন্দর উঠেছে ফটোটা! নয়ন-কোণায় চকিত কটাক্ষ, অধর কিনারে চটুল হাসি!

চুলগুলো কাঁধের ওপর দিয়ে উদ্ধত যৌবন-পুষ্ট বুকের উপর এসে ঠেকেছে। এই সেই আদিম নারী—আরণ্যক প্রাণের দুরন্ত জীবন-যৌবনের রাশমুক্ত লালসার মূর্তিমতী প্রতীক যেন। ঘরের এক পাশে ডানলোপিলোর গদী আঁটা একটা খাটে কাত হ'য়ে পড়েছিল রাখীর স্পন্দনহীন বর তনু।

কে বলবে রাখী মারা গেছে? দেখলে মনে হয় যেন ও ঘুমুচ্ছে! কাজললতার মতো চোখ দু'টি অর্ধ নিমীলিত। ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত রেশমী সুতোর মতো কোমল নিতম্ব লম্বিত কেশদাম পিঠের দু'দিকে গোছা গোছা ছড়ানো। শুষ্ক ঠোঁট দু'টো অল্প একটু খোলা। মিষ্টার সোম দেয়ালে টাঙানো রাখীর ফটোটার দিকে তৃষিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে-ছিলেন। ফটোটার দিকে তাকিয়ে তাজা মনের পাতায় হয়তো কল্পনার তুলি দিয়ে কোন ছবি আঁকছিলেন।

আমি ঘরের চারিদিকে একবার সন্ধানী দৃষ্টিতে খুঁজলুম। না, তেমন কিছু পেলুম না। শুধু পেলুম একটা ওষুধের শিশি। তখনো গোটা কয়েক ট্রাঙ্কুলাইজার ছিল তার মধ্যে। আর একখানা ডায়ারি, ডায়ারির লেখিকা স্বয়ং রাখী মজুমদার। একটা আত্মহত্যার কেসে তদন্ত করার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট। এতো আর মার্ডার কেস্ নয়। ডাক্তার তো প্রাথমিক পরীক্ষা করেই বলেছে

অত্যধিক ঘুমের ওষুধ খেয়েই রাখীর মৃত্যু ঘটেছে। তবে প্রশ্ন, রাখী কি ভুল ক'রে বেশী স্লিপিং পিল খেয়ে ফেলেছে? না, ইচ্ছাকৃত সুইসাইড্ করেছে? বোঝাই যাচ্ছে যে, এটা সুইসাইড্। কমপক্ষে আট থেকে দশটা ট্রাঙ্কুলাইজার একটা জীবন নষ্ট ক'রতে পারে। আর ভুল ক'রে কেউ অতোগুলো স্লিপিং পিল খায় না।

নিলয় সোম তখন মৃতদেহটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। আমি একটা চুরুট ধরালাম। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে নিলয়বাবু বললেন—কি বুঝলেন, মার্ডার অর সুইসাইড্?

—সিম্পল সুইসাইড্।

—আই সি, বিশ্বদীপবাবু, কিছু পেলেন?

—না, তেমন কিছু নয়। রাখী মজুমদারের লেখা একটা ডায়ারি আর গোটা কয়েক স্লিপিং ট্যাবলেট্।

—তবে আর কি? চলুন এবার ফেরা যাক, বারটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। বাঁ হাতের সরু কবজিতে বাঁধা চৌকা ডায়ালের হাত ঘড়িটার দিকে তাকালেন নিলয় সোম।

—ডেড্ বডিটা মর্গে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি, কি বলেন?

—হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি করুন।—ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন তিনি।

মৃতদেহটা মর্গে পাঠিয়ে যখন থানায় ফিরলাম তখন বেলা দু'টো।

আমি বাসায় ফিরবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। নিলয়-বাবু বাধা দিয়ে বললেন—ডায়ারিটা না পড়েই যাবেন?

—বিকেল বেলায় পড়া যাবে, এখন চলি।

—আপনি তো মশাই আচ্ছা বেরসিক দেখছি। আপনার কোন কৌতূহল নেই? এই ডায়ারির মধ্যে একটা মেয়ে তার জীবন-কাহিনী লিখে গেছে, লিখে গেছে তার আনন্দ-বেদনার কথা, আর আপনি নির্বিকার চিত্তে বলছেন বিকেলে পড়া যাবে, যেন ওতে কিছুই নেই! আপনি তো আবার লেখক। লেখকদের কৌতূহল এত সীমিত হওয়া উচিত নয়।

—বসুন, কি—ন্—তু·······

—কিন্তু কি? বউদি না খেয়ে আপনার জন্যে ব'সে থাকবেন, বাড়ি ফিরলে অভিমান ক'রে কথা বলবেন না, এইতো?

—মশাই বিয়ে তো এখনো ক'রলেন না। 'বউ' বস্তুটি যে কী সেটা বুঝবেন কি ক'রে?

—আমার বুঝে কাজ নেই! আপনারাই বুঝুন।

কথায় পেরে ওঠা যায় না সপ্রতিভ নিলয় সোমের সঙ্গে। অগত্যা বসতে হ'ল। বেয়ারা'কে দিয়ে চা-কেক আনালেন। সেগুলির সদ্ব্যবহার করে একটা চুরুট ধরালাম। উনি নস্যি নিলেন।

সাগ্রহে ডায়ারি পড়তে শুরু করলেন নিলয় সোম। আমি শুনতে লাগলাম। প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘটনাগুলো সহজ সরল ভাষায় লিখেছে রাখী মজুমদার। অন্তরের মণিকোঠায় স্মৃতির শিকল দিয়ে ধ'রে রাখতে চেয়েছে প্রতিটি দিনকে, ছোট ছোট ঘটনাগুলোকে। ডায়ারি লিখে জীবন প্রবাহে বাঁধা দিতে চেয়েছে ও।

একসময় থামলেন নিলয় সোম, বললেন—কালকে রাতের লেখা অংশটুকু এবার পড়ছি। মন দিয়ে শুনুন, উপন্যাসের প্লট পেতে পারেন।

—পড়ুন। চুরুটটা এ্যাসট্রেতে গুঁজে দিলুম, উনি আর একটিপ নস্যি নিয়ে আবার পড়তে শুরু করলেন।

"জানি আত্মহত্যা পাপ, এমনকি আত্মহননের পরি-কল্পনা মনে স্থান দেওয়াও পাপ। আর এও জানি আত্ম-হত্যা করলে নরকেও স্থান হয় না। যদিও আমি চিরকালই বিজ্ঞানের ছাত্রী ছিলাম, কোনরকম সুপারষ্টিশান্ আমার নেই, তবু আমি হিন্দু। তাই হিন্দুধর্মের সংস্কারগুলোও আমার মজ্জাগত। আমার বাবা প্রচণ্ড নাস্তিক ছিলেন, হিন্দুধর্মের কোন সংস্কারই তিনি বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু মা ছিলেন বাবার সম্পূর্ণ বিপরীত। মা—যেমন নিষ্ঠাবতী ছিলেন, ঠিক সেই পরিমাণেই ধর্মভীরু। মনে হয়, মায়ের চরিত্রের এই বিশেষ দিকটা আমাকে প্রভাবান্বিত করেছে।

সব জেনে শুনেও আমি আত্মহত্যা করছি। আর এক মুহূর্তও আমি বাঁচতে চাই না। সব সময় কুনালের প্রতারণা আমার বুকে বাজছে। বেঁচে থাকা মানেই তো কুনালের প্রতারণার বিষাক্ত স্মৃতি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বহন করা। না তা আমি পারবো না। কি, বিয়ে করলে সুখী

হ'তে পারতাম? না, তাও পারতাম না। বিয়ে ক'রলে হয়ত দেহ দিতে হতো একজনকে, কিন্তু মন যে কুনালকে দিয়ে দিয়েছি। এইভাবে দ্বিচারিণী হ'য়ে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে লজ্জার, ভীষন লজ্জার। শুধু আমার পক্ষে বলছি কেন? যে কোন মেয়ের পক্ষেই দ্বিচারিণী হ'য়ে বেঁচে থাকা লজ্জার, এর চাইতে মরে যাওয়া অনেক ভালো, অন্তত আমার তো তাই মনে হয়।

কুনালের আগেও অনেক পুরুষ আমার জীবনে এসেছিল। স্কুল লাইফে প্রশান্ত মিত্র, কলেজ লাইফে প্রফেসর কিরণভূষণ দত্তের ছেলে অরিন্দম দত্ত ও আরও অনেক। আই হ্যাড্ মেনি বয় ফ্রেণ্ডস্! কিন্তু কাউকে প্রেমের স্বীকৃতি দিইনি কোনদিন। ওদের আমি ফ্লার্ট করেছি, প্রশান্ত আমার জন্য পাগল হয়েছিল, সুইসাইড্ ক'রবে ব'লে ভয় দেখিয়েছিল, অরিন্দম আমাকে সংবেদনহীন পাথর ব'লেছিল, আমি কেবল মিষ্টি মিষ্টি হেসেছিলাম। সামান্য পাওয়াকেই ওরা চরম পাওয়া বলে ধ'রে নিয়েছিল। লোভী পুরুষগুলোকে হাতের পুতুল ক'রে রাখতে কেমন যেন মজা লাগতো আমার। তবে আমি অমিয়কে ভালবাসতাম। আর ওকে ভালবাসবো নাই-বা কেন? ও শিক্ষিত, তার ওপর আবার মোটা মাইনের সরকারী চাকরি করে। ওর সঙ্গেই আমার বিয়ের ঠিক ছিল।

কিন্তু কি কুক্ষণেই যে কুনালের সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল! Y. M. C. A.-র নাইট ক্লাবে ব্যাডমিণ্টন খেলছিলাম অমিয়কে পার্টনার নিয়ে। আমাদের বিপক্ষে ছিল কুনাল আর রুচিরা। খেলার সুত্রেই কুনালের সঙ্গে আমার পরিচয়। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব আর বন্ধুত্ব থেকে প্রেম! কুনালকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম। অমিয়র চেয়েও বেশি ভালবেসে ফেলেছিলাম। ও এঞ্জিনিয়ারিং পড়ত। কুনাল আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পারে এ আমি কোনদিন কল্পনাও করিনি। কারণ আমার সঙ্গে যে পুরুষগুলো মিশেছে, সবাই তো আমার প্রেমে মজে গেছে। তাই কথায় কথায় একদিন বিয়ের কথা বললাম ওকে। হো-হো করে হেসে উঠে ও বললো—'বিয়ে! তোমাকে বিয়ে করার তো কোন কথা ছিল না। য়ু আর মাই গার্ল ফ্রেণ্ড, অনলি ফ্রেণ্ড—তার ওপরে নয়। রুচিরার আমাকে বিলেত পাঠাবার কথা দিয়েছেন। বন্ধু হিসাবে তুমি বড় জোর একটা নেমন্তন্ন পাবে।'

কুনালের কথায় চাবুক খেলাম, কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না, ওকে অপমান করতে পারলাম না। কারণ আমিও তো অনেককেই ঠিক এই কথাই বলেছি। তারাও তো আমার মতই আঘাত পেয়েছে। রুচিরার কাছে হেরে গিয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারবো না, তাই আত্মহত্যা করছি।"

থামলেন নির্ময় সোম। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, সেন্টিমেন্টাল, ফুল!

নোটিশ

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী 'সচিত্র শিশির'-এর মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ক বিবরণ।

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা—২২-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

২। প্রকাশনার সময়-ব্যবধান—মাসিক।

৩। মুদ্রাকরের নাম—শ্রীতপনকুমার মিত্র, জাতি—ভারতীয়, বাসস্থান—২২-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

৪। প্রকাশকের নাম—শ্রীতপনকুমার মিত্র, জাতি—ভারতীয়, বাসস্থান—২২।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

৫। সম্পাদকের নাম—শ্রীতপনকুমার মিত্র, জাতি—ভারতীয়, বাসস্থান—২২।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

৬। মালিকের নাম—শ্রীমতী মনোরমা মিত্র, জাতি—ভারতীয়, বাসস্থান—২২।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

আমি, তপনকুমার মিত্র, ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সবই সত্য।

তারিখ— স্বাক্ষর—তপনকুমার মিত্র,

মুদ্রাকর ও প্রকাশক।

অতি অপ্রীতিকর!

মুখে দুর্গন্ধ থাকিলে সমাজে অবাধ মেলামেশা করা যায় না। কাজেই ইহা অনেকের জীবন দুঃখময় করে। প্রতিদিন সাধনা দশন ব্যবহার করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, মুখ জীবাণুমুক্ত হয় ও দন্তরাজি সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

আদর্শ দন্তমঞ্জন

সাধনা ঔষধালয় — ঢাকা

১০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ৬

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর

কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন)
এম. সি. এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য।

রোগের দাওয়াই

(গল্প)

শ্রীউমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্রির ঘন অন্ধকারে বন-প্রান্তর বিভীষিকাময়। খোলা আকাশের নীচে সুবিস্তীর্ণ শূন্য নির্জন প্রান্তর যেন বিরাট এক দৈত্য। এরই এক প্রান্তে কালীকপালী সিদ্ধিমাতার আশ্রম। বেশী দিনের নয়। কিন্তু খুব অল্প দিনের মধ্যেই এই আশ্রম প্রান্তর থেকে বহু গ্রামবাসীর অন্তরে মহিমান্বিত শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বহুলোকের আনাগোনায় আজ নীরব প্রান্তর মুখরিত হয়ে উঠেছে। সকলের মুখে মুখে ফেরে সাক্ষাৎ-ভগবতী কালীকপালী সিদ্ধিমাতার নাম!

অম্বরপুর। কোলকাতা থেকে খুব বেশী দূর নয়। এখানকার মাটির সঙ্গে গাছপালার সঙ্গে মিশে আছে আমার জীবন প্রারম্ভের আদি-ইতিহাস। গঙ্গার বুকে মিশে আছে কত দুপুরের দুরন্ত দস্যিপনার উপাখ্যান।

অম্বরপুরকে ভোলা মানে আমার নিজের অতীতকেই ভোলা। তাই ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে হাজির হলাম সেখানে। অনেক দিন পরে আমাকে পেয়ে গাঁয়ের সকলেই আনন্দিত; কিন্তু তারা সন্তুষ্ট হতে পারল না আমার শরীরের দিকে তাকিয়ে। নানা প্রশ্নে তারা জানতে চাইল আমার সত্যিকারের অসুখটা কি? বয়সের সঙ্গে যদি শরীরের সমতা না থাকে তা' হলে প্রশ্ন আপনিই এসে যায়।

আবার সেই সঙ্গে অর্থ যদি কোন অনর্থ না ঘটায় তা' হ'লে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাতেই হয়। তাই নিমুমামা বললেন—শহরে থাক, পয়সাও রোজগার কর ভাল; চিকিৎসার ত্রুটি কিছুই রাখনি নিশ্চয়ই। তবু আমার একটা কথা শুনবে কি?

আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালাম তাঁর মুখের দিকে। মামার বাড়ীর কেউ আর এখন এখানে থাকে না। নিমুমামাই একমাত্র এখন প্রতিনিধি।

আগের কথার জের টেনে তিনি বললেন—ঐ যে 'চরণখোলার মাঠ', সেখানে কলির দেবতা সাক্ষাৎ ভগবতী মা 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী'র আশ্রম। যে কোন কঠিন ব্যাধি মায়ের কৃপায় কর্পূরের মত উবে যায়। ইচ্ছা হয়তো বল তোমাকে একদিন সেখানে নিয়ে যাই।

—কি আশ্চর্য! ওখানে আবার সিদ্ধেশ্বরী মা কবে উদয় হলেন?

—বেশী দিন নয়! কবে যে কোন ফাঁকে এক সন্ন্যাসিনী ওখানে আশ্রম করে বসেছেন, সঠিক কেউ তা বলতে পারে না। সেইটাই আরও আশ্চর্য। আজ অনেক বড় বড় লোকের ও নেতার আনাগোনা ওখানে। ঐ মাঠ আর ফাঁকা থাকবে না। আমি বলছি, মায়ের কৃপায় শহর হতে বেশীদিন লাগবে না।

—বল কি মামা! কিন্তু কে ঐ সন্ন্যাসিনী?

—সে খোঁজে আমাদের দরকার কি বাপু! উপকার হলেই হ'ল।

—কিন্তু মামা, আজকের জগতে শিক্ষিত লোকেরা এতে সন্তুষ্ট হতে নারাজ। তারা সব কিছুই জানতে চায়, বুঝতে চায়। অন্ধবিশ্বাসে কোন কিছুই মেনে নিতে চায় না।

—দেখ বাপু, সব জিনিসেরই একটা রীতি আছে। ঠাকুর-দেবতাকে যদি বুঝতে চাও তাহলে বনে জঙ্গলেই যেতে হবে। ঘরে বসে বৈজ্ঞানিক সূত্রে তাঁর তথ্য আবিষ্কার করা যায় না। যে জিনিসের যে নিয়ম। যাক্ বাপু। এ নিয়ে তোমার সঙ্গে শুধু শুধু বাজে তর্ক করতে রাজী নই। তোমার ভালর জন্যই বললাম। ইচ্ছা হয়তো আমাকে বোলো। নিয়ে যাবো। কাল অমাবস্যা। মায়ের মহাপূজা।

—তুমি যখন অত করে বলছো। তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

পরের দিন যথারীতি অন্যান্য যাত্রীর মত আমিও যাত্রা করলাম নিমুমামা সমভিব্যাহারে আশ্রমের দিকে। বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া সেই চরণখোলা মাঠের স্মৃতি মনের মধ্যে উদিত হ'ল। কত অজানা ভয় ও রহস্যের উপাখ্যানে ঘেরা ছিল এই মাঠ। সীমানার কাছ দিয়ে যেতে গেলে

আগে বুক কাঁপতো। কুল, বঁইচি ও বাবলা গাছে ঘেরা প্রান্তর আজ জন-কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে। রাতের অন্ধকারে সারি সারি মানুষের আনাগোনা। হাতে হারিকেনের স্বল্প আলো পথের নিশানা বলে দেয়।

আমি অন্যমনস্কভাবে পথ চলতে চলতে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলাম। আমার সামনেই এক বিষধর সাপ। নিমু-মামা 'হো হো' করে হেসে উঠলেন।

—না, তুই আর আগেকার মত নেই। একবারে ভীতু হয়ে গেছিস। ওরে, ওরা সাপ নয়—সাপের খোলস। খোলসকে অত ভয়!

—খোলসকে ভয় পাওয়াই ভাল। আসলকে ভাল ভাবে বুঝতে আর কষ্ট হয় না।

মাঠের পূব-দক্ষিণের কোণে জাগ্রত আরাধ্যা দেবী শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতার আশ্রম। টিনের একটা লম্বা হল ঘর। হ্যাজাকের আলোয় উদ্ভাসিত চারিদিক। হল ঘরের পরই প্যাগোডা আকারে তৈরী টিনের ঘর। তারই মধ্যে দেবী অধিষ্ঠিতা। দেবী এবং যাত্রী সাধারণের মধ্যে ব্যবধান করে রেখেছে একটা বাঁশের বেড়া ও চিক। দেবীর কাছে অন্য কোন আলো নেই। মিটমিট করে ঘিয়ের স্বল্প প্রদীপের আলো-আঁধারে মায়ের মূর্তিটিকে রহস্যময়ী করে রেখেছিল।

নিমুমামা ফিসফিস করে বললেন—মূর্তি তো অনেক রকম দেখতে পাবে। ওর অভিনবত্বে কিছু নেই। আসল হচ্ছে ওর ভেতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা। শক্তি দিয়ে ওঁর কৃপা করুণা মানব কল্যাণে ব্যয় করতে পারা। তবেই মাহাত্ম্য। আর তখনই মা জাগ্রতা জগদ্ধাত্রী। মা কালীকপালীর সাধন বলে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী জাগ্রতা জগৎ জননী, অভয় দায়িনী।

দেখলাম মায়ের কৃপায় আর কিছু হোক আর না হোক। নিমুমামা অনেক ভাল ভাল কথা আয়ত্ত করে ফেলেছেন। অধীর আগ্রহে কৌতূহলের সঙ্গে মা সিদ্ধেশ্বরীর অলৌকিক কৃপালাভের আশায় নীরবে বসে রইলাম। টুং-টুং-টুং তিনবার ঘন্টার শব্দ কানে ভেসে এল। যাত্রী সাধারণ চঞ্চল ও উদ্‌গ্রীব। করুণ আকুলতা ব্যাকুলতা সকলের হৃদয়ে। মোহান্ত মহারানী কালীকপালী

করলেন। সকলে 'মা মা' বলে হর্ষে করতালি দিয়ে মাটিতে সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হল। নিমুমামাও বাদ গেলেন না। আমি একেবারে স্তব্ধ স্তম্ভিত!

সকলে নিজ নিজ অভীষ্ট মনস্কামনা একটা খাতায় লিখে দিতে লাগলেন। সে এক হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি কাণ্ড! বিরাট হইচই শুরু হয়ে গেল। আমিও আমার রোগের বর্ণনা লিখে নাম সই করে দিলাম। একজন ভদ্রলোক এসে খাতাটা নিয়ে গেলেন। পরে জানলাম, ঐ ভদ্রলোকই আশ্রমের ম্যানেজার। তাঁরই সুদক্ষ কর্ম-দক্ষতায় ওখানকার কাজকর্ম সুচারুরূপে পরিচালিত হয়।

মোহান্ত মহারানী তাঁর হাত থেকে খাতাটি নিয়ে প্রতিমার সম্মুখস্থ বেদীতে স্থাপন করে ধ্যানস্থ হলেন। সকলেই নীরব। গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। পূজা-অন্তে মা সকলকে অভিবাদন করে ভিতরে অদৃশ্য হলেন।

নিমুমামা আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন—হবে, হবে। অত তাড়াতাড়ি কোন শুভ কার্য সমাধা হয় না। তুমি বস, আমি অফিস ঘর থেকে জেনে আসছি।

নিমুমামা তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি নীরবে বসে রইলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে নিমুমামা ফিরে এসে বললেন—তোর কপালে এখনও ভোগ আছেরে! তোর আজ কোন আদেশ হ'ল না। সময় নেবে তিন দিন।

—বল কি মামা! এই তিন দিন অনিশ্চয়তার মধ্যে আমাকে এখানে শুধু শুধু বসে থাকতে হবে!

—সকল বড় কাজেরই প্রথমে খানিকটা অনিশ্চয়তা থাকে বই কি! আর শুধু শুধু বলছো কেন? রোগে ভুগছো, সেটা যদি মা'র কৃপায় আরোগ্য হয়,—তার চেয়ে আনন্দের আর কি আছে?

আমি নীরব হ'লাম। আমার মনের পুরনো পাতা উলটিয়ে অস্পষ্ট স্মৃতি ভেসে উঠল। বোঝা না-বোঝার দ্বিধায় মন চিন্তান্বিত হয়ে উঠল।

কেদার মুদীর দোকান ছিল ঠিক আমাদের বাড়ীর সামনেই। অতি সামান্য মাল নিয়ে সে তার ব্যবসা চালাতো। সংসারে তার আপনার বলতে ছিল মা মরা

হরিণী। নেচে নেচে সে গাঁয়ের লোকের স্নেহ-আদর কুড়িয়ে বেড়াত। সম্পর্কহীন ব্যক্তির সঙ্গেও ছিল তার অবাধ মেলামেশা। যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাসে একেবারে ভেসে গিয়েছিল। কেউ খোঁজ পায়নি তার। কিছুদিন পরে নিজেই আবার সহসা ধূমকেতুর মত এসে হাজির হল। সহজ ভাবে মিশল, কথা বলল সকলের সঙ্গে। কোন কুণ্ঠা বা লজ্জা নেই নিজের স্বেচ্ছাচারী স্বৈরিণী জীবনের জন্য। কিন্তু সেবারে পূজার ছুটিতে গিয়ে শুনলাম, চাঁপা বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে স্থায়ীভাবে গাঁ ছেড়েছে। ফিরে আর আসবে না বলে গেছে। কেদার মুদীকে দেখলাম। পরিবর্তনহীন ঐতিহ্য বহনকারী। একই ভাবে চলেছে। নতুনের দিকে কোন আকাঙ্ক্ষা নেই—ফেলে আসা পুরনোর প্রতি নেই কোন মোহ।

কয়েক বছর পরে চাঁপাকে দেখেছিলাম সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউয়ের মোড়ে। বেশভূষায় সুন্দর পারিপাট্য, বহুমূল্য অলঙ্কারে সুসজ্জিতা। কাছেই তার বাসা ছিল। আমাকে আমন্ত্রণও জানিয়েছিল। কিন্তু আমার আর যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মনের তলে হারিয়ে গিয়েছিল সে কথা।

মোহান্ত মহারানীকে দেখে আজ হঠাৎ চাঁপার কথা মনে পড়ে গেল। মহারানী যখন হাত তুলে সকলকে অভিবাদন করছিলেন, তখন চাঁপার সালঙ্কার হাতটির কথা সহসা স্মৃতিপটে উদয় হ'ল। কিন্তু চাঁপার রূপ ছিল সত্যই অপূর্ব। যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি! রং ছিল সত্যকারের চাঁপা ফুলের মত। কিন্তু মোহান্ত মহারানী যেন মা সিদ্ধেশ্বরীর জীবন্ত প্রতীক—আঁধার-কালো অমাবস্যার রাত্রি। বৃথা চিন্তার অবসান ঘটিয়ে তখনকার মত নিমুমামাকে অনুসরণ করলাম।

তিন দিন পরে যথারীতি আদেশ পেলাম। নিমুমামা গিয়ে জেনে এলেন। ছোট্ট একটা কাগজে লেখা ছিল—ছোটবেলায় গাছের ওপর থেকে পড়ে যাওয়ায় পেটে আঘাত লেগেছিল। সেই আঘাত এখন ক্ষতে পরিণত হয়েছে। ক্ষত পেটের খুব গভীরে। ডাক্তারদের নিরূপণের ক্ষমতার বাইরে।

মাথায় হাত দিয়ে মুষড়ে পড়লাম। সত্যই তো ছোট-বেলায় গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। পেটের যন্ত্রণায় তিন মাস শয্যাশায়ী ছিলাম। ডাক্তাররা তো কিছুই ধরতে পারছে না। শুধু খাওয়া-দাওয়ার ওপরই তাদের নজর। অন্যদিকে দৃষ্টি নেই। আর ভাবতে পারলাম না। মনে মনে ঠিক করলাম, আজই একবার মায়ের কাছে যেতে হবে। জানতে হবে নিরাময়ের ওষুধ।

নিমুমামাকে প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা মামা, দিনের বেলা মোহান্ত মহারানীর সঙ্গে দেখা করা যায় না, কথা বলা যায় না?

—ক্ষেপেছিস্! দিনের বেলা মাঠের ত্রিসীমানায় কারও যাবার ক্ষমতা নেই। আর মা নিজে কারও সঙ্গে কথা বলেন না। সবই তাঁর ঐ ম্যানেজার মারফত। এটা দেখেও বুঝলি না?—মামা উত্তর দিলেন।

—তাইতো মামা, আচ্ছা থাক!

নিমুমামাকে থাক বললেও মন কিন্তু প্রবোধ মানছিল না। অধৈর্য হয়ে উঠলাম। রাত্রের অন্ধকারে একা একা চুপিসারে গিয়ে হাজির হলাম আশ্রমে। আশ্রমের কাজ তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি একা। ম্যানেজারবাবু এসে আহ্বান জানালেন আমাকে ভিতরে। আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেলাম। মা'র তা'হলে আমার ওপর কৃপা হয়েছে! কম্পিত বক্ষে অগ্রসর হলাম অন্তঃপুরের দিকে। ম্যানেজারবাবু আমাকে একটি সুসজ্জিত ঘরে বসিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মুগ্ধ হলাম ঘরের আভিজাত্য দেখে। কবে কোথা দিয়ে এই তেপান্তরে এসব এল! সত্যই অলৌকিক! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বসে আছি, এমন সময়ে সহসা ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে কে যেন বলে উঠল—নাস্তিক ঘেঁটুবাবু, মনে বিশ্বাস এসেছে এতক্ষণে!—বিশ্বাসে মিলয় বস্তু তর্কে বহুদূর!

একি! আমার ডাক নাম ধরে ডাকে কে? নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হ'ল। ঘন রাত্রির অন্ধকারে চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

সহসা দরজার পর্দা কেঁপে উঠল। আমি উৎকীর্ণ হলাম। একি! আমি স্বপ্ন দেখছি, না সত্য! এক জ্যোতির্ময়ী দেবী মূর্তি আমার সামনে উপস্থিত। আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। ভাল করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ধরে দেখি, এ যে আমার চির পরিচিতা চাঁপা—কেদার মুদীর মেয়ে।

—কিগো ঠাকুর, অমন অবাক্ হয়ে দেখছো কি? চিনতে পারছো না আমাকে, আমি তোমাদের সেই চাঁপা।

—এও কি সম্ভব!

—অসম্ভব কেন? এ-যুগে সবই সম্ভব। এ-যুগ ধাপ্পার যুগ। সোজা পথে কিছু হয় না। তাই এ পথে পা বাড়িয়েছি। কতখানি সফল হয়েছি ভবিষ্যতই তা' বলে দেবে। ব্যাঙ্কে আমার মোটামুটি সুখে থাকবার মত কিছু জমেছে। ওটা দ্বিগুণ হতে বেশী সময়ও লাগবে না। তুমিও আসতে পার আমাদের সঙ্গে। ঐ যে দেখছো ম্যানেজার, উনিই আমার গুরুদেব,—বুদ্ধির জাহাজ। কোন জেলই ওঁকে এক মাসের বেশী আটকে রাখতে পারেনি। এ-রকম জেল খেটেছেন দশবার। এখন কিন্তু একেবারে অন্যরূপ। ওঁর বুদ্ধি আর আমার রূপ—এই আমাদের ব্যবসার মূলধন।

আমি বোবা-দৃষ্টি মেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—নাগো, ঠাকুর না, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। বলতো—একদিন তোমরাই আমার কত বদনাম করেছ। প্রকারান্তরে আজ আবার তোমরাই........

কথা শেষ হয় না। একজন পরিচারিকা ত্রস্তে ঘরে প্রবেশ করে বলে—শেঠ আনন্দলাল এসেছেন কোলকাতা থেকে সোজা মোটরে।

—তাতে কি হয়েছে? বীণাদি'কে ডেকে দেগে যা।

—কিন্তু তিনি আপনার........

—আমি যা বললাম তাই করগে। তাতে যদি তিনি না শোনেন, যা ভাল বোঝেন করুনগে। আমি এখন যেতে পারবো না।

—তাহলে বুঝতে পারছো অসীম, কোটীপতি শেঠ আনন্দলাল সেও ছুটে আসে এখানে। রাতের অন্ধকারে দেশের অনেক গণ্যমান্য লোকই আসেন এখানে। আমাকেও ব্যবস্থা করতে হয়। আমাদের স্বার্থ ওদের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আমার প্রয়োজন টাকার, আর ওদের প্রয়োজন—চল নিজের চোখেই তা দেখবে।

আমি অনুসরণ করি তাকে। একের পর এক সুসজ্জিত কক্ষ নীরব রাতের অভিসারে মাতোয়ারা। আমিই নীরবতা ভঙ্গ করে বলি—সেদিন অন্ধকারে সন্দেহ যে আমার হয়নি, তা নয়। কিন্তু কালো রং আমার সব গুলিয়ে দিয়েছিল।

—সেটা আমার খোলস। এখন খোলা আছে। আজকের দুনিয়ায় সকলেই তো আসল রূপ ঢেকে খোলস গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই ওতে আমার কোন দোষ নেই।

—কিন্তু শহর ছেড়ে এই অজ পাড়াগাঁয়ে কেন?

—সেটাও কি তোমার মত বুদ্ধিমানকে বলে দিতে হবে? শহরে আর আমাদের কোন চটক নেই। ঘরোয়া রূপসীরা আমাদের ব্যবসা নষ্ট করে দিয়েছে। তাদের চাহিদা অল্প। সিনেমার টিকিট, শাড়ী কিম্বা খুব বড় জোর হালকা একখানা গয়না। কিন্তু আমাদের খিদে অত অল্পে মেটে না। তাছাড়া কারও সেবা দাসীর প্রত্যাশায় দিন গুনতে আমি নারাজ।

এরপর আর কিছুই অস্পষ্ট থাকে না। দিনের আলোর মত সবই চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। সামনে সিদ্ধেশ্বরীর নামাবলী ঢাকা দিয়ে পিছনে চলছে পাপের বেসাতী। অন্ধবিশ্বাসী মোহগ্রস্ত গ্রামের লোক প্রচারের মহিমায় উদ্‌ভ্রান্ত। গাঁয়ে গাঁয়ে ছড়িয়ে রয়েছে এদের 'এজেণ্ট্'। তারাই সব তথ্য যোগাড় করে। কে জানে নিমুমামাও তাদেরই একজন কিনা!

নিজের উদরের রোগ সারাতে গিয়ে সমাজের সর্বাঙ্গে যে ক্যান্সার রয়েছে তাই প্রত্যক্ষ করে এলাম! কিন্তু আমরা কি কেউ রেহাই পাব?

৪৬শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৭৩ | ১০ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

যুক্তফ্রণ্ট সরকারের শ্রমনীতির পুনর্বিন্যাস দরকার

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ায় সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মনে যথেষ্ট আশা ও উৎফুল্লের সঞ্চার হয়েছিল। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও বেদনার কারণ এবার হয়ত দূর হ'তে পারে—এরকম একটা প্রত্যাশা অনেকেই করেছিলেন। জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা তাঁদের নীতি নির্ধারণ করবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের ঐকান্তিক আগ্রহাতিশয্যে এখানে অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। পূর্বতন সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধন ও প্রগতিধর্মী নীতি অবলম্বনের দ্বারা দেশ তথা জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের এক প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল এই সরকারের কাছ থেকে।

বাস্তবে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের নীতি কার্যকরী করতে গিয়ে এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের শ্রমনীতি বর্তমানে কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। শ্রমিকদের দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে মালিক পক্ষকে ঘেরাও করার নীতিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমর্থন করায় এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার শ্রমিকদের সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত অধিকার। এই দাবি সমর্থনের পিছনে যুক্তি আছে। কিন্তু 'ঘেরাও' সমর্থনের পিছনে যে কি যুক্তি থাকতে পারে, তা' একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হয়ত জানা আছে। সাধারণতঃ শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক মোটেই প্রীতিদায়ক হয় না। অতএব সেখানে এমন কোন নীতি গ্রহণ না করাই বাঞ্ছনীয়, যাতে উভয়ের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে

পারে।

একথা অনস্বীকার্য যে, 'ঘেরাও' একটি জবরদস্তি নীতি। বলপ্রয়োগের দ্বারা কোন দাবি আদায় করা, সে দাবি যতই যুক্তি সঙ্গত হোক না কেন, মোটেই সমর্থনীয় নয়। সুস্থ পরিবেশে ও সম্মানজনক শর্তে যে কোন সমস্যার মীমাংসা বাঞ্ছনীয়। হুমকি দিয়ে বা বলপ্রয়োগের ভয় দেখিয়ে দাবি আদায় করাকে কখনওই সমর্থন করা যায় না। সুস্থ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন কেউই একে নৈতিক সমর্থন জানাতে পারেন না। স্বভাবতঃই এর ফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

শ্রমিকদের যেমন ন্যায্য দাবি আদায়ের যুক্তি আছে, তেমনি মালিক পক্ষেরও বলপ্রয়োগের দ্বারা দাবি আদায় নীতির বিরুদ্ধে কিছু বক্তব্য থাকতে পারে। অধিকার বোধ কখনওই একতরফা হ'তে পারে না। তার সঙ্গে কিছুটা দায়িত্ব বোধের মিশ্রণ থাকা বাঞ্ছনীয়। অবিমিশ্র অধিকার বোধ বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। সম্ভবতঃ আমাদের নব গঠিত সরকার সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন নন।

শ্রমিক পক্ষের যেমন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের মৌলিক অধিকার আছে, ঠিক তেমনই মালিক পক্ষেরও মৌলিক অধিকার আছে স্বাধীন-ভাবে শিল্প বা ব্যবসায়-বানিজ্য পরিচালনা করার। যে কোন পক্ষেরই মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়, গুরুতর অপরাধ।

এইভাবে 'ঘেরাও' নীতি সরকারী সমর্থন পুষ্ট হলে আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আইন ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব যাঁদের উপর ন্যস্ত, তাঁরা যদি নিরপেক্ষ ভাবে পরিচালিত না হ'ন, তা হলে স্বভাবতঃই জনসাধারণ নিরাপত্তার অভাব অনুভব করবেন। এরকম এক অস্বাচ্ছন্দ্যকর অবস্থা কোন সরকারই বরদাস্ত করতে পারে না।

পুলিসের বাড়াবাড়ি মোটেই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু তাই জন্যে তাকে জনসাধারণের ভৃত্য সাজিয়ে নিষ্ক্রিয় করে রাখলে রাষ্ট্রের শাসন-যন্ত্র পরিচালনা করা কিছুটা কষ্টকর হ'য়ে পড়ে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন—পুলিসের এই কর্তব্য পালনে শৈথিল্য দেখা দিলে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। তার উপর আছে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের নানা ফন্দি ফিকির। এই সবের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি না রাখলে যুক্তফ্রন্ট সরকার যে সব উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, সেগুলি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের এমন কোন নীতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নয়, যার ফলে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। রাজ্য সরকারের কি শ্রমনীতি, কি ভূমিনীতি উভয় বিষয়েই কিছুটা মধ্যপথ অবলম্বন করা উচিত। হঠকারিতার দ্বারা সাধু উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পরিবর্তে বরং পণ্ড হওয়ার আশঙ্কাই অধিক। আমরা আশাকরি রাজ্য সরকার তাঁদের গৃহীত শ্রমনীতি পুনরায় পর্যালোচনা করে দেখবেন ও উভয়পক্ষ-সম্মত কোন নীতি নির্ধারণ করতে সমর্থ হবেন।

হতে চাই, কিন্তু হায়!

বীথি সেন

কবি হতে চাই, কবিতা যে আসে না—
হতে চাই শিল্পী, তুলি হাতে থাকে না!
শিক্ষিত হতে চাই, পাঠে মন বসে না
ধার্মিক হতে চাই, ধর্মে যে মতি মোর লয় না,
রাজনীতিক হতে চাই, কূটনীতি আসে না,

ব্যবসায়ী হতে চাই, ভেজাল ত হাতে ওঠে না!
হৃদয়হীন হতে চাই, হৃদয় তা বোঝে না—
সংসারী হতে চাই, পয়সা যে আসে না
যমালয়ে যেতে চাই, যম মোরে নেয় না—
এই পৃথিবীর এই যে নিয়ম, কেউ যে তা বোঝে না!

রঙ্গ চিত্র

কনে দেখা

—আজকের ঘেরাওয়ের দিনে অফিসার ছেলের জন্যে একটি জাঁদরেল বউ না হলে পালটা-ঘেরাওয়ের ব্যবস্থা করবে কে? স্লিম ফিগার থিয়োরী কিন্তু আপাততঃ অচল! অতএব........

সাতপাঁচ

শ্রীনাথ

একটি সংবাদপত্রের শিরোনামা, "কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে শ্রীকামরাজ, 'মুখে সমাজতন্ত্র অথচ কাজের বেলায় কিছু নয়'।"

—কেবল বাক্‌চাতুরি!

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কলা বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণীতে এ-বছর ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

—নারী-প্রগতির চাক্ষুষ প্রমাণ!

—'পাগলা ছাড়া কেহ বর্তমানে মন্ত্রিত্বের পিছনে দৌড়াইবে না' ব'লে স্বতন্ত্র দলের নেতা সি. রাজগোপালাচারী মন্তব্য করেছেন।

—"ক্ষ্যাপা খুঁজিয়া ফেরে পরশ পাথর!"

সংবাদে প্রকাশ, খড়দহ খালে যে লক গেট দেওয়া হয়েছে পরীক্ষাগারে তার মালমশলা পরীক্ষার পর প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে যে, নিযুক্ত প্রথম শ্রেণীর সরকারী ঠিকাদার মহোদয় সিমেন্টের বদলে স্রেফ গঙ্গামাটি আর বালি দিয়ে ওই গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ কার্যটি সমাধা করছিলেন।

—আমরা পরীক্ষা না করেই বলতে পারি, ঠিকাদার যখন প্রথম শ্রেণীর তখন নিশ্চয় মাটিটা খাঁটি গঙ্গামাটিই ব্যবহার করা হয়েছে।

সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ কে. এল. রাও বলেন যে, স্বাক্ষর করা গাদা গাদা কাগজপত্রের ঠেলায় তিনি প্রায়ই ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

—মন্ত্রিত্বের ফ্যাসাদ আর কি—তবু এর একটা মোহ আছে!

লোকসভায় সদস্য বৃন্দের ক্রমাগত প্রশ্নবানের মধ্যে শ্রীদেশাই স্বীকার করেছেন যে, মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে যে সুফল আশা করা গিয়েছিল, সে আশা পূরণ হয়নি।

—স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধির মত নাকি!

সংবাদে প্রকাশ, সরকারী দুগ্ধ কেন্দ্রে (ডিপো নং—৭০৯) যে দুধ দেওয়া হয় তার একটি গরুর দুধের বোতলের মধ্যে অসংখ্য সাদা সাদা পোকা আর আরশোলার ঠ্যাং ও ডানা পাওয়া গিয়েছিল।

—উপরি পাওনা আর কি!

মধ্য কলকাতার ডাঃ জগবন্ধু লেনের একটি বাড়ীতে জলের কল থেকে কয়েকটি সর্প জাতীয় জীব বের হ'লে ঐ এলাকায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

—এতো নতুন নয়, এত চঞ্চল হলে চলবে কেন?

প্রেসিডেণ্ট আয়ুব বলেছেন, 'ভারতের জন্যেই পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি'।

—অর্থাৎ ভারতকে জব্দ করবার জন্যে আয়ুব বদ্ধ পরিকর!

মুহূর্তের জন্যে

সংস্মিতা

ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন এক যুগান্তকারী বিপ্লব এনে উপস্থিত করেছে। এই নির্বাচনে জনসাধারণ অধিকতর সচেতনতার সঙ্গে তাঁদের অমূল্য রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করায় কেন্দ্রে ও রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় বেশ কিছুটা পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেছে। অন্যান্য বারের মত এখন আর কোন এক দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, যার জোরে সেই দলের স্থায়িত্ব কালের নিশ্চয়তা থাকতে পারে।

আবার রাষ্ট্রপতির নির্বাচনও অদূরবর্তী হয়ে এসেছে; পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা আরও অনেক বেড়ে গেছে। সংবিধান মতে, রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। এর আগে কি কেন্দ্রে, কি রাজ্যে সর্বত্রই কংগ্রেস দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। এবারে ৯টি রাজ্য কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং কেন্দ্রে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও বিরোধী দল যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছে।

এবারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে একদিকে যেরূপ বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা, অপর দিকে সেইরূপ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহাওয়া সৃষ্ট হয়েছে। রাষ্ট্রপতি পদের জন্য অন্যান্য বহু প্রার্থী থাকলেও প্রধানতঃ কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীজাকির হোসেন ও বিরোধী দল সমর্থিত শ্রীকোকা সুব্বা রাওয়ের মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলবে। পদ-মর্যাদানুযায়ী উপ-রাষ্ট্রপতি পদের জন্য যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে, তার তীব্রতা স্বভাবতঃই অনেক কম।

ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীকোকা সুব্বা রাও তাঁর অসাধারণ মনীষা প্রভাবে আইন জগতে ইতিমধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। সুপ্রীম কোর্টে প্রথমে বিচারপতি ও পরে প্রধান বিচারপতি থাকাকালীন সময়ে তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় সমগ্র ভারতবর্ষে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। তার মধ্যে সাম্প্রতিক সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত মামলার রায়, পাশপোর্ট মামলার রায় প্রভৃতির মধ্যে তাঁর অসাধারণ মনীষা-প্রতিভার এক বিশেষ দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে অবতীর্ণ হবার জন্য বিরোধী দল সমূহ একযোগে তাঁকে অনুরোধ করলে তিনি সে প্রস্তাবে সম্মতি দেন এবং প্রধান বিচারপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

পর পর দু'বার উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার পর শ্রীজাকির হোসেন আর একই পদে থাকতে চান না। তাই কংগ্রেস দল তাঁকেই রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করেছে। আর বিরোধী দল সমূহের সমর্থন পুষ্ট হয়ে শ্রীসুব্বা রাও রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হয়েছেন।

সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি সমানুপাতিক হারে অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। বলা বাহুল্য এই অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনে পার্টির হুইপ অনুযায়ী নির্বাচক মণ্ডলী তাঁদের ভোট দানের অধিকার প্রয়োগ করে থাকেন। সেক্ষেত্রে যোগ্যতা নিরূপণের কোন প্রশ্ন নেই।

এই নির্বাচনে বিজয়লক্ষ্মী কার গলায় মালা দেবে সে কথা বলা খুবই কঠিন। তবে যোগ্যতম প্রার্থী যদি পরাজিত হয়—যেটা হওয়ার সম্ভাবনা মোটেই কম নয়—সেটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক!

রঙ বদলায়

শ্রীঅজিত রায়

—কেমন আছেন ?—পাশ থেকে কে যেন নরম গলায় প্রশ্ন করে।

রাস্তায় লোক চলাচলের বিরাম নেই। সকালের সূর্যের আলো সারা শহরটার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে, ছড়িয়ে পড়েছে চৌরাস্তার মোড়ে, আছড়ে পড়েছে ট্রাম রাস্তার ওপর। বাসগুলো যাচ্ছে তীব্রগতিতে। বাসের মানুষগুলোর মুখে অন্যমনস্কতার ছাপ। আশেপাশের মনিহারী দোকানগুলিতে নানা ধরনের জিনিস সাজানো। মোড়ের এককোণে বাজার। বাজারে তখনও লোকের ভিড় হয়নি।

অনিমেষ যাচ্ছিল ছেঁড়া পাঞ্জাবিটা গায়ে চাপিয়ে ময়লা একটা ধুতি পরে, রুক্ষ চুলে থলি হাতে বাজার করতে। শরতের সকালের এই মিঠে রোদ আর চৌরাস্তার এই ব্যস্ত শোভা উপভোগ করবার মনও যেন তার নষ্ট হয়ে গেছে—অবকাশ তো নেই-ই! আকাশের দিকে না তাকিয়েই সূর্যের অবস্থান অনুমান করা যায়।

এই শারদ প্রভাতের স্নিগ্ধ স্পর্শ মনকে সজীব করে, কিন্তু ভোগ করবার সুযোগ নেই তার। বাড়ীতে গৃহিণী আর দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। গলির মধ্যে ছোট বাড়ী। সামান্য যা রোজগার তার তাই দিয়ে সংসার চালানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মাসের প্রথম দিকেই মাইনে যায় শেষ হয়ে। মাসের শেষে ধার করতে হয়। বিয়ে করেছিল বাধ্য হয়ে। যৌবনের আদর্শবাদের প্রভাব তখন ম্লান হয়ে এসেছে, আত্মীয়স্বজন সবাই মোটামুটি গুছিয়ে নিয়েছে, বড় ভাই ভাল একটা চাকরি পেয়েছে, ছোট বোনের সচ্ছল পরিবারে বিয়ে হয়েছে—মেজভাই Competitive পরীক্ষা দিচ্ছে, সে-ই তখন একলা পড়ল। আদর্শ নিয়ে মাতামাতি করে এখন চাকরি জোটানোই শক্ত হ'ল।

পাশের স্কুলটায় একটা শিক্ষকতার কাজ পেল। তাই নিয়েই চলে যাচ্ছিল তার। এমনি করেই হয়ত দিন কাটত, এমন সময়ে এক আত্মীয়ার মুখে এক অল্প বয়সী অনূঢ়া কন্যার গুণপনার কথা শুনল সে। সুগৃহিণী হবে। আর এই বয়সেই তো বিবাহ হয়। সংসারে একটি শান্ত লক্ষ্মী না এলে ঘরের শোভাই বাড়ে না। নানাদিক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করাই স্থির করল সে।

বিয়ে ক'রে প্রথম দু' একটা বছর ভালই চলেছিল। মনে হয়েছিল উদ্দাম সক্রিয় যৌবনের দিনগুলোর পর ঘরের শান্তির মধ্যে নতুন করে স্থিতি পাবে সে। কিন্তু লক্ষ্মী মেয়েটি এবার নতুন রূপ ধরলেন। সংসারের জন্য আজ এটা চাই, কাল সেটা চাই—অর্থ রোজগারের ক্ষমতা নেই কেন—এই সামান্য আয়ে কি হয়—ইত্যাদি নানা মন্তব্য কানে আসতে লাগল।

স্ত্রীর নাম মমতা। বাপের বাড়িতে স্কুল ফাইন্যাল পর্যন্ত পড়েছে। বাবা কেরানী ছিলেন, কাজেই সচ্ছলতা তাদের সংসারে কোনোদিনই ছিল না। সেই পরিবারে মানুষ হবে মনের ঔদার্য, দৃষ্টির প্রসারতা কিছুই যেন ছিল না মমতার। আর সব ত্যাগ করে স্কুলমাষ্টারি নিয়েও অনিমেষের দৃষ্টিভঙ্গী এতটা বদলায় নি যে সংসারের দিন যাপনের আর প্রাণ ধারণের দায়িত্বকে একমাত্র কর্তব্য বলে স্বীকার করে নেবে সে। কাজেই সামান্য ব্যাপারেই মমতার সঙ্গে বিরোধ শুরু হতে লাগল অনিমেষের।

অনিমেষ নিজে রোজই বাজার করতে যায়। একটা পাঞ্জাবি আর একটা কাপড় তোলা আছে বাজারে যাবার জন্য। রোজ সকালে তাই পরে থলে হাতে বাজারের দিকে রওনা হয়। অন্যান্য দিনের মত সে আজও তাই যাচ্ছিল।

এমন সময়ে পাশ থেকে নারীকণ্ঠে কে যেন বললো, কোথায় যাচ্ছেন ?

বিশ্বাস হয় না অনিমেষের। আজ থেকে সাত বছর আগে দেখা হয়েছিল প্রথম। ক্ষীণ পেলব দেহ। শাড়ীটা যেন লতার মত জড়ানো থাকত দেহে। মুখটা শুভ্র। সুন্দর দাঁত বার করে হাসলে আরও ভাল দেখাত।

সেই ১৯৫৬ সাল। ১৭ বছরের একটি সুশ্রী মেয়ে ডায়াসে উঠে বলল, সমাজতন্ত্রে ঋণের ভার চাপানো উচিত যাদের বিত্ত আছে তাদের ওপর ;—যারা বিত্তহীন,

বিকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাদের সম্পর্ক ক্ষয়িষ্ণু—তারা কি করে গ্রহণ করবে উন্নয়ন বোঝার ভার? পরিকল্পনা চলছে সারা দেশ জুড়ে। কোথাও গড়ে উঠছে ভারী শিল্প, কোথাও জলসেচ পরিকল্পনার ভার। কিন্তু রসদ কে যোগাবে? তাই নিয়ে এই বিতণ্ডা। যে কোনো জনগণের হিতকামী সমাজ ব্যবস্থায় এর ভার চাপানো হ'ত সম্পদশালীদের ওপর।

বিবৃতিটা বেশ ভাল লাগল অনিমেষের। তারপর আর দ্বিধা করেনি অনিমেষ। আলাপ করে নিয়েছিল রীতার সঙ্গে। রীতা ধনী এ্যাডভোকেটের মেয়ে। কিন্তু দেশের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা সম্পর্কে তার আগ্রহ আছে। মানুষের দীন অবস্থা সম্পর্কে সে অচেতন নয়। তার মনে হয়, সত্যকার পরিকল্পনা সেটাই যা মানুষের মনুষ্যত্বকে স্বীকার করে, ব্যক্তি স্বাধীনতাকে মূল্য দেয়, দেশের আয় বণ্টনে অসাম্য দূর করার চেষ্টা করে।

অনিমেষ কথা প্রসঙ্গে তাকে আরও বাস্তব ভূমিতে নামাতে চেষ্টা করে। বলে, ধরুন যদি এক জনসাধারণের দল ক্ষমতা পায়—কি করবে তারা? কি করবে তারা ভূমির উন্নতি বিধানের জন্য? কোন্‌টার ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করবে—খাদ্যের ওপর না ভারী শিল্পের ওপর?

সামনের রাস্তা দিয়ে পতাকা সামনে রেখে এক শোভাযাত্রা যায়। রীতা ভাবে, যদি এই দেশে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হ'ত—কি হ'ত তাহলে? মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বের উপশম হ'ত কি? সাধারণ মানুষ পেত মর্যাদা, পেত মনুষ্যত্বের অধিকার? রীতার ইচ্ছা করে সমস্ত সামাজিক ও পারিবারিক বাধা নিষেধ লঙ্ঘন করে সেও নেমে আসে মাটিতে—যোগ দেয় এই উত্তাল উদ্দাম শোভাযাত্রায়। এগিয়ে চলে এই উৎসাহী প্রাণচঞ্চল যুবক-যুবতীদের সঙ্গে।

একদিন ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিল বেরোয়—অনিমেষ তাতে যোগ দেয়। এক জায়গায় পুলিসের সঙ্গে মিছিলের বিরোধ বাধে। পুলিস লাঠি চার্জ করে—অনিমেষের মাথায় পুলিসের লাঠির আঘাত লাগে।

রীতা যায় তাকে হাসপাতালে দেখতে। বিছানায় শোওয়া মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অনিমেষের চোখ দুটো উত্তেজনায় জ্বলছিল। সে বলছিল পার্শ্ববর্তী একজনকে উদ্দেশ করে,—সাধারণের কাছ থেকে বিদেশী কোম্পানি অর্থ লুটবে—এ অসহ্য। জাতীয়করণ করো এইসব বিদেশী প্রতিষ্ঠান, এর থেকে দেশের উন্নতির অর্থ মিলবে। তার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

রীতার বাবা বলেছিলেন, গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশে পার্লামেন্টের মধ্য দিয়েই মতামত জানানো সম্ভব—তার জন্য মিছিল বার করবার প্রয়োজন নেই। রীতা তবুও এসেছে। তারও ইচ্ছা হয়, বাসনা হয় আন্দোলনে যোগ দিতে—সাধারণ মানুষের কাছে আসতে, তাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হতে, সমাজের সত্যকার পরিচয় জানতে, নিজের মতামত ব্যক্ত করতে। কিন্তু পারে না সে। তার অনেক বাধা। বাবা তার এ সমস্তর ঘোর বিরোধী। সমাজ তার প্রতিকূল। সে খুব বেশী হ'লে পারে একটি বই পড়ে Review করতে বা সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে। কিন্তু জীবনে জীবন যোগ করার জন্য যে মনের প্রয়োজন, তা তার নেই। তার সমস্ত পরিবেশ তার চেতনার বিরোধী। তার মা চান I. A. S. Officer-এর সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে হোক্‌। তার আত্মীয়-পরিজনরা সমাজের শ্রেণী বিভেদ সম্পর্কে ও নিজেদের কৌলীন্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।

একদিন সে অনিমেষের সঙ্গে এক রেস্তোরাঁয় বসেছিল। মনের কথা তুলে ধরেছিল অনিমেষের সামনে। সে আরাম করে বসে বলছিল তার ভবিষ্যৎ জীবনটা কিরকম হবে। ইতিহাস খুব ভাল করে পড়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-উত্তর কালের ইতিহাস লিখবে। পরিশ্রম ক'রে রসদ জোগাড় করবে।

অনিমেষ ভাবছিল রীতার সামাজিক পরিবেশ সুস্থ বিপ্লবী জীবনের কত পরিপন্থী। রীতার উচিত তার সামর্থ্য নিয়ে, বুদ্ধি নিয়ে কাজে যোগ দেওয়া। বোঝাতে চাইল রীতাকে সেকথা অনিমেষ। কিন্তু রীতা তার অসামর্থ্যের কথা বলে। বলে, সে ভবিষ্যৎ জীবনে ইতিহাসের লেখিকা হবে—সেও তো এক ধরনের কাজ। কিন্তু I. A. S. পাত্রের জন্য আগ্রহ তার মায়ের এতটুকুও কমেনি। অনিমেষ তাদের বাড়ীতে গেলে আর বিশেষ

আমলই পায় না।

তারপর কলেজের পাঠ শেষ করেছে রীতা। আবার সে মিশে যায় তার সেই পরিবারের উপর তলাকার অবরুদ্ধ আবহাওয়ায়। বিকেলে টি পার্টিতে যোগ দেওয়া—এখন তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। তা সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে যখন রীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় অনিমেষের, রীতা তার মনের কথা বার বার বলে—সে স্রষ্টা হবে, ইতিহাস লিখবে—যাতে থাকবে সাধারণ মানুষের দুঃখ-আনন্দের পরিচয়।

এরপর অনেক বছর কেটে গিয়েছে। অনিমেষও অবস্থার চাপে সাধারন চাকরি নিয়ে সাধারণ গৃহস্থ সেজেছে। তার মনের উত্তাপও গেছে কমে। বিপ্লবী চেতনা কেমন থিতিয়ে গেছে। দেশের বৈপ্লবিক সম্ভাবনার চাইতে স্ত্রীর সঙ্গে কোনো চলতি বাংলা ছবি নিয়েই তার আড্ডা জমে বেশী। প্রতি রবিবার গৃহিণীকে কোনো ছবি দেখাতে নিয়ে যেতে হয়। মাঝে মাঝে শুধু অতীত দিনের সেই ঝড়, যা হৃদয় মনকে নাড়া দিয়েছিল তার কথা মনে হয়।

আজ সে যখন বাজার যাচ্ছিল, পাশ থেকে যে নারীটি ডাকল—তাকিয়ে দেখল অনিমেষ—হ্যাঁ, মাথার ঘোমটা আর সিঁথির লাল সিঁদুর—সেই ১০ বছর আগেকার সুন্দরী মেয়েটিকে চেনা যায়।

রীতা বলে, আমার স্বামী High Court-এর Advocate. এইতো কাছেই বাড়ী—একদিন আসুন না, আলাপ করিয়ে দেব। আবার শুরু করে রীতা—উঃ, কি ঝামেলাতেই না পড়েছি, ননদের জন্য একখানা শাড়ী কিনতে হবে, আর পারি না আমি। দেখুন না, এই মোটা চেহারা নিয়ে কি নড়াচড়া করা যায়!—সত্যিই সে মোটা হয়েছে। নাঃ, ইতিহাস লেখার কথা একবারও বলল না রীতা। শুধু ওর ওনার গল্প আর সাংসারিক ঝামেলা নিয়েই বলে চলল। দেখে মনে হল সুখীই হয়েছে সে।

দশ বছর আগেকার সেই কথাগুলো আর ওঠে না ওদের মধ্যে। কেউ কাউকে এড়িয়েও যায় না। কিন্তু আলাপের পটভূমিকা যেন বদলে গেছে। ১৯৫৬ সাল আর ১৯৬৬ সাল—দশ বছরে দেশের অবস্থা হয়তো অল্পই পালটেছে—একই সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলছে—কিন্তু একটি বিশেষ অবস্থায় দুটি মানুষ যা কল্পনা করেছিল, জীবনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে তাদের সে কল্পনা মেলেনি। তাদের সেই অতীত দিনের চিন্তার সাক্ষীও আজ আর কেউ নেই।

দীঘির নিটোল বুকে

শ্রীনারায়ণ পাত্র, সাহিত্যমণি

ঐ জল টল্ টল্ দীঘির নিটোল বুকে
পদ্মকলি পদ্মপাতায় জড়িয়ে আছে সুখে।
ওর কালো ঢেউএর তালে,
পদ্মফুলে ভ্রমর মধু ঢালে,
পানকৌড়ি বিফল আশায় ঘুরছে বিরস মুখে—
দীঘির নিটোল বুকে!

ঐ ঝির্ ঝির্ ঝির্ ঝাউএর পাতা কাঁপে,
কোকিল বধূ কাঁদছে একা গভীর মনোতাপে।

(তাই) ছিঁড়ে গেছে প্রেমের ফুল-ডোর,
চখাবধূ ওরি ব্যথায় ভাসছে গভীর দুখে—
দীঘির নিটোল বুকে!

ঐ ছম্ ছম্ ছম্ রাতের আকাশ তলে।
জ্বল্ জ্বল্ জ্বল্ তারার জোনাক্ জ্বলে।
কার নীরব বাঁশীর সুরে,
বিরহিণী কাঁদছে কোথায় দূরে,
তার চাওয়া-পাওয়া চিরতরে গেছে বুঝি চুকে—

রাতের মন

(গল্প)

শ্রীসুশোভন দত্ত

বাসন্তী সকালের মিষ্টি রোদের আলতো চুমা বড় ভালো লাগছিল অশ্রুর। বড় বড় আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকাগুলোর ফাঁক থেকে চোরের মতো উঁকি মারছিল মুঠো মুঠো স্বচ্ছ নীল আকাশ। বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। কাল শুতে শুতে রাত দু'টো বেজে গিয়েছিলো। কতক্ষণই বা ঘুমিয়েছে? এর মধ্যেই সকাল হ'য়ে গেল। রোদ্দুর উঠলো। বার কতক এপাশ ওপাশ করলো ও। শাড়িটা এলোমেলো হ'য়ে গিয়েছিলো। গুছিয়ে পরলো। তারপর ক্লান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেল স্যুইটের এ্যাটাচ্‌ড্‌ টয়েলেটের দিকে। শাওয়ার বাথে গরম জলে চান করলো ভাল ক'রে।

একটা হালকা জাফরান রঙের শাড়ি পরলো ও। ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে পিঠের ওপর ছড়ানো নিতম্বস্পর্শী কুঞ্চিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদামে অলস হাতে চিরুনি বুলাল কিছুক্ষণ। না, চুল বাঁধলো না ও। একটা লাল রিবন জড়িয়ে নিলো এলোচুলে। ছোট্ট কপালে কুমকুমের টিপ পড়লো। পাউডারের পাপটা মুখে ঘ'ষে নিলো একবার। যথেষ্ট! এর বেশি আর প্রয়োজন নেই। প্রকৃতি ওকে যা দিয়েছে, কোন পুরুষের চোখে নেশা জাগাতে তাই যথেষ্ট। কিন্তু মেয়েরা স্বভাবতই একটু প্রসাধন-প্রিয়া। প্রসাধন যেন নারী দেহের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই ওটাকে বাদ দিলে স্ত্রীজাতি অচল।

হাত ঘড়িটার দিকে একবার আড় চোখে তাকালো অশ্রু, ন'টা বাজে। এখনো এক ঘণ্টা দেরি আছে। দশটার সময় ওর কুন্তলের সঙ্গে বেরুবার কথা। দু'দিনের মধ্যে গোটা প্যারিটাকে অন্তত একবার দেখে নিতে হবে তো! ফিপথ্‌ মে-ই তো ফিরে যেতে হবে ইণ্ডিয়ায়। তারপর বিয়ে ক'রবে ওরা। ছোট্ট সংসার, ছিমছাম একটা ছোট বাড়ি। ইশ! ভাবতে কি ভালই যে লাগছে! তখনো ও এয়ার হোষ্টেস্‌ থাকবে। কুন্তলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে। জাপান, য়ুরোপ, ফ্রান্স, রাশিয়া—আরও, আরও অনেক জায়গায়। সারা বিশ্ব জুড়ে হবে ওদের সংসার। মনের সাগরে কল্পনার তরী ভাসিয়ে সোফার ওপর ব'সলো অশ্রু। একটা সিনেমা সাপ্তাহিক খুলে এলোমেলো ভাবে পাতা ওলটাতে লাগলো। রাবিশ! যত্তো সব ন্যুড্‌ পিকচারস্‌! পত্রিকাটা বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়ায় অশ্রু। স্যুইং ডোর ঠেলে হাসি হাসি মুখে হাজির হয় কুন্তল।

—কি ব্যাপার, আধ ঘণ্টা আগেই হাজির হ'লে যে? —মুচকি হেসে প্রশ্ন করলো অশ্রু।

—তোমার তো সাজতে এক ঘণ্টা লাগে, তাই।

—বাজে কথা। তোমার প্যাণ্ট-কোট-টাই পরতে যা সময় লাগে, তার চেয়েও কম সময় লাগে আমার।

—তাই নাকি? দেখি কতক্ষণ লাগে। নাও শুরু করো।

—আমি রেডি।

—মাই গড্‌! এতক্ষণ খেয়ালই করিনি। সত্যি তোমাকে আজ খুব চার্মিং লাগছে।

—মোটেই না।

—বিলিভ্‌ মি। ভাবছি অচেনা দেশে তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে কিনা।

—কেন, হারিয়ে যাবো নাকি?

—হারিয়ে না যেতে পারো, কিন্তু কেউ কেড়েও তো নিতে পারে।

—উঃ, কেড়ে নিলেই হ'ল।—কপট ক্রোধে ঠোঁট ওলটালো অশ্রু।

—সত্যি!—অপূর্ব আবেশে অশ্রুর কমনীয় মুখখানা বুকের ভেতর টেনে আনলো ও। ওর কপোলে উষ্ণ অধর ছোঁয়ালো একবার।

অশ্রু সেন আর কুন্তল চ্যাটার্জী। একজন এয়ার হোষ্টেস, আর একজন পাইলট। প্রায় এক বছর আগে-পরে এয়ার ইণ্ডিয়ার সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলো ওরা। ধনীর দুলাল কুন্তল বি. টেক্‌. পাস ক'রে ট্রেনিং নিয়ে শখ ক'রে পাইলট হয়েছে। আর অশ্রু নিতান্ত অভাবের

তাড়নায় এই পথে পা বাড়িয়েছে। সেবার হিন্দু বিদ্বেষী দাঙ্গায় সব হারিয়ে পাকিস্তান থেকে চ'লে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন হিন্দোল সেন। অশ্রুর বাবা। মধ্যমগ্রামের একটা প্রাইমারী স্কুলে মাষ্টারি জুটিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অত অল্প টাকায় কি আর সাতজনের একটা সংসার চলে? —চলে, তবে স্বচ্ছল ভাবে নয়। ওদের সংসারটার গতি মন্থর থেকে মন্থরতর হয়ে আসছিলো দিন দিন। বাবার দায়িত্বের জোয়ালের খানিকটা নিজের কাঁধে তুলে নিতে চাইলো অশ্রু। ভাই-বোনদের মধ্যে বড় ও। ভাই দু'টো তো একেবারে বাচ্চা। অফিসের দরজায় দরজায় ঘুরতে শুরু করলো চাকরির ধান্দায়। আশা দিলো অনেকে, কিন্তু চাকরি দিলো না কেউ। আর ভদ্র চাকরি করবার মতো কিই বা যোগ্যতা আছে ওর? উচ্চপদস্থ পরিচিত কোন মামা বা কাকা তো ওর নেই। নেই কোন উচ্চশিক্ষা। ওর সম্বল শুধু ঢাকা য়ুনিভার্সিটির ইন্টারমিডিয়েট পাসের সার্টিফিকেট্। হাজার হাজার M. A. পাস চাকরির জন্য হাঁ ক'রে আছে। লক্ষ লক্ষ Graduate দু'বেলা অফিসে অফিসে চাকরির উমেদারি করছে, হতাশ হচ্ছে। তাদের পাশে ইন্টারমিডিয়েট পাস অশ্রু সেনের দাবি কতটুকু? তাও আবার ঢাকা য়ুনিভার্সিটির সার্টিফিকেট! চূড়ান্ত ভেঙে পড়েছিলো ও।

সুযোগ সব সময় আকস্মিক ভাবেই আসে। ওর জীবনেও একটা সুযোগ জুটে গেল। এয়ার হোষ্টেস হওয়ার সুযোগ। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের ঠিকানা মিলিয়ে একটা দরখাস্ত পাঠালো ও। সময় মতো ইন্টারভিউ লেটারটাও হাতে এলো। সময় মতো ইন্টারভিউ দিলো ও। কয়েকটি প্রশ্ন ক'রেছিলেন মেজর সেন। ও উত্তর দিয়েছিলো কাঁপা কাঁপা স্বরে। মেজর সেন ওকে আশা দিলেন, অশ্রু সিলেকটেড্ হ'ল। এক বছরের ট্রেনিং, তারপরই এয়ার হোষ্টেস্।

কুন্তলের সঙ্গে ওর পরিচয় লণ্ডনে। একই বোয়িং প্লেনের পাইলট ছিল কুন্তল, আর অশ্রু এয়ার হোষ্টেস। নিতান্তই পরিচয় হ'য়েছিল। ঘনিষ্ঠতা হয়নি। ঘনিষ্ঠতা হ'ল রোমে। এবারও একই প্লেনে ডিউটি পড়েছিলো ওদের। এয়ার পোর্টের রেস্টহাউসে ছিল ওরা। কুন্তল অসুস্থ হ'য়ে পড়লো হঠাৎ। ভীষণ জ্বর। হাই টেম্পারেচার, আর ভুল বকা। অক্লান্ত সেবায় কুন্তলকে সুস্থ ক'রে তুলেছিলো অশ্রু। একান্ত আপন জনের মতো ওর মাথার কাছে ব'সে কুন্তলের পরিচর্যায় বেশ কয়েকটা রাত বিনিদ্র কাটিয়ে দিয়েছিল। কুন্তল সুস্থ হ'য়ে উঠলো। কিন্তু ততক্ষণে একটি হৃদয়ের কাছে অপর একটা হৃদয় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেছে।

তারপর আরও অনেক জায়গায় যেতে হ'য়েছে ওদের। ভেনিস, ফ্লোরেন্স, মস্কো, বন—বেশ কয়েক বার গিয়েছে, এক সঙ্গেই গিয়েছে। মনের গ্রন্থিটা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে দিন দিন। ওরা বিয়ে করবে ঠিক করেছে। কুন্তল অশ্রুকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। ভারতে ফিরেই বিয়ে করবে ওরা। হঠাৎ এভাবে প্যারিসে আসতে না হ'লে ওদের বিয়েটা আরও আগেই হয়ত হ'য়ে যেত।

প্যারিতে এসে আবার নতুন ফ্যাসাদ হ'ল। হোটেলে জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। বসন্তের প্যারিতে একটা ভালো হোটেল পাওয়া আর হাতে চাঁদ পাওয়া অনেকটা একই রকম। তার ওপর অল্প খরচায় ভালো হোটেল। অতএব ভালো হোটেলের আশা ত্যাগ করতে হ'ল ওদের। তবে হোটেল একটা জুটলো, ল্যাটিন কোয়ার্টারে 'দেস ভজেস'। চার তলায় সিঙ্গল বেডের পাশাপাশি দু'টো রুম। মাঝখানে একটা ছোট্ট স্যুইং ডোর। ঘরগুলো অপরিচ্ছন্ন আর অন্ধকার। হ'লেই বা, তবুও তো হোটেল; আর ভাড়াটাও সস্তা, দৈনিক পাঁচ ফ্রাঁ মাত্র।

এক তলায় এলে হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হ'ল ওদের। জ্যা লা ভালজা। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ভদ্রলোক আলাপী। ওদের দেখতে পেয়েই এগিয়ে এলেন তিনি। সযত্নে পালিত গুম্ফে পাক দিয়ে কুন্তলকে প্রশ্ন করলেন তিনি—মশিয়েঁ, প্যারি দেখতে চললেন বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা ফিরবেন কখন?

—একটু রাত ক'রে।

—ডিনার তো এখানে খাবেন না। সাপারও কি বাইরে খেয়ে আসবেন?

—না, সাপার হোটেলে ফিরে এসেই খাবো।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। একটা কোচট্যুর

দাঁড়িয়েছিল সামনে। তাতেই চেপে বসলো ওরা। প্রথমে প্যারিটাকে দেখলো। ফলিস বার্জার, আর্চ ড্র ট্রায়াম্ফ, ইফেল টাওয়ার। একটা বড় রেস্তোরাঁয় ডিনার খেল। তারপর মাইল দশেক দূরে ইতিহাসের ভার্সাই।

সূর্য বিদায় নিলো প্যারির আকাশের বুক থেকে। তারার চুমকি বসান শাড়ি পরলো আকাশটা। এবার চাঁদ আসবে অভিসারে। তাই বেশ পরিবর্তন করলো প্যারি। নতুন ক'রে সাজলো।

এবার ফিরতে হবে হোটেলে। একটা ট্যাক্সি মিলল। হোটেলের ঠিকানা ব'লে দিল কুন্তল। ট্যাক্সি ছুটতে লাগলো। একটা সিগারেট ধরালো ও। অশ্রু তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। বিভোর হ'য়ে দেখছে রাতের প্যারিকে। স্বপ্নময় প্যারি। য়ুরোপের বাগদাদ, কল্পনার স্বর্গ। গত দু'হাজার বছর ধ'রে মানব জাতির কতো উত্থান-পতন ঘ'টে গেল এই প্যারির বুকের উপর দিয়ে বয়ে চ'লা সেইনের তীরে। প্যারির আত্মা তবু ম্লান হয়নি এতটুকু।

হাত ঘড়িটার ওপর চোখ পড়লো কুন্তলের, দশটা বাজে। প্যারির বোধহয় সবে সন্ধ্যে হ'য়েছে। কাফে-গুলো ভর্তি। বারগুলো মদে ডুবছে। রাস্তার ফুটপাতের ওপর প্রকাশ্য জুয়ার আসরগুলো জমজমাট হচ্ছে। রাজ-পথের এখানে ওখানে দেহোপজীবিনীদের ভিড়। মাত্র কয়েক ফ্রাঁর বিনিময়ে হাতছানি দিয়ে রাত্রি অভিসারের আহ্বান জানায় তপ্ত যৌবনা ললনা। সারা শহরটা যেন নেশায় মাতোয়ারা। এই হ'চ্ছে রাতের প্যারি। যেন আরব্য উপন্যাসের পঠিত কোন স্বপ্নালু রজনী। অশ্রুর এলিয়ে পড়া নগ্ন বাহু দু'টো নিজের হাতের মধ্যে নেয় কুন্তল। আস্তে আস্তে চাপ দেয়।

—এই কি হচ্ছে?—ফিসফিস ক'রে ব'লে অশ্রু।

—কাছে এগিয়ে এসো।

—ভালো হবে না বলছি।—রাগের ভান করে অশ্রু। হাত দু'টো ছাড়িয়ে নিতে চায়, পারে না। ওকে কাছে টেনে আনে কুন্তল। মৃদু হাসিতে সমর্থন জানায় অশ্রু।

—জানো অশ্রু, মাথাটা ভীষণ ধ'রেছে।—কুন্তল ব'লে।

—এসো, আমি হাত বুলিয়ে দি। বারণ করলে তো শুনবে না। বললাম আজ ভার্সাই দেখে কাজ নেই, কাল দেখলেই হবে। তা নয়, আজই দেখা চাই।

—তোমার বোধহয় খুব কষ্ট হয়েছে?

—হয়েছেই তো। সারা দিন টোটো ক'রে ঘোরা। আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু তোমার তো মাথা ধ'রলো।

—ও কিছু না। এখুনি ঠিক হ'য়ে যাবে। অশ্রুর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে কুন্তল। আস্তে আস্তে কুন্তলের মাথায় হাত বুলাতে থাকে ও।

বিকট শব্দ ক'রে থেমে যায় ট্যাক্সিটা। গাড়ি থেকে নেমে পড়লো কুন্তল। ওর পেছনে পেছনে নামে অশ্রু। মিটার দেখে ভাড়া মিটিয়ে দেয় কুন্তল।

—সাপার খেয়ে একবারেই স্যুইটে যাবো, কি বলো?—অশ্রু জিজ্ঞাসা করে।

—সেই ভালো।—মাথা নেড়ে সমর্থন জানায় কুন্তল।

দোতলায় ডাইনিং হলে ঢোকে ওরা। সাপার খায়। শুতে চ'লে যায় কুন্তল। ও আজ ভীষণ ক্লান্ত। রাত অনেক হয়েছে। অশ্রুকেও শুয়ে পড়তে বলে। একুশ বসন্ত পেরিয়ে যাওয়া দেহটাকে বিছানায় এলিয়ে দেয় অশ্রু। কিন্তু ঘুম আসে না। চোখ বুজে ঘণ্টা খানেক পড়ে থাকে বিছানায়, তবু ঘুম আসে না। বিছানা থেকে উঠে পড়ে ও। কম পাওয়ারের নীল আলোটা জ্বালে। কুন্তল কি ঘুমিয়ে পড়েছে? মাঝখানের দরজাটা অল্প একটু ফাঁক করে দেখে, কুন্তল ঘুমুচ্ছে। বড় ঘুম কাতুরে ও! ঘুমুতে পেলে ও আর কিছুই চায় না—অসহ্য মনে হয় অশ্রুর। নিঃশব্দে কুন্তলের ঘরে ঢোকে। ওর বিছানার কাছে এগিয়ে যায়। ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বেচারী! ওর বিছানার এক পাশে ব'সে পড়ে অশ্রু। আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলাতে থাকে। চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলো দিয়ে কুন্তলের চুলে বিলি কাটতে শুরু করলো ও। হঠাৎ কুন্তল ধ'রে ফেলে ওর হাতখান। অশ্রু পালিয়ে যেতে চায়, কিন্তু পারে না। কুন্তলের সবল বাহুপাশে ও ততক্ষণে আবদ্ধা। মিটিমিটি হাসতে থাকে কুন্তল। লাজে আবীর-রাঙা হ'য়ে যায় ও। সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করে।

(শেষাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভালবাসা

(গল্প)

রাঙ্গা সেন

—দেখ, এখনও বলছি তুই বাড়ি ফিরে চল্। এসব বাজে খেয়াল ছাড়!—বললেন অমলা দেবী।

—তোমার কাছে এটা বাজে খেয়াল হতে পারে মা! আমার কাছে এটা জীবন-মরণ সমস্যা। আমি কিছুতেই আর বাড়ি যেতে পারবো না।—বললো অণিমা।

—খুকী, তোর মা যা বলছে সেই মতো কাজ কর। নতুবা জোর করে তোকে আমরা এখান থেকে নিয়ে যাবো।—বললেন অণিমার বাবা সমর বোস।

—আমাকে কেটে অর্ধেক করে নিয়ে যেতে পারো—সম্পূর্ণ আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।

—খুকী!—হুঙ্কার ছাড়লেন অণিমার বাবা।

—তোমার কথায় এখন আর আমি ভয় পাই না বাবা! আমি প্রাপ্তবয়স্কা হয়েছি। স্বাধীন ভাবে চিন্তা করে কাজ করবার, চলাফেরা করবার অধিকার আমার আছে। তবে তোমরা কেন আমাকে সে অধিকার দিতে চাইছো না?

অবাক্ হয়ে যান সমর বোস। এই কি তাঁর সেই ছোট মেয়ে! যে মেয়ে মুখের উপর উত্তর দেওয়া দূরে থাক—তাকাতে পর্যন্ত ভয় পেতো। কি দেখলো ওই নেপালী যুবক বীরবাহাদুরের মধ্যে! বীরবাহাদুরকে এত ভালবাসলো অণিমা! যার জন্য আজ সে মা-বাবাকে পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারে। একি হৃদয়ের সত্যকার ভালবাসা—না ক্ষণিকের উত্তেজনা? হঠাৎ রেগে উঠে বলেন এখনও বলছি বাড়ি ফিরে চল—নতুবা জোর করে আমরা নিয়ে যাবো। ঝোঁকের মাথায় পাগলামি করিস না!

—তোমরা অযথা কেন বাধা দিতে আসছো! তাছাড়া, এ বিয়ে আমি করবই—যতো বাধা আসে আসুক। আর এ কাজ তো ঝোঁকের মাথায় করছি না। চার বছর ধরে যাকে মনে-প্রাণে ভালবেসেছি, নাইবা হলো সে একজাত, তার সাথেই তো মিলতে যাচ্ছি। এতে তো কোন অন্যায় দেখছি না!

নরম হয়ে যান সমর বোস। বলেন—দেখ, তোর দিদিও পাঞ্জাবীকে ভালবেসে বিয়ে করলো। আবার তুইও করতে যাচ্ছিস নেপালীকে। আমার তোরা দুটি মাত্রই মেয়ে ছিলি—দুজনেই একরকম কাজ করতে চাইছিস। এরপর, তুইই বল, কি করে লোকের কাছে মুখ দেখাবো। —করুণ কান্নার মতো শোনায় স্বর।—তোমাদের লোক-লজ্জা ঠেকাতে হলে আমাকে তবে আত্মহত্যা করতে হয়। তা আমি পারবো না। কারণ তাতে প্রেমের স্বীকৃতি নেই।

—অণি, এতদিন যারা তোকে মানুষ করলো, বড় করলো, তারাই আজ পর হলো। আর এই বাহাদুরই হলো তোর আপন জন—একান্ত আপনার জন!

—বাবা, তোমাদের তো আমি পর করতে চাইনি—তোমরাই তো আমাকে পর করে দিচ্ছ!—করুণ কান্নাঝরা কণ্ঠে বলে অণিমা।

—আমরা ইচ্ছা করে করছি না, তুই বাধ্য হয়ে

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ)

—ও, তুমি তা'হলে এখনো ঘুমাও নি!—মিষ্টি করে হেসে প্রশ্ন করে অশ্রু।

—না।

—কেন?

—তাহ'লে তুমি এলে যে টের পেতাম না।

—জানো, আমিও ঘুমুতে পারছি না। কেমন যেন ভয় করছে।

—কিসের ভয়। তুমি তা'হলে আমার কাছেই শুয়ে পড়।

—কি করে শোব? খাটটা খুব ছোট যে!

—হোক্ গে! এতেই দু'জনার হবে যাবে। অশ্রুকে জোর ক'রে নিজের পাশে শুইয়ে দেয় কুন্তল।

করাচ্ছিস। তাছাড়া বাহাদুরের আয়ও বেশী নয়—তোকে সুখে রাখতেও পারবে না সে।

—কোন রকমে ডাল-ভাত খেয়ে চলে গেলেই আমি সন্তুষ্ট। আমি অর্থের সুখ চাই না। আমাদের ভালবাসা যেন অক্ষয় হয়, এই আশীর্বাদ করো বাবা।—বসে বাবার পায়ে হাত দেয় অনিমা।

হঠাৎ কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়ে সমর বোস বলেন—না-না, আশীর্বাদ করবো না—করতে পারবো না।—কয়েক পা পিছিয়ে যান তিনি।

—চলুন জামাইবাবু, বাইরে চলুন।—উত্তরের অপেক্ষা না করে হাত ধরে বাইরে টেনে নিয়ে যান অলোক দত্ত—অনিমার ছোট মামা। অমলা দেবীও বেরিয়ে আসেন ওদের সঙ্গে।

অনিমার দু-চোখ বেয়ে অঝোর ঝরে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। জীবনের চরম মুহূর্তে ওরা পিতা-মাতার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'ল।

সেই মাঝ রাত্রেই কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাড়িতে ফিরে যান অনিমার মা-বাবা।

বীরবাহাদুর ছোটবেলা থেকেই বাংলা দেশে আছে। তার মা ও এক ভাই থাকে বিহারের এক ছোট শহরে—ব্যাবসা করে সেখানে। আগে তারা বাংলা দেশেই থাকতো। মা-ভাই যাবার পর আর পড়তে পারেনি বাহাদুর—দশম শ্রেণীতে উঠেই পড়া ছেড়ে দিতে হয়েছে। তবুও মা-ভাইয়ের সঙ্গে বিহারে যায়নি—বাংলা দেশ তার ভালো লেগেছে। বাংলাই এখন তার একরকম মাতৃভাষা। পেটের তাগিদে কুড়ি বছর বয়সে রাণাঘাটের এক মেয়েদের স্কুলে দারোয়ানের কাজ নিলো। এখানেই পরিচয় হলো চোদ্দ বছরের সুন্দরী ছাত্রী অনিমার সঙ্গে। পরিচয় ধীরে ধীরে ভালবাসায় পরিণত হলো। দু-বছর পরে অর্থাভাবে পড়া ছেড়ে দিলো অনিমা। স্কুল ছেড়ে দেওয়াতে দেখা-সাক্ষাতের অসুবিধা হতে লাগলো। দেখা-সাক্ষাৎ না করেও থাকা যায় না। অগত্যা ছোট মামার শরণাপন্ন হলো অনিমা।

ছোটমামা অনিমাকে খুব স্নেহ করেন। সব শুনে বললেন—এখন মা-বাবাকে জানাস না। পরে আমি ব্যবস্থা করবো। আমার বাড়িতে তোরা দেখা-সাক্ষাৎ করিস। কাউকে জানাতে তোর মামীমাকে নিষেধ করে দেবো।

অনিমার পড়া ছাড়ার পরের বছর বীরবাহাদুরও স্কুলের কাজ ছেড়ে দেয়। একটা সরকারী অফিসে দারোয়ানের কাজ পায় সে। মামার পরামর্শ মতই এরা দুজনে মামার বাড়িতে দেখা-সাক্ষাৎ করতে থাকে। মামীমাকে মামা নিষেধ করে দিয়েছে। কাজেই কোন ভয় নেই। অনিমাদের বাড়ি থেকে মামার বাড়ি মাত্র আধ মাইল পথ।

একদিন একদিন করে এদের পরিচয়ের মোট চারটি বৎসর কাটে। যৌবনের প্রচণ্ড ঢেউ দুজনকেই অস্থির করে তোলে। মামার সঙ্গে পরামর্শ হয়। কথা হয়, রাত্ত বারোটা নাগাদ বীরবাহাদুর রিক্সা নিয়ে অনিমাদের গেটের কাছে যাবে। অনিমা যেন নজর রাখে। বীর-বাহাদুরকে দেখলেই যেন সঙ্গে সঙ্গে অনিমা রিক্সা করে এখানে চলে আসে। পুরুত এনে রাখা হবে। সেরকম চেনা লোকও দু-চারজন আসবে। রাত্রি দুটো কয়েক মিনিটে যে লগ্ন সে লগ্নেই শাস্ত্রমতে দুজনের বিয়ে হবে। তারপর পরের দিন আবার রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হবে।

ব্যবস্থা অনুযায়ী সব ঠিক হলো। বীরবাহাদুর গিয়ে অনিমাকে আনলো।

ওদিকে অনিমা চলে আসার একটু পরেই ঘুম ভেঙ্গে গেলো অনিমার বাবার। কি মনে করে উঠলেন। ভেতর দিয়ে অনিমার ঘরে ঢুকলেন। বিছানা খালি। দরজা বাইরে থেকে শিকল আঁটা। স্ত্রীকে ডাকলেন। ঘর, উঠন, বাথরুম, পায়খানা খুঁজলেন। ডাকলেন বার বার, তবু সাড়া নেই। ঘরে তালা দিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনে বেড়িয়ে পড়লেন। প্রথমে থানায় যাবেন, ভাবলেন। তারপর ভাবলেন, আগে অলোকের পরামর্শ নেওয়া যাক। অলোকের বাড়ির উদ্দেশ্যেই চললেন।

অলোকের ঘরে ঢুকেই চমকিয়ে উঠলেন। তারপর জ্বলে উঠলো তাঁর দু' চোখ। অগ্নিজ্বালা চোখে অলোককে বললেন—কার, অনিমার বিয়ে!

—হাঁ।—কোনরকমে বললো অলোক।

—কার সাথে?

—বাহাদুর বলে এই……।—অলোকের কথা শেষ

হলো না।

—বাহাদুর!—রাগে চীৎকার করে উঠলেন। তারপর বললেন—তাইতো বলি মাঝ রাত্রে মেয়ে গেলো কোথায়! আমি ধারণা করিনি তুমি এইসব নষ্টের মূলে।

—রাস্তাঘাটে কোথায় বিপদে পড়তো!—আমতা আমতা করলো অলোক।

—থামো!—অলোক চুপ করে গেলো।

তারপর মেয়ের দিকে অগ্নিজ্বালা চোখে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কথা বলতে থাকেন সমর বোস।

রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করতে বেরুবার আগে বাহাদুর একটু বাইরে বেড়িয়েছিলো। অমনি ওখানকার ছেলেরা ধরে তাকে বেদম প্রহার দিলো। নেপালী হয়ে বাঙ্গালী মেয়ে বিয়ে করার এত দুঃসাহস! শেষে অলোক দত্তের হস্তক্ষেপে ব্যাপারটা মিটে যায়।

মামা বাহাদুরকে পরামর্শ দেয়—আজ রাত্রেই তুমি অণিমাকে নিয়ে তোমার বাসায় চলে যাও। লোকের রাগটা আগে একটু পড়ুক, তারপর কোর্টে গেলেই হবে। আর জামাইবাবু যাতে পুলিসের ঝামেলা না করেন—তার ব্যবস্থা আমি করবো। কোন ভয় নেই।

সেদিন রাত্রেই বাহাদুর অণিমাকে নিয়ে রিক্সা করে চুপি চুপি তার বাসার দিকে আসে। তার ইচ্ছা, কাউকে না জানিয়ে ঘরে ঢুকবে। কি জানি, ঘরে ঢুকতে এরা আবার যদি বাধা দেয়!

বাহাদুর জানেনা, এখানকার ছেলেরা আগেই খবর পেয়ে গেছে। তাকে মারবে বলে পথের উপর একদল ছেলে অপেক্ষা করতে থাকে। দূর থেকে একদল ছেলে দেখেই বাহাদুরের ভয় হলো। এরা আবার কি জন্য দাঁড়িয়ে আছে! পাশ দিয়ে রিক্সা যাচ্ছিলো। একজন বলে উঠলো, রিক্সায় কে যায়?

—বাজারের ওখান থেকে লোক আনছি!—বললো রিক্সাওয়ালা।

—থামা বেটা!—গর্জে ওঠে কয়েকজন।

—ভেতরে স্বামী-স্ত্রী আছে বাবু!—রিক্সার গতি আস্তে হলো।

—তই থামা বলছি বেটা!—অনেকেই গর্জে ওঠে।

রিক্সাওয়ালা ভয়ে ভয়ে থামালো।

—এইতো শালা বাহাদুর! ব্যাটার জান এবার শেষ করবো! নেমে আয় বেটা!—একসঙ্গে গর্জে ওঠে অনেকে।

বুকটা কাঁপে বাহাদুরের। আবার বুঝি মার খেতে হয়। আর এতগুলি ছেলে যদি মারে তবে তো তার আর বাঁচার আশা নেই। আকুল মনে প্রার্থনা জানায়, প্রভু আমায় রক্ষা কর!

অণিমার হাত-পা ভয়ে ঠক্‌ঠক করে কাঁপতে থাকে। মনে হয়, রক্ত চলাচল বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়, আমরা তো তোমার পায়ে কোন অন্যায় করিনি প্রভু! আমাদের বাঁচাও—রক্ষা কর—স্বামীকে বাঁচাও!

আর সময় নেই। অণিমাই আগে রিক্সা থেকে নেমে সাহস করে বলে—দেখুন, আপনারা এঁকে মাপ করুন! এঁর কোন অপরাধ নেই। এ আমাকে বিয়ে করতে সাহস করেনি। আমিই জোর করে একে বিয়ে করেছি। কারণ একে না পেলে আমি বাঁচব না। যদি দোষ কোন হয়ে থাকে সেটা আমি করেছি—ও নয়। বলেন তো আপনাদের সবার পা ধরে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি!

থমকে যায় ছেলের দল। মুখে কোন কথা যোগায় না। বাহাদুরের প্রার্থনাতে—না অণিমার প্রার্থনাতে, কে জানে! দেবতার দয়া হয়। যে অফিসে বাহাদুর দারোয়ানের কাজ করে, সে অফিসের দুজন লোককে বাহাদুর এই দলের মধ্যে দেখতে পায়। আর এই দুই-জনই বাহাদুরকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে। তাড়াতাড়ি রিক্সা থেকে নেমে গিয়ে তাদের পায়ে পড়ে বাহাদুর বলে—এ বিয়েতে আমার কোন দোষ নেই। আমাকে না পেলে ও আত্মহত্যা করবে বলেছিলো, তাই বিয়ে করলাম। আপনারা একটু দয়া করে এদের বুঝিয়ে বলুন। আমাকে বাঁচান।

এরা অনেক বোঝাবার পর দলটা কোনরকমে ঠাণ্ডা হলো। মনে হলো কিছুটা ক্ষুণ্ণও হয়েছে। এদের দুজনের কথা অমান্য করতে না পেরেই যেন থামা। সকলে চলে গেলো।

লোক দুটি বাহাদুরকে পরামর্শ দিলো, তুমি একঃ

ভোরবেলা উঠে চলে যাও। ক'দিন বাইরে বাইরে কাটাও। এদের রাগটা পড়ুক। নতুবা কবে আবার মেরে বসবে। আর ও বাসায় তোমার বউয়ের ক'দিন একা থাকতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। চারিপাশের ঘরে মেয়েছেলে ভর্তি। তারাই নিশ্চয় দেখবে।

লোক দুটির পরামর্শ মতই বাহাদুর ক'দিন বাইরে বাইরে কাটালো। তারপর সবার রাগ পড়ে গেলে ক'দিন পর ফিরে এসে কাজ করতে লাগলো। এখন দেখলে দু-একটা কথা ভিন্ন তারা আর বিশেষ কিছু বলে না। ক'দিন পর কিছুই বলবে না। এর মাঝে একদিন মামার সাথে গিয়ে বিয়ে রেজিস্ট্রি করে এলো।

মাস তিনেক হোতে যায়।

মাঝে মাঝে একা বসে ভাবেন সমর বোস। এই যে তাঁর দুই মেয়ে ভিন্ন জাতের লোককে ভালবেসে বিয়ে করলো, এর জন্য দায়ী কি সে নিজে? তার অর্থহীনতা? না আধুনিক সমাজ? যদি তার অর্থহীনতা দায়ী হবে, তবে অর্থহীন বাহাদুরকে ভালবাসলো কেন তার মেয়ে? আর যদি বাসলোই, সে নিজে কেন স্বীকার করতে পারছে না! একি শুধু লোকলজ্জা! লোকলজ্জা বড়, না জীবন বড়?—নানা প্রশ্নই মনে আসা-যাওয়া করে। কোন উত্তর খুঁজে পান না তিনি।

অমলা দেবীও আর থাকতে পারেন না। স্বামীকে না জানিয়ে অলোককে নিয়ে একদিন দুপুরে বেড়িয়ে পড়েন অণিমার বাসার দিকে। তাঁর ইচ্ছা, স্নেহের কাঙ্গালিনী কন্যাকে একবার আশীর্বাদ করবেন। মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া সে জীবন-সংগ্রামে সুখী হবে কি করে?

ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই অণিমা ও বাহাদুর এসে মা ও মামাকে প্রণাম করলো। অণিমা আশপাশের লোকের সাথে মা ও মামার পরিচয় করিয়ে দিলো। কিছুক্ষণ কথা বলে একে একে সবাই চলে গেলো।

অমলা দেবী বললেন, এখন তোদের দেখে যে কি শান্তি পেলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছিনে। তোরা ভাবিস, মা-বাবা কি পাষাণ! কেন পাষাণ হয়েছে সে খবর রাখিস না। আজ তোর বাবাকে না জানিয়ে এসেছি। কেন এসেছি জানিস না! মা-বাবার হৃদয় আছে। শুধু —তা বোঝাতে পারি না। তোরা ভুল বুঝে শুধু মা-বাবার ওপর অভিমান করিস।—টপ্ টপ করে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে তাঁর চোখ দিয়ে।

—না মা তোমাদের ওপর ভুল বুঝে অভিমান করিনি। জানি আমাদের জন্য তোমাদের প্রাণ কত ব্যাকুল হয়। —অণিমাও কেঁদে ফেলে।

—কাঁদিস না মা, দুটো পান-সুপারি নিয়ে আয়, তোদের আশীর্বাদ করে যাই।—মেয়ের চোখ মুছিয়ে দেন অমলা দেবী।

অণিমা পান-সুপারি নিয়ে আসে।

বাহাদুর ও অণিমাকে আশীর্বাদ করে অমলা দেবী বলেন, আশীর্বাদ করি জীবনে তোরা চিরসুখী হ। তোদের ভালবাসা যেন অক্ষয় হয়ে নতুন দিনের, নতুন পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শেষে থেমে বলেন, পারিস তো দুঃখী মা-বাবার কথা একটু মনে রাখিস!

অশ্রু সিক্ত চোখেই অণিমা ও বাহাদুর মাকে প্রণাম করে।

———

ক্ষুধা
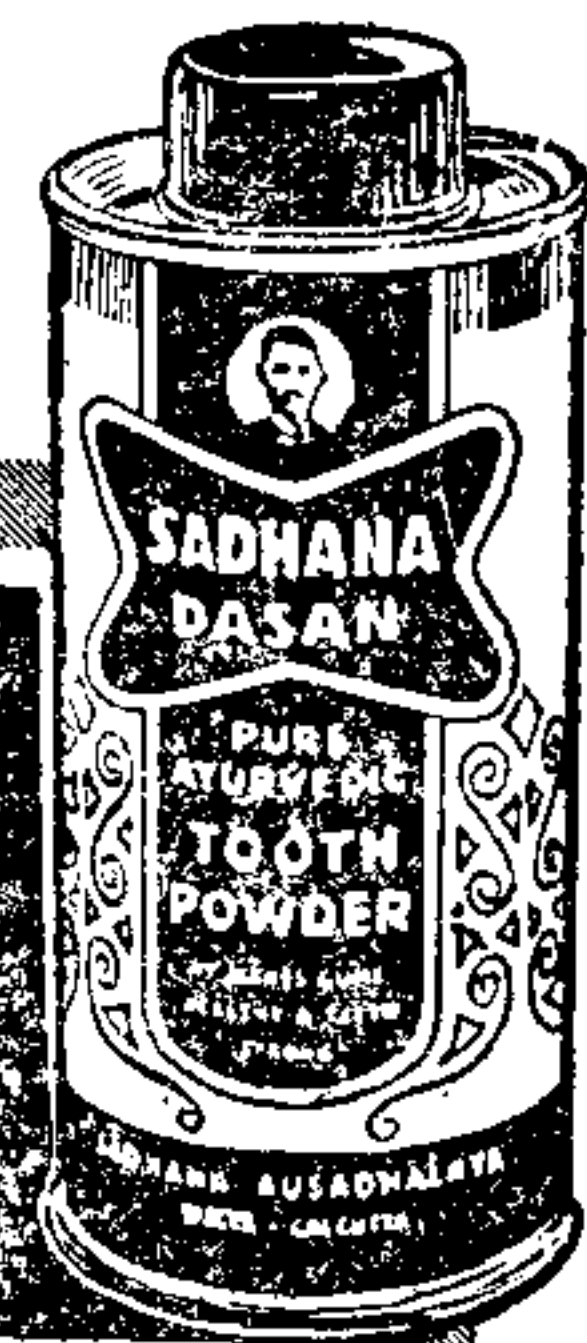
শ্রী আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রিয় নবীন সাংবাদিক—

সাংবাদিকের চাকরি নিয়ে প্রথম দিনেই তুমি যে চাঞ্চল্যকর আত্মহত্যা কাহিনী রিপোর্ট সংগ্রহ করেছো এবং অপূর্ব লেখনীতে সংবাদপত্রে পরিবেশন করে শহর সুদ্ধ মানুষকে তাক লাগিয়ে দিয়েছো, সেজন্য তোমায় ধন্যবাদ!

দেখেছো একটা ফটো বা পিতৃদত্ত নাম প্রকাশের জন্যে কত বড় বড় মানুষ পর্যন্ত কেমন হ্যাংলাপনা করে? আমরা ম'রে একদিনের জন্য ফটো সহ নাম করে গেলাম বাংলা-দেশে। আঃ, কি আরাম! অজানা অখ্যাত এ পরিবারের কাহিনী কত লোকের চোখে পড়বে, হয়তো-বা তোমার লেখনী-প্রসাদে দু-চারজনের চোখের কোণও চিকচিক করে উঠবে। ইশ, একসঙ্গে দু-জোড়া খুন!

পুলিসের লোকগুলো যখন আমাদের লাশগুলো গাড়ীতে তুলছিলো তুমি কেমন যেন ভ্যাবাচাকা হয়ে গিয়েছিলে। তুমি যেন সাংবাদিক নও, আমাদের পারিবারিক বন্ধু!—আমাদের ছেলে-মেয়ে নীরদ আর বুলুর চেহারা দেখলে? দু'ভাই-বোন যেন দুটি গোলাপের কুঁড়ি, অথচ দুটি তাজা ফুল আমাদের তথা দেশের কত উজ্জ্বল সম্ভাবনার বীজ অকালে বিনষ্ট হল! আর ওদের বাপ যেন সব অপরাধের কালিমা মুখে লেপে বিষাদমগ্ন হৃদয়ে ঘুমুচ্ছে! কিন্তু আমার চেহারা দেখলে? শান্তির প্রতিচ্ছায়া। আমার স্বামীর ওপর এতটুকু ক্ষোভ নেই, অভিমান নেই—সে বেচারার দোষ দিতে পারি না। ক্ষমা করলে ছোট করা হয়, তাই ভগবানের কাছে পূর্বাহ্লেই প্রার্থনা জানিয়েছি, আমাদের এ খুনের জন্য সে দায়ী নয়, হে জগদীশ্বর তুমি তাকে মাপ করো।

আমি জানি, তুমি কাগজের অফিসে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছো, আমাদের পার্শ্ববর্তী বাসিন্দাদের কাছে যতটুকু আমাদের কথা জানতে পেরেছো এবং পুলিসের লোক ধারণার ভিত্তিতে কল্পনা করেছে সেসব তথ্যের ওপর নির্ভর করে তুমি সাংবাদিকের প্রথম দিন নামে একটা ডায়েরী লিখবে কিন্তু তার আগে আমি তোমায় অনুরোধ করবো, সংবাদ বিকৃত হলেও ডায়েরী যেন বিকৃত না হয়। তাই তোমার প্রথম ডায়েরীর পাতা সত্যে পূর্ণ করে নাও—তুমি সাংবাদিকতায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করো, এই কামনা করি।

শোন তবে—

আমার স্বামী অভয়বাবুকে তোমরা দেখেছো?—কাশীপুর থেকে যে প্রতিদিনে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া-আসা করে চাকরি বজায় রেখেছিলো? তোমর, বলবে ট্রাম-বাসে গেলে এলে কি এমন ক্ষতি হতো। ফুটপাথে ষাট-সত্তর পয়সা দামের বাতিল টায়ারের চটি দেখেছো, তা'ও তার পায়ে এক জোড়া ছিল। অনুযোগ করবে, অভয়বাবু কি বিংশ শতাব্দীর মানুষ?—পকেটে একটা টিফিন কৌটা দেখেছো, যার ভেতরে দুখানা ছোট রুটি আর একটা কাঁচা লঙ্কা থাকতো এবং যা' সহকর্মীদের লুকিয়ে গোপনে গলাধঃকরণ করতে হতো তাকে!

চা-বিড়ি-সিগারেটের কথা তুলো না। তা' হলে সে বর্তমান সমাজ জীবনে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যাবে। দৃষ্টি শক্তির অভাবে যে চশমা জোড়া কিনেছিলো পাঁচ বছর আগে, কিছুদিন পর তার একটা কাঁচ কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছিলো—কেনবার পয়সা জোটেনি একটা বছরেও, অথচ একচক্ষু হরিণের মত তাকে তাতেই কাল পর্যন্ত কাজ চালাতে হয়েছে।—একটা চোখ একরকম চলেই গিয়েছিলো বলা চলে।

একটা চোখ যেমন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক দৃষ্টির অধিকারী নয়, তেমনি আমাদের সংসারটাও আয় দৃষ্টে অস্বাভা-বিকতায় ভরা ছিলো। বসন্তের ঝরা পাতাগুলো যেমন সারাদিন রোদে পুড়ে একদিন গুঁড়ো হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়, আমরাও তেমনি সমাজ জীবনে ঝরা পাতার মত ঝরেই গেলাম অকালে। দুঃখ নেই, অনুযোগ নেই আছে শুধু অনুতাপ আর আমাদের মত মানুষগুলোর ভবিষ্যৎ কি ধরনের হবে, তা' জানবার কৌতূহল।

আমার স্বামী একশো টাকা মাইনের চাকুরে ছিলো! আগেকার একশো টাকা হলে আমাদের মত মানুষের

রীতিমত ভাবতো টাকাটা কিভাবে খরচ করবে, কিন্তু এখন একশো টাকায় কি হবে? সে একশো টাকা ছাড়া মাস মাস কমপক্ষে আরও ত্রিশ-চল্লিশ টাকা বাড়তি খরচ হতো আমাদের। আমি সংসারের কাজকর্ম সেরে কায়-ক্লেশে কাগজের ঠোঙা তৈরী করে প্রায় ঐ টাকাটা যোগাড় করতাম। চলছিলো অমনি করে, তার মানে কোনপ্রকারে জীবন ধারণ করেছিলাম আমরা। ক্রমশঃ আমাদের বাজেট ছাড়িয়ে গেল কালোবাজারের দৌলতে। নীরদ নতুন শ্রেণীতে উঠলে তার বই কিনে দিতে পারলাম না। সে ব্যাকুল হয়ে বলত, অর্ধেকগুলো কিনে দাও, বাকীটা অন্য ছেলের বই পড়ে চালিয়ে নেবো।

তার বাবা তত অশ্রুজলে ভাসে, 'অনেক টাকার বই—ক্ষমতা নেই নীরু—তা' হলে তোদের একমাস উপোস করিয়ে রাখতে হবে।'

বুলুকে ত জোর করে পড়া ছাড়িয়ে দিতে হয়েছিলো দু-বছর আগে।

আমার যা' দু-একখানা গহনা ছিল, আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কোনমতেই বই কিনে দিতে পারলাম না। ছেলেটা গোপনে প্রকাশকদের দরজায় দরজায় ধরনা দিয়ে দু-চারখানা বই ভিক্ষে করেছিলো। কিন্তু—কিন্তু হঠাৎ একদিন সে এক প্রকাশকের কাছে বই ভিক্ষা করতে গিয়ে বিনা দোষে চোর বলে ধরা পড়ে গেল। আদালতের বিচারে হতভাগার দিনকতক সাজা হল। ও যেদিন ফিরে এলো ছাড়া পেয়ে আমার মনের দুঃখ সহস্র গুণ বেড়ে গেল। আমার পা-ছুঁয়ে বললে, 'মা তুমি বিশ্বাস করো, আমি চোর নই—আমি—'

—জানি নীরু, আমার ছেলে চোর নয়। হতে পারে না—এসব আমাদের দুরদৃষ্ট!

নীরদের পরকাল গেল। ঘেন্নায় দুঃখে সে দিনের পর দিন কেমন যেন মনমরা হয়ে গেল। মেয়েটার বিয়ের সময় হয়েছে অথচ তার বিয়ে দেওয়া আমাদের কাছে স্বপ্ন! বিশৃঙ্খলায় ভরে গেল আমাদের মন। এ সংসারে কি প্রয়োজন? যে মা-বাবা ছেলে-মেয়েকে শিক্ষা দিতে পারে না, এমনকি পেট পুরে দুমুঠো খেতে দিতে পারে না, তাদের মৃত্যুই ভাল নয় কি? আমাদের জীবনগুলো কি কাগজের ঠোঙা?

তারপর শোন—

মাস মাস দু-দশ টাকা করে যে ঋণ না হতো আমাদের তা' নয়—এমনি করে বেশ কিছু ঋণের বোঝাও চেপে গেল। পাওনাদারদের তাগিদে নিরাপদে বাস করাও কঠিন হয়ে পড়লো আমাদের।

বিশ্বাস করো ভাই, অশেষ দুঃখ, প্রভূত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে আমাদের। ব্যবসায়ীরা যেমন জিনিসপত্রে ভেজাল দিয়ে, ওপরওয়ালাদের ঘুষ দিয়েও লাভ করে আমরা তেমনি আমাদের আহারে-বিহারে এত ভেজাল দিয়েও লাভ দেখতে পেলাম না। বুঝলাম, জীবনটা লোকসানে ভরা।

আত্মহত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই আমাদের। কিন্তু আত্মহত্যা করা কি এতই সোজা ব্যাপার? সবাই পারে?

আমরা হাসি মুখে খুন হলাম। আমার স্বামী আমাদের সকলকে শেষ করে নিজেকে নিজে শেষ করেছে—নয় কি?

এ সংবাদ ছেপে কি হবে? যদি পার ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমাদের মত মানুষগুলোকে বাঁচাও। মানুষগুলো যেন দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পায়। আমাদের মত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা অসহ্য, পাওনাদারদের কড়া তাগিদ মর্মান্তিক!

বর্তমান পৃথিবীর মানব সমাজের এ করুণ চিত্র যে কবে মুছবে!—আমাদের আত্মাগুলো সেদিকেই রইলো করুণ ভাবে চেয়ে।

———

কৃতিত্বের স্বীকৃতি

সুদর্শন চক্রবর্ত্তী

সবার মুখে শুভেন্দুর সুখ্যাতি আর ধরে না। লোক ভাল এই শুভেন্দু। খুবই পরোপকারী, ভারী ঠাণ্ডা মেজাজ তার আর বেশ বিনয়ী। কেউ অভাবে পড়ে শুভেন্দুর কাছে হাত পাতলে তার হাতে এক পয়সা না থাকলেও ব্যবস্থা একটা হবেই। হয়ত কেউ জানাল যে তার ক'টা টাকা আজ না হলেই নয়; শুভেন্দু আর স্থির থাকতে পারে না। কোন বন্ধুর কাছ থেকে ধার ক'রে এনে তাকে দিয়ে তবে শান্তি। শুধু কি তাই? পাড়াপড়শীর অসুখ-বিসুখে শুভেন্দু এ অঞ্চলের প্রথম ও প্রধান সহায়। এরপর কারও মড়া পড়ে আছে, সেখানেও শুভেন্দুর ডাক পড়ে। এ ছাড়া শুভেন্দু আবার ইউনিয়নেরও পাণ্ডা। সেসব নানা ঝামেলাও তাকেই পোহাতে হয়। এরপরও একটা দিক আছে তার। সেটা হ'ল শুভেন্দুর সাহিত্য সেবা। দেশে, জনসমাজে যখন যে সমস্যাটা দেখা দেয়, শুভেন্দু কাউকে রেহাই না দিয়ে অমনি তার সমাধান পাঠায়।

এই সব নানাদিকে তার ব্যস্ত থাকার জন্য সংসারের সব কাজ দেখা তার পক্ষে সব সময় ঠিকমত হয়ে ওঠে না। এইত সেদিন আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য মীনাক্ষী বলল, এই সব ইউনিয়ন-টিউনিয়নে সময় নষ্ট না ক'রে বৈকালে ছেলে-মেয়েদের পড়াগুলো একটু দেখিয়ে দিলে হয়। শুভেন্দু তখন খুব কড়া ক'রে জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু পারল না শুধু মাইনের দিকে তাকিয়ে। কেবল বলল, তা বটে!

পয়সার অভাবে একদিকে যেমন বেশী বেশী জিনিস এক সঙ্গে কিনতে পারে না, তেমনই আবার সময়ের অভাবে রোজ সকালবেলা বাজার করাও শুভেন্দুর হয়ে ওঠে না। তাই ছেলেটাকে সকালবেলা যখন আলুভাতে দিয়ে শুকনো ভাতগুলো ধ'রে দিতে হয়, মীনাক্ষীর মনে সেটা লাগে। এক আধ দিনের ব্যাপার নয়, প্রায়ই আজকাল এইরকম হয়। কারণ শুভেন্দু যেদিন বাজার করে, সেদিনও নানা লোকের নানা কথার জবাব দিয়ে বাড়ী ফিরতে তার দশটার আগে হ'য়ে ওঠে না। তাই মীনাক্ষী সেদিন বলেছিল, দু একটা ডিম এনে রাখতে। শুভেন্দুও না বলেনি। বাজারে গিয়ে ডিমের দিকে তাকিয়েও ছিল সে। কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে শুভেন্দু দেখল, অসম্ভব। কাজেই সে ফিরে না এসে পারল না।

কিন্তু ক'দিন কাটাবে সে এমন ক'রে এতগুলো পোষ্য নিয়ে? বড় ভয় তার দেনাকে। দেনায় মানুষ বিকিয়ে গেলে তার আর নিজস্ব সত্তা কিছু থাকে না। দেনায় শুধু নিজেকেই ছোট করা হয় না, সম্বন্ধটাও ছোট হয়ে যায়। তাছাড়া মধ্যবিত্ত উপায়ী মানুষ সে। মাসের শেষে গোনা ক'ট টাকা। এতেই এতবড় সংসার তাকে চালাতে হয়। কাজেই দেনা করলে সে শোধ দেবে কেমন ক'রে? তাই দেনার নাম শুনলে মুখটা তার শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে যায়।

কিন্তু উপায় কি? ছেলেটার জ্বর হয়েছে আজ ক'দিন হ'ল। ডাক্তার ডাকতে হবে। অনেক কষ্টে সে ভাল হ'য়ে উঠল। আবার মীনাক্ষীর হ'ল এপেণ্ডিসাইটিস্। তখনই অপারেশনের ব্যবস্থা না করলেই নয়। মাইনের কটা টাকা কবে শেষ হ'য়ে গেছে। শুভেন্দু আর ভাবতে পারে না।

পাড়ার আবীদা ডেকে বলেন, এই নে টাকা। তোকে ভাবতে হবে না শুভেন্দু, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর।

সঙ্কোচে সন্ত্রাসে হাতটা তার কেঁপে ওঠে। কিন্তু সে শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্যে। এ ধার যে তার না করলেই নয়। কিন্তু শুধবে কি ক'রে? তা বলে চোখের সামনে ত সে এসব অচল অবস্থা দেখতে পারে না! যতক্ষণ পারে তাকেই ত চালিয়ে যেতে হবে।

পাড়ায় একটা সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। নগরের সেরা সেরা অভিনেত্রীরা আসবেন। চাঁদা হিসাবে তাকে অন্ততঃ পাঁচটা টাকা দিতেই হবে। পাড়ার ছেলেরা আরও বলতে থাকে, শুভেন্দু হ'ল পাড়ার একজন মুরুব্বী ধরনের লোক। কাজেই তার পক্ষে এটা না হ'লেই নয়। এমনই সব কত কথাই না তারা বলে যায় একে একে। ফলে শুভেন্দু তা থেকে পাঁচটা টাকা তাদের আর না দিয়ে পারল না। জল যে নীচু দিকেই গড়ায়, এ ত আর অজানা

নয়, তবু দিতে হয়।

পরের দিন এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া তার এগার বছরের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে শুভেন্দুর বাড়ী এসে ওঠে। একঘেয়ে জীবনে বড়ই কাহিল হ'য়ে পড়েছে, তাই কিছুদিন একটু হাওয়া বদল করে যাবে। শুভেন্দু শুনল সবই। কিন্তু দোকানী যে আর ধার দিতে চায় না। ছেলে-মেয়েগুলো বড় হয়েছে। কলেজে পড়াবার সাধ্য তার নেই। কোথাও একটা চাকরির হিল্লেও করতে পারেনি এতদিন। অথচ এইভাবে যে আর একটা দিনও তার কাটতে চায় না! কি করতে পারে সে এখন?

ধুঁকতে ধুঁকতে অফিস করে সে। চিঠি টাইপ করতে করতে আনমনা হ'য়ে চিন্তার মধ্যে ডুবে যায় শুভেন্দু।

বড় সাহেবের একটা জরুরী চিঠি টাইপ করতে হবে। এত দেরি হচ্ছে দেখে বড় সাহেব নিজেই উঠে এলেন। —একি শুভেন্দুবাবু, কতক্ষণ লাগে এই সামান্যটুকু টাইপ করতে?—বলে ওঠেন বড় সাহেব শুভেন্দুর পাশে এসে।

কিন্তু শুভেন্দু নিরুত্তর। টাইপ মেশিনের উপর মাথাটা রেখে সে যে বেশ আরামেই ঘুমিয়ে চলেছে! রাগে, অভিমানে ও বিরক্তিতে বড় সাহেব মাথায় একটা হাত দিয়ে মুখটা তুলে ধরতেই দেখেন এক ঝলক রক্ত মুখ থেকে গড়িয়ে সমস্ত কাগজপত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব দেখে বড় সাহেবের হাই ব্লাড প্রেসারটা সহসা নেচে ওঠে। তা ছাড়া ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও কাল রাত্রে একটু বেশী রকম খেয়ে পেটটা আজ ভালও ছিল না। এ অবস্থায় এই দৃশ্য দেখে তিনি আর সামলাতে না পেরে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

কাজে কাজেই এখন দুটো রোগীকেই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। এদের মধ্যে একজন খেতে না পেয়ে মরতে বসেছে, আর অপর জন খেয়ে খেয়ে মরমর হয়েছেন এই একই পৃথিবীতে।

এরপর আর কয়েকটা দিন মাত্র যেতে না যেতেই দেখা গেল, বিকেলে একদিন জাঁকজমক ক'রে সভা বসেছে। শুভেন্দুর ফটোর উপরে মালা দিয়ে ধূপ জ্বেলে শোক প্রকাশ করা হচ্ছে। নার্সিং হোম থেকে ফিরে এসে বড় সাহেব সভাপতির বক্তৃতায় যখন শুভেন্দুর দেশ সেবার সুখ্যাতি করছিলেন, তখন একজন বলতে চাইলেন যে, এই যে শুভেন্দুবাবু অভাবের তাড়নায় এভাবে পলে পলে মৃত্যুকে বরণ করলেন নীরবে, এটা আমরা কেন এতদিন দেখিনি?

কিন্তু তাকে কিছু বলতে না দিয়ে সভাপতি তার সমাপ্তি ভাষণ শেষ করলেন—এই জীবন সকলকে প্রেরণা দিক ব'লে!

যাকে অব্যক্ত কথাটি বলতে দেওয়া হ'ল না সে এখন পথ চলতে চলতে কেবল একটা কথাই ভাবতে লাগল যে, এমনই করে দেশে ও সমাজে শুভেন্দুদের কাছ থেকে আমরা শুধু নিয়েই যাব যুগ যুগ ধরে, দেবার কি আমাদের কিছুই নেই? ক্রমশঃ তার এ প্রশ্নও আজ মিলিয়ে গেল জনতার ভিড়ে, চাল-ডাল-নুন-তেলের চাহিদার চাপে।

প্রণতি

(মৃতের প্রতি)

শ্রীতারাপদ দাশ

হে নীরব-যাত্রী !
লহ মোর নমস্কার।
নির্মল নির্মাল্য তুমি পবিত্র কুসুম,
বিশ্ব-বিধাত্রীর,—স্নেহময়ী অধরার ॥

সুদুঃসহ অতীতেরে দিয়ে জলাঞ্জলি,
অজানা বিস্ময় পানে আছ মুখ তুলি ;
স্তব্ধতার সুপ্তিবক্ষে নিস্পন্দ, নির্বাক,
আশার পুলক চিত্র—মহাসাধনার ॥

তুচ্ছ করি জড়তার পার্থিব বন্ধন,
ভুলে গিয়ে সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন,
সঙ্কুচিত বেদনার অন্ধ কশাঘাত—,
মহাসন্ধানের পথে আজ অভিসার ॥

হাসি-অশ্রু, ক্লান্তি-দৈন্য, বিরোধ-বিদ্বেষ,
বিস্মৃতির আবরণে হউক নিঃশেষ ;
অবিশ্রান্ত জীবনের যাত্রাপথ তব
হোক্ দীপ্তিময়, বিদূরিত হোক্ অন্ধকার ॥

তাঁহার আহ্বানে, হে শুভ ইচ্ছা যত
হউক সার্থক—, সুনির্মল অনাহত
কল্যাণ সৌরভে ব্যাপ্ত হোক্ দিগন্তর,
পূর্ণ হোক্, শান্ত হোক, ব্যথা উপচার।

হে বিদেহী ! তোমার চলার পথে
লহ মোর ক্ষুদ্র নমস্কার ॥

কায়ার মায়া

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, কাব্যশ্রী

মধুর হেসে মধুর বেশে
উদিল চাঁদ গগন 'পর,
কিরণ-সুধা প্লাবিয়া দিক্
ঝরিয়া পড়ে যেন নিঝর !
তাহারে হেরি' সরসী-জলে,
কুমুদী-হিয়া ব্যথায় জলে,
কিরণ ঝরে বুকের 'পরে
তবু না ঘোচে দূরান্তর।
দূরের চাঁদ আসে না কেন
তৃষিত তার বুকের 'পর !

হাসিল চাঁদ সুদূরে রহি',
নিকটে তবু এল না হায়,
আবেশময় নয়ন মেলি'
কুমুদী পানে কেবলি চায় !
তবু যে হায়, দেয় না ধরা,
কত যে প্রেম হৃদয় ভরা,
কুসুম-হিয়া ভরে না তাই
বিরহ-তাপে পরান ছায় !
হাসিল চাঁদ সুদূরে রহি'
নিকটে তবু এল না হায় !

আকাশ হ'তে সরসী-জলে
নামিয়া এল চাঁদের ছায়া,
কুমুদী বলে—"কোথা সে প্রিয়,
এযে গো শুধু কায়ার মায়া !"
জোছনা-ধারা ঢলিয়া পড়ে,
কুমুদী-হিয়া কাঁদিয়া মরে,
বিরহ-তাপে নিজেরে দহি'
ঝরালো তার কোমল-কায়া !
কুমুদী-হিয়া পেল না চাঁদে,
পেল সে শুধু কায়ার মায়া !

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন)সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

সবুজ সঙ্কেত

(গল্প)

শ্রীনিরঞ্জন সেন

তারপর সন্ধ্যা এলো ঠিক আমার সময়েই। রোজ যেমন ভাবে আসে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা থাকে তারপর চলে যায়। তবুও ওদের ভাল লাগে নির্জনে এই গোপন মিলনটুকু। অকৃত্রিম সত্যকার ভাল লাগা। মিলন সেনের নির্জনতা-প্রিয় কবি-মন ঠাঁই নেয় কল্পনার উৎসে।

আজ যেন নতুন মনে হয় মিলনের সন্ধ্যাকে। সন্ধ্যা বিশ্বাস। মাথার খোঁপাটি সুন্দর করে সযত্নে জড়িয়েছে সন্ধ্যা।

—এই, আমার মাথার খোঁপাটির কি নাম বলতো?—ছোট্ট হেসে প্রশ্ন করে সন্ধ্যা।

মিলন চুপচাপ।

—কি? পারলে না তো! তবে আমিই বলে দিচ্ছি—'প্রজাপতি খোঁপা'। এ ছাড়াও আরো কত রকমের খোঁপা আছে শোন,—'নাগ খোঁপা', 'শিব-কামিন খোঁপা', 'অজন্তা খোঁপা', 'পান খোঁপা', 'অভিসারিকা খোঁপা'—ইত্যাদি ইত্যাদি!—মিলন!—শান্ত গলার স্বর সন্ধ্যার।

—বল—জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ধরে সন্ধ্যার মুখের ওপরে মিলন।

সন্ধ্যার মনোবীণায় নেপথ্যে একটু মধুর অনুরণন হলো।

—আজ আর তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না—আবেশ জড়ানো কণ্ঠ সন্ধ্যার।

—বেশ! যেও না—বলে মিলন সন্ধ্যাকে কাছে টেনে আনে!

ছায়া জড়ানো পরিবেশ। বনানী শ্যামল প্রান্তরে ওরা বসে আছে।--সন্ধ্যা বিশ্বাস আর মিলন সেন। বসন্ত এসেছে—নতুন পোশাক পরেছে বনানী—সবুজ পোশাক। সবুজ স্বপ্ন ওদের চোখে।

—মিলন! ভয় হয় যদি নিয়তির নিষ্ঠুর হাত আমাদের সব আশা ছিঁড়ে দেয়। তবে কি হবে বলতে পার। শুধু কি তাই মিলন, আরও কত কি........

—থামলে কেন সন্ধ্যা, বল—প্রশ্ন করে মিলন।

—আচ্ছা মিলন, সমাজ কি স্বীকৃতি দেবে আমাদের এই প্রেমকে—সমাজ এক অদ্ভুত সংস্কার জড়ানো সংস্থা—তাই বলছিলাম।

—শুধু তুমি আমি কেন, তোমার আমার মত অনেকেই হেরে গেছে সমাজের কাছে—গেছে—যাবেও—যাচ্ছে। মনের সব সাবলীলতা শেষ হয়ে যাবে—এই অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্য কোথায় চলে যাবে! সংস্কারান্ধ সমাজের কাছে প্রেমের কোন মূল্য নেই—স্বীকৃতিও!

সন্ধ্যাকে আরও কাছে টেনে আনে মিলন। সন্ধ্যার সুন্দর কমনীয় মুখখানা তুলে নিয়ে নিজের মুখের কাছে রাখে। সন্ধ্যার লাল গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট দু'টির ওপর নিজের ঠোঁট দু'টি রাখে মিলন।

—এই ছাড়, কেউ এসে পড়বে—একটা সলজ্জ ভাব ফুটে ওঠে সন্ধ্যার চোখে মুখে।

*　　*　　*

সত্যিই সংস্কারান্ধ সমাজের কাছে হেরে গিয়েছিল ওরা—সন্ধ্যা বিশ্বাস আর মিলন সেন। হৃদয়হীন সমাজ! ব্যর্থতার মর্মান্তিক পরাজয় সহ্য করতে পারেনি মিলন, তাই গ্রাম ছাড়ল। আর সন্ধ্যা রতনপুরের দাসেদের বাড়ীর বউ হয়ে চলে গেছে। রতনপুরের লোকে বলে ঘর আলো করা বউ! মৃগাঙ্ক দাসের পুত্রবধূর রূপের প্রশংসা রতনপুর ছাড়িয়ে গেল!

সন্ধ্যার কিন্তু রতনপুরের মিলন-হারা জীবনটা ভাল লাগে না। যা-হোক একটা কিছু করতে হবে—জোর পায় সন্ধ্যা মনে—ভালবাসার তাগিদে! পরিবর্তন এলো সন্ধ্যার—কেমন যেন হয়ে গেল সে।

এবার সন্ধ্যার নিন্দায় আর গ্রামে কান পাতা যায় না। কেউ বলে, কেমন মায়ের মেয়ে—আর বাপ মাতাল, চরিত্রহীন! ওর মা ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল—ছি! ছি!

সেই মায়ের মেয়ে তো সন্ধ্যা-বউ।

মিলনের ঠিকানা পেল ফুলকুমারীর কাছ থেকে—ফুলকুমারী ওর সই। ইলোরার ফুলকুমারী। ইলোরা ওদের পাশের গ্রাম।

মিলন,

তোমাকে আমি ভুলিনি। স্বরূপ (অর্থাৎ আমার স্বামী) আমাকে ছলনার আশ্রয় নিয়ে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে এনেছিল—তাকে তো আমি সুখী হতে দিই নি। স্বাভাবিকই!

কেবলমাত্র ফুলশয্যার রাতটা একঘরে ছিলাম—তাও ওর সঙ্গে একটি কথাও বলিনি—কাছেও যাইনি! তারপর থেকে আর কোন রাত এক ঘরে কাটাই নি। সব দিক থেকে আমি তোমারই আছি—থাকবও। কেবল আছে এখন সিঁথিতে একটা সিঁদুরের দাগ—কৃত্রিম লাল দাগ!

মিলন, আমি আর সেই সন্ধ্যা নেই। সেই মিষ্টি মধুর হাসি ভুলে গেছি। তুমি এখানে এসে দাসেদের বাড়ীর বউরূপে আমাকে দেখলে ভয় পাবে। সংসারটা ওদের ভেঙ্গে দিয়েছি—যেটুকু আছে তাও ভেঙ্গে দেব—দেবই ত!

সবাইকে কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি—স্বরূপকেও—কেবল তোমার কাছে যাব—আরও আপন করে কাছে পাব বলে।

তুমি আমাকে স্বীকৃতি দেবে তো তোমার স্ত্রীরূপে? উত্তর দিও।

তোমার-ই সন্ধ্যা

সুধাশশী বউ-এর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করল। বাড়ীর ঝি-চাকররাও ছেড়ে যেতে লাগল। নতুন যারা এলো তারাও ছাড়ল। সুধাশশী স্বামীকে বলে—রূপ! রূপ দেখে সন্ধ্যাকে ঘরের বউ করলে। আমি তো আগেই বলেছিলাম—ওর মা-বাবার কথা। কে না জানে ওর মায়ের ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটা!—তারপরে মিলন আছে। মিলন সেন। সন্ধ্যা ওকে ভালবাসতো।

সুধাশশীর সংসার ভাঙ্গছে। ভাঙ্গছে কেন সন্ধ্যা-বউ ভেঙ্গে দিল একেবারে। সুধাশশী পাগল হয়ে যাবে এমন অবস্থা হলো।

প্রতিশোধ—প্রতিশোধ নিয়েছে সন্ধ্যা! এবার দাস বংশের ইতিহাসে সে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। "বউ পালিয়েছে দাস বংশের"—একথা ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে! তা হলে আর কেউ ওদের ঘরে কুটুম করবে না।

স্বরূপ তো জানতো মিলন আর সন্ধ্যার ভালবাসার কথা—তবুও অদ্ভুত!

মিলন সন্ধ্যার চিঠির উত্তর দিয়েছিল যথাসময়ে। তাতে সন্ধ্যার প্রশ্নের উত্তরও ছিল—উত্তর মানেই সবুজ সঙ্কেত—নতুন দিনের ডাক। সন্ধ্যা আসছে—মিলনের প্রিয়া—মনের মানুষ। নীড় বাঁধবে ওরা। ছোট্ট একটি শান্তির নীড়!

অকৃত্রিম সত্যকার ভালবাসার মৃত্যু নেই—তাই সন্ধ্যার প্রশ্নের উত্তর মানেই সবুজ সঙ্কেত, তা আর বুঝতে কষ্ট হয়নি—হবেও না।

শ্রী ৪২০

শ্রীপথের সাথী

সুট বুট পরে যায়
বাবু যেন বড়লাট
চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি
পকেটটি গড়ের মাঠ।
বাবার হোটেলে খায় দায়
আর সিগারেট ফোঁকে

বন্ধুর পয়সা মেরে
সিনেমা হলে ঢোকে।
চায়ের দোকানে আড্ডা জমায়
তরুণী দেখে দেয় শিস
তাদের কেউ বলে বোম্বেটে
আবার কেউ বলে ৪২০।